গ্রাম বাংলার ইতিকথা

গ্রাম বাংলার ইতিকথা

ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টার-প্রণীত

'অ্যানাল্‌স অফ রুরাল বেঙ্গল'-এর বঙ্গানুবাদ

অ নু বা দ

অসীম চট্টোপাধ্যায়

সু ব র্ণ রে খা

কলকাতা ॥ ১৯৮৪

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৪

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদাব
সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড
অফিস ও বিক্রয়-কেন্দ্র :
সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর : পুলিনচন্দ্র বেরা
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : উইলিয়াম হজেস-অংকিত গ্রাম বাংলার চিত্র, ১৭৮৬
প্রচ্ছদলিপি : বিমল মজুমদার

উৎসর্গ

আমার বাবা ও মা—

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী শোভা দেবী-কে

মুখবন্ধ

বঙ্গদেশীয় সুধীজন সম্মুখে এই বইটির ভূমিকার কোনো প্রয়োজন নেই—অতি পরিচিত বইগুলির এটি অন্যতম। কিন্তু অনুবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

বইটির বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভবের গৌরব আমার নয়। ১৯৭৮ সনে জেল থেকে বেরিয়ে সর্বব্যাপী তাত্ত্বিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে একদিকে পথসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে যখন বিপর্যস্ত, মধ্যমবর্গীয় বুদ্ধিজীবী 'বাবু'গণ দ্বারা প্রায় পরিত্যক্ত হবার কারণে যখন বিব্রত, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে অনুবাদের প্রস্তাব নিয়ে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রদা 'মুশকিল আসান'-এর মতোই উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বইটি নির্বাচনের গৌরব রথীনদার। জীবন-জীবিকার প্রয়োজন ছাড়াও তিনটি কারণে এই প্রস্তাব গ্রহণ করি। প্রথমত, মূল্যবান এই বইটির বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয়তা। বঙ্গবাসী কতখানি আত্মবিস্মৃত সেই বিচারে না গিয়েও তার ইতিহাস চেতনার অভাব আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। অতি সাম্প্রতিক ইতিহাস-চর্চার বর্ধিত আগ্রহে এই অনুবাদ সহায়তা করবে—এই বোধ উৎসাহিত করেছে। দ্বিতীয়ত, এই বইয়ের সুবিশাল চালচিত্র জুড়ে বীরভূম জেলার উপস্থিতি। বীরভূমনিবাসী হবার কারণে এই বইয়ের প্রতি দুর্বলতা অনুবাদে প্রেরণা যুগিয়েছে। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতের পথসন্ধানে অতীতের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান। সমসাময়িক বহু সমস্যার সঠিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই অনুবাদ সহায়তা করতে পারে। এই অতীতচারিতা কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল, সে বিচার ভবিষ্যৎ করবে; কিন্তু সে প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কমলকুমার মজুমদারের একটি উক্তি মনে পড়েছে। একদা ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করার কারণে সমালোচকদের দ্বারা ব্যর্থ অতীতচারিতার অভিযোগের জবাবে তিনি বলেছিলেন—'বাবু নিশ্চিত জানিবেন, তীর সম্মুখগতি হেতু পিছু হঠে।'

অনুবাদের ভাষা প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, হাণ্টার সাহেবের আমলের ইংরেজির অনুবাদের জন্য তৎসম শব্দবহুল ভাষা ব্যবহার সংগত মনে করেছি। অতিসরল লোকায়ত ভাষা ব্যবহারে মূল গ্রন্থের গাম্ভীর্য, সংহতি ও আবেদন ব্যাহত

হবার সম্ভাবনা। এই ভাষা ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য গুরুচণ্ডালিতে অনুবাদ দুষ্ট কিনা, তা সুধীজন বিচার্য।

মূল গ্রন্থের এটি পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ। হাণ্টার সাহেবের আমলে সাঁওতালি ভাষায় লিখিত কোনো ব্যাকরণ না থাকার জন্য তিনি উপসংহারে সাঁওতালি ব্যাকরণের কয়েক পৃষ্ঠার এক উপক্রমণিকা যুক্ত করেছিলেন। বর্তমানে ডঃ অমলকান্তি দাস ও শ্রীযুক্ত দিলীপ সোরেনের পরামর্শ অনুসারে, বাহুল্য বিবেচনা করে এটি যুক্ত করিনি।

বর্তমান অনুবাদের সুযোগ করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রদা। শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা লিপি ঘটকের সার্বিক আনুকূল্য, পরামর্শ ও সংযোগিতা ছাড়া এই অনুবাদ সম্ভব ছিল না। বন্ধুবর ত্রিদিব চন্দ্রের পরোক্ষ সহায়তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মূল গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত সুজিত পোদ্দার। নির্ঘণ্ট ও নির্দেশিকা বিন্যাস করেছেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ। এ ছাড়াও বহুজন নানাভাবে সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতা
১ মার্চ, ১৯৮৪

অসীম চট্টোপাধ্যায়

অ ধ্যা য় সূ চি

প্রথম পরিচ্ছেদ

প রি চা য়ি কা

পলাশির প্রান্তরের পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে নিম্নবঙ্গের সীমান্তে মধ্যভারতের উঁচু মালভূমি ও গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে দুটি প্রাচীন রাজ্যের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আদিম যে শক্তি মধ্যবর্তী ভূভাগকে সমুন্নত শৈলশ্রেণীতে পরিণত করেছে, তা এখানে এসে খণ্ড-বিখণ্ড শৈলশিরাশ্রেণী ও বিস্তৃত ভূভাগকে তরঙ্গায়িত করে নিঃশেষিত হয়েছে। পশ্চিমে সমুন্নত সবুজ গিরিমালা। চারপাশে পুষ্পময় লতারাজির দুর্ভেদ্য ঘনসন্নিবদ্ধ বিস্তার। সমতলভূমির ওপর এখানে সেখানে দুর্গের মতো দণ্ডায়মান বিচ্ছিন্ন কবন্ধ পাহাড। পত্রাচ্ছাদিত গিরিগাত্রগুলি হতে চঞ্চল ঝর্ণা বহতা নদীসংগমের আকুলতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে উপত্যকার বুকে। বছরের একসময়ে নদীগুলি চওড়ায় আধমাইল, বিশফুট গভীর—বিপুল জলরাশির বিস্তার; আবার অন্য সময়ে এই নদীই বিস্তৃত বালুকারাজির মাঝে বিশীর্ণ রূপালি রেখাপ্রায়। উত্তরভাগে জঙ্গল এখনো আদিম—একদিকে হিংস্র জন্তুর গুপ্ত আস্তানা, অন্যদিকে নিরীহ তৃণভোজীদের জন্যে ছায়া-সুনিবিড় শান্তি' ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফলভারাবনত কুঞ্জশোভিত, এই সমতলভূমি, উজ্জ্বল সবুজ ধানের ক্ষেত চিত্রিত, সমৃদ্ধশালী গ্রাম খচিত, সাধারণভাবে ক্রমশ তরঙ্গায়িত হয়ে ধীরে পুবে অগ্রসরমান। পুববাংলার তুলনায় এখানের জমি কম উর্বর, তবু নিচু জমিগুলি দোফসলা এবং আবহাওয়ার দরুন বাড়তি পরিশ্রম কম ক্লান্তিকর। বনাঞ্চল কাঠ, আঠা এবং উজ্জ্বল লাক্ষা রঙের স্বতঃস্ফূর্ত ঐশ্বর্যে ধনী। উপত্যকা জুড়ে পাওয়া যায় সর্বোত্তম নীল; তাছাড়াও প্রভূত পরিমাণে জন্মে তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ এবং নানাধরনের শস্য; হারেমের সুন্দরীদের অঙ্গসজ্জার রেশম, তাও এখানে তুঁতঝাড় হতে এখনো তৈরি হয়, পর্বত খুঁড়ে রৌপ্যআকর আর পর্বতগাত্র হতে পাওয়া যায় তামা। নদীর বুক হতে ছেঁকে তোলা হয় ছোট-ছোট স্বর্ণকণিকা; এবং দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চল লোহা আর কয়লার জন্যে বিখ্যাত।

এই সুজলা ভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব ; বছরের পাঁচমাস এখানের আবহাওয়া চমৎকার।[১] এই অঞ্চল ভারতীয় ইতিহাসের আদিম সংগ্রামগুলির অন্যতম রণভূমি। নিম্নবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে এই অঞ্চল বারবার আর্য সভ্যতার সাথে আদিবাসীদের জঙ্গি অংশের সুতীব্র সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়েছে। তিন হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা পার্বত্যাঞ্চল ও গাঙ্গেয় উপত্যকার সংযোগকারী গিরিপথগুলি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আজ পর্যন্ত তারা সমতলের প্রতিবেশীদের তুলনায় বেশি তেজস্বী ; তাই প্রথম থেকেই দুটি রাজ্যের একটির নাম মল্লভূমি অর্থাৎ মল্লদের দেশ এবং অন্যটি বীরভূমি অর্থাৎ বীরদের দেশ আখ্যায় বিভূষিত।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার সঙ্গমস্থল এই সীমান্ত অতীত বহু ঘটনাবলীর সাক্ষী; কিন্তু অনুশোচনার বিষয় হলো এর কোনো লিখিত বিবরণী নেই। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক প্রান্তের এমনকি প্রত্যেক পাড়ার রয়েছে নিজস্ব বিবরণী, অথচ ভারতবর্ষে, সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চেয়েও আয়তনে বড় বিরাট বিরাট প্রদেশেরও কোনো রকমের নিজস্ব ইতিহাস লিখিত নেই। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বা সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে বিভিন্ন বিখ্যাত জেলার ক্ষণিক উল্লেখ হয়তো দেশের সাধারণ ইতিহাস বর্ণনায় রয়েছে, কিন্তু অপরিচিত এই গ্রামগুলির সাথে পরিচিত হবার আগেই বর্ণনা এগিয়ে চলে এবং এই সকল নামই হারিয়ে যায়। এমনকি এই দেশের অধিবাসীদের নিজেদেরও নিজ দেশের ইতিহাসের সাথে পরিচিতি বিশেষ নেই বললেই চলে। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি প্রতিটি আলাদা জমিরও নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। বিগত শতকে যে পরিমাণ ফসল এই জমিতে হয়েছে, কত রাজস্ব দেওয়া হয়েছে, কতবার এর মালিকানা বদল হয়েছে, জলনিকাশ এবং সীমানা নিয়ে পুরনো বিবাদ—এ সবই যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে জেলার বিগত দিনগুলির হাসিকান্নার হিসাব, এর স্মরণীয় পরিবর্তনগুলি, এর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বসমূহ, পুরনো ধরনের শিল্পের পতন এবং নতুনের উত্থান—, এক কথায় গ্রাম্যজীবনের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই সব বিষয়গুলিই হারিয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে লক্ষণীয়ভাবে রয়েছে বহির্জগতের সেই প্রভাব, যা জীবন দাবি করে। কিন্তু এখানে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের নিজেদের ভেতর মেলামেশা কম ; বর্ণবৈষম্য ও ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে পারস্পরিক সৌজন্য বা আতিথ্যের অবকাশ সীমিত এবং মহিলাদের সম্পূর্ণরূপে অন্তঃপুরবাসিনী করার ফলে ইয়োরোপীয় ধরনে সামাজিক মেলামেশার কোনো সুযোগ অনুপস্থিত। আঞ্চলিকতার যে শক্তিশালী বোধ ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় অভিজাতদের ঐক্যবদ্ধ রাখে, ভারতের ভূস্বামীদের মধ্যে সে বোধ বিকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। প্রতিটি পরিবার আপন দলিল দস্তাবেজ নিষ্ঠা সহকারে রক্ষা করে, কিন্তু তা অতি সতর্কভাবে আপন প্রতিবেশীদের থেকেও গুপ্ত। বস্তুত বর্তমানে যা নীরস,

সমকালীন ঘটনাবলী, আগামীদিনে সেটাই ইতিহাসের উপজীব্য—উদাসীন এ দেশীয় ধনী অভিজাতদের এটা কখনো খেয়ালই হয় না; আবার ব্যক্তিগত অহমিকা বা স্বার্থপরতার কারণে যেটুকু সামান্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি সংগ্রহ করার মতো কোনো সংগ্রাহকও নেই। বিগতদিনের ইংরেজদের তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ জাত ব্যক্তিগত দলিল-দস্তাবেজের সম্ভারের কাছে ইংলণ্ডীয় ইতিহাস আপন মূল্য ও আবেদনের জন্যে চিরঋণী; কিন্তু ভারতবর্ষে, গ্রামীণ প্রতিটি প্রজন্ম পুরুষানুক্রমে আপন স্বপ্ন লালন করে এসেছে এবং পরিশেষে সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছে বিস্মৃতির অতলে।

পারিবারিক দলিলপত্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্ভার আমার হাতে বিশেষ আসেনি। রাজাদের ভগ্নপ্রাসাদ হতে কিছু পুঁথিপত্তর আমার হেফাজতে আসে, অন্যান্য মান্যগণ্য পরিবারগুলির প্রতিনিধিরা একই পথের পথিক হয়; দেশব্যাপী ঘোরাঘুরি করার জন্যে পণ্ডিতদের নিযুক্ত করা হয়—যাদের কাজ হয় নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রত্যেক জেলার ইতিহাস রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ; এবং বেশকিছু দেশীয় ভদ্রলোক স্থানীয় লোকগাথা সংগ্রহে আমায় সহযোগিতা করেন। অবশ্য এই অনুসন্ধানের ফলাফল হয় যৎসামান্য এবং সেটুকুও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য না হবার ফলে প্রকাশনার অযোগ্য হয়। কিন্তু চার বছর আগে জেলার খাজাঞ্চি-খানার দায়িত্ব নেবার সময় একটি পুরনো সিন্দুক হঠাৎ আমার চোখে পড়ে; তালাগুলির অবস্থা দেখে মনে হয় বহুদিন ওগুলি খোলা হয় নি এবং ওর ভেতরে কি রয়েছে সে সম্বন্ধে স্থানীয় কর্মচারিরা কেউই অবহিত নয়। তালা ভাঙার পর পাওয়া গেল জেলার আদি আমলের কাগজপত্র—প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ-শাসন শুরু হবার অব্যবহিত পর হতে জেলার রেকর্ড সমূহ। কাগজপত্র জীর্ণ, প্রাচীন, কীটদষ্ট, পেলব স্পর্শেও ভঙ্গুর, কিছু কাগজপত্রের আবার একমাত্র অবশিষ্টাংশ হচ্ছে কুচি কাগজ এবং টুকরো উইমাটি।

এগুলি সযত্নে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করে নিশ্চিত হয়েছি। ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার সময়ের বা প্রাথমিক পর্যায়ের আর কি নির্ভরযোগ্য দলিল আমাদের আছে? প্রাচ্যে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিস্তৃত বিবরণ অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু এইসব বিবরণীগুলিই ইংরেজ সরকারের দলিল বা ভারতে ইংরেজ গভর্নরদের জীবনী, কোনোটিই ভারতীয় জনগণের ইতিহাস নয়। লক্ষ লক্ষ মূক, নিপীড়িত ভারতীয়দের কোনো ইতিহাস রচয়িতার সন্ধান আজো মেলেনি।[২]

গ্রামভারতের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে একমাত্র বিস্তৃত তদন্ত করেন জরিপ বিভাগ এবং এ বিষয়ে লভ্য এই একমাত্র দলিলটি দিয়েই এক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতার পরিমাপ সহজেই করা যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে বাংলাদেশের যে তিনটি নগরকে রাজধানী করে তিনটি জাতি পরপর রাজত্ব করে গেছে, সেই

তিনটি শহরের ইতিহাসই মূল বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজধানী কলকাতা সহ সমগ্র জেলার উৎপত্তি ও ইতিহাসে ব্যয়িত হয়েছে একপাতার সামান্য বেশি—তার আবার বেশ কিছু অংশ গ্রাস করেছে অন্ধকূপের এক অস্পষ্ট বিবরণী এবং পরবর্তী কালের বহু বর্ণিত সংঘর্ষগুলি। মুসলিম সমৃদ্ধির পুরনো কেন্দ্র মুর্শিদাবাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস আধ পাতায় শেষ! এবং বাংলাদেশে হিন্দুরাজাদের রাজধানী মালদহের বিচিত্র, দীর্ঘ, সমৃদ্ধশালী ইতিহাস বর্ণনায় এমনকি এক পৃষ্ঠাও প্রয়োজন হয়নি।

গ্রামের ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে প্রামাণ্য তথ্য সত্ত্বেও এই অবস্থা। মূল্যবান ব্যক্তিগত দলিলপত্রের অভাব সরকারি রেকর্ডের প্রাচুর্যের ফলে অনুভূত হয় না। আমি যে পুরনো দলিলপত্রের কথা বলেছি, বাংলাদেশের সব জেলার প্রধান সরকারি অফিস সেরকম কাগজপত্রে ভর্তি। রেকর্ড, চিঠিপত্র, কার্যবিবরণী, বিচারবিভাগীয় নথিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশের শাসনভার নিজেদের হাতে নেবার পরবর্তী পর্যায়ের প্রাত্যহিক ইতিহাস প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে যথেষ্ট সঠিকভাবে বর্ণিত রয়েছে। অনেক লেখার সংক্ষিপ্ত কাঠখোট্টা ধরন দেখলেই বোঝা যায় সেগুলি উত্তেজনা বা বিপদের আবেগতাড়িত তাগিদে লিখিত; কিন্তু অনুলেখকদের ভুলভ্রান্তি, কাগজপত্রের জীর্ণতা ছাপিয়ে ফুটে ওঠে বাস্তব জীবনের একটা ছাপ, যা রচনা দক্ষতার ফল নয়, বরং লিখিত বিষয়ে লেখকদের মগ্নতার প্রতিচ্ছবি। এইসব জীর্ণ পাণ্ডুলিপি হতে বোঝা যায়, ঘটনাবলীর যে সমাহার ভারতীয় ইতিহাস হিসেবে পরিগণিত হয়, সমসাময়িক ভারতীয় জনসাধারণের সুবিপুল অংশের কাছে তা বহুলাংশে ছিল অজানা এবং তাদের ওপর এসবের প্রভাব ছিল খুব সীমিত। বিগত শতাব্দীর উত্থান-পতন বা বিপ্লবের কোনো ছাপ এই ধূসর পৃষ্ঠাগুলিতে নেই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, বিভিন্ন রাজবংশের পতন ঘটেছে, কিন্তু জনগণের সুবিপুল অংশের সেজন্যে না ছিল কোনো সহানুভূতি, না ছিল কোনো বিস্ময়বোধ। এইসব বিপর্যয় বা বহির্জগতের আতংকের কারণে গ্রাম বাংলার জীবন বিন্দুমাত্র স্পন্দিত হয়নি। কিন্তু আমাদের জানা ঘটনাবলী সম্বন্ধে নীরব এই পাণ্ডুলিপিগুলি পশ্চিমি দুনিয়া যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে সম্বন্ধে সোচ্চার সঠিকতায় সরব। এখানে রয়েছে মুসলিম রাজত্ব অবসানের পর গ্রাম-ভারতের বর্ণময় এক ছবি। আমাদের ক্ষমতা দখলের ফলে সাময়িকভাবে জনগণের দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যাবার জটিল কারণগুলি এখানে ব্যক্ত। যে ভুল বোঝাবুঝি এবং বিপযয়কর দোদুল্যমানতার মাঝে আমাদের প্রথম দৃঢ় অগ্রগতি ঘটে, তা এখানে একের পর এক উন্মুক্ত। হীন উদ্দেশ্য ও সরকারি অযোগ্যতার পাশাপাশি দুর্লভ অনুরক্তি ও প্রশাসনিক দক্ষতা নিরপেক্ষভাবে এখানে চিত্রিত। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এই পাণ্ডুলিপিগুলি প্রাচ্যে ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্বের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে। এক অজ্ঞাত, অর্ধদমিত দেশের শাসনভার গ্রহণে কিভাবে স্বল্প

সংখ্যক আমাদেরই স্বদেশবাসী এগিয়ে এলো, তা এখানে প্রকাশিত। এইসব ব্যক্তিত্বের বীরত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামনে দেশীয় মনস্বীরা নত হয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের জন্যে মারাঠা সুলভ এক প্রকারের অমার্জিত প্রাধান্য অর্জন করে, কিন্তু গ্রামভিত্তিক এই নথিপত্র প্রমাণ করে যে, বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্বের স্থায়ী উৎস ছিল অসামরিক লোকদের সচেতন সাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি, অসাধারণ সামরিক সাফল্য নয়।

এখনো অলিখিত এবং যথার্থ ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে এই স্মৃতিকথাগুলি মূল্যবান ; কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনভার যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের কাছে এছাড়াও এগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনভার গ্রহণ করার পর হতে প্রচলিত দেশীয় প্রথার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে শাসন করার নীতি গ্রহণ করে। এই অঙ্গীকার পূরণে প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল দেশীয় এই প্রথাগুলি ঠিকভাবে নিরূপণ করা। এই উদ্দেশ্যে তদন্ত করার জন্যে তিরিশ বছর ধরে বারবার স্থানীয় অফিসারদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে ; ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্দেশ প্রত্যাহৃত হবার পরও খবরাখবর সংগ্রহ ও প্রেরণের রীতি ১৮২০ সন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গ্রামীণ রেকর্ডপত্রের সূচনার সময়টা বিশেষ ধরনের। ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রাচীন ও আধুনিক পর্যায়ের এটা সন্ধিক্ষণ। ভূমিরাজস্বের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা চালু করার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে; রাজস্ব সংক্রান্ত আইনসমূহের প্রতিটি দিক প্রতিটি জেলার কৃষি-অর্থনীতির প্রতিটি খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয়। ভূস্বামীরা কতদিন মালিকানাস্বত্ব ভোগ করছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথে তাদের সম্পর্ক, বর্গাদারদের রায়তিস্বত্ব, তাদের আয় ও জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের বেশবাস ও কর্মহীন দিনগুলিতে তাদের পরিবারের পেশা, গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য ; বিভিন্ন জমির ভিন্ন ভিন্ন খাজনা, জেলার খনিজ দ্রব্য, হস্তশিল্পী বা স্থানীয় উৎপাদকদের অবস্থা, তাদের মুনাফা ও দায়ভার ; স্থানীয় মুদ্রাব্যবস্থা ও বিনিময় প্রথা ; দেশীয় পুলিশি ব্যবস্থা, স্থানীয় জেলের অবস্থা এবং পরিশেষে সেস্, টোল, ঋণ ও আইনি বা বেআইনি সবরকমের কর ব্যবস্থা—একের পর এক এই সবই রিপোর্টের উপজীব্য হয়েছে। এককথায় বাংলার গ্রামীণ জীবন তার হাসিকান্না, হরেক অত্যাচারের চুলচেরা বিচারে এখানে উদ্‌ঘাটিত।

বর্তমান শতাব্দীর পঁচিশ বছরের শেষে আমূল রাজস্ব সংস্কারের পর প্রতি বৎসরান্তে আরো উপযোগী প্রশাসনের দাবি ওঠে। তাই এই বিষয়গুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিবেচনার অবসর বা মানসিকতা ছিল না। পূর্বতন জমানার অফিসারদের পরিশ্রমের ফসল সম্বন্ধে পরবর্তীরা উদাসীন হয়ে ওঠে, ভারতে সংগতিপূর্ণ এক গ্রামীণ আইনব্যবস্থা প্রণয়নের ভিত্তিস্বরূপ যে গবেষণায় আমাদের

সক্ষমতম প্রশাসকরা আমাদের শাসনকালের প্রথম পঞ্চাশ বছর নিজেদের একমনে নিয়োজিত করেন, পরের পঞ্চাশ বছরে তার অধিকাংশেই উই ধরে, ছাতা পড়ে।

এর ফলে রেকর্ডপত্র কত যে নষ্ট হয়েছে, তা কখনো জানা যাবে না। যেটুকু অবশিষ্ট আছে, একমাত্র রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে স্থায়ীভাবে তার সংরক্ষণ সম্ভব। উচ্চ-শিক্ষিত, পরিশীলিত জাতির ক্ষেত্রে জাতীয় ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর ছাড়া যায়; কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষে এই প্রকার গবেষণা পরিচালনায় যোগ্য, প্রাজ্ঞ ও শিক্ষিত শ্রেণী এখনো বিকশিত হয়নি।[৩] বাস্তবিক পুরোপুরি সুসভ্য নয় যেসব সমাজ সেখানে সরকারকে এখন অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, যেগুলি সভ্য সমাজে বিচক্ষণতার সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর অর্পিত হয়। ইয়োরোপীয় গ্রন্থাগারগুলি হতে আট হাজার মাইল দূরের জঙ্গলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবিকার্জনের প্রাত্যহিক দাবি মিটিয়ে বর্তমান রচনাটি লিখিত; তাই এর অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধ লেখক সম্পূর্ণ সচেতন। এই বিচ্ছিন্নতার কারণেই অনেক সহজবোধ্য ত্রুটি ঘটেছে; কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার জন্যেই আবার আজ পর্যন্ত অসম্পাদিত বহু কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রথম লণ্ডনস্থ ভারতীয় মহাফেজ-খানায়, কলিকাতায় এবং বাংলাদেশের প্রাদেশিক অফিসগুলিতে রক্ষিত পাণ্ডু-লিপিগুলির তুলনামূলক বিচার সম্ভব হয়েছে। জেলার ইতিহাস রচনার জন্যে দেশীয় পণ্ডিতবর্গ নিয়োজিত হয়েছেন এবং এই প্রথম বাংলাদেশের প্রাচীন পরি-বারগুলিকে তাদের পারিবারিক নথিপত্রের দপ্তর প্রদর্শনে রাজী করানো গেছে। সব ধরনের মিশনারিরা একযোগে সানন্দে এই কাজে যোগ দেন এবং পাহাড়িয়া আদিবাসীদের রীতিনীতি ও ভাষা সম্বন্ধে নিজ নিজ গবেষণালব্ধ ফলাফল দিয়ে আমাকে সহায়তা করেন। আমার সহায়তাকারীদের কোনো অংশকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলে যদি কেউ আহতবোধ না করেন, তবে স্বচ্ছন্দে বলা যায় সে ধন্যবাদ এইসব শ্রদ্ধেয় বিদগ্ধজনেরই প্রাপ্য।

প্রাথমিক এই রচনার যতই খামতি থাক, লেখকের বিশ্বাস এবং আশা যে, বিশাল এক তথ্যরাজির সম্ভার এর ফলে আবিষ্কৃত হবে, রক্ষিত হবে; প্রাপ্ত তথ্যাদির সার সংকলনের মাধ্যমে অমূল্য রচনাসম্ভার সম্ভব হবে। প্রাপ্ত তথ্যাদির সহায়তায় ভারত সবকার আজ পর্যন্ত অবহেলিত দুটি কর্তব্য সমাধান করতে পারবেন। প্রথমত—স্বজাতির প্রতি কর্তব্য অর্থাৎ বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র আনুষাঙ্গিক বিবরণী রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত—অন্য জাতিগুলির প্রতি কর্তব্য অর্থাৎ পাশ্চাত্য দুনিয়ার সম্মুখে ভারতের লক্ষ-লক্ষ গ্রামীণ জনসাধারণের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপিত করা।[৪]

উল্লেখপঞ্জি

১. 'এমন দেশটি যেখানে রয়েছে পাহাড় ও উপত্যকা, বনাঞ্চল ও নদনদী, ভূতত্ত্ববিদ ও সৌন্দর্য পিপাসুদের আকর্ষণযোগ্য দৃশ্যাবলীর প্রাচুর্য, আবহাওয়ার পরিবর্তনও বিচিত্র; শীতল ও পরিষ্কার রাত্রি : পেছনে পড়ে থাকে কলকাতার আর্দ্রতা আর কুয়াশা'। *The Grand Trunk Road, its Localities*, pamphlet কলিকাতা, পৃ. ১৮। একই পর্যটক কিছুটা অতিরিক্ত উৎসাহে বীরভূমের উচ্চভূমিকে বলেছেন 'বাংলার সুইজারল্যাণ্ড', পাদরি জেমস্ লং রচিত ও পরবর্তীকালে উদ্ধৃত বর্তমান পুস্তিকাটি সহ আরো কয়েকটি পুস্তিকা *Calcutta Review* পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. *The Grand Trunk Road, its Localities*, (পৃ. ১৬)। লেখকের মতে, বীরভূমি 'প্রায় অনাবিষ্কৃত', দশ বছরও হয়নি কলকাতার একশো মাইলের মধ্যে, মাত্র পাঁচ ঘণ্টার রেলযাত্রা সাপেক্ষে এই জেলা সম্বন্ধে একথা লেখা হয়েছে। আরো দূরবর্তী প্রদেশগুলি সম্পর্কে আমাদের তথ্যের পরিমাণ সহজে অনুমেয়।

৩. বীরভূমের উত্তরের জেলাগুলির পরিসংখ্যানগত ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনারত ডাঃ বুকানন বিশাল বিহার প্রদেশের কোনোস্থানে একটিমাত্র প্রাচীন নিদর্শনের বা একটিমাত্র ঐতিহাসিক দলিলেরও সন্ধান পাননি। *The History, Antiquities etc. of Eastern India*—R. Montgomery Martin কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের বুকাননের পাণ্ডুলিপি হতে সংকলিত, ৩ খণ্ড, ১৮৩৮; ১ম খণ্ড, পৃ. ২১। মাত্র কয়েকটি জেলায় সীমিত না হলেও এই গ্রন্থটি গ্রাম-বাংলার ইতিহাসের এক চমৎকার ভিত্তি হতে পারত।

৪. বাংলা সরকার বলতে পারেন, বর্তমান গ্রন্থটি যার প্রথম ফলশ্রুতি সেই গবেষণা করার জন্যে অন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম হতে আমায় স্বল্পকালীন অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্তটা সম্পন্ন হতে না হতেই ১৮৬৫-৬৬ সনের দুর্ভিক্ষ হাজির হয় এবং বাস্তব কাজকর্মের জন্যে সমস্ত অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতে দেশের অবস্থা

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯ মার্চ, ব্রিটিশ সরকার নিম্নবঙ্গের দুইটি বিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। অনিয়ন্ত্রিত সীমান্তের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত এই রাজ্য দুটি রাজধানী হতে নদনদী, জলাভূমি এবং প্রায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এতাবৎ দেশীয় রাজারা বংশপরম্পরায় এইগুলি শাসন করে এসেছেন।[১] ইংরেজরাও এপর্যন্ত এইখানে পূর্বাবস্থা অব্যাহত রাখে। এইসব অভিজাতবৃন্দের অবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্রিটেনের সীমান্ত শাসকদের অনুরূপ। অর্ধস্বাধীন শাসক হিসেবে তাঁরা রাজ্যশাসন করতেন; আবার সামান্য নজরানা এবং পশ্চিম-সীমান্তের প্রতিরক্ষার দায়িত্বগ্রহণের বিনিময়ে তাঁরা সুবে বাংলার নবাবের কাছ হতে সামরিক সনদ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু ১৭৮৭ সনের পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বৎসরে এঁদের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়। উত্তরের জেলা বীরভূমি যা সচরাচর বীরভূম বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে এক বিফল বিদ্রোহের ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার বোঝা দ্বিগুণ হয়; আবার যন্ত্রণাকর এক রোগের প্রাদুর্ভাবে একাদিক্রমে রাজারা সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হন। দক্ষিণে জেলা বিষ্ণুপুর—প্রাচীন নাম মল্লভূমি; এখানকার অবস্থা আরো খারাপ।[২] পারিবারিক কলহে রাজবংশ জীর্ণ; এবং শুভ্রকেশ, দুর্বল বর্তমান রাজা একের পর এক দুর্ভাগ্যের শিকার। উভয় রাজ্যেই উত্তরাধিকারী শাসক জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অক্ষম। সীমান্তে পর্বতশ্রেণী গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্রমে বিলীয়মান—বিভিন্ন দস্যুদল এইখানে সমাবিষ্ট। ১৭৮৪ সন নাগাদ অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটে, যে ব্রিটিশ শক্তির হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৭৮৫ সনের মে মাসে মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক পার্শ্ববর্তী বীরভূম সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে, অসামরিক কর্তৃপক্ষ, 'উপযুক্ত শক্তির অভাবে এইরূপ সশস্ত্র দলবলের মোকাবিলায় অপারগ' এবং চারশত সশস্ত্র দস্যুর মোকাবিলার প্রয়োজনে সৈন্য প্রেরণের জন্যে আবেদন

করেন।[৪] একমাসের মধ্যে দস্যুদের সংখ্যা 'প্রায় একহাজার' দাঁড়ায় এবং নিম্নভূমিতে সংগঠিত আক্রমণের জন্যে তারা প্রস্তুত হতে থাকে।[৫] এক বছরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ দস্যুদল বীরভূমে দৃঢ় ঘাঁটি গাড়ে, সুবিধাজনক সামরিক অবস্থানগুলিতে গড়ে ওঠে তাদের স্থায়ী শিবির, স্থানীয় রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া দূরে থাক, এক ঘণ্টার জন্যেও সিংহাসনে আসীন হতে অক্ষম ; সরকারি রাজস্ব মধ্যপথে লুণ্ঠিত এবং জেলার মধ্যে কোম্পানির ব্যবসায়িক লেনদেন একেবারে নিশ্চল।[৬] পুরনো ব্যবস্থাকে আর বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখা যাবে না, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই কারণে, দস্যুদলের বিরুদ্ধে রাজাকে সহায়তা করার জন্যে, কৃষকদের অভিযোগগুলি তদন্ত করার জন্যে এবং সামরিক সনদের দায়ভার হতে মুক্তি দিয়ে রাজ্যটিকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে নিয়ে এলে রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণ করার জন্যে, মুর্শিদাবাদ হতে অসামরিক একজন অফিসারকে প্রেরণ করা হয়।[৭]

এই ভদ্রলোকের প্রশাসনের কোনো বিবরণী আবিষ্কৃত হয়নি ; মনে হয় না তিনি বিশেষ কিছু করে উঠতে পেরেছিলেন, তবে সেরকম সময়ও তাঁকে দেওয়া হয়নি। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৭ সনে[৮] বাংলাদেশের বিভাগগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। সেই সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, কোনো আংশিক বা অস্থায়ী ব্যবস্থা দিয়ে এর কোনো প্রতিকার সম্ভব নয় এবং মুর্শিদাবাদের এক দূরবর্তী অধীন রাজ্য হিসেবে যতদিন বীরভূম থাকবে, পাহাড়িয়া দস্যুদের হাত হতে এর কোনো নিস্তার নেই। পূর্বেই দক্ষিণে বিষ্ণুপুর জেলার অবস্থা এত সঙ্গীন হয় যে, সেইখানে সরকারের একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধির উপস্থিতি আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই সীমান্ত রাজ্যদুটি মিলিত করে এক একীভূত ব্রিটিশ জেলা গঠন করতে লর্ড কর্নওয়ালিস মনস্থ করেন। সেইমতো, ১৭৮৭ সনের ২৯ মার্চ কলিকাতা গেজেটে (Calcutta Gazette) নিম্নোক্ত নিযুক্তি ঘোষিত হয় ; ডাবলিউ. পাই মহোদয়ের, বীরভূম ছাড়াও বিষ্ণুপুরের ইতিপূর্বে জি. আর. ফোলি মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল, জেলা সমাহর্তা হিসাবে নিযুক্তি অনুমোদিত।[৯]

বিষ্ণুপুরের কয়েকটি শহর লুণ্ঠিত হলে দস্যুদের পশ্চাদ্ধাবন করে মিঃ পাই বীরভূমে আসেন ; এছাড়া বীরভূম পরিদর্শনে তিনি আসেন বলে মনে হয় না। উপরিউক্ত নিযুক্তি ঘোষিত হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে হঠাৎ তিনি বাংলা দেশের দূরবর্তী প্রান্তে বদলি হন।[১০] এরপর আসেন মিঃ শেরবার্ন।[১১] তাঁর দেড় বৎসরের শাসনে জেলা সদর অজয় নদীর দক্ষিণের বিষ্ণুপুর হতে নদীর উত্তরে বর্তমান জেলা সদর সিউড়ি শহরে স্থানান্তরিত হয়। বড় বড় দস্যুদলগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে ; উভয় রাজ্যই সাধারণ নাগরিকে পর্যবসিত হয়। নতুন রাজ্য বিশেষত সীমান্তরাজ্য যেমন কঠোর হস্তে শাসন করা উচিত, মিঃ শেরবার্ন সেইভাবেই শাসন করেন। আজও পুরনো লোকজনদের মুখে তাঁর

নাম উচ্চারিত। সেইসময়, অবশ্য জেলার দায়িত্বে একজন উদ্যমী প্রশাসক থাকার একমাত্র ফল হতো দস্যুদল এক্তিয়ারের বাইরে সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ত; ১৭৮৮ সনের অকটোবর মাসে কলকাতার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হলো : অজয়ের দক্ষিণে সরকারি রাজস্ব ট্রেজারিতে আনার সময় সামরিক রক্ষীরা আক্রান্ত ও পরাজিত হয়েছে, পাঁচজন নিহত হয়েছে এবং ৩০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা (৩০০০ পাউণ্ড) লুন্ঠিত হয়েছে।[১২]

১৭৮৮ সনের নভেম্বরের প্রথমে, শেরবার্ন দুর্নীতি-পরায়ণতার সন্দেহে অপসারিত হন এবং কিছুদিন পর ক্রিস্টোফার কিটিং মহোদয় নিযুক্ত যুগ্ম জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৩] লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালের প্রথম বারো বছরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় প্রশাসনে নানা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। এর ফলে মিঃ কিটিং পূর্ণ কর্মক্ষম এক স্থানীয় প্রশাসন লাভ করেন। মিঃ শেরবার্নের আঠারো মাসের শাসনকালে, সীমান্তরাজ্য দুইটি সামরিক জায়গির থেকে রীতিমতো এক ব্রিটিশ জেলায় উন্নীত হয়েছে—শাসনকার্যের দায়িত্বে আছে জেলা। সমাহর্তা ও পেশাদারি সহযোগীরা, নিরাপত্তার জন্যে কোম্পানির সৈন্যদল, রয়েছে বহু সুরক্ষিত ফ্যাক্টরি, সামরিক প্রয়োজনে নির্মিত নতুন রাস্তা এবং ক্ষমতার কেন্দ্র কলকাতার সাথে প্রাত্যহিক যোগাযোগ। এই সময় হতে সমস্ত রেকর্ডপত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত আছে। ১৭৮৬ সনে জেলা সম্পূর্ণত রাজাদের দখলে ছিল ; ১৭৮৮ সন হতে সঠিক, যথাযথ তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব হয়। মধ্যবর্তী স্বল্প অবসরে রাজাদের ভাগ্যবিবর্তন ঘটেছে এবং স্থানীয় প্রশাসনে পরিবর্তন এসেছে সত্য, কিন্তু জনগণের অবস্থার কোনো গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেনি। ১৭৮৭ সনে মিঃ পাই-এর আমলে, লোকসংখ্যা, রীতিনীতি, দায়ভার বা সামাজিক মঙ্গলের বিচারে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের অবস্থা যা ছিল, ১৭৮৮ সনের নভেম্বরে একই থাকে। সেইসব সুযোগ সুবিধা বা অসুবিধা তাঁরা ভোগ করতেন, সেই সবই ছিল স্থানীয় সরকারের অবদান, ব্রিটিশ সরকারের নয়। এবং তাঁদের অবস্থা থেকে তৎকালীন অনুরূপ অর্ধস্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলির অধিবাসীদের অবস্থার মোটা-মুটি চিত্র পাওয়া যায়। দুনিয়ার অন্য প্রান্ত হতে দেখে, অতিক্রান্ত সময়ের মোহিনীমায়ায় পেলব, অবলুপ্ত প্রাচীন বস্তুর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে জনগণের এই অবস্থা পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনাধীন অবস্থা থেকে অধিক আনন্দময়, বাঙালিদের পক্ষে অধিক উপযোগী হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এই চিত্রায়ণ কতদূর যথাযথ, প্রত্যক্ষদর্শীদের ইতিহাস-অচেতন এই গ্রামীণ বিবরণীগুলির নিবিড় পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তা বোঝা যাবে।

১৭৬৯ সনের শীতকালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার জের দুই পুরুষ ধরে চলে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ইতিহাস ছিল

চমকপ্রদ সামরিক সাফল্যে প্রাণবন্ত কোম্পানির প্রশংসাপত্র সহ ধারাবাহিক সংগ্রামগুলির সমাহার ; সুতরাং যুদ্ধ বা সংসদীয় বিতর্কের সাথে সংযোগহীন এই ঘটনার সম্পর্কে তাদের বক্তব্য বিশেষ নেই বললেই চলে। যথার্থতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খতা সম্বন্ধে এত সচেতন মিল সাহেবও এই বিষয়ে দায়সারা মাত্র পাঁচ লাইনে[১৪] শেষ করেছেন এবং সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষ কমিশনের সদস্যরা এই বিষয়ে আরো বিস্তৃত তথ্যাদি পূরণে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করেছেন।[১৫] কিন্তু আমাদের শাসনের প্রত্যূষকালীন যে সর্বনাশা দুর্বিপাক আজ বহুযুগের ওপার হতে অণুবৎ প্রতীয়মান, সমকালীন বিবরণীগুলিতে তা বিরাট আকারে উপস্থিত। বাস্তবিক, পরবর্তী চল্লিশ বৎসরের বাংলার ইতিহাসের চাবিকাঠি এইখানেই নিহিত। বিজয়ী ইংরেজরা নিম্ন-উপত্যকার সর্বত্রই যে বিশাল, জনহীন প্রান্তরের দেখা পান সেইগুলির ওপরে এই ঘটনা নতুন আলোক-সম্পাত করে ; প্রকাশ করে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত প্রথা ও রীতিগুলি অকেজো হওয়ার ফলে প্রাচীন এক গ্রামীণ সমাজের অবর্ণনীয় দুর্দশা ; এবং পরিশেষে ব্যক্ত করে বিশৃংখল, খণ্ডিত অংশগুলির এক নতুন শৃংখলায় বিবর্তিত হওয়ার কাহিনী।[১৬]

নিম্নবঙ্গে প্রতি বছর ফসল কাটার মরশুম তিনটি : সামান্য পরিমাণে ভালো বসন্তের ফসল ; কিঞ্চিৎ অধিক শরৎকালীন আমন, এবং তারপর প্রকৃত ফসল কাটার মরশুম—হেমন্তের আউশ ধানের সম্ভার।

১৭৬৮ সনে ফলনের আংশিক ক্ষতির ফলে সরকারি রাজস্ব বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও, ১৭৬৯ সনের প্রারম্ভে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।[১৭] স্থানীয় অফিসারদের অভিযোগ ও আশংকা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় দপ্তরের কর্তৃপক্ষ জমির খাজনা কঠোরভাবে আদায় করার কথা প্রচার করলেন ;[১৮] এবং উত্তরের জেলা-গুলিতে কম হলেও, ১৭৬৯ সনের বর্ষা প্রাথমিকভাবে আশা সঞ্চার করল।[১৯] বদ্বীপ অঞ্চলে প্রবল বর্ষায় বন্যাজনিত সাময়িক ক্ষতিও হয় ; এবং পরবর্তী দুর্ভিক্ষের বছরে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে কোনো অভিযোগ উচ্চারিত হয়নি।[২০] বস্তুত শরৎকালীন ফলন এত ভালো হয় যে, মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও বঙ্গীয় পরিষদ (Bengal Council) মাদ্রাজকে বিপুল পরিমাণে শস্য প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।[২১] কিন্তু সেই মাস হতেই মরশুমি বর্ষা অসময়ে বন্ধ হয় এবং এই বর্ষণের ওপর নির্ভরশীল সমস্ত ফসল শুকিয়ে নষ্ট হয়। পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুপুরের দেশীয় অধ্যক্ষ লেখেন, 'ধানের ক্ষেত হয়ে ওঠে শুকনো খড়ের মাঠ'। সেই সময়, অবশ্য স্থানীয় কর্মচারিদের তরফে আসন্ন বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা এত সাধারণ ঘটনা ছিল যে, রাজ্যপাল কোনোরকম বিপদ সংকেত প্রেরণ করতে গররাজী হলেন। ১৭৬৯ সনে আসন্ন দুর্ভিক্ষের খবর গুরুত্ব সহকারে পরিচালক সভাকে (Court of Directors) জানিয়ে যে বক্তব্য প্রেরিত হয় তাতে পরিষদের সভাপতি

ভেরেল্স্ট-এর স্বাক্ষর ছিল না, পরিবর্তে পরিষদে গুরুত্বে দ্বিতীয় মিঃ কার্টিয়ার স্বাক্ষর করেন। পরে মিঃ কার্টিয়ারই পরবর্তী সভাপতি হন।[২২] সরকার সৈন্য-বাহিনীর জন্যে শস্য মজুত করা প্রয়োজন অনুভব করেন—ফলন খুব ভালো বা খুব খারাপ হলে এটা ছিল তৎকালীন সাধারণ দূরদর্শিতার অঙ্গ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মিঃ কার্টিয়ার তা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। সেই বৎসর ২৪ ডিসেম্বর, আউশ কাটার সাথে সাথে ফসল কাটার মরশুম শেষ; আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো কিছু ওপরওয়ালাদের না জানিয়ে মিঃ ভেরেল্স্ট পদত্যাগ করলেন।[২৩]

সেই দিনই মিঃ কার্টিয়ার প্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কিন্তু মনে হয়, ১৭৭০ সনের জানুয়ারির শেষভাগের আগে তিনিও ওপরওয়ালাদের কাছে আর কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি। সেই মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি লিখেছিলেন, একটি জেলায় দুর্দশা এত অবর্ণনীয় যে জমির খাজনা কিঞ্চিৎ কমানো আবশ্যক;[২৪] কিন্তু দশদিন পর তিনি সভাকে (Court) জানালেন যে, যদিও দুর্দশা নিশ্চিত-ভাবে খুব বেশি, তবু পরিষদ 'রাজস্ব বা ঘোষিত পাওনা আদায়ে কোনো ব্যর্থতা এখনো লক্ষ্য করেনি'।[২৫]

ইতিমধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে, কারণ শস্যক্ষেত্রে বসন্তকালীন ফসল দ্রুত, যদিও সাময়িক, উপশমের প্রতিশ্রুতি এনেছে। উপরন্তু জানা গেল যে, প্রদেশের উত্তরে গঙ্গার উভয় তীরে পর্যাপ্ত বার্লি এবং গমের ফলন হয়েছে।[২৬] জন-গণের দুর্ভোগ চরমে উঠল—সে দুর্ভোগ যে কী চরম, তা সময়মতো নির্ণয় করা কি সেই সময়ে, কি আজও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সমান কঠিন; এবং জেলাগুলি হতে উদ্বেগজনক খবরাখবর আসা সত্ত্বেও, ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ অবধি পরিষদ এইটিকে প্রধানত রাজস্বের প্রশ্ন বলেই বিশ্বাস করত। পরিষদ লিখল, 'খারাপ ফলনের কারণে প্রচলিত খাজনা দিতে কৃষকদের অক্ষমতা সম্বন্ধে নরম মনোভাব গ্রহণের বেশি কিছু সরকারের কাছে আশা করা যায় না'।[২৭] ফলন খারাপ হলে সাময়িকভাবে আংশিক খাজনা মকুব বা আগাম দেওয়া সেই সময়ে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৭৬৯-৭০ সনে এই প্রকারের প্রশ্রয় বারবার প্রস্তাবিত হলেও সামান্য একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কোথাও রূপায়িত হয়নি। বিভিন্ন প্রকারের দাতব্য যোজনা পেশ করা হয়, কিন্তু এই পর্যায়ে বিলেতে প্রেরিত চিঠিপত্রে প্রয়োজনীয় কোনো রিলিফের ব্যবস্থার কোনো উল্লেখ নেই, এবং পরে দেখা যাবে, স্থানীয় প্রচেষ্টাগুলি ছিল দুঃখজনক ভাবে অপর্যাপ্ত। এপ্রিল মাসে যৎসামান্য বসন্তকালীন ফলন তোলা হলো এবং মুসলিম অর্থমন্ত্রীর পরামর্শে পরিষদ পরবর্তী বৎসরের জন্যে জমির খাজনায় আরো শতকরা দশটাকা যোগ করলেন।[২৮]

কিন্তু দুর্দশা যে হারে বাড়তে থাকল তাতে সরকারি গণনা বিভ্রান্ত হয়ে

পড়ল।[২৯] বিস্ময়কর ও অতীব করুণ নীরবতার সাথে দুঃখকষ্ট সহ্য করার বাঙালি বৈশিষ্ট্য অবশেষে ভেঙ্গে পড়ল ; মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘুম ভাঙলো—চতুর্দিকে তখন সর্বব্যাপী ও প্রতিকারহীন অনাহার। অবশেষে তাঁরা লিখলেন, 'মৃত্যুহার, ভিক্ষাবৃত্তি বর্ণনাতীত। একদা প্রাচুর্যময় পূর্ণিয়াপ্রদেশে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি অধিবাসী মৃত এবং অন্যান্য প্রান্তেও একই দুর্দশা'।[৩০]

সেই সময়ে স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বে পূর্বতন দেশীয় অফিসাররা থাকা সত্ত্বেও সরকারের এই বিপর্যয়ের প্রকৃত চেহারা বুঝতে অক্ষমতা আরো আশ্চর্যজনক।[৩১] একজন মুসলমান রাষ্ট্রমন্ত্রী[৩২] সমস্ত অভ্যন্তরীণ সরকারি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতেন ; সারা প্রদেশ জুড়ে ছিল মধ্যস্বত্বভোগীর দল, প্রতিটি খামারে ছিল তাদের নজর, এবং প্রতিটি ক্ষেতের শস্য নিয়ে তাদের চতুর হিসেব চলত ; গ্রামীণ বিচারালয়ে আসীন ছিলেন দেশীয় বিচারকবৃন্দ ; এবং তখনো পুলিশ প্রশাসনের সর্বময় দায়িত্বে ছিল দেশীয় অফিসারেরা। এই সকল লোকই এই দেশ, এর সক্ষমতা, গড ফলন, মোটামুটি প্রয়োজনীয় পরিমাণ, এইসব এত ভালোভাবে জানত, যা চরম অধ্যবসায়ী কোনো ইংরেজ অফিসারেরও কখনো আয়ত্তাধীন হওয়ার নয়। বাস্তব অবস্থাকে আরো খারাপ হিসেবে চিত্রিত করা তাদের স্বার্থের অনুকূল ছিল ; কারণ দুর্দশা যত চরম, জমির খাজনা আদায়ের কৃতিত্ব তত বেশি। প্রতিটি আলোচনা সভাতেই আসন্ন বিপদাশংকা জনগণের দুঃখ-দুর্দশার এক অতিরঞ্জিত চিত্র তারা হাজির করত। কিন্তু সমস্যাটি যে রাজস্বের নয়, বরং মহামারীর—এই প্রত্যয় বিগত শীতকালে পরিষদের মাথায় ঢোকে বলে মনে হয় না। এই আপাত আশ্চর্যজনক ভুল ধারণার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বর্তমান।

ইতিহাসের আদিপর্ব হতে নিম্নবঙ্গের অধিবাসীরা যেরূপ সংযমী, আত্মমগ্ন, বিদেশি মতামতে অবিশ্বাসী, তার সাথে অন্য কোনো সভ্য জাতির তুলনা হয় না। এই অনীহার কারণ পরে ব্যাখ্যা করা যাবে ; কিন্তু বিগত অভিজ্ঞতা বা জনগণের বর্তমান অবস্থার সাথে পরিচিত কেউই এর ফলাফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারে না। স্থানীয় কর্মচারিরা যতই ভীতিপ্রদ রিপোর্ট লিখুক না কেন, বিরাজিত চরম আপাত প্রশান্তি তাদের আশংকাকে খণ্ডন করে। দুর্দশার যুক্তিগ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ প্রায়শই অনুপস্থিত ; এবং ১৭৭০ সনের মতো যখন প্রচুর লক্ষণ দেখাও যায়। সচরাচর তার বিপরীত লক্ষণেরও কোনো অভাব থাকে না। যে অবিচল স্থৈর্যের সাথে বাঙালি বাঁচে, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য তাতে কোনো দাগ কাটতে পারে না। সে সম্পদে মৌন, বিপদে অবিচল। তার চারিত্রিক আবেগপ্রবণতা কঠিন সংযমে আবদ্ধ, তার ঘৃণা দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু অব্যক্ত ; তার কৃতজ্ঞতা বংশানুক্রমিক। আব্রু বজায় রাখার জন্যে আবেগের চরম প্রকাশ ঘটে পারিবারিক সম্পর্কে।

এমনকি দীনতম পরিবারেও বহিরাগতদের বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের জন্যে বহির্বাটির একটি ঘর—বৈঠকখানা—নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু এর ওপারে অন্তঃপুরের সবকিছুই রহস্যাবৃত, প্রতিবেশীর স্ত্রী বা কন্যার প্রসঙ্গে মামুলি শিষ্টাচার সম্মত প্রশ্ন করতে এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও সাহসী হয় না, ইয়োরোপীয় শিষ্টাচারে যা সামান্য পরিচিত জনদের কাছ হতে বরং প্রত্যাশিত। এই পারিবারিক গোপনীয়তা বজায় রাখা যথেষ্ট মূল্য সাপেক্ষ। ১৮৬৬ সনের দুর্ভিক্ষে দেখা যায় যে, মান্যগণ্য শ্রেণীর মহিলাদের নিকট কোনোপ্রকার সরকারি সহায়তা পৌঁছানো অসম্ভব, এবং বহু গ্রামীণ পরিবার নীরবে, ধীরে ধীরে, প্রতিবাদহীন, অনাহারমৃত্যু বরণ করে।

১৭৭০ সনের সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে গণমড়ক অব্যাহত থাকে। কৃষকরা গবাদি পশু বিক্রি করে দেয়; বিক্রি করে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, তারা বীজধান খেয়ে ফেলে; নিজেদের ছেলেমেয়েদের তারা বিক্রি করতে থাকে এবং তারপর তারও কোনো ক্রেতা পাওয়া যায় না।[৩৩] তারা গাছের পাতা, ক্ষেতের ঘাস খেতে থাকে;[৩৪] এবং ১৭৭০ সনের জুন মাসে দরবারে আবাসিক প্রতিনিধি (Resident at the Durbar) শবভক্ষণের সত্যতা সমর্থন করেন।[৩৫] দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, রোগগ্রস্ত হতভাগ্যের দল দিবারাত্রি বড় বড় নগরগুলি পূর্ণ করতে থাকল। বছরের প্রথমে মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদে গুটিবসন্ত দেখা দিল, হানা দিল খোদ নবাবের প্রাসাদে এবং নবাব সাইফুতের প্রাণহরণ করল।[৩৬] অর্ধমৃতদের সাথে শবদেহের অবিন্যস্ত স্তূপে পথ অবরুদ্ধ; নির্বিচারে কবর দিয়েও সমস্যার আশু সুরাহা হলো না; এমনকি প্রাচ্যের ঝাড়ুদার হিসেবে খ্যাত শিয়াল-কুকুরের দলও সাফাইয়ের বিতৃষ্ণাকর কাজে ব্যর্থ হলো এবং অবশেষে পচাগলা শবদেহগুলি নাগরিকদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুললো।

দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে তরুণ এক প্রশাসক কলকাতায় অবতরণ করেন; প্রাচ্যে যে কোনো ব্রিটিশ প্রজার স্বপ্নস্বরূপ সর্বোচ্চপদে তিনি পরবর্তীকালে আসীন হন। জন শোর, পরবর্তীকালে লর্ড টেইনমাউথ ছিলেন অসাধারণ সৎলোক, এবং অতিরঞ্জনের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ বিতৃষ্ণা। ১৭৭০ সনের ঘটনাবলী তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করে; ঘটনাবহুল কর্মজীবন বা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সক্রিয় জীবন সত্ত্বেও সেই স্মৃতি অটুট থাকে। উচ্চপদে আসীন থাকাকালীন অনটনের সামান্যতম পূর্বলক্ষণে তাঁর অদ্ভুত সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দেখা যেত, এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার আশায় তিনি বিশদ এক ব্যবস্থা কায়েম করেন। গণমৃত্যু জনিত যে বিপর্যয় আমরা বর্ণনা করছি, তাকে কেন্দ্র করেই তাঁর সবচেয়ে ঐতিহাসিক কীর্তির জন্ম;[৩৭] এবং প্রায় চল্লিশ বছর পরে প্রাচ্যে কর্মজীবনের বহু পরবর্তী ঘটনাবলী বিস্মৃত হওয়া সত্ত্বেও ১৭৭০ সনের অবিস্মরণীয় বিভীষিকা তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হয়। যদিও বেসরকারি প্রত্যক্ষদর্শীর একমাত্র বর্ণনা ছন্দোবদ্ধ কবিতায়

পাওয়া অনুশোচনার বিষয়, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে জন শোরের কবিতা অনেকের গদ্যরচনার চেয়ে বেশি তথ্যনির্ভর—

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue ;
Still hear the mothers shrieks and infant's moans,
Cries of despair and agonizing moans,
In wild confusion dead and dying lie ;—
Hark to the jackal's yell and vultures cry,
The dogs fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey !
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface."

এখনও টাটকা রয়েছে স্মৃতিতে, ভাসছে দৃশ্য নয়নের 'পরে,
দড়ি দড়ি সব শুকনো শরীর, বিবর্ণ দেহ, চক্ষু কোটরে,
চিল চিৎকারে জননী আকুল, এখানে ওখানে শিশুর গোঙানি,
বুকভাঙা ব্যথা, যন্ত্রণা নীল হতাশ বিলাপ চারিদিকে শুনি
যত মৃত আর মৃত্যুগামীরা জড়াজড়ি করে কী তালগোল,
কানে আসে শুধু শৃগালের রব, মত্তলোলুপ গৃধিনীর বোল,
দিনের আলোয় পথকুকুর দঙ্গল বেঁধে গর্জে বেড়ায়,
শবদেহ নিয়ে অবাধ উৎসব, বিকট উল্লাসে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়,
চারিদিকে শুধু বিভীষিকা নাচে, স্তব্ধ লেখনী, মৌন কবি
সময় গড়াবে স্মৃতির পরতে দগ্‌দগে রবে এই প্রেতছবি ॥[৩৮]

প্রাচীনকালে 'মহামারী' এবং 'দুর্ভিক্ষ' কথাগুলি যে অর্থে ব্যবহৃত হতো, খ্রীস্টীয় মানবিকতা ও আলোকপ্রাপ্ত শাসনপদ্ধতির ফলে আধুনিক শাসকবর্গ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বাস্তবিক, দুর্ভিক্ষ কথাটির অর্থ কি হতে পারে, বঙ্গদেশে সাম্প্রতিক বিপর্যয় তায় কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিয়েছে ; কিন্তু বর্তমান দুর্ভিক্ষের চরমতম অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় অফিসারেরাও পুরনো জমানার দুর্ভিক্ষের ফলাফল কল্পনা করতে ব্যর্থ হবেন। যদি কেউ শোরের কবিতাকে অতিরঞ্জিত বা আমার বর্ণনাকে অত্যুক্তি বলতে প্রলুব্ধ হন, তাই কয়েক শতাব্দী পূর্বে গৌড়ের বিপর্যয়ের আক্ষরিক বর্ণনা তৎকালীন মুসলমান লেখকদের রচনা হতে উদ্‌ধৃত করছি।[৩৯] ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যূষে ১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষ যেমন এক আতংকজনক প্রেতমূর্তির মতো দণ্ডায়মান, বাংলার মোগল সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির বৎসরটি তেমনই এক বিপর্যয় দ্বারা চিহ্নিত—এই বিপর্যয় এই হিন্দু রাজধানী কোনোদিন

সমস্ত সরকারি ও অধিকাংশ সত্যসচেতন লেখকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।[৫৫] এই হচ্ছে একক দুর্দশার সমাহারের এমন এক প্রতীক যা ইতিহাসের স্মরণাতীত কালের মধ্যে কোনো ইয়োরোপীয় জাতিকে কখনো ভাবতে হয়নি। দুর্ভিক্ষের কুড়ি বছর পরে মোট জনসংখ্যার হিসেব দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ হতে তিন কোটির মধ্যে; এবং এক মরশুমের শস্যহানি ও পরের বছরের অনটনের কারণে মাত্র নয় মাসের মধ্যে এককোটি লোকের জীবনহানি ঘটে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ব্যতীত কোনো উপায় থাকে না।

এদের মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী, আজকের দিনে যে কোনো ইংরেজের মনে এই প্রশ্ন সর্বপ্রথম উদিত হওয়া স্বাভাবিক; আমি যে সময়ের কথা লিখছি, সে কালে কি আমাদের স্বজাতীয়দের, কি ভারতীয়দের মনে এই প্রশ্ন সর্বশেষে উদিত হতো। ১৭৭২ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ জনসাধারণ বাংলাকে একটা বিশাল গুদামখানা হিসাবে দেখত, যেখানে বেশ কিছু দুঃসাহসী ইংরেজ মোটা লাভে এবং বিশাল পরিসরে ব্যবসা চালাচ্ছে।[৫৬] বিপুল দেশীয় জনসংখ্যা সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল ঠিকই, এটাকে তারা একটা আকস্মিক পরিস্থিতি বলে বিবেচনা করত এবং বর্তমানে আমরা নাটাল বা বা প্রিয়েরি-লিয়নের আদিবাসীদের সম্পর্কে যে আগ্রহ বোধ করি, তার চেয়েও কম আগ্রহ তারা এ সম্বন্ধে বোধ করত। লক্ষ-লক্ষ ভারত-বাসীকে ব্রিটিশ জাতির সামনে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তাদের জীবন স্পন্দন ও যন্ত্রণাসহ উপস্থিত করা যে বার্ক্রীর নিয়তি ছিল; এই বিপর্যয়ের অন্যূন চার বছর পূর্বে তিনি ওয়েনডোভারে আসীন হয়েছিলেন; একজন ব্রিটিশ অভিজাতের ব্যক্তি-গত সচিব হিসেবে তিনি পার্লামেন্টে প্রবেশাধিকার পান এবং তখনো পর্যন্ত এক-জন আইরিশ সাহিত্যকার হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র মহল দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটি ব্যতীত দেশীয় অন্য কোনো মহলে এসব, ক্ষেত্রে এমনকি এত দেরিতেও এই দায়িত্বের প্রশ্নটি সম্ভবত উঠত না। জীবনহানি গৃহীত হতো শস্যহানির স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত পরিণাম হিসেবে। ফসল হয়নি, সুতরাং সাধারণ ও ন্যায়সংগত ঘটনা পরম্পরায় লোক মরেছে।

কিন্তু বিয়োগান্ত এই কাহিনী আজ জেনে কোনো ইংরেজ সন্তুষ্ট হতে পারে না। এটাও জানা থাক যে, কলিকাতায় ইংরেজ পরিষদ (English Council) এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রারম্ভেই তারা শস্য নিয়ে মজুতদারি ও একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন এবং এই রায় যাতে সম্যক গুরুত্ব পায়, তার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন।[৫৭] এই পদক্ষেপের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে পরে আমায় বলতে হবে; কিন্তু এর উদ্গাতারা যে সচেতনভাবেই এই রোগের দাওয়াই হিসেবে এইগুলি গ্রহণ করেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাঁরা শস্য রফতানির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং এইভাবে প্রদেশের সামান্য

মজুতকে নিজেদের বিবেচনামতো যথাসাধ্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। বেসরকারি সাহায্য ও চাউল আমদানির কথাও অনুরূপভাবে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু এইসব ব্যবস্থাই গৃহীত হয় শোচনীয় ভাবে অপ্রতুল মাত্রায়। মাসে বিশ-হাজার লোক মারা যাচ্ছে যে জেলায়, তার প্রাপ্য কোটা ছিল মাত্র একশত পঞ্চাশটি টাকা। চার লক্ষ উপবাসী মানুষের জন্যে এক প্রাদেশিক পরিষদ গভীর বিবেচনার পর মহানুভবতার সাথে প্রতিদিন অনুদান হিসেবে দশ শিলিং মূল্যের চাউল অনুমোদিত করেন;[৫৮] এবং 'অর্ধেক কৃষক ও প্রজা উপবাসে মারা যাবে' এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও, পরিষদ তিন কোটি মানুষের ছয় মাস নির্বাহের জন্যে কোম্পানির অনুদান ধার্য করেন ৪ হাজার পউণ্ড।[৫৯]

অতিরিক্ত যে কোনো ব্যয়ভার দেশীয় রাজাদের বহন করতে হবে, তারা এই শর্ত আরোপ করেন। দেশীয় অভিজাতরা তাঁদের সাধ্যানুযায়ী কর্তব্য পালন করেন বলেই মনে হয়।[৬০] কোম্পানির ৪০ হাজার পাউণ্ডের সাথে তাঁরা ৪,৭০০ পাউণ্ড যোগ করেন এবং তাঁদের উপরই অতিরিক্ত যে কোনো ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কিন্তু বিপর্যয়ের মুখে এই সমগ্র অর্থই সম্পূর্ণ অপ্রতুল প্রমাণিত হয় এবং কোষাধ্যক্ষরা সচেতন হবার আগেই, শস্য আমদানির জন্যে ১৫ হাজার পাউণ্ড এবং বীরভূম সহ অন্যান্য সীমান্ত জেলাগুলিতে অতিরিক্ত আরো ৩,১০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়।[৬১] অতিরিক্ত এই খরচের চরম বিশৃংখলা ও বহু অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ আসে এবং সরকারি সহায়তার পরিমাণ নির্ণয় করা সুকঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু একদিকে, দেশীয় রাজন্যবর্গ অতিরিক্ত দায়ভার গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন; অন্যদিকে দেশীয় রাজারা ইতিমধ্যে বিশাল অর্থদান করেছেন বিবেচনা করে, গোপন কমিটি (Secret Committee) তাঁদের উপর আরো ভার অর্পণ না করতে সুপারিশ করেন; এবং পরিশেষে আশ্বস্ত করা হয় যে, কোম্পানির তহবিল হতে ৬ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হয়েছে।[৬২] পশ্চিমের জেলাগুলিতে যে ৩০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয় তা এর অতিরিক্ত ধরে নিলেও, যখন সরকারি সাহায্য প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জানার জন্যে পরিচালক সভা চাপ দেন, পরিষদ সর্বসাকুল্যে ৯ হাজার পাউণ্ড খরচ দেখাতে পারেন। তিন কোটি মানুষের জন্যে—যাদের প্রতি ষোল জনে ছয়জন মারা যাবার সত্যতা সরকারিভাবে স্বীকৃত।[৬৩]

দান হিসেবে বিতরিত ও শস্য আমদানির জন্যে নির্ধারিত টাকার সর্বমোট যোগফল এই সামান্য টাকা। বাস্তবিক শস্য আমদানির ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ও হৃদয়হীনতার চিত্র প্রকাশিত হয়, তাতে সরকার অনুমোদিত নামমাত্র এই সামান্য ভাতাও প্রকৃত নির্যাতিতদের হাতে যায় কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যে শস্য নিয়ে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে সমগ্র প্রশাসন অভিযুক্ত হয়। অপরাধীদের নাম দাবি করে পরিচালক সভা বৃথাই একের পর এক পত্রে রোষ প্রকাশ করেন। সন্তোষজনক কোনো প্রকার তদন্ত কখনো করা

হয়নি ; মর্জিমাফিক দামে কৃষকদের স্বল্প সঞ্চয় কেড়ে নেওয়া, অন্য প্রদেশ হতে আমদানিকৃত শস্য বোঝাই নৌকা থামিয়ে জোর করে খালি করা এবং পরবর্তী বৎসরের জন্যে প্রয়োজনীয় বীজ ধান বিক্রি করতে রায়তদের বাধ্য করা—এ সকল অভিযোগেই শাসকবর্গের দেশীয় অনুচরেরা আজও অভিযুক্ত।[৬৪] সরকারি কাজে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেই অপরাধীরা রয়েছে, পরিচালক সভার এই সন্দেহ প্রকাশ মোটেও অমূলক নয় ; এবং অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই অপরাধে লিপ্ত থাকার দায়ে একমাত্র যে উচ্চপদাধিকারীর বিচার হয়, তিনি হলেন দেশীয় অর্থমন্ত্রী, যিনি ইংরেজ প্রশাসনের দুর্নীতি প্রকাশে অটল ছিলেন। বলে রাখা ভালো যে তিনি বেকসুর মুক্তিলাভ করেন।[৬৫]

এছাড়া অন্যসব ত্রাণকার্য হিসাবে উপদ্রুত এলাকা হতে সৈন্যাপসরণ ও রাজস্ব হ্রাস প্রস্তাবিত হয়। বিলেত হতে প্রাপ্ত সাধারণ আদেশের অজুহাতে প্রথম ব্যবস্থাটি রূপায়িত হয় না—শক্তিশালী প্রশাসনের এরকম এক অসাধারণ দুর্বৎসরে সাধারণ আদেশ সাময়িকভাবে বাতিল করার কথা। উত্তপ্ত আবহাওয়াকেও অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয় এবং এইরকম পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক বিপদের ভিত্তিহীন আশংকা প্রকাশ করা হয়, অবশ্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চলে এবং রাজার কাছে চিত্রিত করা হয় যে, তাঁরই সুবিধার জন্যে এইটা করা হচ্ছে ; সুতরাং দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে ইংরেজ প্রশাসন সেনাবাহিনীর জন্যে যথেষ্ট শস্য মজুত তো করেই না, বরং কৃষকরা অভিযোগ করে যে, তাদের বাঁচার শেষ সম্বলটুকু সামরিক বাহিনী ছিনিয়ে নেয়।[৬৬] ভূমিরাজস্ব হ্রাস ও কৃষকদের অগ্রিম দাদনের জন্যে স্থানীয় কর্মচারির ক্রমাগত আবেদন করলেও, তার বাস্তব কোনো ফলাফল লক্ষিত হয় না। যে বছরে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ এবং কৃষক সমাজের শতকরা ৫০ ভাগ ধ্বংস হয়, সে বছরে জমির খাজনা শতকরা পাঁচ-ভাগও কমে না, আবার আগামী বছরের (১৭৭০-৭১) জন্যে আরো শতকরা দশ ভাগ বাড়ানো হয়।[৬৭] উড়িষ্যার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের সময়ে বঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টার সাথে যারা পরিচিত, ১৭৭০ সনে ত্রাণ ব্যবস্থার বিবরণ তাদের কাছে অমানবিক রূপে অপ্রতুল মনে হবে। কিন্তু এইসব ব্যবস্থাদি গ্রহণের সুফল বা এইসবের অনুপস্থিতির কুফলকে বাড়িয়ে দেখা সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও যানবাহনহীন তৎকালীন বাংলা বা বর্তমান উড়িষ্যার মতো দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবার পর মানবিক কোনো প্রচেষ্টাই বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। বাংলা প্রবাদ অনুসারে বলা যায়, এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।[৬৮] এইসব প্রচেষ্টাই অপ্রতুল প্রমাণিত হয়েছে এবং হবে ; এবং যে পরিমাণে জনগণের অনড় মনোযোগ এতে নিবদ্ধ থাকবে, সেই পরিমাণে এই অপ্রতুলতা ভয়াবহ প্রতীয়মান হবে। দুর্ভিক্ষ কথাটি ভারতীয় বোধে যে বিভীষিকার দ্যোতক, সেই প্রকারের

দুর্ভিক্ষ উত্তরখণ্ডে (Northern Presidency) বিগত একশত বৎসরে তিনবার এসেছে। ১৭৭০ সনে ইংরেজ সরকারের এই দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল খুব সীমিত, অধিবাসীদের সম্বন্ধে আরো কম। তবু, অতিরঞ্জনের প্রচেষ্টা[৬৯] সত্বেও, নির্জলা সত্য আকারে যা ছিল যথেষ্ট দুঃখজনক, সেই ত্রাণ সহায়তার মাত্রা সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ পরিদকে বিন্দুমাত্র ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয় না।[৭০] ১৮৩৭-৩৮ সনে সরকারি প্রচেষ্টা আরো প্রসারিত হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা হয় ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকার ফলে এবং সরকারও এই ব্যাপারে দুর্বল পরিচালনা বরদাস্ত করত না।[৭১] তৎকালীন বাংলায় ব্রিটিশ জনমত বলতে বোঝাত ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ ও তার মুখপত্রগুলির ধ্যানধারণা ; কিন্তু এদেশে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হওয়ার পরে ইংল্যাণ্ডের জনমত তার বিশাল উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এবং বঙ্গদেশে ইংরেজকৃত প্রশংসা বা নিন্দা আর ভারতে বসবাসকারী আমাদের স্বদেশীয় এক ক্ষুদ্রগোষ্ঠী কৃত প্রশংসা বা নিন্দা থাকে না, তা ইংরেজ জাতির বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই, ১৮৬৬ সনে যে মাত্রায় ও উৎসাহের সাথে সরকারি প্রচেষ্টা নেওয়া হয় তা অভূতপূর্ব হলেও, এই প্রচেষ্টার অপ্রতুলতা ইঙ্গ-ভারতীয় মহল ছাড়াও সমগ্র ইংরেজ জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়।

এই সমীক্ষা ভারতীয় প্রশাসকদের পক্ষে কখনো কখনো বিরক্তিকর এমনকি বিরলপ্রায় ক্ষেত্রে অন্যায় হলেও, এব সুফল সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে সহজেই চোখে পড়ে। ১৭৭০ সনের বিপর্যয়ের সাথে এর সাদৃশ্য বহু ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। উভয় ক্ষেত্রেই, ঘাটতির আশু কারণ শরৎকালীন বর্ষণে অকাল বিরতি, ফলে হৈমন্তিক আউশ ফলনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং পরে বসন্তকালীন শস্যের আংশিক হানি। উভয় ক্ষেত্রেই, দুর্ভোগ অনাহারের পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত বিপর্যয়ের প্রকৃত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে বা মোকাবিলা করতে সরকার ব্যর্থ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের সূচনায় এই প্রদেশে গড় সাধারণ শস্য মজুত কম ছিল ; এবং উভয় ক্ষেত্রেই শরৎকালীন পর্যাপ্ত ফলন সাময়িক উপশম আনে এবং পরবর্তী ডিসেম্বরের ফসল দুর্ভিক্ষে সমাপ্তি টানে, এমনকি সর্বোচ্চ মূল্যমানের ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য বজায় থাকে : প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে চাউলের মূল্য থাকে পাউণ্ড প্রতি দুই পেনি, বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার পেনি ; এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বাজারে কোনো শস্য না থাকার কারণে এবং মুদ্রার বিনিময় যোগ্যতা সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার ফলে, উদ্ধৃত মূল্যমান বিচ্ছিন্ন কিছু-কিছু স্থানে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে নামে মাত্র বজায় ছিল।[৭২] উভয় ক্ষেত্রেই জনসাধারণ নীরবে সবকিছু শেষদিন পর্যন্ত সহ্য করে ; বীরত্বপূর্ণ এই সহিষ্ণুতাকে ভিন্ন মানসিকতার বা ভিন্ন প্রকারের জাতির পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে ঔদাসীন্য হিসাবে ভুল করা স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভুক্তভোগীদের সাথে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা একে

সাধারণভাবে সম্মানযোগ্য গুণাবলীর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত না করে পারবেন না।[৭৩]

কিন্তু সাদৃশ্যের এইখানেই ইতি। ১৭৭০ সনে সরকার শস্যের একচেটিয়া কারবার নিষিদ্ধ করার নামে মূল্যমানের স্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করেন। প্রদেশে যে পরিমাণ শস্য ছিল, তা দিয়ে নয়মাস অতিবাহিত করার কথা। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে, পরবর্তীকালে ঘাটতির সময় বৃহত্তর লাভের আশায় ফসল তোলার সময় সহজলভ্য শস্য সংগৃহীত হতো। ফলে তৎ-ক্ষণাৎ মূল্যবৃদ্ধি ঘটত এবং অভাবের একেবারে স্থচনা হতেই জনসাধারণ চাহিদা কমাতে বাধ্য হতো। এইভাবে সাধারণ মজুত রক্ষিত হতো এবং শেষ ছয় মাসে অতিরিক্ত চাপের বদলে পুরো নয়মাস ব্যাপী পর্যায়ে এইটা সমভাবে বণ্টিত হতো। শস্যের দাম ১৮৬৫-৬৬ সনের মতো একলাফে পাউণ্ড প্রতি সাড়ে-তিন পেনিতে ওঠে না, বরং দুর্ভিক্ষের প্রাথমিক মাসগুলিতে তিন ফার্দিং দাম অব্যাহত থাকে।[৭৪] পরবর্তী মাসগুলিতে এইটা দুই পেনি ও বিশেষ অঞ্চলে ৪ পেনি পর্যন্ত ওঠে। ১৮৬৬ সনে সরকার এইটি উপলব্ধি করেন। তাই ব্যক্তিগত কারবারগুলিতে মর্জি মাফিক হস্তক্ষেপ দ্বারা হতোৎসাহ করার বদলে সরকার একমাত্র উপায় হিসেবে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলিকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করেন। ১৭৭০ সনে যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শস্যের কারবার হতে শতহস্ত দূরে থাকতেন ; মজুত ছাড়া কারবার অসম্ভব ছিল ; আইনভঙ্গ না করে মজুত করা অসম্ভব ছিল। ১৮৬৬ সনে বিপুল সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হন ; সরকার প্রতিটি জেলার সাপ্তাহিক দরের হিসাব প্রকাশ করায় শস্য চালান সহজ ও নিরাপদ হয়। কোথায় শস্য স্থলভে ক্রয় করা যাবে, কোথায়ই বা তা সবচেয়ে চড়া দরে বিক্রয় করা যাবে প্রত্যেকের তা জানা ছিল, এবং এই ভাবে সবচেয়ে সহজে প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য দিতে সমর্থ জেলাগুলি হতে যেখানে প্রয়োজন সর্বাধিক, সেখানে শস্য নিয়ে আসা হতো। এর ফলে প্রপীড়িত অঞ্চলে যতদূর সম্ভব মূল্যের সমতা অর্জিত তো হয়ই, উপরন্তু নিম্নবঙ্গে চড়া দরের প্রচারে উত্তরের প্রদেশগুলি হতে জলপথে প্রেরিত বিশাল পরিমাণ শস্যও যুক্ত হয়, এবং নদীপথে আনীত বিপুল এই শস্যসম্ভারের স্থানসংকুলানে এমনকি প্রধানতম ব্যবসায় স্থলও অক্ষম হয়। রেলপথ, জলপথ এবং রাজপথগুলির সক্রিয় কর্তব্য সম্পাদনের ফলে দেশের সর্বত্র হতে ধানচাল প্রপীড়িত জেলাগুলিতে অবিশ্রান্ত আসতে থাকে।

ভারতে ইংরেজি সংবাদপত্র মহলের সহায়তা ও পরামর্শ ছাড়া সরকার এই পথগ্রহণ করতেন কিনা বলা সম্ভব নয় ; এই কথা স্থনিশ্চিত যে, একেবারে প্রারম্ভেই সংবাদপত্রমহল সরকারকে এইপথ গ্রহণের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ

জানায়। এইটাও সমভাবে নিশ্চিত যে, নিম্নবঙ্গের যে জেলাগুলিতে একশ্রেণীর বেসরকারি ইংরেজদের বসবাস ছিল এবং পরিণামে যাদের উপর ইংরেজ জনমত প্রযুক্ত হয়, সেইখানে এই ব্যবস্থাগুলি উচ্চসাফল্য লাভ করে। যেইখানেই ইংরেজ বাগিচামালিক বা ব্যবসায়ী যায়, সেইখানেই রাস্তা, রেল বা খালগুলি নিশ্চিতরূপে তাদের অনুসরণ করে; এবং যেইখানেই যানবাহনের এই সুবিধা থাকে, সেইখানেই শস্যের সাধারণ মজুতের প্রয়োজনীয় বণ্টনের ফলে ঘাটতি কখনো দুর্ভিক্ষে পরিণত হতে পারে না।[৭৫] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার একপ্রান্তে বেসরকারি কোনো ইংরেজের যাতায়াত নেই। আন্তর্যোগাযোগ যাদের প্রথম দাবি, সেই ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় অনুপস্থিত থাকার ফলে সাধারণভাবে উড়িষ্যা নামে পরিচিত দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলিতে আন্তর্যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব কখনো ব্যক্ত হয়নি। এই অঞ্চল ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিকভাবে প্রদেশের বাকি অংশের সাথে অঙ্গীভূত নয় এবং একে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো প্রচেষ্টাও হয়নি।[৭৬] প্রাপ্ত অতীত রেকর্ড অনুসারে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য উড়িষ্যা উৎপন্ন করে।[৭৭] এই প্রদেশ শস্য আমদানি করে না, বরং রফতানি করে, অতিরিক্ত শস্য সমুদ্রপথে চালান যায়, স্থলপথে নিম্নবঙ্গের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনও হয় না, ইচ্ছাও নেই। ঘাটতির প্রাথমিক মাসগুলিতে প্রদেশের বাকি অংশের মতো এই অঞ্চলের দুর্ভোগের কথাও বিদিত ছিল; কিন্তু অন্যান্য জেলা অপেক্ষা উড়িষ্যার শস্যহানির অনুপাত যে বেশি সে বিষয়ে জনসাধারণ বা সরকার কেউই সচেতন ছিল না,[৭৮] এবং শস্যের সাধারণ প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে দেশীয় বণিক সম্প্রদায় রফতানির পরিমাণ হ্রাস করলেও আমদানির কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না।[৭৯] কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ উড়িষ্যার অবস্থার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়তে শুরু করল। আসল কথা এই যে, প্রদেশের বাকি অংশে ফলনের ব্যর্থতা পূরণের জন্যে বিপুল আমদানি ও বণ্টন কখনো উড়িষ্যায় আসেনি। যে জেলাগুলি সর্বদা বিপুল পরিমাণে রফতানি করেছে এবং প্রদেশের বাকি অংশ এক বৎসর কালীন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করার অনেক পরেও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের এই পণ্য রফতানি করেছে, সেই খানে এক দীর্ঘ সমুদ্রপথে শস্য বহন করা লাভজনক হবে এইটা কেউ সন্দেহও করেনি। অবশেষে যখন মার্চ মাসে বোঝা গেল যে উড়িষ্যা ধানচাল শূন্য, তখন আমদানি বা রফতানি দুইই সমভাবে অসম্ভব। দক্ষিণপ-শ্চিম মৌসুমি বায়ুজনিত বর্ষা শুরু হয়েছে। সাধারণভাবে সামান্য সময়ের জন্যে ব্যবহারযোগ্য উড়িষ্যার বন্দরগুলি অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে। স্থলপথে একমাত্র রাস্তা উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহের জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এবং হতভাগ্য জনসমুদয় 'খাদ্যশূন্য জাহাজের যাত্রীদের মতো' সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিজেদের আবিষ্কার করল।[৮০]

১৭৭০ সনে ঠিক একই অবস্থায় সমগ্র নিম্নবঙ্গ প্রদেশ পড়ে। সরকার ব্যক্তি-গত কারবারিদের বাধা না দিলেও, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে বণ্টন

ব্যবস্থা অসম্ভব ছিল। একই কারণে উপযুক্ত মাত্রায় আমদানিও সম্ভব ছিল না। একটি মাত্র তথ্যই প্রতিটি জেলার বিচ্ছিন্নতা প্রকট করতে যথেষ্ট। আমাদের বার-বার বলা হয়েছে যে, বাৎসরিক ফলনের প্রাচুর্য রাজস্বের ক্ষেত্রে খারাপ ফলনের মতোই সমান বিপর্যয়কর; কারণ বিশাল পরিমাণ ফসল বাজারে বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে পরিবহন খরচেই প্রাপ্ত মূল্যের অনেকাংশ ব্যয়িত হয়।[৮১] বস্তুত, আন্তর্যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার ফলে আমদানি সম্ভব হলেও সেই সময়ে প্রদেশে খাদ্যের বিনিময়ে দেবার মতো টাকা ছিল না। বিভিন্ন বিভাগে ছিল ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা, যা আবার খুব ক্ষতিকারক বিনিময় স্বীকার না করলে ছিল সর্বত্রই অচলপ্রায়।[৮২] শুধু তাই নয়, এর ওপরে সেই দুর্ভাগ্যের বছরে বাংলার সমস্ত মুদ্রা নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। রেকর্ডসমূহের পাণ্ডুলিপিতে মুদ্রাব্যবস্থার গলদ সম্বন্ধে অভিযোগ এত অসংখ্য যে, এর দ্বারা সূচিত জনগণের দুর্ভোগ সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। ১৭৬৯-৭০ সনে অবস্থা চরমে ওঠে মনে হয়। ১৭৬৯ সনের সেপ্টেম্বরে ট্রেজারিতে মোট অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৪৮২ পাউণ্ড এবং কোম্পানির কোষাগারে সমগ্র সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪,৬৭৯ পাউণ্ড।[৮৩] বিনিয়োগের জন্য প্রচলিত অগ্রিম দাদন দিতে প্রয়োজনীয় রৌপ্য-মুদ্রা সংগ্রহে কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা ব্যর্থ হয়; ঋণ পরিশোধে সমর্থ ব্যক্তিরাও মুদ্রার অভাবে ঋণশোধে অক্ষম হচ্ছে দেখে ব্যক্তিগত কারবাররিাও কোনো প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করতে অস্বীকৃত হয় এবং ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে।[৮৪] দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে এই ছিল অবস্থা; অন্তিম পর্যায়ে অবস্থা, যেখানে সম্ভব, আরো খারাপ হয়। ১৭৭০ সনের আগস্ট মাসে, পরিষদ মাদ্রাজে বিনিয়োগের জন্যে প্রচলিত সরবরাহে যথেষ্ট ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও, স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, প্রেরণ করার মতো মুদ্রা তাদের কাছে নেই।[৮৫]

আমদানি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি আরো পরিতাপের বিষয় হওয়ার কারণ সন্নিহিত জেলাগুলি সহজেই শস্য সরবরাহ করতে পারত। সীমিত কিছু এলাকা ছাড়া দক্ষিণ-পূর্বে ভালো ফসল হয়; এবং আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার এই অঞ্চল হতে রফতানি হয়েছে এবং তার জন্যে পরিণামে কোনো ঘাটতির অভিযোগ হয়নি।[৮৬] উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলিকেও প্রাথমিক-ভাবে সমান ভাগ্যবান মনে হয়েছিল, এবং বিহারের তত্ত্বাবধায়কের বিলাপের জবাবে কেন্দ্রীয় কমিটি তিক্ত মন্তব্য করেন : 'যেখানে আপনার প্রতিবেশীরা প্রায় প্রাচুর্যময় এক মরশুমের সৌভাগ্য ভোগ করছে, সেখানে আপনি ঘাটতি আর দুর্ভিক্ষের ভোগান্তি ভোগ করছেন, এই চিত্র একটা অপ্রীতিকর বৈপরীত্য প্রদর্শন করছে এবং ইংরেজকৃত নীতির প্রতি আস্থাতে আঘাত করছে।'[৮৭] বস্তুত বিগত শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ যতই স্থানীয় হোক-না কেন, ফলাফল সমভাবে বিপর্যয়-কর ছিল। ১৭৮০ এবং ১৭৮১ সনে উত্তর-পূর্ব বাংলার একটি জেলা শ্রীহট্টে

অস্বাভাবিক প্রাচুর্যময় ফসল হয়, কিন্তু পরবর্তী বছরে স্থানীয় প্লাবনের ফলে শস্যহানি ঘটে এবং জলযানের সহায়তায় আমদানির সুবিধা থাকা সত্ত্বেও জনসমুদায়ের এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়। ১৭৮৪ সনে একই ঘটনা ঘটে এবং গবাদি পশুর দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়।[৮৮]

১৮৮৬ সনে ইয়োরোপের সাথে ব্যাপক ব্যবসায়ের অস্তিত্বের ফলে উড়িষ্যা বাদে বাকি বাংলার অন্যান্য প্রদেশ হতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে সমর্থ হয়। শস্য আমদানি ছিল পুঁজির জন্যে এক লাভজনক বিনিয়োগ, এবং প্রচুর মাত্রায় পুঁজি এই খাতে প্রবাহিত হয়। একটি মাত্র প্রদেশের ঘাটতি পূরণের জন্যে সমগ্র উত্তর-ভারতের শস্যসম্ভার বলপূর্বক আনা হয়, এইভাবে অবশ্যম্ভাবী দুর্ভোগকে হ্রাস করে সর্বনিম্ন করা হয় এবং বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চলে, নিশ্চিতরূপে পরিতাপজনক ভাবে বিপুল হলেও, সাধারণভাবে জীবনহানি প্রতিরোধ করা হয়, কোনো অঞ্চলেই তা গণমৃত্যুর পর্যায়ে ওঠে না।

দুর্ভিক্ষের বিষয়টি ছাড়ার আগে আমি, যা এর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে পদ্ধতিতে একে প্রতিরোধ করা যায়—এই ব্যাপার দুটো ব্যাখ্যা করতে চাই। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের কারণ হলো শস্যহানির ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিক ঘাটতি। যে অনুপাতে শস্যহানি ঘটে, সেই অনুপাতে দুর্ভিক্ষের তীব্রতা বাড়ে বা কমে। প্লাবনের ফলেও সাময়িক ঘাটতি হতে পারে, কিন্তু নিচু জমির এলাকার ক্ষতি সচরাচর পূরণ হয়ে যায় উঁচু জমির উত্তরকালীন প্রাচুর্যে। অন্যদিকে, ডিসেম্বরের ফসল নষ্ট করার মতো যথেষ্ট তীব্র অনাবৃষ্টির ফলশ্রুতি দুর্ভিক্ষ। অবশ্য, দুর্ভিক্ষের প্রভাব বোঝা যায় মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা এবং এইটা দুর্ভিক্ষের বাস্তব ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। দেশীয় রাজত্বের আমলে এবং ১৭৭০ সনে প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রচেষ্টার আমলে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত প্রকোপ প্রাকৃতিক ঘাটতির সাথে সমানুপাতিক ছিল। শস্য নষ্ট হলে লোক মারা যায় : প্রকৃত চাপ স্বাভাবিক ঘাটতির অনুপাত অনুসারী ছিল এবং স্বাভাবিক ঘাটতি একই ভাবে ছিল প্রকৃত চাপের অনুসারী। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সমগ্র প্রবণতা হলো মধ্যবর্তী বিভিন্ন প্রভাবগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করা, যার ফলে প্রকৃত প্রভাবের সাথে স্বাভাবিক ঘাটতির সম্পর্কটি কম নিশ্চিত ও কম প্রত্যক্ষ হয় এবং অবশেষে এরদা পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য পদ দুইটির মধ্যে কোনো সম্পর্কই থাকে না। ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ বৎসরে যে এইটাই হয়েছে, তা পরবর্তী উদাহরণ দুইটিতে বোঝা যায়।

ঐ সময়ে বাংলার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে দুইবার প্রচণ্ড খরা নামে। উভয়ক্ষেত্রেই শস্যহানির অনুপাত একই মনে হয় এবং সরকারি হিসাবমতে, স্বাভাবিক ঘাটতিও প্রায় সমান।[৮৯] প্রথমটি ঘটে ১৮৩৮ সনে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৬০-৬১ সনে। ১৮৩৭ সনে ভারতবর্ষ দ্বিধাহীনভাবে ইয়োরোপীয় উদ্যোগের

সামনাসামনি হওয়ার মুখে, কিন্তু তখনো পরিবর্তন ঘটেনি। রেলপথ হয়নি ; রাস্তা ও জলপথের সংখ্যা আওরঙ্গজেবের আমল হতে প্রায় বাড়েনি ; বেসরকারি ইংরেজদের প্রভাব এবং এর ফলশ্রুতিতে পরিবহনের সুবিধা নগরগুলির একেবারে সন্নিহিত এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল ; এবং বর্তমান বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে উদ্বৃত্ত পুঁজির বিপুল সম্ভার সতত বিনিয়োগের সুযোগ সন্ধানে ব্যগ্র, তা তখনো বিকশিত হয়নি। সংক্ষেপে, আধুনিক সভ্যতা স্বাভাবিক ঘাটতি ও তার প্রভাবের মাঝে যে বাঁধ গড়ে তোলে, তা তখনো নির্মিত হয়নি এবং অনাহারের প্রাচীন একঘেয়ে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং সেই সময় অসাধারণ মানবতাবোধ সম্পন্ন নবাব থাকা সত্ত্বেও, দুইটি প্রধান নগরে মৃত্যুসংখ্যা দৈনিক ১২ শত দাঁড়ায় ;[৯০] গ্রামাঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয় এবং নয় মাসের দুর্ভিক্ষে সমগ্র গ্রামীণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বৎসরে ভারতবর্ষ সভ্যতা অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হতে বাধ্য হয়, এবং ১৮৬০ সনের অনাবৃষ্টির ফলাফল ১৮৩৭ সনে অজানা শতেক বিপরীতমুখী প্রভাবের ফলে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাভাবিক ঘাটতি ছিল অভিন্ন, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ হতে খাদ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্যে ছিল পুঁজির প্রাচুর্য, এবং নবনির্মিত রেলপথ আপন অজস্র জাল বিস্তার করে সুলভে এর দ্রুত বণ্টন সম্ভব করেছিল। সরকারিভাবে ঘোষিত হয় যে, রোমীয় দৃঢ়তাসম্পন্ন রাজপথ গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড পনেরো দিনে জীর্ণ হয়ে পড়ে ;[৯১] 'প্রতিটি গাড়ি, গোরু, উট, গাধা, সংক্ষেপে দেশে লভ্য সর্বপ্রকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগান হয়, এবং অবশেষে সমস্ত প্রধান রেল স্টেশনগুলি শস্য বোঝাই হয়ে পড়ে।[৯২] একদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এইভাবে স্বাভাবিক ঘাটতি ও প্রকৃত প্রভাবের মধ্যবর্তী বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে জনগণের যে অংশ স্বাভাবিক ফলনের সময়ই কায়ক্লেশে জীবনধারণ করে, ব্যক্তিগত দানধ্যান তাদের ভারবহন করে ; শ্রম ও পুঁজির বর্তমান সম্পর্ক যতদিন বঙ্গদেশে বজায় থাকবে, ততদিন অভাব অনটনের সময়ে জনগনের এই অংশকে সবজনীন বদান্যতার ওপর নির্ভর করতে হবে।

১৭৭০ সনে ও ১৮৬৬ সনে নিম্নবঙ্গের প্রদেশগুলি যে দুটি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে, দ্বিতীয় উদাহরণটি সেইগুলি হতে গৃহীত। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘাটতির তুলনায় অন্য খুব কম প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা জানি যে, স্বাভাবিক ঘাটতি প্রকৃত প্রকোপে রূপান্তরিত হওয়ার পথে মধ্যবর্তী বাধার ক্ষেত্রে ১৭৭০ সনে সারা সারা দেশের অবস্থা যা ছিল, ১৮৬৬ সনে বাংলার একটা প্রান্ত উড়িষ্যায় সেই একই অবস্থা বজায় ছিল। সমঅবস্থিতি সম্পন্ন এই অঞ্চলগুলিতে চাউলের মূল্যকে সূচক ধরে নিরূপিত প্রকৃত প্রভাব উভয় দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে একেবারে সমান ছিল, সর্বোচ্চ ছিল পাউণ্ড প্রতি চার পেনি এবং গড় দুই পেনির ওপর। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, তখন রৌপ্য অধিক মূল্যবান ছিল। শস্যহানির অনুপাতও

সমান ছিল মনে হয়। উড়িষ্যার জেলাগুলিতে, যেগুলি ১৮৬৬ সনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে এবং ১৭৭০ সনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির অন্যতম রাজমহল জেলায়, সরকারি হিসাব অনুসারে দুর্ভিক্ষ পূর্ববর্তী ফসলের মরশুমে সাধারণ উৎপাদনের অর্ধেক শস্য উৎপাদিত হয়,[৯৩] এবং রাজমহলের ১৭৬৯ সনে ফলনের চেয়ে উড়িষ্যার ১৮৬৫ সনের প্রাথমিক ফলন ভালো হলেও, উড়িষ্যার বন্দরগুলি উত্তরকালীন রফতানি উভয়ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং, উভয় ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘাটতি সমান ছিল—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সৌভাগ্যের বিষয় প্রকৃত প্রকোপ কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে খুবই ভিন্ন ছিল। ১৭৭০ সনে স্বাভাবিক ঘাটতি অবাধে এবং প্রত্যক্ষরূপে প্রকৃত প্রকোপে পরিণত হয়। বছরের মধ্যভাগ শুরু হবার আগেই এককোটি জনসাধারণ ধ্বংস হয়; বছরের শেষে, গরিব একশ্রেণী চুনভাটির কর্মীদের সম্বন্ধে সরকারি এক কর্মচারির রিপোর্ট অনুসারে দেড়শত মানুষের মধ্যে মাত্র পাঁচজন বাঁচে,[৯৪] এবং দেশের এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলে প্রত্যাবর্তন করে। ১৮৬৬ সনে অন্য প্রদেশ হতে শস্য আনয়নে রাস্তা, রেলপথ এবং খালগুলি দিবারাত্র ব্যস্ত থাকে, অবশেষে যে বন্দর হতে[৯৫] নিম্নবঙ্গের নদীপথ ব্যবস্থার সুযোগ রেলপথ গ্রহণ করে, অভূতপূর্ব মালপত্র রাখার স্থান সংগ্রহে অক্ষম হয়, এবং রেললাইনের পাশে বা সাইডিংয়ে মালপত্র রাখা হতে দেশীয় জাহাজীদের নিবৃত্ত করার জন্যে রেল কোম্পানিকে কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে হয়। বাংলার একপ্রান্ত, অবশ্য, ১৮৬৬ সনেও ১৭৭০ সনে সারারাজ্য যে অবস্থায় ছিল সেই একই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে এবং দুর্ভিক্ষের প্রকৃত প্রকোপ স্বাভাবিক ঘাটতির সমান হলে কি ঘটে, উড়িষ্যার হতভাগ্য জনগণ সেই অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং দুর্ভিক্ষ নামের এই প্রাচীন কথাটির প্রকৃত অর্থ আধুনিক যুগের কাছে স্পষ্ট করে।

দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধকগুলি পরিষ্কার দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, কিছু প্রতিষেধকের প্রবণতা স্বাভাবিক ঘাটতি পরিহার করার এবং অন্যগুলির লক্ষ্য স্বাভাবিক ঘাটতি ও প্রকৃত প্রভাবের মধ্যবর্তী বাধাগুলিকে বিকশিত করার অভিমুখে। স্বাভাবিক ঘাটতি পরিহারের দুইটি উপায়: সরকারি খরচে সেচ ও জলনিকাশি কাজকর্মের জন্যে সরকারি প্রচেষ্টাগ্রহণ, নচেৎ জমির মালিকদের জমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করা ও এইভাবে ঐসব কাজকর্মের লাভ তাদের জন্যে নিশ্চিত করে এইগুলিতে জমিদারদের উৎসাহিত করা, এই ক্ষেত্রে ১৮৬৬ সনে উড়িষ্যার অবস্থা ছিল সারা দেশের ১৭৭০ সনের অবস্থার অনুরূপ: এখানে না ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত,[৯৬] না ছিল সরকারি রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত কোনো সেচ-প্রকল্প, এবং নিম্নবঙ্গের এইটিই ছিল একমাত্র অঞ্চল যেখানে ১৭৭০ সনে দৃশ্যাবলীর পুনরাভিনয় ঘটে।[৯৭]

দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিষেধকগুলি, যেগুলি স্বাভাবিক ঘাটতি ও প্রকৃত প্রভাবের মাঝে বাধা খাড়া করে, আকারে বিশাল। বাণিজ্যিক বিস্তৃতি ও পুঁজির বৃদ্ধির

গ্রাম্য অত্যাচারের এক অশ্রুতপূর্ব হৈচৈ ওঠে। শতাব্দীর প্রারম্ভে একাদিক্রমে অস্বাভাবিক প্রাচুর্যপূর্ণ ফলনের[১০৭] ফলশ্রুতি এই অবস্থার ইতি ঘটে ১৭৫০ সনের দুর্ভিক্ষে এবং জমির তুলনায় কৃষকের অপ্রতুলতা যে কোনো নবাগতেরও চোখে পড়ত। ১৭৭৬ সনে মিঃ ফ্রান্সিস লেখেন, 'দেশের বর্তমান অবস্থায় জমিদারের চেয়ে প্রজার সুবিধা বেশি। যেখানে এত বেশি জমি পতিত থাকে, এবং কৃষিকাজের জন্যে এত কম লোক থাকে, সেখানে কৃষকদের মনোরঞ্জন করে এটা করানো আবশ্যক।[১০৮] ধীরে ধীরে কৃষিজীবী জনসাধারণ নিজেদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করল : তথাকথিত খুদকস্ত বা স্থায়ী রায়ত[১০৯] যারা তাদের প্রাচীন বাস্তুর প্রতি মমতাবশত বা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারের প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণে দুর্ভিক্ষের পরও পূর্বের তালুকে রায়তি অব্যাহত রাখল ; এবং অস্থায়ী রায়ত[১১০] বা পাইকস্ত নামে পরিচিত আর একদল যারা আর একটু দুঃসাহসী হয়ে পুরানো পাট্টা ছেড়ে দিয়ে জমির জনশূন্যতাজনিত মূল্য হ্রাসের ফলে, কম খাজনার নতুন পাট্টার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণী বিভাজন সুনির্দিষ্ট রূপ পায় এবং পূর্বে যারা তাৎপর্যহীন, মর্যাদাহীন সম্প্রদায়মাত্র ছিল সেই পাইকস্তরা তিরিশ বৎসর ধরে বাংলার গ্রামীণ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বিশিষ্ট উপাদান ছিল। পূর্বে জমির অভাবে পাইকস্তরা ছিল প্রদেশের সর্বত্র বিচরণশীল ; ১৭৭০ সনের পর পূর্বাবেক্ষা সুলভে সর্বত্র জমি পাওয়ার ফলে রায়তরা পাইকস্তদের দলে যোগ দিল, এবং কোনো ইংরেজ ভদ্রলোক সুবিধাজনক শর্তে তার কাছ হতে ,জমি নিয়েছে বোঝাতে খাজনা আদায়কারীরা সেই ভদ্রলোককে সংক্ষেপে বলত 'পাইকস্ত রায়ত' (অস্থায়ী রায়ত)।

দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী প্রথম পনেরো বৎসরে জনশূন্যতা অবিচলিতভাবে বাড়তে থাকে। ঘাটতির সময়ে বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় শিকার হয় শিশুরা এবং ১৭৮৫ সন পর্যন্ত বৃদ্ধরা মারা যায়, কিন্তু তাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্যে নতুন কোনো প্রজন্ম ছিল না।[১১১] এই সাধারণ দুর্ভোগের সাথে যুক্ত হয়েছিল জমির মালিকদের মধ্যে প্রচণ্ডতম বিবাদ। তাদের জমির এক-তৃতীয়াংশ অনাবাদি পড়ে থাকায় প্রত্যেকে খুব কম খাজনার জমি ও মামলার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে প্রতিবেশীর প্রজাকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করে।[১১২] তাদের অবস্থা যত খারাপ হতে থাকল, তত তারা কৃষকদের পাওয়ার জন্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে দরাদরি করতে থাকল, এইভাবে অবশেষে পাইকস্তরা অর্ধেক খাজনার জমি পেলো।[১১৩] এই শর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম থাকার ফলে ভূমিদাস বা খুদকস্তরা তাদের আবাদ ত্যাগ করল। এতাবৎ কৃষকদের মধ্যে এরাই ছিল সমৃদ্ধতম অংশ, কিন্তু এখন তারা নিজেদের প্রবঞ্চিত বোধ করতে শুরু করল এবং এই পলায়ন এত

সাধারণ হয়ে দাঁড়ালো যে, এই অধঃপতনের বহিঃপ্রকাশের সাথে পরিচিত কিন্তু কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ পার্লামেণ্ট ১৭৮৪ সনে কৃষিজীবী শ্রেণীগুলি কি কারণে 'জমি ত্যাগ করতে ও পলায়নে' বাধ্য হচ্ছে জানার জন্যে এক তদন্তের আদেশ জারি করে।[১১৪] কিন্তু পার্লামেণ্টের আইন মোতাবেক একটা প্রদেশ নতুন করে জনাকীর্ণ হতে পারে না। জমি পতিত পড়েই রইল এবং তিন বৎসরের সতর্ক তদন্তের পর ১৭৮৯ সনে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার কোম্পানির এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলকে 'বন্যজন্তু আকীর্ণ জঙ্গল' বলে ঘোষণা করেন।[১১৫]

ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার সময় প্রদেশের এই ছিল সাধারণ অবস্থা। পুস্তকের এই খণ্ডের বিশেষ বিষয় পশ্চিমের দুইটি দেশীয় রাজ্যও, অর্থাৎ বীরভূম ও বিষ্ণুপুরও, জাতীয় এই বিপর্যয়ের পূর্ণমাত্রায় শিকার হয়। দুর্ভিক্ষের চার বৎসর আগে ১৭৬৫ সনে প্রায় ছয় হাজার গ্রামীণ জনপদে চাষ হয়, চতুর্দিকে ভূমিবিস্তারের মাঝে একেকটি ক্ষুদ্র গ্রাম নিয়ে প্রতিটি জনপদ গঠিত।[১১৬] দুর্ভিক্ষের তিন বৎসর পরে ক্ষুদ্র এই জনপদগুলির মাত্র চার হাজার ৫ শতটি টিঁকে থাকে।[১১৭] কৃষকেরা গ্রাম ত্যাগ করে নগরে পলায়ন করে, কিন্তু, বীরভূমের এক কর্মচারি ১৭৭১ সনে লেখেন, 'বড় শহরগুলিতেও এক-চতুর্থাংশ বাড়িতে বসবাস করা হতো না'.।[১১৮] পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৭৭২-৭৩ সনটি স্মরণীয়, কারণ এই বছর ওয়াবেন হেস্টিংস মুসলিম গৃহমন্ত্রী ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে জমির খাজনা নির্ধারণের প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, এবং দুর্ধর্ষ এই ইংরেজের অনুগ্রহ লাভের আশায় দেশীয় অধীনস্থ কর্মচারিরা জনপদগুলির সংখ্যা ১৭৭১-৭২ অপেক্ষা প্রায় একশতটি বাড়িয়ে দেখায়।[১১৯] কিন্তু প্রকৃত তথ্য গোপন করা যায়নি : জনশূন্যতা একনাগাড়ে ১৭৮৫ সন পর্যন্ত চলে, এই সংখ্যা চার হাজার ৪ শত হয়, এবং ১৭৬৫ সনের ছয় হাজার সমৃদ্ধশালী জনপদের প্রায় পনেরো শত লোপ পায় ও সেই জমি জঙ্গলে পরিণত হয়।[১২০] যেগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়নি, সেগুলিতেই বহু বর্গমাইল উর্বরা জমি অনাবাদি থাকে এবং একের পর এক নায়েবের দল জনগণের নিকট হতে খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হয়। ১৭৭২ সনে, পুরোনো চাষীরা মরীয়া হয়ে তাদের কাজ ছেড়ে দিলে তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং বকেয়া খাজনার দায়ে কলকাতার ঋণগ্রস্তদের কারাগারে তাদের কয়েদ করা হয়। রাজস্ব নির্ধারণের প্রতিটি পর্যায়ে একই ঘটনা ঘটে; নায়েবদের খাজনা আদায়ে ব্যর্থতার কারণে রাজা ইংরেজদের কোষাগারে ভূমিরাজস্ব দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন এবং নায়েবদের নির্দয়ভাবে কয়েদ করা হয়। দুর্ভিক্ষের প্রায় ২০ বৎসর পর ব্রিটিশরা জেলার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণকালে, জেলগুলি বকেয়া খাজনাজনিত বন্দীতে পূর্ণ ছিল এবং কোনো বন্দীরই পুনর্মুক্তির কোনো আশা ছিল না।[১২১] এই অবস্থার জন্যে একমাত্র রাজাই দায়ী ছিলেন না। দেশ যখন প্রতিটি বৎসরের সাথে আরো অধঃপতিত হচ্ছে, তখন ইংরেজ সরকার ক্রমাগত বর্ধিত খাজনা

দাবি করতে থাকে। ১৭৭১ সনে আবাদি জমির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জমি সরকারি হিসাবে 'পরিত্যক্ত' বলে দেখানো হয়;[১২২] ১৭৭৬ সনে এই হিসাব সমগ্র আবাদি জমির অর্ধাংশেরও বেশি দাঁড়ায়, প্রতি সাত একর আবাদি জমির সাথে ৪ একর পতিত থাকে।[১২৩] অন্যদিকে কোম্পানির দাবি ১৭৭২ সনে ১০০০,০০০ পাউণ্ডের কম হতে বেড়ে ১৭৭৬ সনে প্রায় ১১২০০০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। মুসলিম সৈন্যের সাহায্যে সামরিক উৎপীড়ন দ্বারা গ্রামবাসীদের খাজনা দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু শত উৎপীড়ন সত্ত্বেও দাবির অর্ধাংশের বেশি আদায় করা যায়না।[১২৪]

১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষের শেষে বীরভূমের অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শীকৃত বর্ণনা পরিশিষ্ট 'খ'তে সরকারিভাবে পাওয়া যাবে। দশ বছর পরে সমগ্র জেলা জনহীন, দুর্গম জঙ্গলে পরিণত হয়। প্রাচীনকালে এই জেলার মধ্য দিয়ে ছিল সৈন্য চলাচলের নিয়মিত পথ, বাংলার ভাগ্য একাধিকবার নির্ধারিত হয়েছে এখানের অনুকূল রণাঙ্গনে; ১৭৮০ সনে সিপাহিদের ছোট এক দলেরও এখানের জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হওয়া অতীব কষ্টকর ছিল। তৎকালীন এক সাংবাদিকের ভাষায় 'তাদের ১২০ মাইল যাত্রার পথে শুধুই বিস্তৃত জঙ্গল, সমগ্র পথ সম্পূর্ণত উষর, নির্জন প্রান্তর; এই জঙ্গলের মাঝে হঠাৎ কখনো কোনো ছোটগ্রাম দেখা দেয়, গ্রামের চারিধারে সামান্য আবাদি জমি, তার পরিসর এত ক্ষুদ্র যে এই দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্যের কোনোক্রমে স্থান সংকুলান হয়। এই বনভূমি বাঘভাল্লুকে আকীর্ণ, প্রতি রাতে তারা ক্যাম্পে হানা দেয়, কোনো বাচ্চাকে নিয়ে পালানো বা বাবুদের গোরুর গাড়ির বলদের জীবননাশ ছাড়া বিশেষ কোনো ক্ষতি করে না।' পথে বহু প্রতিবন্ধকতার জন্যে এবং জেলার বিগত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে লেখকের অতিরঞ্জন এই যাত্রাকে অভূতপূর্ব কীর্তি হিসাবে চিত্রিত করেন। নয় বৎসরের মধ্যে জঙ্গল এত দুর্গম হয় যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি শহরের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, এবং ডাক যোগাযোগের জন্যে অন্য জেলার মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত পঞ্চাশ মাইল ঘোরা আবশ্যক হয়।[১২৫]

জঙ্গল ছেড়ে গ্রামীণ জনপদগুলি যত জেলা কেন্দ্রের সন্নিকটবর্তী হতে থাকল, ক্ষুধার্ত বন্য জন্তুর দলও যেন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তত এগিয়ে এলো। একটি কৃষক পরিবারের তিন মাস স্বচ্ছল ভাবে চলবার উপযোগী অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রতিটি বাঘের মাথাপিছু ঘোষণা করেও কোম্পানি ব্যর্থ হলো, এই বাবদ খরচ এত প্রয়োজনীয় মনে করা হতো যে, এমনকি অস্বাভাবিক অবস্থাতেও সকল প্রকার অর্থের আদান-প্রদান বন্ধ রাখলেও নিয়মের ব্যতিক্রম করে বাঘ শিকারের পুরস্কার ও বন্দীদের খাদ্য ভাতা দেওয়া হতো।[১২৭] প্রতিটি গ্রামের চারপাশে ছিল বন্যজন্তু অধ্যুষিত জঙ্গল; সরকারি রেকর্ডে প্রায়শ বন্যজন্তু দ্বারা ডাক লুঠ হওয়ার উল্লেখ রয়েছে;[১২৮] এবং জমির মালিকদের বারংবার জঙ্গল সাফ করবার জন্যে

ব্যর্থ হুকুমজারির পর বীরভূমের মধ্য দিয়ে নতুন সামরিক সড়ক খোলা রাখার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারি অনুদান অনুমোদনে বাধ্য হন।[১২৯] বন্য হস্তীর ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের ফলে, প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের সূচনার কিছু পর হতেই এদের নির্মূলকরণ কালেকটারদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। দেশীয় শাসন পর্যায়ের অন্তিম কয়েক বৎসরে, মাত্র দুটি মহল্লায় সমগ্র জমি সহ ৫৬টি গ্রামের সবগুলিই 'বন্য হস্তীর উপদ্রবে ধ্বংস হয় ও জঙ্গলে পরিণত হয়;[১৩০] এবং এক সরকারি হিসাব অনুসারে একই কারণে সমগ্র জেলা ব্যাপী ৪০টি গঞ্জ্ পরিত্যক্ত হয়। বুনো হাতি ধরার জন্য লাটসাহেবের পোষাহাতির পাল ধরে দেবার জন্য বাংলার নবাবের উপর[১৩১] প্রভাব খাটাতে রাজা কোম্পানির নিকট আবেদন করেন।[১৩২] ধৃত সব শিকার নবাবের প্রাপ্য থাকবে। এই সহায়তা না পাওয়ার পর, বন্য হস্তীর উপদ্রবে জনশূন্যতার কারণে ভূমি রাজস্ব হ্রাসের জন্য রাজা আনুষ্ঠানিক ভাবে দাবি করেন। জেলাশাসক এই দাবিকে ন্যায়সংগত বলেন। তিনি লেখেন, "দেওঘর যাত্রার পথে তাদের ধ্বংসলীলার অবশেষ চিহ্নের চাক্ষুষ প্রমাণ আমি পেয়েছি। দরিদ্র, ভীরু দেশীয়রা গাছের উপরে মাচা বেঁধে রাখে, হাতির দঙ্গল হাজির হলেই উঠে পড়ে এই মাচায়, এবং আপন কুটীর সহ সকল শ্রমের ফসলে ধ্বংসলীলা নীরবে প্রত্যক্ষ করে। যাত্রাপথে এই রকম কয়েকটি আশ্রয়স্থল (মাচা) আমার চোখে পড়ে এবং এইগুলির কারণ সম্বন্ধে অবগত হই। বেলপাতা গ্রামে জনাকয়েক মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে এবং এই বিধ্বংসী জন্তুগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করার কোনো পদ্ধতি গ্রহণ না করলে, কয়েক বৎসরের মধ্যে সন্নিহিত গ্রামগুলি সম্বন্ধেও জমিদারেরর আশংকা নিশ্চিতভাবে বাস্তবে পরিণত হবে"।[১৩৩] বৃহদাকার বন্যজন্তুর মোকাবিলায় শুধু তীর-ধনুক-বল্লম-সর্বস্ব কৃষককুলের অরক্ষিত অবস্থা সম্যকভাবে বোঝা আবাল্য আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে পরিচিত ইংরেজের পক্ষে সুকঠিন। জঙ্গলে বীটারদের সাথে শিকারের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইংরেজরা জানেন যে, এইটা সাহসের অভাব নয়। বস্তুত, বীরভূমের পাহাড়িয়ার দল শঙ্কাহীন যে দক্ষতায় বাঘকে ঘিরে ফেলে, সেই ঝুঁকি সম্বন্ধে সচেতন প্রত্যেককে এই সাহস সদা বিস্মিত করে। কিন্তু যূথবদ্ধ হাতির দল অপ্রতিরোধ্য; ছাদ উপড়ে ফেলা, দলিত-মথিত—এ যেন বালুকাবেলায় শিশু রচিত বালির শহর। তৎকালীন দক্ষতম হস্তীশিকারী লিখেছিলেন, দেশবাসীর পক্ষে চরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, পর্বতমালার নিঃসঙ্গতা এদের প্রিয়; যদি সমতলে বিচরণ এদের কাম্য হতো, সমগ্র রাজ্য বিধ্বস্ত মরুভূমিতে পরিণত হতো।[১৩৪] দেশের বহু অঞ্চলে জীবন্ত সমাধিলাভের ভয়ে কৃষকরা আপন গৃহে রাত্রিযাপনে সাহসী হতো না, এবং এমনকি ১৮৯০ সনেও বীরভূমের সামান্য উত্তরের এক জেলার জরিপকারের এক বিবরণ অনুযায়ী, 'হাতির উপদ্রবের আতঙ্ক চরম। পাহাড়ের নিকট আমি একবার রাত্রি যাপন করি, আমাদের

সাথে রক্ষী থাকা সত্ত্বেও তাঁবুর সন্নিহিত গ্রামের পুরুষরা গাছের উপর রাত কাটায় এবং মেয়েরা গোরু-মহিষের পালের মাঝে লুকিয়ে থাকে, তাদের কুঁড়েঘরগুলি হাতিদের থেকে অরক্ষিত খোলা পড়ে থাকে এবং শস্য সন্ধানের স্থান হাতিদের ভালোভাবেই জানা আছে। দুইরাত আগে, কয়েকটি হাতি গ্রামের একটি কুঁড়েঘরের ছাউনি উপড়ে ফেলে, এবং দরিদ্র এক পরিবারের সঞ্চিত সকল শস্য খেয়ে ফেলে।'[১৩৫] একথা যোগ করা সংগত যে, দুর্ভিক্ষ বহু আবাদি গ্রাস করার পর বন্যহস্তীর উপদ্রব নিঃসন্দেহে বাড়ে, কিন্তু ১৭৭০ সনের বহু আগে হতেই এরা ছিল বিধ্বংসী, বিভীষিকা। বর্তমানে বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী জেলাগুলি, যেগুলি হতে বড় বড় উর্বর প্রদেশের সমান রাজস্ব আদায় হয়, যেগুলি মূলত, কখনো কখনো একমাত্র রাজস্বের উৎস, এমনকি মুসলিম শাসনের সমৃদ্ধতম পর্যায়েও সেইগুলি বন্য হস্তীসংকুল।[১৩৬]

১৭৮৬ সন নাগাদ এই উপদ্রব চরমে ওঠে। এই সন হতেই বীরভূমে কমবেশি প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ তত্ত্বাবধান শুরু হয়। বাঘ ও হাতির উপদ্রবে শুধুমাত্র কৃষকশ্রেণীই নিপীড়িত ছিল না। প্রাচীন ইংরেজি নথিপত্র প্রকাশ করে যে, জঙ্গলে কামারদের বস্তি পরিত্যক্ত, বন্যজন্তুর অত্যাচারে জ্বালানি সংগ্রাহকের দল নিজ পেশা পরিত্যাগে বাধ্য; বহু কারখানা ও গঞ্জ পরিত্যক্ত; জেলার ব্যবসা তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ গবাদি পশুর বেচাকেনা স্তব্ধ; এবং পাহাড় হতে সমতলে অবতরণের পথে যে চটিগুলি পশুদের খাদ্য ও বিশ্রাম জোগাত, সেইগুলি অব্যবহৃত, পতিত হিসাবে গণ্য হয়।[১৩৭]

কিন্তু বাঘ ও বুনো হাতি কৃষকদের নিষ্ঠুরতম দুশমন ছিল না। ইংরেজ শাসনের পূর্বেই বাংলা দস্যু কবলিত, এবং প্রতিটি দেশীয় ইতিহাসে রয়েছে জবরদস্ত খাঁ[১৩৮]-এর মতো বিগত শতাব্দীর সফল দস্যু সর্দারদের নাম, লুণ্ঠন আর অত্যাচারের কাহিনী। মুসলিম রাজস্ব আদায়কারীদের দ্বারা জমি হতে সম্পূর্ণত বা অংশত উৎখাত হয়ে দেশ জুড়ে বহু উল্লেখযোগ্য পরিবারই লুণ্ঠনবৃত্তি গ্রহণ করে; পাহাড়িয়া ও সমতলের জমিদারদের মাঝে একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, প্রথমোক্তরা আরো প্রকাশ্যে, আরো বাপক মাত্রায় লুণ্ঠন করত। বস্তুত, নিজেদের জমিদারিতে দস্যুদের আশ্রয়দান শেষোক্তদের কাছে ছিল আরো লাভজনক; লুণ্ঠন হতে রেহাই পাওয়ার মূল্য হিসাবে চারপাশের গ্রামগুলি হতে তারা কর আদায় করত এবং যারা কোনো বোঝাপড়ায় আসত না তাদের লুণ্ঠন করে লুঠের ভাগ নিত। তাদের পল্লীনিবাসগুলি ছিল ডাকাতদের ঘাঁটি, এবং বাংলার প্রথম যুগের ইংরেজ প্রশাসকরা লিখিত অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন যে, প্রতিটি ডাকাতির পেছনে নাটের গুরু কোনো-না কোনো জমিদার।[১৩৯] মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আবর্জনাস্বরূপ কর্মচ্যুত সৈন্যদের ভ্রাম্যমাণ দঙ্গল সর্বত্র লুণ্ঠন চালাত।

গ্রামবাসীদের পুরোপুরি নিষ্পেষণের জন্য প্রায়শই তারা কোম্পানির উর্দি

পরন্ত—চলাচলের পথে আমাদের নিজেদের সৈন্যদের বিশৃংখল আচরণের ফলে এই জাতীয় প্রতারণা এত সহজ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যে, রাশিকৃত কঠোর অনুশাসনও এইটা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়। অরাজকতা অধিকতর অরাজকতার জন্ম দেয় এবং শীতকালের জন্য সঞ্চিত সম্বল হতে বঞ্চিত দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সমাজ কালে নিজেরাই লুঠেরা হতে বাধ্য হয়। ১৭৭১ সনের প্রারম্ভে, স্থানীয় অফিসাররা জানায়, 'প্রায়শ গ্রামে আগুন লাগানোর ঘটনা,—দুর্দশার তাড়নায় জনগণ এই বেপরোয়া অপকর্ম করতে বাধ্য হচ্ছে। এতকাল প্রতিবেশীদের নিকট সচ্চরিত্র হিসাবে পরিচিত বহু সংখ্যক রায়ত প্রাণধারণের তাগিদে অবশেষে এই শেষ পন্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।[১৪০] তারা নিজেদের সংগঠিত করেছে তথাকথিত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের দলে,[১৪১] এবং পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যাকারে সংগঠিত ভবঘুরের দল দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ হয়েছে। ১৭৭৩ সনে পরিষদ লেখেন, এইসব দেশ বহুদিন যাবৎ সন্ন্যাসী বা ফকির নামে পরিচিত একদল আইন বিবর্জিত দস্যু অধ্যুষিত অঞ্চল; এবং ধর্মীয় তীর্থযাত্রার নামে বাংলার মূল ভূখণ্ডে বিচরণে এবং সুযোগ সুবিধা মতো ভিক্ষা, চুরি বা লুঠ করায় অভ্যস্ত।'[১৪২] দুর্ভিক্ষ পরবর্তী বৎসরগুলিতে পুনরায় চাষ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় বীজ বা সরঞ্জাম না থাকায় উপবাসী কৃষক সম্প্রদায় দলে দলে এদের বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করে, এবং ১৭৭২ সনে শীতকালে নিম্নবঙ্গের শস্য শ্যামল জমিতে এরা হানা দেয়, পুড়িয়ে, লুঠ করে, ধ্বংস করে ফেরে 'পঞ্চাশ হাজার লোকের বাহিনী'।[১৪৩] জেলাশাসকরা মিলিটারি নামায়, কিন্তু সাময়িক সাফল্যের পর আমাদের সিপাহিরা 'অবশেষে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়, এবং প্রায় সমগ্র বাহিনী সমেত ক্যাপ্টেন টমাস (তাদের নেতা) বিধ্বস্ত হয়'।[১৪৪] শীতের প্রায় সমাপ্তির মুখে, তার আগে নয়, পরিষদের পক্ষে পরিচালক সভাকে জানানো সম্ভব হয় যে, একজন সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য এদের বিরুদ্ধে সফল হয়েছে;[১৪৫] এবং একমাস পরেই আমরা দেখি যে, এই বিলম্বিত সংবাদও ছিল অসময়োচিত। ১৭৭৩ সনের ৩১ মার্চ ওয়ারেন হেস্টিংস সোজাসুজি স্বীকার করেন যে, ক্যাপ্টেন টমাসের পরবর্তী সেনাধ্যক্ষও 'দুর্ভাগ্যবশত একই ভাগ্যের শরিক হয়েছে'; এবং দস্যুদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে চার ব্যাটেলিয়ান সেনাদিগকে নিযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু, জমির মালিকদের নিকট হতে সামরিক লেভি আদায় করা সত্ত্বেও এই সংযুক্ত আক্রমণ বিফল হয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়নি, অধিবাসীরা লুঠেরাদের সাথে যোগ দিয়েছে, এবং সমগ্র গ্রামীণ প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। এই প্রকারের বহিরাক্রমণ ছিল বাৎসরিক ঘটনা, অথচ অনেকে এর মধ্যে বাংলার নিস্তরঙ্গ জীবনের প্রতীক আবিষ্কার করেছে।

চরম দারিদ্র্য বা স্বভাবগত চরিত্র দোষের জন্য লুণ্ঠনকার্যে রত ব্যক্তিরা ছাড়াও বহু সংখ্যক সমৃদ্ধ গোষ্ঠীও বংশগত পেশা হিসাবে ডাকাতি করত। ঠগ ও ডাকাত-

দের নিজেদের পেশার জন্য কোনোপ্রকার লজ্জাবোধ ছিল না, এবং তাদের প্রতি-দেশবাসীদের সভয় ব্যবহার তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রায় সম্ভ্রম বলে বিবেচিত হতো। জনৈক ইংরেজ অফিসারের নিকট এদের একজনের বয়ান হলো, "ঠগ হিসাবে রাজার খাতায় আমার নাম আছে। আমি ও আমার বাবা, গত বিশ পুরুষ ধরে, আমরা বংশানুক্রমে ঠগ।" কুখ্যাত এক ডাকাত ঘোষণা করে,—"আমার পূর্বপুরুষদের পেশা আমি সর্বদা গ্রহণ করেছি।' আরেকজন বলে, আমার আগে আমার পূর্বপুরুষদের এই পেশা ছিল, আমাদের ছেলেদেরও আমরা একই শিক্ষা দিয়ে থাকি।" ঠগী ও ডাকাতি কমিশন এই ব্যাপারে এত বেশি আলোকপাত করেছেন যে, আমার বক্তব্য আমি, যে সময়ে গ্রামীণ প্রশাসন ধীরে ধীরে ইংরেজ হস্তগত হয় সেই ২৫ বৎসরের মধ্যে সীমিত রাখব।[১৪৬] ১৭৭২ সনে এক সরকারি দলিলে বলা হয়, "ইংল্যাণ্ডের ডাকাতদের মতো হঠাৎ-দারিদ্র্যে বেপরোয়া হয়ে বাংলার ডাকাতরা ব্যক্তিগতভাবে এই পথ গ্রহণ করেনি। তারা পেশাগত-ভাবে, এমনকি বংশগতভাবেও ডাকাত। তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট সমাজ, এবং লুঠের বখরা দিয়েই তাদের পারিবারিক ভরণপোষণ চলে।[১৪৭] প্রায়শই লুঠের এই বখরা বহুদূর হতে আনা হতো; কলকাতায় সিঁদ কেটে গঙ্গার উজানে বহু দূরবর্তী গ্রামের জীবিকা চলত এবং ওয়ারেন হেস্টিংস পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, অপরাধ নিবারণের জন্য শুধু প্রকৃত দোষীদের নয়, লুঠের দূরবর্তী ভাগীদারদেরও সমভাবে শাস্তিবিধান আবশ্যক। অপ্রিয় যে কোনো কাজ যেমন সরাসরি ও নির্ণায়কভাবে তিনি করতেন, এই কাজে সেভাবেই তিনি অগ্রসর হন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, প্রতিটি সাজাপ্রাপ্ত ডাকাতকে হত্যা করা হবে; 'আইনের বিধান ও সম্ভ্রাস অনুযায়ী' নিজগ্রামে তাকে হত্যা করা হবে; তার সমগ্র পরিবারকে ক্রীতদাস করা হবে; এবং প্রতিটি গ্রামবাসীকে জরিমানা দিতে হবে। এইসব কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ডাকাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং আরো ৭৫ বৎসরাধিক অব্যাহত থাকে। পাঁচ থেকে একশত জনের দল নিয়ে গ্রামে সশস্ত্র আক্রমণ, এবং বড় শহরগুলিতে আগুন লাগিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সেই সুযোগে লুণ্ঠন—এই ছিল ডাকাতদের সাধারণ কর্মপন্থা। প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে সমগ্র নগর ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। ১৭৮০ সনের মার্চ মাসে এক অগ্নিকাণ্ডে কলকাতায় পনেরো হাজার বাড়ি ভস্মীভূত হয়। প্রায় দুইশত জন আগুনে পুড়ে মারা যায়।[১৪৮] পরিষ্কার অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমাগত লিপিবদ্ধ হতে থাকে, এবং অবশেষে গম্ভীরভাবে 'সুপারিশ করা হয় যে, অপরাধীদের ধরার জন্য খড়ের ঘরের মালিকদের একটি লম্বা বাঁশ, বা শেষ প্রান্তে তিনটি আংটা সহ, রাখা উচিত।'[১৪৯] রাজধানীর সবচেয়ে কেতাদুরস্ত অঞ্চলের সন্নিকটে এইসব সংগঠিত দৌরাত্ম্য করা হতো। ১৭৮০ সনে কলকাতার এক পত্রিকা ঘোষণা করে, 'কয়েক রাত আগে চারজন সশস্ত্র লোক

'চৌরঙ্গি এলাকায় জনৈক নিগ্রোর বাড়ি হতে তার কন্যাকে অপহরণ করে।' পুরাতন বাসিন্দারা সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে যখন কোনো দেশীয় লোক একটা ভালো শাল গায়ে দিয়ে রাত্রে বের হতে সাহস করত না ; এবং এমনকি ইংরেজ বাড়িতেও ব্যতিক্রমহীন ভাবে এই রীতি দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকবার খাবার শুরুতে দারোয়ান সদর দরজা বন্ধ রাখবে এবং থালা-বাসন নিরাপদে তালাবন্দী হবার খবর এলে দরজা আবার খোলা হবে।

বীরভূম ও সন্নিহিত পশ্চিম সীমান্তব্যাপী এই বিশৃংখলা প্রায় দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে ওঠে। উত্তরে বীরভূমের সন্নিহিত অঞ্চলবাসীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক নির্ভরযোগ্য পুরাতত্ত্ববিদের বক্তব্য,—"বহু যুগ হতে তারা ছিল সমতলে হানাদার, দুর্দমনীয় চোর আর খুনীর দল, বদলা হিসাবে যাদের মুসলিম জমিদারেরা কুত্তার মতো গুলী করে মারতো।"[১৫০] একদিকে বিশাল এক সমতলভূমি, অন্যদিকে অনির্দিষ্ট কিন্তু বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকার সমন্বয়ে বীরভূমের রাজার রাজত্ব গঠিত ছিল ; সমতলবাসীরা মূলত প্রাকার বেষ্টিত নগরীতে নিরবচ্ছিন্ন অবরোধের অবস্থায় বাস করত, আর পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের উৎপত্তি, ভাষা, ধর্ম —সকলই ছিল ভিন্ন এবং মান্ধাতা আমলের মারাত্মক বিবাদে উভয় জাতি পরস্পব বিচ্ছিন্ন ছিল। সন্নিহিত জেলার জনৈক রাজস্ব নিরীক্ষক লেখেন, "মুসলিম রাজাদের আমল হতে সন্নিহিত জেলাগুলির পক্ষে এই পাহাড়িয়ারা ছিল ক্রমাগত যন্ত্রণা আর আতংকের হেতু, কাবণ পাহাড়িয়াদের তুষ্ট রাখার জন্য জেলাবাসীদের অর্থদণ্ড দিতে হতো ; নচেৎ তীর-ধনুক সজ্জিত সশস্ত্র দল পাহাড় হতে সমতলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, সামনে যাকে পেত হত্যা করত, সমগ্র দেশ ছারখার করত, তারপর নিজেদের জংলি দুর্গে পশ্চাদপসারণ করত ; সেখান পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করতে কেউ সাহস করত না—ফলে নিপীড়িতদের তারা পরোয়া করত না।"[১৫১] বীরভূমের উত্তরের রাজ্যে গঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে একশত মাইল জুড়ে সন্ধ্যার পর নৌকা নোঙর করতে কেউ সাহস করত না, ডাক ক্রমাগত অপহৃত হতো ; তহবিল মাঝপথে লুণ্ঠিত হতো ; রাজপথে সর্বপ্রকার যাতায়াত কিছুকাল বন্ধ ছিল ; এবং ভাগলপুর হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত ভগ্নপ্রায় দুর্গের সারি আজও এই প্রাচীন, বিতর্কিত অঞ্চলের জীবন ও সম্পদের তৎকালীন নিরাপত্তাহীনতার সাক্ষ্য বহন করে।

অবশ্য সাধারণ বর্ণনা নির্দিষ্ট তথ্যের সমান বাঙ্‌ময় নয় ; এবং, পাছে কোনো ভারতীয় রাজকবির রাখালিয়া মধুর ধুন পাঠকের স্মৃতিতে এখনো অনুরণন তোলে, তাই আমি বীরভূম ও বিষ্ণুপুরে ব্রিটিশ শাসনে, প্রথম দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করব—এই সময়ের সমস্ত রেকর্ড বর্তমান। যে বিশৃংখলার কারণে লর্ড কর্নওয়ালিস জেলাদ্বয়কে একজন ইংরেজ অফিসারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখেন, তা ইতিমধ্যে বর্ণিত। দেশীয় রাজার অধীনে বীরভূম প্রসঙ্গে

শেষ চিঠির বক্তব্য ছিল যে, এক হাজার দস্যুর এক বাহিনীর সংগঠিত হামলা আসন্ন।[১৫২] স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসনের প্রথম চিঠি এক কোম্পানির সিপাহির আগমনকে ধন্যবাদের সাথে স্বীকার করছে, কিন্তু অল্পদিন পরেই এই বাহিনীকে দ্বিগুণ করতে হয়।[১৫৩] এইটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই পত্র-দ্বয়ের মধ্যবর্তী সময় দস্যুদমনে মিঃ শেরবার্ন-এর প্রয়াস সীমিত সময়ের পরিসরে সফল ছিল ; এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে রয়েছে ইংরেজ শাসনের সূত্র-পাতে বাংলার অবস্থার ও মুসলিম অপশাসনের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অশান্তির এক অতিরঞ্জিত, পরিমার্জিত ও পরিমিত আলেখ্য।

প্রধান ইংরেজ রাজপুরুষ, কালেকটার বা জেলাশাসক হিসাবে, নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে প্রধান সেনাধ্যক্ষ ও বেসামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতেন। তার কাজের সামরিক দিকটি কয়েক বৎসর অহেতুক গুরুত্ব লাভ করে। শীতের শুরুতে বৎসরের ফসল কাটার মরশুমের প্রারম্ভে তিনি কোন কোন পথগুলি পরবর্তী বর্ষার আগমনে ডাকাতদলের নিজ আস্তানায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত রক্ষা করতে হবে, তার একটা তালিকা সেনাবাহিনীর প্রধানকে দিতেন। তাঁর সেনা-বাহিনীর শক্তি হ্রাসের এক প্রস্তাবের উত্তরে তিনি পরিষ্কার জানান যে, জেলার দায়িত্ব গ্রহণে তিনি অপারগ, 'সামরিক যোগাযোগ নামাঙ্কিত এক ফাইলে উচ্চতর সামরিক অফিসারের সাথে তাঁর তিন বৎসর ব্যাপী যোগাযোগের রেকর্ড প্রায় না থাকার মতো। প্রথম যে কালেকটারের রেকর্ডপত্র বর্তমান, সেই মিঃ কীটিং[১৫৪] স্বীয়পদে বহাল হওয়ার দুই মাসের মধ্যেই পাঁচশত জনের এক ডাকাত দলের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে বাধ্য হন ; ইংরেজদের জেলা সদর হতে অশ্বারোহণে দুই ঘণ্টার পথ এক গঞ্জ শহরে এই ডাকাতদল 'হানা দেয় এবং ৩০ থেকে ৪০টি গ্রামের অধিবাসীদের' হত্যা করে বা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়।[১৫৫] কয়েক সপ্তাহ পরে (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯), পাহাড়িয়ারা সদলবলে পুলিশ চৌকির বেষ্টনী ভেদ করে 'জেলার দূরতম সকল গ্রাম অবধি তাদের লুণ্ঠন কার্য' প্রসারিত করে।[১৫৬] চতুর্দিকে আতঙ্ক আর রক্তপাত ; সীমান্ত পথগুলি হতে সত্বর পুলিশচৌকি প্রত্যাহার করে দেওয়া হয় এবং ১৭৮৫ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা দেখি মিঃ কীটিং দস্যুদের বিরুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর সাথে এক-যোগে সক্রিয় হওয়ার জন্য স্থানীয় বাহিনীর সৈন্য সংগ্রহে রত ; এই দস্যুরা তখন 'ভালোভাবে সশস্ত্র হয়ে তিন থেকে চারশত লোকের বাহিনী' গঠন করে সমগ্র দেশে শহর লুণ্ঠন করছিল। অবশ্য এত সহজেই দুর্বৃত্তির মোকাবিলা সম্ভব ছিল না, এবং অবশেষে সন্নিহিত জেলার কালেকটারদের সমগ্র শক্তি ঐক্যবদ্ধ করার নির্দেশ দিতে পরিষদের গভর্নর-জেনারেল বাধ্য হলেন ; এক্তিয়ারের সকল প্রশ্ন শিকেয় তোলা হলো ;[১৫৭] সংঘর্ষ শুরু হলো এবং দস্যুদল পাহাড়ের গভীর অভ্যন্তরে বিতাড়িত হলো। কিন্তু সামান্য এক সংকীর্ণ আমলাতান্ত্রিক ঈর্ষার

কারণে পূর্ণ সাফল্য অনার্জিত থাকে। জেলাশাসকদের জোট হতে সন্নিহিত এক জেলার কালেকটার বাদ পড়ে যান, ফলে ডাকাতরা তার জেলায় আশ্রয় পায়। ক্রুদ্ধ মিঃ কিটিং লেখেন,—"সদ্য-প্রত্যাগত এক আহত সিপাহির কথা হতে আমি জানলাম যে, পাচেত (পাঞ্চেত)-এর সীমান্তে ডাকাতদের সাথে তাদের এক হঠাৎ সংঘর্ষ হয়; কিন্তু কালেকটারের রক্ষীরা ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবনে সিপাহি-দের সহায়তা করার পরিবর্তে ঐ জেলার মধ্যে তাদের অগ্রগতিকে বাধা দেয়, এবং ডাকাত দলের কিছু অনুচরকে আশ্রয় দান করে। সিপাহিটি আমায় বলে পাচেতের লোকদের এই প্রকার আচরণের [এই হস্তক্ষেপের] ফলে, আমাদের লোকরা তাদের চার-পাঁচজনকে গ্রেফতার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছে এবং নিজেদের আচরণের জবাবদিহি করার জন্য তাদের আনা হচ্ছে।[১৫৮] শান্তির সময়ে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে রক্ষীদের গ্রেফতারে পাচেতের কালেকটারের ক্রোধ এবং পরবর্তীকালে পারস্পরিক দোষারোপ সহজেই অনুমেয়।

অন্য যে কোনো অপেক্ষাকৃত কম অশান্তির সময়ে, বিষ্ণুপুরের বিশৃংখলাকে বিদ্রোহ বলা হতো। ভূমি-রাজস্ব বাকি পড়ার দায়ে রাজা কারারুদ্ধ; তাঁর রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কালেকটারের প্রধান সহযোগী, মিঃ হেসিলরিজ,[১৫৯] এবং রাজ্যের অধিবাসীরা সরকারের বিরোধী হয়ে ডাকাতদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৭৮৯ সনের জুন মাসে, বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সহায়তার জন্য দ্রুত এক সামরিক বাহিনী প্রেরিত হয়, আট দিন বাদে আরো শক্তি বৃদ্ধি করা হলেও, জেলার প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র শহরটিকে প্রকাশ্য দিবালোকে লুণ্ঠন হতে রক্ষা করা যায়নি।[১৬০] পরের মাসে, মিঃ কিটিং সরকারকে জানান যে, দস্যুরা 'তলোয়ার ও গাদা বন্দুকে সশস্ত্র হয়ে বিশাল বাহিনী আকারে' অজয় নদী পার হয়ে বীরভূমে ঘাঁটি গেড়েছে, এবং তাদের খর্ব করার বিষয়টি নির্ভেজাল, সামরিক শক্তির প্রশ্ন।

অবশ্য বর্ষাকাল কর্তৃপক্ষের জন্য সুবিধাজনক হলো। পরবর্তী শীতে নিজেদের কাজকর্ম অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বিষ্ণুপুরে রেখে লুঠেরারা লুঠের মাল সমেত নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে গেল; এই বিরতির সুযোগে মিঃ কিটিং সীমান্ত রক্ষার জন্য আরো বিশদ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের নিকট তিনি এই মত প্রকাশ করলেন[১৬১] যে, জেলা প্রশাসন অটুট রাখার পক্ষে বর্তমান সামরিক শক্তি অপ্রতুল; স্থানীয় সর্দারদের সংগৃহীত স্থানীয় সেনাদল স্বভাবত বিশৃংখল, ভীরু,—দস্যুদের বিরুদ্ধা-চারণের চেয়ে তাদের পক্ষে কাজ করার প্রবণতা এদের বেশি; এবং সমতলে শান্তি অটুট রাখার জন্য নিয়মিত বাহিনী হতে বাছাই-করা সৈন্যদের রক্ষীদল হিসাবে প্রতিটি জনপথে বহাল করা একান্ত আবশ্যক। এইভাবেই এমন একটা কেন্দ্রীয় শক্তি গড়ে ওঠা সম্ভব, যাকে ঘিরে অনিয়মিত সেনাদল জমায়েত হতে

পারে। ভারতীয় প্রশাসক হিসাবে লর্ড কর্নওয়ালিসের সাফল্যের চাবিকাঠি যে তৎপরতা, তার ফলশ্রুতি হিসাবে ফেরত ডাকেই জবাব এলো, 'সাধারণত দস্যুদল যেসব গিরিপথ (ঘাট) ব্যবহার করে সমতলভূমিতে অবতরণ করে, সেইসব স্থানে বহালার্থে' কালেকটারকে উপযুক্ত শক্তি জোগানোর জন্য 'প্রধান সেনাধ্যক্ষকে সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।' নভেম্বর মাসে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘাট দখল করা হয়, বিষ্ণুপুরে একদল সেনা রাখা হয়, দস্যুদের নদী অতিক্রম বন্ধ করার জন্য আরেক দল অজয় নদীতীরে প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র শহরটিতে (গত গ্রীষ্মে যেটি লুণ্ঠিত হয়) ঘাঁটি গাড়ে। সংযুক্ত জেলাটিকে অজয়-নদী দুইভাগে ভাগ করে—দক্ষিণে বিষ্ণুপুর, উত্তরে বীরভূম ; এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে প্রথমটিতে আপেক্ষিক শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হলেও, শেষোক্তটি অরক্ষিত থাকে। মিঃ কিটিং লেখেন, 'প্রায় প্রতি রাত্রেই একটা-না একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি ঘটেই।' ক্রমাগত নৈশ টহলদারি এবং ছোট ছোট দলে বিভাজনের ফলে, দস্যুদের সাথে পাল্লা দেওয়া দূরে থাক, সামরিক বাহিনী প্রধান শহরগুলিকেও রক্ষা করতে অপারগ হলো। ১৭৮৯ সনের ২৫ ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জানান যে, রাজধানীর সরকারি অফিসগুলি রক্ষার জন্য চারজন মাত্র থাকে ; এবং কয়েক সপ্তাহ পরে, জেলার মধ্য দিয়ে সরকারি তহবিল স্থানান্তরকরণে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত রক্ষী নিয়োগে তিনি আপন অপারগতা ব্যক্ত করেন। অবশেষে ৫ই জুন, রাজপ্রাসাদ সহ পুরাতন রাজধানী রাজনগর দস্যু-কবলিত হলো।[১৬২] পাঁচ শতকেরও বেশি সময় যাবৎ বীরভূমে এই প্রকার বিপর্যয় ঘটেনি। ১২৪৪ সনে দক্ষিণ-পশ্চিম হতে আগত বন্য উপজাতিরা নগর লুণ্ঠন করে, এবং গুরুতর রাষ্ট্রবিপ্লবের মতোই সমান বিশ্বস্তভাবে এই অখ্যাত জেলার ভাগ্যাকাশেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাতের মতোই তার অন্তিম লগ্নেও একই বিপর্যয় দেখা যায়।

মিঃ কিটিং খুব কঠিন অবস্থায় পড়েন। অজয় নদীর দক্ষিণে বিষ্ণুপুর, উত্তরে বীরভূম এবং সর্বোপরি পশ্চিম সীমান্তের ঘাটগুলি রক্ষার দায়িত্ব তাঁরই ছিল। ইংরেজ শাসনক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হিসাবে বীরভূমের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক ; কিন্তু বিষ্ণুপুর হতে সৈন্য আনা হলে পূর্ব বৎসরের বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটবে ; আবার পশ্চিম সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহার করলে, উত্তর ও দক্ষিণ জুড়ে সমগ্র জেলা পাহাড়িয়াদের মর্জি নির্ভর হয়ে পড়বে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সমগ্র সীমান্ত অরক্ষিত রাখার পরিবর্তে অজয়ের দক্ষিণে দস্যুদের সাময়িক সক্রিয়তা শ্রেয়তর। অতএব, বীরভূম উদ্ধারের জন্য সত্বর বিষ্ণুপুর হতে সেনাবাহিনী আনা হলো ; কিন্তু নদী অতিক্রম করা মাত্র খবর আসতে থাকলো যে "প্রায় এক হাজার বিদ্রোহী' খোদ বিষ্ণুপুর দখল করেছে। সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে

পড়ে, এবং দক্ষিণের কালেকটাররা একযোগে মিঃ কিটিং-এর তিক্ত সমালোচনা করেন যে, নিজ সীমান্তের ফাঁড়িগুলি যথাযথ রাখার জন্য তিনি বহু জেলার শান্তি বলি দিলেন। যত কঠোরভাবে এই ঘাটগুলি রক্ষা করা হতে থাকলো, তত বেশি সংখ্যক হানাদার অজয়ের দক্ষিণে অরক্ষিত অঞ্চলে ঘুরপথে জমায়েত হলো। তাদের অত্যাচার সীমাহীন হয়ে উঠলো ; আসন্ন বর্ষায় সামরিক বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখা হলে বেশ কয়েক মাসের জন্য বিষ্ণুপুর তাদের দখলে থেকে যাবার আশংকা দেখা দিল" ; অবশেষে, একবছর আগে সহযোগী হিসাবে যাদের কৃষক সমাজ স্বাগত জানিয়েছে, সেই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অতিষ্ঠ সমগ্র কৃষক সমাজ, যত না বাঁচার জন্য, তার চেয়েও বেশি মৃত্যু কামনায়, রুখে দাঁড়ালো, এইভাবে শয়তানরা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়লো। তিন শতব্দী আগে বাংলায় হাবসি-ক্রীতদাস প্রহরীদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, বিষ্ণুপুরের হানাদারদের ভাগ্যেও তাই জুটলো ; বদ্ধ নগর প্রাচীরের বাইরেই তাদের থাকতে হলো, নানা ছলনায় তাদের দুই-তিনজন করে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হতো, কৃষক বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, এবং লাঠিপেটা হয়ে তারা কুকুরের মতো মরত। ১৭৯০ সনে মিঃ কিটিং, সিনিয়ার ক্যাপটেনকে এই আদেশ দেন যে, "একজন অফিসার সহ সামরিক রক্ষীবাহিনী বিষ্ণুপুরে মোতায়েন করা হোক। এদের একমাত্র কাজ হবে প্রেরিত সকল ডাকাত ও চোরদের দায়িত্ব গ্রহণ করা।"

এইভাবেই বীরভূমে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। এই পর্যায়ের সম্পূর্ণ রেকর্ড আমাদের আছে। এই খানের বিপর্যয়গুলি হতে অতীত ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি। দস্যুদল কি পরিমাণ ধন সম্পদ নষ্ট করছে তা কয়েক বৎসর আগে রচিত এক সরকারি দলিল হতে বোঝা যায়। ১৭৮২ সনে বেনারস জেলা সংক্রান্ত এই দলিলটির বক্তব্য, 'দুই মাসের গোল-যোগ জনিত ধ্বংস বাবদ বাদ যাবে ৬৬৬, ৬৬৬ : ১০ : ১০ রৌপ্যমুদ্রা।'[৬৩] অর্থাৎ ৭০ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং-এরও বেশি। এই যদি দুই মাসের ফল, তবে দুই বৎসর ব্যাপী ক্ষতির পরিমাণ কি ছিল ? কিছুদিন পর স্বেচ্ছাচারী বলপ্রয়োগে শান্তি সুনিশ্চিত করার পর ধীরে-সুস্থে এবং কিঞ্চিৎ হতাশার সাথে মিঃ কিটিং এত পরিশ্রমের ফলাফল খতিয়ে দেখেন। তিনি লেখেন, 'বীরভূম দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে বিরাট পশ্চিমের জঙ্গল দ্বারা পরিবৃত ; এই জঙ্গল বহুদিন ধরে অসংখ্য ডাকাত দলকে আইনের শাসন হতে রক্ষা করেছে। এখানে আশ্রয় নিয়ে ডাকাতরা প্রতিবেশী অসহায় কৃষকদের উপরে অত্যাচার চালাত। একদা জন-বহুল শহরগুলি বর্তমানে পরিত্যক্ত ; কারিগররা অধঃপতিত ; এবং একদা যেখানে বাণিজ্য আড়ম্বরে বিকাশমান ছিল, সেখানে মাত্র কয়েকটি হত-দরিদ্র, জীর্ণ কুটির দেখা যায়। অজয় নদীর সমগ্র গতিপথ জুড়ে বিশেষভাবে ইলাম-বাজারের (১৭৮৯ সনে যে শহর লুণ্ঠিত হয়) অধঃপতনের মাধ্যমে এবং একদা

বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র সাকারাকুণ্ডা বর্তমান পরিত্যক্তপ্রায় অবস্থার মধ্য দিয়ে এই তাণ্ডবের ফলশ্রুতি প্রকাশিত। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলগুলি দারিদ্র্যের কারণে যখন আর ডাকাতদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল রইল না, তখন দস্যুবৃত্তি জেলার কেন্দ্রস্থলে প্রসারিত হলো এবং তিন শতাধিক দস্যু জেলা শাসকের কুঠির দুই ক্রোশের (চার মাইল) মধ্যে হত্যা ও লুণ্ঠন অব্যাহত রাখলো।[১৬৪]

অন্তরের এই অকপট চিত্র কোনো প্রকার অন্তিম পালিশ ছাড়া এইভাবেই শেস করা সবচেয়ে সংগত। সেই সময় হতে তেরো বৎসর আগে সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত সরকারের সশস্ত্র বিরোধিতা বীরভূমে অজানা ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক এই অশান্ত বৎসরগুলিতেও কৃষক সমাজের যে নিরাপত্তা ছিল, তা বহুবৎসর যাবৎ তারা ভোগ করেনি। এর ফলে চাষ-আবাদ বাড়লো এবং বীরভূম 'তত্ত্বাবধানে' মিঃ ফোলি প্রেরিত হওয়ার সময় হতে, মিঃ কিটিং কর্তৃক সীমান্ত রক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে ৩২৮টি গ্রামীণ জনবসতি আবার গড়ে ওঠে এবং চাষ-আবাদ পুনরায় শুরু হয়।[১৬৫] এর ফলে জেলার মোট গ্রাম সংখ্যায় সাত-শতাংশের অধিক বৃদ্ধি ঘটে। যে দুইটি বিপর্যয়কর বৎসরের সাথে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত, সেই সময়ে সবচেয়ে দ্রুত উন্নতি হয়। ১৭৫৫ সনের নভেম্বর মাসে মিঃ কিটিং দস্যুদের স্বাধীনভাবে সারা জেলায় বিচরণশীল দেখেন। পাহাড়ি অঞ্চল হতে দস্যুদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তিনি সীমান্ত চৌকি স্থাপন করেন, কিন্তু এই চৌকিগুলি বলপূর্বক ছত্রভঙ্গ করা হয়। ১৭৮৯ সনে জেলার অবস্থা তাঁর দায়িত্ব গ্রহণকালের চেয়ে বাহ্যত কোনো দিক দিয়েই অধিকতর নিরাপদে ছিল না। কিন্তু প্রথম শীতকালীন বিপর্যয় করণীয় সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে। অতিরিক্ত সেনাবাহিনী এনে সীমান্ত চৌকিগুলিকে সুসংহত করা হয়, ফলে কোনোরূপ প্রবেশপথ না পেয়ে দস্যুবাহিনী ঘুরপথে দক্ষিণে যায় ও অজয় নদীর ঐ কূলে সমবেত হয়। ১৭৯০ সনে বর্ষার প্রারম্ভে স্থানীয় অধিবাসীরা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারের সাথে সোৎসাহে সহযোগিতা করে, এবং গাজা বাসীদের মতোই বীরভূমে দস্যুদলও সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হওয়ার জন্যই যেন একস্থানে একত্রে জমায়েত হয়েছিল।

শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে আইনের শাসন দ্রুত অনুভূত হতে থাকে। সংগঠিত ডাকাতি ও জমিদারদের মধ্যে সশস্ত্র বিরোধের ফলে জেলার শান্তি মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হতো ঠিকই, কিন্তু পুরাতন সেই বিপর্যয়ের স্মৃতি জাগরূক রাখার পক্ষে তা ছিল অতি অপ্রতুল—এমনকি সিংভূম, শেরঘর, শেরঘাটি, শিকারপুর ইত্যাদি নামগুলি যে বন্যজন্তুর কারণে ক্রমক্ষীয়মাণ চাষ আবাদের দিনগুলির স্মৃতি-দ্যোতক, এই প্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রায় মনে থাকে না। ১৮০২ সনে স্যার হেনরি স্ট্র্যাচি ডাকাতির উপদ্রব মুক্ত এলাকা হিসাবে বিশেষভাবে

বীরভূমের উল্লেখ করেন, বর্তমানে এইটি বোধহয় বাংলার সবচেয়ে শান্ত জেলা ; তাই অতীত সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে অসচেতন সাম্প্রতিক এক সরকারি দলিলে, এই জেলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে 'উপদ্রবহীনতার প্রাচীন ঐতিহ্য' এখনো বর্তমান।

বন্যজন্তুদের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন কম উল্লেখযোগ্য নয়। বর্তমানে বুনো হাতির সন্ধান পাওয়া অসম্ভব এবং জেলার এ-প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত অবধি কোথাও বাঘের ডাক শোনা বিরলপ্রায় ঘটনা। ১৮৬৪ সনের মে মাসে শেষ বাঘ শিকারের ঘটনা ঘটে। প্রায় পাঁচশত পাহাড়িয়ার একদল বহু বর্গমাইল জঙ্গল ঝাড়ু করেও, বাঘ বা হাতি দূরে থাক, একটা ভালুক বা চিতার সন্ধান পাওয়া যায়নি। বৃহত্তম যে জানোয়ার আমাদের নজরে পড়ে, সেইটি হলো একটি ছোট চিতা হরিণ। জঙ্গলের গভীরে এখনো চিতা ও ভালুক বর্তমান, কিন্তু তারা স্থানীয় অধিবাসীদের বিরক্ত করে না, এবং এদের ধরা প্রায় স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে ঈগল শিকারের মতোই সমান চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতে বাংলায় বিশৃংখলার জন্য স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়কে দায়ী করা যায় না। সেই সময়ে মুসলিম অত্যাচার ও বিপর্যয়ের ফলে তারা আর জনগণের স্বাভাবিক নেতা ছিল না। কিন্তু বাঙালির অবিস্মরণীয় দুর্দশার মূল আরো গভীরে নিহিত। জাতীয়তার একপ্রবল উদ্দীপনার উপস্থিতিতে এই প্রকারের দীর্ঘস্থায়ী অত্যাচার সম্ভব হতো না ; এশীয় দেশে ইসলাম ধর্ম বিস্তৃতির পর্যায়ে এই উদ্দীপনার অভাব, পরাজয় ও জাতীয় গ্লানিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। যে সময়ে প্রজাশাসনের তাগিদে ইংরেজ রাষ্ট্রনায়করা লক্ষ-লক্ষ ভিন্নধর্মী দেশীয়দের মধ্যে স্বনির্ভর এক জাতীয় জীবন বিকাশে সচেষ্ট, তখন এত পরিশ্রমী, এত ধৈর্যশীল অথচ এত বিচক্ষণ ও প্রত্যুৎপন্নমতি জনসাধারণ কেন একটা জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল না, কারণগুলি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যেহেতু বাঙালি পারিবারিক জীবনও কৃষি-ব্যবস্থার বহু ব্যাখ্যাহীন ব্যাপারের মূলে রয়েছে এই কারণগুলি, তাই গ্রামীণ ইতিকথার প্রাথমিক সংখ্যায় এই অনুসন্ধান অতি প্রাসঙ্গিক—যদিও এর ফলে আমাদের আশু বিষয়বস্তু হতে আপাতত সরে যেতে হবে। সুতরাং, যেসব উপাদানগত ও আঙ্গিকগত ত্রুটির ফলে বাংলার বর্ণসংকর অধিবাসীবৃন্দ একটা জাতি হিসাবে বিকশিত হতে অক্ষম হলো, সেইগুলি পরের দুইটি পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ বিশদভাবে আলোচিত হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. ১৭৬৯ সনে বীরভূমকে সামরিক তত্ত্বাবধানের অধীনে রাখা হয়; ১৭৭২ সনে পরিদর্শক কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে এখানে 'সফর' করেন, কিন্তু রাজার হাতে স্থানীয় প্রশাসন থাকে—মুর্শিদাবাদের রাজস্ব পরিষদের আলোচনা—২০ অকটোবর ১৭৭০, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১ ইত্যাদি; রাজার আবেদনপত্র, সিলেক্ট কমিটির কার্যবিবরণী, ২৮ এপ্রিল ১৭৭০, ইণ্ডিয়া অফিস রেকর্ড নথিপত্র; বীরভূমের রাজাদের বংশতালিকা, বীরভূম রাজাদের পারিবারিক নথিপত্র।

২. বর্তমানে বিভক্ত হয়ে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত; বাঁকুড়া আদালত ও অফিসের নথিপত্র।

৩. বড়লাট বাহাদুর ও রাজস্ব পরিষদের সভ্যদের নিকট মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক এডওয়ার্ড অটো আইভস মহোদয়ের পত্র, ১৫ আগস্ট ১৭৮৪। বী. বি. ন.

৪. একই ব্যক্তির্দের উদ্দেশ্যে একই ব্যক্তির পত্র, তাং মুর্শিদাবাদ, ২৬ মে ১৭৮৫। বী. বি. ন.

৫. ঐ, তাং ৩০ জুন, ১৭৮৫। বী. বি. ন.

৬. বহু কারখানা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। বী. বি. ন.

৭. বিবিধ কার্যবিবরণ; রাজস্ব কমিটি, ফোর্ট উইলিয়াম। ১৭৮৬ সনের ৯ ফেব্রুয়ারি, আলোচ্য ভদ্রলোকটির, মিঃ জি. আর. ফোলির আবেদন অনুমোদন লাভ করে। ক. অ. ন.

৮. রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্রের পাণ্ডুলিপি। ক. অ. ন.

৯. কলিকাতা গেজেট বা 'ওরিয়েণ্টাল অ্যাডভার্টাইজার—সাপ্তাহিক পত্রিকা, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতো; সরকারের বিশেষ আদেশের জন্য বিশেষ গেজেট ও অন্যান্য খবরাখবর থাকত। এই পত্রিকার সবথেকে ভালো সংকলন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রয়েছে; ১৮০২ হতে ১৮০৪ সন পর্যন্ত ব্যতীত ১৭৮৪ হতে ১৮০৫ সন পর্যন্ত সকল সংখ্যা রয়েছে। ভারতে অপেক্ষাকৃত কম সঠিক এক সংকলন হতে বাংলার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্যতম বিচারক তথা বাংলার সিভিল সার্ভিসের মিঃ ডব্লু. এস. মেটন-কার নির্বাচিত অংশ বিশেষ দুই খণ্ডে সংকলিত করেন। ই. অ. লা.

১০. ১৭৮৬ সনের ২৫ এপ্রিল, বিষ্ণুপুর মিঃ পাই-এর অধীন হয়; ১৭৮৭ সনের ১৯ এপ্রিল, তিনি সংযুক্ত জেলা পরিত্যাগ করেন। উচ্চপদে

আসীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তিনি পরবর্তী বদলি অফিসারের জন্যে অপেক্ষা না করে সহকারীকে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। —রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্রের পাণ্ডুলিপি। ক. অ. ন.

১১. নিযুক্তি ৪ এপ্রিল ১৭৮৭; দায়িত্ব গ্রহণ, ২৯ এপ্রিল ১৭৮৭; দায়িত্ব প্রত্যর্পণ, ৩ নভেম্বর ১৭৮৮। —রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্র। ক. অ. ন.

১২. সিক্কা টাকা, ৩০ হাজার। ১৭৮৮ সনের ১৬ অকটোবর, বৃহস্পতিবারের 'কলিকাতা গেজেট'। বর্ধমান জেলার মণিরামপুর থানায় এই আক্রমণ ঘটে।

১৩. নিযুক্তি, ২৯ অকটোবর, ১৭৮৮; জেলার দায়িত্ব গ্রহণ, ১৪ নভেম্বর; পাঁচ বছর শাসন করার পর ১৭৯৩ সনের ৬ অগাস্ট দায়িত্ব প্রত্যর্পণ ও জেলা ত্যাগ। ক. অ. ন.

১৪. অষ্টম খণ্ড, ১৮৬০, ৩য় অধ্যায়, পৃ. ৪৮৬

১৫. '১৭৭০ সনের বাংলার দুর্ভিক্ষের বিশদ বিবরণ এখনো পাইনি।' মহামান্য রাণীর আদেশে সংসদে উপস্থাপিত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬) সংক্রান্ত নথিপত্র। প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২৮; পরে অবশ্য কিছু তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে (পৃ. ৩৭৫)।

১৬. পরবর্তীকালে উদ্ধৃত বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র ছাড়াও এই অধ্যায়ের ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলি আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ: 'A narrative of what happened in Bengal in 1760'; Memoirs of the Revolutions in Bengal', 1760. 'Lord Clive's Letter to the Proprietors of the East India Stock,' 1764. 'Dangers, etc. from the East India Company's building their own Ships', 1768. 'Original papers relative to the Disturbances in Bengal from 1759 to 1764', (অতি মূল্যবান সংকলন), 1765। 'An account of the Trade to the East Indies,' etc. 1772; 'Essay on the Rights of the East India Company', 1772; 'Letter from G. Dodwell, Eeq., to the Proprietors', 1777। কোম্পানির নিজস্ব জাহাজ তৈরি সম্বন্ধে দুটি লেখা, ১৭৭৮। 'Considerations, on the East India Bill now depending in Parliament, 1779'। ১৭৮০ সনের পর বাংলা সম্বন্ধে পুস্তিকা ও সংবাদপত্র অসংখ্য হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য পুস্তিকাদির সংখ্যা ১৩০-এর বশি। উত্তরপাড়া-সংগ্রহ, এবং ই. অ. ল.

১৭. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, তাং ফোর্ট উইলিয়াম, ৩০ সেপটেম্বর ১৭৬৯। সিলেক্ট কমিটির কার্যবিবরণী, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৭৬৯, ইত্যাদি। ই. অ. ন.

১৮. 'রাজস্ব পূর্বে কখনো এত নিবিড়ভাবে সংগৃহীত হয়নি।'—দরবারে প্রতিনিধি, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৯। ই. অ. ন.

১৯. ১৭৬৯ সনের ১৬ আগস্টের আলোচনায় বিহারের প্রধান মিঃ রামবোল্ড।

২০. মিঃ বেচার, দরবারেব প্রতিনিধি, ৩০ মার্চ ১৭৭০, ইত্যাদি। ই. অ. ন.

২১. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, তাং ২৫ সেপটেম্বর ১৭৬৯। সরকারি আলোচনা, ৭ আগস্ট ১৭৬৯

২২. ঐ একই ব্যক্তিদের নিকট হতে একই ব্যক্তিদের প্রতি, তাং ২৩ নভেম্বর ১৭৬৮, অনু. ৮, ৯, ১০। মিঃ ভেরেল্‌স্টের দস্তখত না করা সম্ভবত ইচ্ছাকৃত, কারণ তিনি সভার কার্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ তারিখে অন্য একটি পত্রে দস্তগত করেন। ২৫ ও ৩০ সেপটেম্বরের পত্র শুধু রাজস্ব সম্বন্ধে আশংকা ব্যক্ত করেন, বাংলায় সাধারণ দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নয়।

২৩. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতি লিখিত, তাং ২৬ ডিসেম্বর, ১৭৬৯। পুনশ্চ হিসেবে সংযোজিত। পরিশিষ্ট ২-তে, '১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষের সরকারি বয়ান'-এ, মূল দলিল হতে উদ্‌ধৃতি পাওয়া যাবে। স্থানীয় অফিসারদের আশংকা এবং সরকার কর্তৃক নির্ণীত ও গৃহীত সাধারণ তথ্যাদির মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে পাঠক সচেতন থাকবেন।

২৪. একই ব্যক্তিদের নিকট একই ব্যক্তিদের পত্র, ২৫ জানুয়ারি, ১৭৭০, অনু. ৪৮। ১৭৮৭ সনে মোট রাজস্ব ৪৫০,০০০ স্টালিং হতে প্রস্তাবিত হ্রাসের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার পাউণ্ড। পরিচালক সভার নিকট পরিষদের বড়লাট বাহাদুরের পত্র, তাং ৩১ জুলাই, ১৭৮৭। ই. অ. ন.

২৫. ঐ একই পত্র, তাং ৪ ফেব্রুয়ারি ১৭৭০, অনু. ৪, ৫ ও ৬। ই. অ. ন.

২৬. ১৭৭০ সনের ৯ জুনের আলোচনা। ই. অ. ন.

২৭. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৭৭০, অনু. ৬। ই. অ. ন.

২৮. ঐ একই পত্র, ১১ সেপটেম্বর ১৭৭০; অনু. ৫। ১০ এপ্রিল হতে অর্থনৈতিক বর্ষের সূচনা। দুর্ভিক্ষের বৎসরে রাজস্ব ১,৩৮০,২৬৯ পাউণ্ড হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫৪২,৫৬৭ পাউণ্ড হয়। ই. অ. ন.

২৯. বসন্তকালীন ফসল খারাপ হয়। পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভপতির পত্র, ৯ মে ১৭৭০। ই. অ. ন.

৩০. ঐ পত্র, অনু. ৩

৩১. ১৭৭২ সনের আগে পর্যন্ত কোম্পানি বাংলার বেসামরিক প্রশাসক হয়ে ওঠেনি।

৩২. বিখ্যাত মহম্মদ রেজা খাঁ।

৩৩. পুর্ণিয়ার ফৌজদার মহম্মদ আলি খানের আবেদনপত্র, ১৭৭০ সনের ২৮ এপ্রিলের আলোচনা, ইত্যাদি। ই. অ. ন.

৩৪. যশোরে আমিল উজাগর মালের আবেদন পত্র। ১৭৭০ সনের ২৮ এপ্রিলের আলোচনা। ই. অ. ন.

৩৫. ২ জুনের পত্র। ১৭৭০ সনের ৯ জুনের আলোচনা। ই. অ. ন.

৩৬. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতিব পত্র, ১৯ মার্চ ১৯৭০। ই. অ. ন.

৩৭. লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক ১৭৮৯ সনের বন্দোবস্তকে তৎক্ষণাৎ চিরস্থায়ী করণের বিপক্ষে তাঁর বিরোধিতা। শোর ভেবেছিলেন, জনগণের অর্ধাংশ যখন বিনষ্ট এবং এক-তৃতীয়াংশ জমি যখন পতিত পড়ে রয়েছে, দেশ তখন এরূপ এক ব্যবস্থার জন্যে প্রস্তুত নয়।

৩৮. তাঁর পুনর্লিখিত *Memoir of the Life and correspondence of John Lord Teigumouth*, ১ম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৪৩। পৃ. ২৫-২৬

৩৯. এই বিপযয়ের যথার্থ চরিত্র অজ্ঞানা ; সম্ভবত দুর্ভিক্ষজাত মহামারী।

৪০. জে. সি. মার্শম্যান, বাংলার ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ। শ্রীরামপুর।

৪১. পরিচালক সভাকে লিখিত পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ২৪ ডিসেম্বর ১৭৭০, অনু. ২২। ই. অ. ন.

৪২. ঐ, ১২ ডিসেম্বর ১৭৭০, অনু. ৯। ই. অ. ন.

৪৩. ঐ, ফোর্ট উইলিয়াম, ১১ সেপ্টেম্বর ১৭৭০, অনু. ৪। ই. অ. ন

৪৪. ঐ, ২৪ ডিসেম্বর ১৭৭০, অনু. ২২। ঐ, ১২ ডিসেম্বর ১৭৭০ অনু. ৯ দ্রষ্টব্য। ই. অ. ন.

৪৫. ১৭৭০ সনের ১৪ নভেম্বরের সরকারি আলোচনা। ই. অ. ন.

৪৬. পরিচালক সভাকে লিখিত পরিষদ তথা সভাপতির পত্র। ১০ জানুয়ারি ১৭৭২, অনু. ১৬ ইত্যাদি।

৪৭. ঐ, ১০ নভেম্বর ১৭৭৩, অনু. ৩৩। ৩০ ডিসেম্বরের পত্রও দ্রষ্টব্য। ই. অ. ন.

৪৮. ১৭৭৩ সনের ১০ নভেম্বরের পত্র, অনু. ৩২। ই. অ. ন.

৪৯. ১৭৭৩ সনের ৩০ ডিসেম্বরের পত্র, অনু. ৯। ই. অ. ন.

৫০. ১৭৬৮-৬৯ সনের রাজস্ব বিবরণী হতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। স্থানীয় অফিসাররা যথারীতি তারস্বরে তাদের আশংকা ব্যক্ত

করেছে ; কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভূমিরাজস্ব 'পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে' আদায় করা হয়েছে। ১৭৭২ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৬৮-৬৯ সনের আদায়কে মোটামুটি আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তিন বৎসরের প্রাচুর্যের ফলশ্রুতি হিসেবে ও তাঁর স্বীকারোক্তি অনুসারে, একই মাত্রার নিষ্ঠুর নিপীড়নের মাধ্যমে রাজস্ববৃদ্ধি ঘটানোর জন্যে প্রশংসা লাভ করেন। ১৬৭০ সনে, অর্থমন্ত্রী তথা গৃহমন্ত্রী মহম্মদ রেজা খান ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। তাঁর প্রস্তাবিত পবিমাণ ছিল ১,৫২৪,৫৬৭ পাউণ্ড। ১৭৬৮-৬৯ সনে প্রকৃত আদায় হয় ১,৫২৫,৪৮৫ পাউণ্ড। ১৭৬৮ সনে কোনো রূপ গুরুতর ফসল হানি ঘটে থাকলে, ভূমিরাজস্বের অবশ্যই ক্ষতি হতো (যেমন ১৭৬৯-৭০ সনে হয়েছিল), এবং ১৭৬৮ সনের আদায় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হতো না। আবার, ১৭৬৮ সনের ঘাটতির জন্যে ১৭৬৯ সনে দেশ গুরুতর ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হলে, ১৭৬৯-৭০ সনের মতো এত বিপুল পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হতো না। দুর্ভিক্ষের বছরে সামগ্রিক চাহিদা ১,৩৮০,২৬৯ পাউণ্ডের মধ্যে মাত্র ৬৫,৩৫৫ পাউণ্ড প্রেরিত হয়। —পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্রাবলী, ১১ সেপটেম্বর, ১৭৭০, অনু. ৫ ; ৩ নভেম্বর, ১৭৭২ সনের পত্রের অনু. ৬ ; এবং অন্যান্য দলিল। ই. অ. ন.

৫১. বিহারের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ জেমস আলেকজাণ্ডার ; ১৭৭০ সনের ৯ জুনের আলোচনা, এবং পূর্ণিয়ার মিঃ ডিউকারেলের সঙ্গে, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০। ই. অ. ন.

৫২. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১, অনু. ৪৪। একই তারিখের অপর একটি পত্রে তাঁরা 'বিপুল জনহানি'র কথা বলেছেন। কয়েক মাস আগে একটি পত্রে তাঁরা 'দুর্ভিক্ষের ফলে বহু সংখ্যক উদ্যমী কৃষক ও উৎপাদক বিনষ্ট হওয়ার' জন্যে বিলাপ করেন। ই. অ. ন.

৫৩. ঐ, ৫ সেপটেম্বর ১৭৭২, অনু. ১০। ই. অ. ন.

৫৪. ঐ, ৩ নভেম্বর ১৭৭২, অনু. ৬। প্রশংসনীয় এই পত্রে রয়েছে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালের সূচনা পর্বে সমগ্র দেশের তথা গ্রামীণ প্রশাসন ব্যবস্থার এক জীবন্ত ও সঠিক বিবরণ ;—এই পত্রটি পরিশিষ্ট-১ হিসেবে '১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে বাংলার চিত্রায়ণ' নামে সম্পূর্ণাকারে মুদ্রিত হয়েছে।

৫৫. যেমন. মিল দ্বারা (৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬, ১৮৪০ সংস্করণ) ও অবার (Rise and Progress, খণ্ড ১, ১৮৩৭ সং, পৃ. ৪১৪)।

৫৬. যেসব পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলার অভ্যন্তরীণ শাসনভার ইংরেজদের হাতে আসে, সেগুলি যে কত মন্থর ও অনিশ্চিত ছিল, তা 'গ্রামীণ

প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস' নামে পরবর্তী এক অধ্যায়ে দেখানো হবে।

৫৭. এই ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তিত হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নথিপত্রে দেখা যায় না। অবশ্য প্রায়শ এগুলির উল্লেখ করা হয়; যথা: পরিচালক সভাকে লিখিত পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ৯ মার্চ ১৭৭২, অনু. ৪৬, ৪৭; ১৭৭২ সনের ৫ সেপ্টেম্বরের পত্র, অনু. ৫। ই. অ. ন.

৫৮. রংপুরের তত্ত্বাবধায়কের পত্র, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৭৭০। প্রাদেশিক পরিষদ, মুর্শিদাবাদ, আলোচনা, ৪ অকটোবর। ই. অ. ন.

৫৯. দরবারের প্রতিনিধি মিঃ বেচারের পত্র, ২৪ ডিসেম্বর ১৭৭০। নায়েব দেওয়ানের আবেদনপত্র, ১ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১।

৬০. গোপন কমিটির টীকা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১। মহম্মদ রেজা খানের বিচারের বিবরণী, ১৭৭২।

৬১. নায়েব দেওয়ানের আবেদনপত্র।

৬২. গোপন কমিটির টীকা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। ই. অ. ন.

৬৩. এর সাথে দেশীয়দের প্রদত্ত চাঁদা ৪,৭০০ পাউণ্ড যোগ করলে সমস্ত সূত্র প্রাপ্ত মোট পরিমাণ হতে ১৩,৭০০ পাউণ্ড। আমদানি কৃত চাউল বিক্রয়বাবদ লাভ ৬,০৫৯ পাউণ্ড, সাধারণ ব্যয় হতে এই পরিমাণ বাদ দিতে হবে।—চাউল বিক্রয় সংক্রান্ত স্মারক পত্র, ১ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১।

৬৪. বাংলার পরিষদ তথা সভাপতির নিকট পরিচালক সভার পত্রাবলী, ১০ এপ্রিল ১৭৭১, ২৮ আগস্ট ১৭৭১, ইত্যাদি। ই. অ. ন.

৬৫. মহম্মদ রেজা খান। রাজা সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে তদন্তের বিষয়টি বিচারের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রকাশ্য ভর্ৎসনা ছিল।

৬৬. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ৯ মে ১৭৭০, অনু. ৩০। পাটনার তত্ত্বাবধায়ক মিঃ আলেকজাণ্ডার, জেনারেল স্যার রবার্ট বার্কার, কর্নেল গ্যালিয়েজ, ক্যাপ্টেন হার্পারের পত্রাবলী; এবং ১৭৭০ সনের মে ও জুন মাসের আলোচনা। সেনাবাহিনীর জন্য শস্য আমদানির পত্রে কয়েকটি প্রয়াসের ব্যর্থতাও প্রকাশিত। ই. অ. ন.

৬৭. গৃহীত কঠোর ব্যবস্থাসমূহের জন্যে পরিশিষ্ট-১, '১৭৭২ সনে বাংলার চিত্রায়ণ' দ্রষ্টব্য; পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্রাবলী, ১১ সেপ্টেম্বর ১৭৭০, ৩ নভেম্বর ১৭৭২, ইত্যাদি। বিভিন্ন পত্রে বিভিন্ন প্রকারের হ্রাস উল্লেখিত। ১৭৭০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের আগে জমা ছিল মাত্র ৮০,৩৩২ পাউণ্ড; পরে হ্রাস পেয়ে হয় সর্বমোট ১,৩৮০,২৬৯ পাউণ্ডের মধ্যে ৬৫,৩৫৫ পাউণ্ড।

৬৮. 'গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা'।

৬৯. বহু আগে ১৭৭২ সনের নভেম্বর মাস নাগাদ ওয়ারেন হেস্টিংস এই প্রকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। পরিচালক সভার নিকট পত্র।

৭০. পরিষদের ত্রাণ ব্যবস্থা বিষয়ে পরিচালক সভা বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু শস্যের একচেটিয়া ও ব্যক্তিগত কারবারের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে পরিষদকে ভৎর্সনা করেন।

৭১. ঐদিনের কলিকাতা ও আগ্রার সংবাদপত্রগুলিতে / সুপরিচিত ভারতীয় সাংবাদিক মিঃ জে. ও'ব সণ্ডার্স মহাশয়ের *Diary of an Invalid on his Journey down the Ganges* রচনাটি দুর্ভিক্ষের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দলিলগুলির অন্যতম।

৭২. পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬) সংক্রান্ত নথিপত্র ইত্যাদি : প্রথম ভাগ, পৃ. ৩৪৫। দরবারে প্রতিনিধি মিঃ বেচারের পত্র, ১৮ জুন, ১৭৭০। নায়েব দেওয়ানের প্রতিবেদন, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। কুকের বীরভূম বিবরণী (পরিশিষ্ট-৩)।

৭৩. ১৮৬৭ সনে দুর্ভিক্ষ চরম থাকাকালীন আমি উড়িষ্যা সহ নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের সরকারি নির্দেশ তত্ত্বাবধান করতাম। অধীনস্থ প্রায় আট শত দেশীয় অফিসার প্রশংসাতীত একনিষ্ঠতা ও প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগে স্বাক্ষর রাখেন। অনেকের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। পরিদর্শনকালে প্রায় পালকিতেই একজন মারা যায়। পরিদর্শনকালে গরিব গ্রামবাসীদের মধ্যে আমি যে স্বার্থত্যাগ ও নীরব বীরত্বের হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য দেখেছি, তা শেষদিন অবধি আমার স্মৃতিতে থাকবে।

৭৪. নায়েব দেওয়ানের প্রতিবেদন—আলোচনা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। পরিশিষ্ট-২

৭৫. সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন যে, ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে এক বাস্তব পার্থক্য আছে, এবং সর্বস্বীকৃত এক পর্যায়ে প্রথমটি দ্বিতীয়টিতে পরিণত হয়।—পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত বাংলায় দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত নথিপত্র ইত্যাদি। খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৪ ফোলিও।

৭৬. *Famine Commissioner's Report* (1866), খণ্ড ১, অনু. ৩২, ৪৬, ৪১২ ইত্যাদি।

৭৭. ঐ, খণ্ড ১, অনু. ৪৭ ইত্যাদি।

৭৮. বস্তুত, কমিশনাররা সঠিক ভাবেই বলেছেন যে, জানুয়ারি মাসে ধান ঝাড়াই-এর আগে শস্যের পরিমাণ নির্ণয় অসম্ভব ; খড়ের পরিমাণ দ্বারা নিরূপণ ভ্রমাত্মক—ঐ রিপোর্ট, প্রথম ভাগ, অনু. ১১২

৭৯. সরকারি ও বেসরকারি তথ্যাভিজ্ঞ মহলের সাধারণ মতামত এই ছিল

যে, কাটকাবাজদের হাতে ব্যক্তিগত বিপুল পরিমাণ শস্য মজুত ছিল। 'জনসাধারণ খুব নির্ধারকভাবে এই মতামত পোষণ করত' ; এবং কমিশনার মনে করতেন যে, 'বেশ কয়েক বৎসর বাজারে সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট (শস্য) রয়েছে।' গ্রামীণ পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সামগ্রিক অনুপস্থিতিতে, এই মতামতগুলির বিরোধিতা করার মতো কোনো প্রমাণাদি নেই। — ঐ রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, অনু. ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬ ইত্যাদি।

৮০. ফেমিন রিপোর্ট : 'ভুয়া উপকূলভাগ ব্যতিরেকে, উড়িষ্যার সংলগ্ন উপকূলভাগে সাধারণ জলযানগুলি সামুদ্রিক ঝাপ্‌টার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রতিরাগহীন, অবস্থায় কোনোক্রমে নোঙর ফেলতে পারে এবং তুমুল বর্ষার মাঝে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে অতি ধীরে মালপত্র খালাস করতে পারে।' অনু. ২৯০, প্রথম ভাগ। এই প্রচেষ্টায় বহু জলযান ধ্বংস হয় বা মালপত্র হারায়।

৮১. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ ও সভাপতির পত্র, ১০ নভেম্বর, ১৭৭৩, অনু. ৩৩। লর্ড লিণ্ডসে লিখিত 'লিণ্ডসেদের জীবনী' গ্রন্থে শ্রীহট্টের সমাহর্তা, মাননীয় রবার্ট লিণ্ডসের আত্মজীবনী, ১৭৭৮-৮৮, খণ্ড-৩, পৃ. ২০৭; আট খণ্ডে সম্পূর্ণ, লণ্ডন, ১৮৪৯।

৮২. উদাহরণ হিসেবে, বিহারের নারায়ণী টাকা, শ্রীহট্টের কড়ি-মুদ্রা ব্যবস্থা (যে ব্যবস্থায় এক শিলিং-এর মূল্য ২৫০০ ছোট কড়ির অধিক) ইত্যাদি। — বাংলা সম্বন্ধে পত্র, ১০ নভেম্বর ১৭৭৩, অনু. ৪। ই. অ. ন. সরকারি দফতরের কার্যবিবরণী, ফোর্ট উইলিয়াম, ২৪ অকটোবর ১৭৯২। ক. অ. ন.। লিণ্ডসেদের জীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭০ ইত্যাদি।

৮৩. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৬৯, অনু. ১২৫, ই. অ. ন.

৮৪. ঐ, অনু. ৩৯, ই. অ. ন.

৮৫. ঐ, ২৫ আগস্ট ১৭৭০, অনু. ২৬, ই. অ. ন.

৮৬. আলোচনা, ২৮ এপ্রিল ১৭৭০, ইত্যাদি।

৮৭. আলোচনা, ৩ মে ১৭৮০। পরবর্তীকালে উত্তর হতে আমদানি নিষিদ্ধ হয় এবং সেখানেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

৮৮. শ্রীহট্টের সমাহর্তা মাননীয় রবার্ট লিণ্ডসের বিবরণী, ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ ; ফেমিন রিপোর্ট, ১৮৬৬। লর্ড লিণ্ডসে লিখিত লিণ্ডসেদের জীবনী, ৩য় খণ্ড, অনু. ২০৮ (১৪৯)

৮৯. কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথের বিবরণ। — বাংলার দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত, পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত নথিপত্র, ফোলিও, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০

৯০. প্রধান ত্রাণ কমিটির এক সদস্যের পত্রের ভিত্তিতে এই বক্তব্য, কলিকাতায়

প্রকাশিত আমার 'গ্রামীণ রেখাচিত্র'তে আরো সম্পূর্ণ রূপে এই পরিসংখ্যান দেওয়া আছে।

৯১. ফেমিন কমিশনার্স রিপোর্ট (১৮৬৬), ১ম খণ্ড, অনু. ৭৩

৯২. ঐ

৯৩. ঐ, অনু. ৭৪। রাজমহলের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ হারউডের বিবরণ, আলোচনা, ২৮ এপ্রিল ১৭৭০, ইত্যাদি।

৯৪. আলোচনা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১।

৯৫. কুষ্টিয়া। আমার নিজের আদালতে এই ঘটনাটি ঘটে।

৯৬. দুর্ভিক্ষের একেবারে সূচনায় বাংলার জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থগিত রাখার ফলে উড়িষ্যায় চাষের নিরুৎসাহীকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৯৭. একমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, ১৮৬৬ সনে নরভক্ষণের কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং সমগ্র বাংলায় এক কোটির পরিবর্তে সাড়ে-সাত লক্ষ সামগ্রিক জনহানি ঘটে।

৯৮. ফেমিন কমিশনাররা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের বিজ্ঞতার সঙ্গে আমদানি করা অনুমোদন করলেও রফতানির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। আমার আশংকা মিঃ মিলের যুক্তিগুলি উভয় ক্ষেত্রে খাটে।

৯৯. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ফোর্ট উইলিয়াম, ১০ নভেম্বর ১৭৭৩। ই. অ. ন.

১০০. ঐ, ২৫ আগস্ট ১৭৭০, অনু. ৫৩। ই. অ. ন.

১০১ রাজস্ব পর্ষদকে বর্ধমান জেলা সমাহর্তার পত্র, ১৩ মে ১৭৮৬। ক. ন.

১০২. এই পরিবারের এক বিবরণী 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্', বার্লিনে সম্পাদিত, ১৮৫২।

১০৩. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ফোর্ট উইলিয়াম, ১০ নভেম্বর ১৭৭৩, অনু. ৮, ১১ ইত্যাদি।

১০৪. রানী বনোয়ারী।

১০৫. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ১৫ মার্চ ১৭৭৪, অনু. ৬

১০৬. ঐ, ১০ নভেম্বর ১৭৭৩, অনু. ১৬

১০৭. এক বৎসরে শিলিং প্রতি শতাধিক পাউণ্ড চাউল বিক্রয় করা হতো; এবং প্রচলিত আছে যে, ঢাকার এক নবাব, তাঁর রাজত্বকালে চাউলের সর্বনিম্ন দর হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ শিলিং প্রতি ১৫০ পাউণ্ড দর নামা পর্যন্ত নগরের তোরণ বন্ধ রাখেন।

১০৮. রাজস্ব পর্যালোচনা—মিঃ ফ্রান্সিস কৃত কার্যবিবরণী, ৫ নভেম্বর ১৭৭৬,

ই. অ ন.

১০৯. খুদ্ কশ্ত।

১১০. পাহিকশ্ত। ইংরেজি শব্দগুলি হেস্টিংস ও ফ্রান্সিস কৃত।

১১১. উদাহরণ স্বরূপ, বীরভূমে।—রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি জন শোর মহোদয়ের নিকট জেলা সমাহর্তা ক্রিস্টোফার কিটিং মহাশয়ের পত্র, ৩ জুলাই ১৭৮৯। বী. রা. ন.

১১২. ঐ, ৩০ আগস্ট ১৭৮৯। জেলা সমাহর্তার নিকট রাজস্ব পর্ষদের পত্র, ১০ মে ১৭৯০, ইত্যাদি। বী. রা. ন.

১১৩. গরীব দাস লিখিত বাংলার ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত মোকাররী ব্যবস্থায় বিধিনিষেধ ও টীকা; প্রত্যুত্তর সহ। ৮খণ্ড, লণ্ডন, ১৭৯৪। এইটি মিঃ জে. প্রিন্সেপ ও মিঃ থোস্ল-এর মধ্যে ১৭৯২ সনে 'মর্নিং ক্রনিকল'-এ কিঞ্চিৎ তিক্ত আলোচনার পুনর্মুদ্রণ। উ. স.

১১৪. ২৪ জিও. III, ৩৯, উ. স.

১১৫. গভর্নর-জেনারেলের কার্যবিবরণী, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৮৯। তাঁর ১৭৮৯ সনের ২ আগস্টের পত্রও দ্রষ্টব্য।

১১৬. রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ৩ জুলাই ১৭৮৯। বী. রা. ন.

১১৭. বাংলা ১১৭৮ (১৭৭১-৭২ খ্রী.) সনের জন্যে হস্তাবুদ হিসাব ও নথিপত্র, রাজস্ব পর্ষদ। ক. অ. ন.

১১৮. তত্ত্বাবধায়ক মিঃ হিগিনসনের বিবরণ। ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। ই. অ. ন.

১১৯. বীরভূম হস্তাবুদ—রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ৩ জুলাই ১৭৮৯। বী. রা. ন.

১২০. সঠিক সংখ্যা ছিল ১৪৪৫।

১২১. রাজস্ব পর্ষদের নিকট জেলা সমাহর্তার পত্রাবলী, ১ আগস্ট ১৭৮৯ সন ইত্যাদি। বী. রা. ন.

১২২. পলাতিকা। বাংলা ১১৭৮ সনে বীরভূমের হস্তাবুদ বিবরণী। ক. অ. ন.

১২৩. বাংলা ১১৮৩ সনে বীরভূমের হস্তাবুদ বিবরণী। ক. অ. ন.

১২৪.

	সরকারি ভাবে ধার্য	প্রকৃত আদায়
১৭৭২,...	৯৯,৪১৩ পাউণ্ড	৫৫,২০৭ পাউণ্ড
১৭৭৩,...	১০৩,০৮৯	৬২,৩৬৫
১৭৭৪,...	১০১,৭৯৯	৫২,৫৩৩
১৭৭৫,...	১০০,৯৮৩	৫৩,৯৯৭
১৭৭৬,...	১১১,৪৮২	৬৩,৩৫০

১২৫. হিকির গেজেট, কলিকাতা, ২৯ এপ্রিল ১৭৮০।

১২৬. আনুষঙ্গিক ব্যয়ের হিসাব, ২৯ মে ১৭৮৯। বী. অ. ন.
১২৭. বীরভূম জেলা শাসকের নিকট মহাগাণনিক মহোদয়ের পত্রাবলী, ২৯ ডিসেম্বর ১৭৯০ এবং ২৮ জানুয়ারি ১৭৯১। বী. অ. ন.
১২৮. জেলাশাসকের নিকট রাজস্ব পর্ষদের পত্র, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯, ইত্যাদি। বী. অ. ন.
১২৯. ঐ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯, ৩০ এপ্রিল ১৭৯০, ইত্যাদি। বী. অ. ন.
১৩০. রাজস্ব পর্ষদের নিকট বীরভূম জেলা-শাসকের পত্র, এপ্রিল ১৭৯০। বী. অ. ন.
১৩১. মুবারক-অদ-দৌলত।
১৩২. পর্ষদের নিকট জেলা-শাসকের পত্র, ১৫ অকটোবর ১৭৯০ ; এবং পর্ষদের জবাব, ২৬ অকটোবর ১৭৯০। বী. অ. ন.
১৩৩. ঐ, ৬ আগস্ট ১৭৯১। বী. অ. ন.
১৩৪. শ্রীহট্টের জেলাশাসক মাননীয় রবার্ট লিণ্ডসে মহোদয়ের আত্মজীবনী ; আনুমানিক ১৭৭৮, লিণ্ডসেদের জীবনী, লর্ড লিণ্ডসে লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০
১৩৫ ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে বকানন নথিপত্র হতে, 'পূর্বভারতের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪
১৩৬. পাদরি জেমস্ লং কৃত *Analysis of the Bengali Poem Raj-mala*, পৃ. ১৯। পুস্তিকা, ৮ খণ্ড, কলিকাতা। লিণ্ডসেদের জীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩, ইত্যাদি।
১৩৭. রাজস্ব পর্ষদের নিকট বীরভূম জেলা-শাসকের পত্র, ৯ অকটোবর ১৭৮৯ ; বী. অ. ন.
১৩৮. সন্নিহিত বর্ধমান জেলায় কুখ্যাত।
১৩৯. জেরার জবাব, ১৯০১ সনে প্রচারিত।
১৪০. রাজশাহির তত্ত্বাবধায়ক মিঃ রউসের পত্র, ১৩ এপ্রিল ১৭৭১। ই. অ. ন.
১৪১. সন্ন্যাসী বা ফকির।
১৪২. পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির (গুপ্ত বিভাগ) পত্র, ১৪ জানুয়ারি ১৭৭৩, অনু. ১৩। ই. অ. ন.
১৪৩. ঐ, ১ মার্চ ১৭৭৩, অনু. ১৬ ইত্যাদি।
১৪৪. ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৭৭৩
১৪৫. ঐ, ১ মার্চ, অনু. ১৬
১৪৬. পরবর্তীকালের ঠগী ও ডাকাতির বিবরণ, মিঃ কেই-র চমৎকার রচনা, ***Administration of the East India Company***, ৩য় ভাগ, ২য়.

ও ৩য় অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

১৪৭. ফোর্ট উইলিয়ামে পরিষদের নিকট পরিদর্শক কমিটির পত্র, ১৫ আগস্ট ১৭৭২, কাশিমবাজার।

১৪৮. রেভা. জেমস লং কৃত *Calcutta in the Olden Times*, পৃ. ৩৭, পুস্তিকা, ৮ খণ্ড, কলিকাতা।

১৪৯. ঐ

১৫০. রাজমহল, পুস্তিকা, পৃ. ২১

১৫১. ক্যাপ্টেন শেরউইলের রিপোর্ট, পৃ. ২৬, কোলিও। ক. অ. ন.

১৫২. পরিষদের গভর্নর-জেনারেলের নিকট এডওয়ার্ড অটো আইভ্‌সের পত্র। বী. অ. ন.

১৫৩. রাজস্ব পর্ষদের নিকট জেলাশাসক ক্রিস্টোফার কিটিং মহোদয়ের পত্র, ২২ নভেমবর ১৭৮৮। বী. অ. ন.

১৫৪. ১৭৬৭ সনে জুলাই মাসে ক্রিস্টোফার কিটিং, রাইটার হিসাবে, কলিকাতায় আসেন; ১৭৮৮ সনের ২৯ অকটোবর বীরভূমের জেলা-শাসক নিযুক্ত; ১৭৯৩ সনের ১ মে, মুর্শিদাবাদ আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেও, ৬ আগস্ট পর্যন্ত বীরভূম ত্যাগ করেন নি; ১৮০৪ সনে সিভিল লিস্টে একজন বড় ব্যবসায়ী হিসাবে আবির্ভূত। ক. অ. ন.

১৫৫. লেফটেনাণ্ট জে. এফ. স্মিথের নিকট জেলা-শাসকের পত্র, ১০ জানুয়ারি ১৭৮৯। বী. অ. ন.

১৫৬. সামরিক পত্রাবলী, পৃ. ১৫, বী. অ. ন.

১৫৭. বর্ধমানের জেলাশাসক লরেন্স মার্সারের নিকট ক্রিস্টোফার কিটিং-এর পত্র, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯। বী. অ. ন.

১৫৮. ঐ, ৯ এপ্রিল ১৭৮৯

১৫৯. পরবর্তীকালে স্যার আর্থার হেসিলরিজ। ১৭৭৬ সনে 'রাইটার' হিসাবে আগমন; ১৭৮৬ সনের ২৫ এপ্রিল হতে ৯ জুলাই পর্যন্ত বীরভূম বা বিষ্ণুপুরের সহ-জেলাশাসক, কখনো কখনো পরিবর্ত জেলাশাসক; কিন্তু তহবিল তছরূপের অভিযোগে অপসারিত; নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার পর, ১৭৯৩ সনের ১ মে, যশোরের জেলাশাসক নিযুক্ত; ১৮০৪ সনের সিভিল লিস্টে বড় ব্যবসায়ী হিসাবে আবির্ভাব।

১৬০. অজয় নদীর তীরবর্তী ইসলাম বাজার বা ইলামবাজার গ্রাম।

১৬১. ১৭৮৯ সনের ১৬ অকটোবরের পত্র। বী. অ. ন.

১৬২. সন্নিহিত বিহার প্রদেশের রাজধানী গয়া এক বৎসর আগে দস্যুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়—বীরভূম জেলা-শাসকের নিকট বিহারের পরিবর্ত জেলাশাসক

এ. সেটন মহোদয়ের পত্র, ২৩ এপ্রিল ১৭৮৯।

১৬৩. *Treaties and Engagements with the native Princes, etc, of Asia*, পৃ. ৯৩। কোয়ার্টো, ১৮১২

১৬৪. রাজস্ব পর্ষদের নিকট জেলাশাসকের পত্র, ১ জুন, ১৭৯২। বী. অ. ন.

১৬৫. রাজস্ব পর্ষদের নিকট জেলাশাসকের এক রিপোর্টে প্রদত্ত পরিসংখ্যান, ৩ জুলাই, ১৭৮৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলার নিম্নভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান

অর্ধ শতাব্দীর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের পর অবশেষে ১৭৯০ সনে শান্তি স্থাপিত হয় এবং নতুন শাসকরা নিজেদের ছত্রছায়ায় সদ্য আগত জনসাধারণের সমীক্ষার অবসর পান। বিষ্ণুপুরের রাজা, তাঁর সভাসদবর্গ ও সমগ্র জনসাধারণ ছিলেন হিন্দু। কিন্তু অজয় নদের অপর তীরে বীরভূম রাজবংশ এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ বহু মুসলিম পরিবারবর্গ নিজেদের আফগান বা পাঠান বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতেন ও দেশীয় কাফেরদের সাথে রক্ত সম্পর্ক স্থাপনে ঘৃণা বোধ করতেন। প্রজাদের সাথে ধর্ম, ভাষা ও বংশ গৌরবের কারণে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তাঁরা সামাজিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হন। ব্যাপক জনসাধারণ দুই ভিন্ন জাতি সমন্বয়ে গঠিত ছিল; বুদ্ধিমত্তা, ভাষা এবং অপর যে সকল বিষয়ের নিরিখে একটি জাতির মহানতা বা হীনতা নির্ণীত হয়, সেইসব বিচারে এই দুই জাতি মানব সমাজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ধরনের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিল। উর্বরা উপত্যকা ভূমি হতে আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত বাংলার আদিবাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার অন্তিম প্রচেষ্টায় বীরভূমের পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নেয়; প্রাগৈতিহাসিক অতীত হতে বিভিন্ন জাতির মাঝে সীমারেখা চিহ্নিতকারী পর্বতমালা আজও সমভাবে উভয় জাতির সীমান্ত চিহ্নিত করছে। দুই ভিন্ন গোষ্ঠীজাত, অসমমাত্রার সভ্যতায় স্থিত দ্বিজাতিক জনগণ যখন পরস্পরের স্থায়ী ও নিবিড় সান্নিধ্যে আসে, তখন ইতিহাসের বহু আকর্ষণীয় প্রশ্নাবলী উপস্থাপিত হয়। আর্যরা ও আদিবাসীরা কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করে, কোন কোন প্রশ্নে তারা কিয়ৎ মাত্রায় ঐক্যবদ্ধ হয় ও জাতিগত কি কি সমঝোতা করতে বাধ্য হয় – এই সবই এই পরিচ্ছেদের উপজীব্য।

এই অনুসন্ধান আমাদের পিতৃতান্ত্রিক নিশ্চলতার সুদূর অতীতে নিয়ে যায়।[১] কিন্তু ভারতের প্রাচীন জীবন স্পন্দনের প্রতিধ্বনির সাথে সিসিলীয় পল্লীকবিতা বা গ্রীক সংগীত-দেবতার বংশীধ্বনির সুরলহরীর কোনো সাদৃশ্য নেই, বরং শোনা যায় নিপীড়িত, ভবঘুরে নানা জাতির জনগণের সদাগতিময় যন্ত্রণাক্ত হাহাকার। অবশ্য, সৃষ্টির আদি পর্যায়ের নিসর্গ বন্দনা চূড়ান্ত করলেও প্রারম্ভিক ভারতীয় গবেষণা অদ্ভুতভাবে যুগোপযোগী এক সান্ত্বনার আশ্রয় নেয়। তারা পরিষ্কার বলে দেয় যে, কি ইয়োরোপে কি এশিয়ায়, মানবজাতির আদি পর্যায় ছিল এক অস্থিরতার পর্যায়; এবং সভ্যতার শতেক দাবি ও নাগরিক জীবনের স্নায়বিক চাপ সত্ত্বেও, সভ্যতা হচ্ছে এক শান্ত সমাহিত অবস্থা।

ভারতে মানবগোষ্ঠীর বিষয়ে এক নজরে সর্ব প্রথম চোখে পড়ে ভিন্ন উৎসজাত দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির আধিপত্যের জন্য পারস্পরিক সংগ্রাম। আদিকালে, ইতিহাস সূচনার দিগন্তে দীর্ঘকায় শুভ্রদেহী এক জাতি হিমালয় অতিক্রম করে। তারা ছিল দিগ্বিজয়ী বংশজাত। স্থায়ী বসতির নিরাপত্তা ও প্রাচুর্যের সাথে তারা পরিচিত ছিল। তাদের সাথে ছিল পুরাকাহিনী আর ভক্তিগীতির ভাণ্ডার, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ভারতে প্রথম পদার্পণের সময়ে না হোক, বাংলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে অভিপ্রয়াণের পযায়ে তাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত ছিল জাতীয়তার সেই উচ্চ বোধ, যা নিজেদের স্বর্গীয় ইচ্ছার প্রতিভূ বিবেচনাকারী প্রত্যেক জনসম্প্রদায়ের থাকে।[২] স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে নবাগতদের প্রাথমিক জীবনসংগ্রামের কোনো বিবরণী নেই। আমরা তাদের যাত্রারম্ভের দিন-ক্ষণও জানি না, তাদের নেতাদের নামও জানি না। পরবর্তী সন্তুরাধিক প্রজন্মকে আকর্ষণ করার মতো সাত-সমুদ্র পারের অজানা বালুকাবেলায় সুকঠিন দিগ্বিজয়ের কোনো কাহিনীও আমাদের জানা নেই। ভাষাবিদরা জোর দিয়ে শুধু এটুকুই বলতে পারেন যে, এক মহান জাতির এক শাখা অসংখ্য, নিকৃষ্টতর উপজাতিদের মাঝে নিজেদের জন্য বসতি গড়ে এবং ইতিহাসের প্রাক্-প্রত্যুষকালেই স্থানীয় অধিবাসীরা কৃষক প্রজায় পরিণত হয়, অথবা জঙ্গলে বিতাড়িত হয়।

আর্য বংশোদ্ভূত এই দেশান্তরীরা মধ্য-এশিয়া হতে তৎকালীন দুনিয়ার সুদূরতম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একদল চীন সীমান্তে উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন শক্তিশালী এক রাজত্ব গড়ে তোলে; আর একদল পারস্য রাজ-বংশের পত্তন করে; তৃতীয় ধারা গড়ে তোলে এথেন্স ও স্পার্টা; চতুর্থ দল, সাত-পাহাড়ের নগরী। এই একই জাতির এক সুদূর উপনিবেশ প্রাগৈতিহাসিক স্পেনে রৌপ্য আকর আহরিত হয়: এবং আমাদের নিজেদের দেশ ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম ইতিহাসে আমরা দেখি আর্যদেরই এক বসতি—উইলো কাঠের ছোট্ট নৌকোয় মৎস্যশিকারে বা কর্নওয়ালের খনি গহ্বরে কর্মরত। এশিয়ার অর্ধাংশে এবং সমগ্র ইয়োরোপের ভাষাগুলির ভিত্তি আর্যভাষা; বর্তমানে নতুন দুনিয়ার

এমনকি বনাঞ্চলেও এর বিজয় অব্যাহত এবং এর মাধ্যমে ইন্দো-জার্মান সংস্কৃতি দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জেও ক্রম বিস্তারমান। প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস বলতে সনাতন পণ্ডিতেরা আজও বোঝেন ভূমধ্যসাগর সৈকতে মুষ্টিমেয় আর্য-বসতির ইতিহাস, এবং আধুনিক সভ্যতার একমাত্র অর্থ হলো ঐ একই জাতির পশ্চিমী ধারার সভ্যতা।

আর্যদের যে ধারা ভারতে বসতি স্থাপন করে, বৈদিক সাহিত্যে তাদের নতুন জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। যে পথ ধরেই তারা আসুক, তারা যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সুজলা উপত্যকায় সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বস্তুত ভারতীয় ও পারসিক, উভয় ধারার সাধারণ স্মৃতিতে পাঞ্জাবের সপ্তনদী গাঁথা; এবং যেসব পণ্ডিতরা মনে করেন যে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মাঝে পার্থক্যের সূচনা হিমালয়ের ভারতীয় প্রান্তেই হয়েছে, তাঁদের বক্তব্য এইসব হতে আরো বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।[৩] সারা ভারতব্যাপী পরবর্তী পরিভ্রমণ কালে সংস্কৃতভাষী এই জাতি তাদের উত্তরের আদি বাসভূমির কথা কখনো ভোলেনি। বিশুদ্ধ ভাষার দেশ;[৪] স্বর্গীয় জ্ঞানের উৎস; পবিত্র বারিধারার উৎসমুখ; আদি সৃষ্টিকথা; উমার[৫] বিবাহ ও সতীর দেহত্যাগ; হিমালয়[৬] রাজের অলৌকিক জগৎ; যে অঞ্চলে অর্জুন একাকী মহাদেবের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন[৭] এবং পরাজিত হলেও বাইবেলের জেকবের মতো দেবতার বর পাশুপত অস্ত্রলাভ করেন—এই সবই এবং আরো অসংখ্য আখ্যান ও গল্পকথার মাধ্যমে সংস্কৃতভাষী জাতি অব্যাহত তীর্থ ভ্রমণের ক্ষণিক অবসরে বারবার প্রিয় উত্তরভূমিকে স্মরণ করেছে। এখানেই তাদের অলিম্পাস পর্বত—দেবতাদের আবাসস্থল; এই স্বর্গ হতেই দৈববাণী নেমে আসে মর্ত্যের মানুষের মাঝে; এবং এখানে স্বর্ণাভ শৈলশ্রেণীর ছত্রছায়ায় পুণ্যাত্মাদের আবাসস্থল স্বর্গ, পবিত্র যুগল সরোবরে[৮] তার মায়াবী প্রতিফলন। বিশেষভাবে অবিস্মরণীয় একটি উপত্যকা ভারতীয় আর্যদের পবিত্র ভূমি, এবং ছিন্নমূল ইহুদিদের অন্তরে জর্ডান নদী যে আবেগ সঞ্চারিত করে, এই উপত্যকায় জল সিঞ্চনকারী নদীটিকেও[৯] সমান মমতা ও ভক্তির সাথে দীর্ঘদিন ধরে স্মরণ করা হয়।

আনন্দময় এই উপত্যকা হতে অধিবাসীরা পূবে ও দক্ষিণে একের পর এক উপনিবেশ গড়ে তোলে; তাদের প্রথাগুলি নিয়ে জাতীয় আচার-সংহিতা রচিত হয়, কিন্তু তার আগেই বাংলা বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। তৎকালীন সংস্কৃত ভাষীদের মানচিত্র সম্বন্ধে মনুর কয়েকটি অদ্ভুত শ্লোককে আপন পাণ্ডিত্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে সম্প্রতি ডাঃ ম্যুর ভারতে আর্য-সভ্যতার বিস্তৃতির ওপরে এক নূতন ও চূড়ান্ত আলোকপাত করেছেন। মনুর সভ্য জগতের আকৃতি ধূমকেতু সদৃশ, উত্তর-পশ্চিম ভারতে যার মুখ এবং বিশাল পুচ্ছ দেশ দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত হয়ে

বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। তিনি একে চারভাগে ভাগ করেছেন, উত্তরের সূচনা বিন্দু হতে দূরত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক অংশের বিশুদ্ধতা কমেছে এবং প্রত্যেক অংশ বিভিন্ন যুগে আর্যদের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রয়াণের প্রতীক।

সর্বপ্রথম উত্তরের উপত্যকা, স্বয়ং দেবধাম, মনুর বর্ণনানুযায়ী 'দুই পবিত্র নদীর[১০] মাঝে অবস্থিত, দেবনির্মিত দেশ, দেবনামে অভিহিত।'[১১] এই দেবধামের দক্ষিণ-পূর্বে সন্নিহিত ব্রহ্মর্ষিদেশ[১২] এখানেই সংস্কৃতভাষী সভ্যতার পরিধি বিস্তারের সূচনা। চতুর্বেদের অন্তত শেষাংশে শ্লোকগুলি এখানেই রচিত হয়, এবং এখানে প্রতিটি নদী সংগমে তীর্থস্থানগুলির পুণ্য গরিমা প্রায় দেবধাম তুল্য। 'এই দেশজাত ব্রাহ্মণের কাছে পৃথিবীর প্রত্যেক লোক কর্তব্য কর্ম শিখুক।'[১৩]

কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় এই বিস্তৃতিও যথেষ্ট ছিল না, তাই পরবর্তী বিস্তার ছিল আরো ব্যাপক। উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত-মালা, পূর্বে এলাহাবাদ হতে, নদী যেখানে ম্লেচ্ছদের স্পর্শ এড়াতে পশ্চিমের মরুভূমিতে আত্মগোপন করেছে সে পর্যন্ত, এক কথায় পুরো নদী ব্যবস্থা সমেত সমগ্র উত্তর-ভারত, অর্থাৎ মনু কর্তৃক সঠিকভাবে অভিহিত সমগ্র 'মধ্যদেশ', আর্য সভ্যতার আওতায় আসে। বৈদিকযুগ শেষ হবার আগে এই উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয় বলে মনে হয় না এবং বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে এটা গড়ে ওঠে। এই সময়ে এই প্রথম ঋষিদের সরল বিশ্বাস রাজকীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির দ্বারা অলংকৃত হয় এবং পরে এই আড়ম্বরের অন্তরালে অবলুপ্ত হয়। পিতৃতান্ত্রিক জনপদের এক দুর্বল সমাহার হতে, কয়েকটি সুসংহত জাতিতে উত্তরণ এই যুগেই ঘটে; প্রতিটি জাতির ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বাহিনী, অন্যদিকে প্রত্যেক জাতিই ছিল জাতিভেদে জীর্ণ, অবশেষে যার ফলশ্রুতিতে সংস্কৃতভাষী জনগণের পতন অনিবার্য হয়। মনুসংহিতায় বর্ণিত ভূমিনীতি প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মধ্যদেশের যে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেখা যায়, তাতে বলা যায় যে, প্রকৃত মধ্যদেশ-বাসী না হলেও তারা ওতপ্রোত ভাবে এই দেশের সাথে সম্পর্কিত ছিল; এবং একথা নিশ্চিত যে, মধ্যদেশে বিকশিত সভ্যতার স্তরে ভারতীয় আর্যরা উপনীত হবার আগে মনুসংহিতা রচিত হয়নি।

ঐ তিনটি অঞ্চল অবশ্যই দীর্ঘদিন ধরে আর্যদের প্রভূত এলাকা জোগান দিয়ে থাকবে, যারাই ভারতীয় নদীগুলির ভয়াবহতার সাথে পরিচিত এদের আকস্মিক নৈশ প্লাবন, নিয়ন্ত্রণাতীত প্রবল স্রোতোবেগ, যত্র-তত্র জলঘূর্ণী এবং আপাত নিরীহ চোবাবালির বিশ্বাসঘাতকতার সাথে পরিচিত, গঙ্গার নিম্ন উপত্যকার উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভে আর্যদের দ্বিধায় তারা কেউ আশ্চর্য হবে না। কিন্তু জাতির বিস্তার সব সময় নদীপথ দ্বারা নির্ধারিত হয়ে এসেছে, এবং আগে বা পরে গঙ্গা নদী বঙ্গদেশ অভিমুখে সংস্কৃত সভ্যতার অগ্রগতি নির্দেশিত করেছে। অভিন্ন

অবস্থায় উত্তর-ইয়োরোপের যাযাবর জাতিগুলির মতোই, 'তারা নদীর অজানা গতিপথ অনুসরণ করে, তাদের ছিল নিজেদের শৌর্যে আস্থা, ছিল না বিরুদ্ধাচারী কোনো শক্তির পরোয়া' ;[১৪] এবং জাতীয় আচার-সংহিতা, যা বেশ কয়েকজনের রচিত হলেও সাধারণভাবে মনুসংহিতা নামে পরিচিত, রচিত হবার আগেই তারা সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ে—'পূবসাগর হতে এমনকি পশ্চিম সাগর অবধি।'[১৫] এই অঞ্চলকে মনু 'আর্য্যদের সীমানা' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর সময়ে সংস্কৃত সভ্যতার সমগ্র দুনিয়া এখানে আবদ্ধ ছিল। এর বাইরে সবকিছুই ছিল 'অচেনা জগৎ', সংস্কৃত লেখকদের মতে, দৈত্য-রাক্ষসদের দেশ—কৃষ্ণসার মৃগযূথও যেখানে বিচরণে গররাজী, এবং আর্য ঋষিদেরও যেখানে বাস নিষিদ্ধ।

আমরা ভারতবর্ষকে একটি মাত্র দেশ হিসাবে এবং ভারতবাসীদের একটিমাত্র জাতি হিসাবে গণ্য করতে খুব অভ্যস্ত ; কিন্তু সত্য এই যে ইতিহাস, বিস্তার ও জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষে রয়েছে একটিমাত্র রাজ্যের নয়, সমগ্র এক মহাদেশের বৈচিত্র্য। কোনো বিশেষ অঞ্চলের প্রথা বা বিশ্বাস ভুলভাবে সমগ্রের উপর দৃঢ়ভাবে আরোপিত করা এবং বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলিকে অতিরঞ্জিত করে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই আমাদের ভুলগুলির উৎস। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মধ্যে ভারতীয় সাম্রাজ্যকে একটি রাজনৈতিক একক হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত ইংরেজ জনমানস এই এককের বিভিন্ন অংশগুলিকে ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে অভিন্ন হিসাবে দেখে আসছে। জাতিগত ও ধর্মীয় বিশ্বাসগত বিস্তর ফারাকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই অবহিত, কিন্তু এই উপলব্ধি বাস্তব ও সুদৃঢ় তো নয়ই, বরং দুর্বল ও অনুমান নির্ভর। মুসলিমদের ও তাদের অনুগামীদের বাদ দিলে, সাধারণভাবে ধরা হয় যে, ভারতবাসীরা বহু যুগ ধরেই এবং বর্তমানেও হিন্দু ; ইতিহাসের সূচনা হতেই ভারতের ধর্ম হিন্দুধর্ম ; এবং স্মরণাতীত কাল হতে ভারতীয় সমাজ হিন্দু বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে চারভাগে বিভক্ত। এই মতামতগুলি ভারতের জনগণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে,—যার ফলে ভারতের সাথে আমাদের রাজনৈতিক সমগ্র কাজকর্ম বিকৃত পক্ষপাত দুষ্ট হয়েছে ; এবং এই ভুল উপলব্ধিগুলির ফলে, এশীয় দুনিয়ার নিকট সক্রিয়তর মানবতাবোধ ও বিশুদ্ধতর বিশ্বাসের তথা নবযুগের বার্তাবহ ও অগ্রদূত ইংল্যাণ্ডের সাথে আমাদের পূর্বদেশীয় প্রজাদের দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণরা ও মনুসংহিতা যে সভ্যতার প্রতিভূ, সাধারণভাবে যা প্রাচীন ভারতের সভ্যতারূপে প্রচলিত, তা দেশের উত্তরভাগে, মনু কথিত মধ্যদেশে ও বর্তমান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে সামগ্রিকভাবে আবদ্ধ থেকেছে। সম্পূর্ণরূপে পরাজিত উত্তরভাগে বিজয়ী জাতির উপর সক্রিয় জীবনের দাবি ছিল লঘু। চূড়ান্ত সক্রিয়তায় যুগাবসানের পর আসে চিন্তাভাবনার যুগ এবং আর্যরা মেগাস্থিনিস বর্ণিত আম্রকুঞ্জে, জীবন ও মৃত্যু নিয়ে আলোচনারত নিমীলিত-নেত্র

দার্শনিকে পরিণত হয়। সমগ্র শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করে টীকা রচিত হয়, এবং তাদের সরল স্তোত্রগুলি বিশদ ব্যাখ্যার ফলে জটিল, আড়ম্বরপূর্ণ ও আচার সর্বস্ব হয়ে ওঠে। সকল কিছুর নিহিত অর্থ নির্ণয়ে দৃঢ় সংকল্পী চিন্তাশীল পরবর্তী প্রজন্ম কর্মী পূর্বপুরুষদের কথনের মর্মোদ্ধারে নিযুক্ত হয়। বাস্তব বিশোধিত হয়ে আধ্যাত্মিক হয়; আবহবার্তা সংক্রান্ত এক বক্তব্য হতে ধর্মরক্ষার মতবাদ তৈরি হয়; এবং বিজয়োৎসবের এক বর্ণনা ব্রহ্মবিদ্যার এক সামগ্রিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়। পণ্ডিতদের বিবাদ চলে, বিভিন্ন দলে চলে কূট তর্ক, গড়ে ওঠে আচার সর্বস্বতার পাহাড়; এইভাবে অবশেষে ব্যাকরণের হেঁয়ালি প্রচার বা তিন পুরুষ ব্যাপী শতাধিক বৎসরের যজ্ঞের সফল সম্পাদন আর্য অস্তিত্বের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।[১৬] নিম্নবঙ্গের আর্য দেশান্তরীরা এ জাতীয় পরিমার্জনা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। তাদের যাত্রাকালে তাদের দেশবাসীরা ভাবুক ছিল না, ছিল কর্মী; দক্ষিণ উপত্যকার গহন অরণ্য দর্শন প্রসারের সহায়ক ছিল না; তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য নিয়ে নবাগতরা বিশেষ চিন্তিত ছিল না, কি করে অস্তিত্ব বজায় রাখা যাবে, এ বিষয়ে তারা অনেক বেশি চিন্তিত ছিল। নতুন নতুন ব্যাখ্যায় সজ্জিত প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতবর্গ তাদের বিরুদ্ধপক্ষ ছিল না, তাদের বিরুদ্ধে ছিল শাণিত বর্শা ও বিষাক্ত তীরের সশস্ত্র কালো শক্ত-সমর্থ জাতিগুলি। হিন্দুধর্ম বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায়, বাংলার মূল ভূখণ্ডের হিন্দুরা ঐতিহাসিক সময়ের আগে তা পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। উত্তর-ভারতে ধর্মীয় বিশ্বাসের রাজকীয় ব্যূহ, প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্ভার ও কায়েমি স্বার্থ বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধিতা করে, কিন্তু নিজেদের উচ্চমানের কোনো ধর্ম বিকশিত না হবার ফলে নিম্নবঙ্গবাসীদের মাঝে বৌদ্ধধর্ম গুরুত্ব পায়। উপরন্তু, বৌদ্ধধর্মের সহজতম ও সবচেয়ে স্থায়ী বিজয় মধ্যদেশের বাইরে ঘটে; বর্তমানে হিন্দু মন্দিরে পরিণত হলেও বীরভূম সন্নিহিত জেলাগুলিতেই আজও বৌদ্ধ স্মৃতি স্তম্ভগুলি বিশিষ্টতম স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে বিরাজমান। নিম্ন উপত্যকার অধিবাসীরা হয় মধ্যদেশে প্রচলিত আর্য-ধর্মের বিশেষ মতবাদ দ্রুত ভুলে যায়, অথবা এই মতবাদ গড়ে ওঠার আগেই দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করে। ইতিহাসে হিন্দু হিসাবে নয়, বৌদ্ধ হিসাবেই তাদের প্রথম আবির্ভাব; তাদের রাজারা আর্য ছিল না, ছিল আদিবাসী; এবং এই সংকর বাঙালি জাতি বর্তমান ধর্মগ্রহণে বহু শতাব্দী আগে আইয়োনাতে কেল্‌টিক জাতি খ্রীস্টীয় ধর্মসংগীত শোনে। ধর্মান্তরের পর তারা বারবার সচেতনভাবে মধ্যদেশ হতে হিন্দুয়ানি আমদানি করে নিজেদের যৎসামান্য হিন্দুত্বকে পূরণ করেছে; এবং ঐতিহাসিক ভিত্তিসম্পন্ন আদি কিংবদন্তিগুলির একটি হতে জানা যায় যে, উত্তর-ভারতে বহুযুগ ধরে প্রচলিত যাগযজ্ঞাদি বাংলা মূল ভূখণ্ডের পুরোহিতদের জানা না থাকায় তা শেখাবার জন্য গৌড়ের রাজাকে উত্তর হতে পুরোহিতদের নিয়ে আসতে হয়। নিম্ন উপত্যকার স্থানীয় স্মৃতিসৌধগুলি সহ

ঐতিহ্যের চুলচেরা পর্যালোচনা করলে যে কেউ এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, মনুসংহিতা ও ব্রহ্মসংহিতা অনুসারী হিন্দু ধর্মবিশ্বাস উত্তর-ভারত হতে আমদানিকৃত তুলনায় আধুনিক ব্যাপার, এবং বিশদ যে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে বাঙালিদের পরিচয় ঘটে সেইটি বৌদ্ধধর্ম।[১৭]

কিন্তু বাস্তব স্থানীয় প্রথা বা বিশ্বাসগুলিকে সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে আরোপ করার অভ্যাসজাত ভ্রান্তিতে যে ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সামাজিক সংস্থাগুলি ও বাস্তব ভারতীয় জনজীবন সম্বন্ধে রাজপুরুষদের ধ্যান-ধারণার বিকৃতিতে। এতকাল আমরা শুনতে অভ্যস্ত যে, ভারতীয় সমাজ অনড় ও কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত ; মনু বর্ণিত এবং প্রচলিত ধারণানুযায়ী সমগ্র হিন্দু সমাজে আরোপিত বর্ণভেদ প্রথা যে বাস্তবে মধ্যদেশে মাত্র প্রচলিত, সেকথা প্রমাণে বেশ দীর্ঘ পর্যালোচনার প্রযোজন ঘটবে। কিন্তু দেখা যাবে যে, সাধারণভাবে ভারতীয় বর্ণভেদ প্রথা, বিশেষত নিম্নবঙ্গের ক্ষেত্রে অনড়ও নয়, কৃত্রিম বিভাজনে খণ্ডিতও নয় ; বিজয়ী ও বিজিত—প্রাচীন সমাজের চিরন্তন ও স্বাভাবিক এই ভিত্তিতেই এটা গড়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—মনুর এই চতুর্বর্ণ বিভাজনে নিহিত কঠোরতা ও নিশ্চলতা ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের পক্ষে চরম নৈরাশ্যজনক হলেও, এটাই আবার তাদের নিষ্ক্রিয়তার অজুহাত হিসাবে কাজ করেছে ও অকর্মণ্যতার কলঙ্ক হতে তাদের রক্ষা করেছে। জনগণের ইতিহাস যে চতুর্বর্ণ বিভাজন জনিত এই তথাকথিত নিশ্চলতার অভিযোগ অনুমোদন করে না এবং বাংলার জনসাধারণের মধ্যে যে রয়েছে জাতিগত উপাদানের দুইটি সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিক ধারা—সেটাই পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির প্রতিপাদ্য।

মধ্যদেশে শান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক প্রভেদকে বিকশিত করে ; কিন্তু আদিবাসীদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে দক্ষিণের অভিযাত্রীরা সে পরিমাণ চিন্তাভাবনার অবসর বা সম্পদের সহায়তাও পায়নি। নির্দিষ্ট কোন তারিখে বর্ণভেদ প্রথার সূচনা, তা বলা অসম্ভব ; কিন্তু কোন যুগে এটা ছিল না, এর প্রভাব কখন হতে অনুভূত হতে শুরু করে এবং কখন হতে এটা দেশে পূর্ণ বিকশিত বিশিষ্টতম বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেসব বলা সহজ। পরবর্তীকালে ঋগ্বেদের শ্লোকগুলিকে বিকৃত করে বর্ণভেদ প্রথার প্রামাণিক অনুমোদন লাভ করা হলেও, ঋগ্বেদে কিন্তু বর্ণভেদ প্রথা সম্পূর্ণরূপে বা প্রায় অনুপস্থিত।[১৮] হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যবস্থা যত বিকশিত হতে থাকে, ততই সামাজিক ভেদাভেদ প্রকট হয়, এবং যজুর্বেদ রচিত হয়ে সেখানে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণবাদ জটিল ধর্মীয় রীতিনীতি চালু করেছে এবং ব্রাহ্মণবাদে নিহিত মানুষে-মানুষে নিষ্ঠুর ভেদাভেদ সমাজ কিয়দংশে মেনে নিয়েছে। মনুসংহিতা রচিত হবার পূর্বেই বর্ণভেদ প্রথার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। মনুসংহিতায় অবশ্য ভারতীয় সমাজের একটি মাত্র অঞ্চলের অর্থাৎ মধ্যদেশের অবস্থা সঠিকভাবে প্রতিফলিত। পশ্চিমে বর্ণভেদ সিন্ধু-

নদ অতিক্রম করেনি, এবং এই নদীতীরে কয়েকশো মাইলের মধ্যে আদৌ বর্ণভেদ এসেছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। লিখিত ইতিহাসের জমানার আগে রাজপুতরা চতুর্বর্ণ বিভাজন গ্রহণ করেনি। সিন্ধুর অপর পারে বিস্তৃত বাহিকাদেশ—সংস্কৃতভাষী উপজাতিদের দেশ; এদের মতে, ঈশ্বর সকল মানুষকে সমান গড়েছেন এবং তাঁর আরাধনার জন্য পুরোহিত নির্দেশিত কোনো নির্দিষ্ট তন্ত্র প্রয়োজনীয় নয়। আরো পশ্চিমে আবার কাশ্মীরের সকল আর্যদের জাতি অভিন্ন বলে কথিত ;[১৯] বস্তুত, মধ্যদেশের পশ্চিমে সর্বত্র মনু-বর্ণিত চতুর্বর্ণের আনুষ্ঠানিক বিভাজন অজ্ঞাত। পশ্চিমের এই সংস্কৃতভাষী জাতিগুলি মধ্যদেশের সভ্যতাকে নাকচ করে পূর্বপুরুষদের সরল ধর্মমত ও প্রথার পক্ষে দাঁড়ায়—সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত অংশে এদের উল্লেখ সর্বত্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের সাথে করা হয়েছে। বর্ণভেদ গ্রহণ ও বর্জনের সাথে ব্রাহ্মণদের সমগ্র আচারবিধি গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই কালক্রমে এইটি মধ্য দেশের আর্যদের সাথে পশ্চিমের আর্যদের বিরোধের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণ-অনুসারী হিন্দুরা এই ব্যবস্থা সমগ্র দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কখনো কখনো শান্তিপূর্ণভাবে বা সর্বোচ্চ বর্ণভুক্ত করার লোভ[২০] দেখিয়ে সম্ভব হলেও অধিকাংশ সময়েই তীব্র ধর্মীয় যুদ্ধের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব হয়েছে; বেদ-পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বত্র এর অসহিষ্ণু ছাপ চোখে পড়ে,—এই প্রকারের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ইতিহাসে প্রথম জাতীয় সংগ্রাম গড়ে উঠেছে।[২১] শীঘ্রই বর্ণভেদ প্রথা ব্রাহ্মণ-অনুসারী আর্যদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে, এবং যখন মনু ঘোষণা করেন যে, জাতিচ্যুত যাযাবর ক্ষত্রিয়দের থেকেই গ্রীক ও পারসিকদের উৎপত্তি, তখন তিনি যে কত সঠিক ছিলেন নিজেই জানতেন না।[২২]

মনু অনুযায়ী, হিমালয় পর্বতমালা মধ্যদেশের উত্তর সীমান্ত আর বিন্ধ্য পর্বতমালা দক্ষিণ সীমান্ত চিহ্নিত করে। একথা নিশ্চিত যে, মনুর কঠোর চতুর্বর্ণ বিভাগ কখনো এই পর্বতদ্বয়কে অতিক্রম করেনি। দক্ষিণ-ভারতের সমগ্র আর্যসমাজ ব্রাহ্মণত্বের দাবি করে; তাই এখানে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষত্রিয় কোনো পরিবার বা গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেলে, তাদের বহির্দেশীয় উৎপত্তি বা তুলনায় সাম্প্রতিক দক্ষিণে আগমন সহজেই বোঝা যায়। বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে, উত্তর পূর্ব ও পশ্চিমের মতোই সংকরজাতির আধিক্য দেখা যায়; কিন্তু এখানের বর্ণসংকর বা মনু উল্লেখিত প্রথম তিনটি বর্ণের আন্তঃবিবাহ জাত নয়, আদিবাসীদের সাথে নবাগত আর্যদের সহবাসের ফল।

মনুর কৃত্রিম বিন্যাস সামগ্রিকভাবে যেমন উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে মধ্যদেশ অতিক্রম করেনি, তেমনি পূব দিকেও, নিম্ন বঙ্গের যেখানে শুরু, চতুর্বর্ণ বিন্যাসের ভিত্তিতে বর্ণভেদের সমাপ্তি। প্রাচীন মধ্যদেশের সীমান্তবর্তী উত্তর-বিহারে,

জাতিভেদ একেবারে বাহ্যিক।[২৪] নিম্নবঙ্গের সন্নিহিত দক্ষিণ-বিহারে ইহা অজ্ঞাত, এখানে জনগণ মনুর চতুর্বর্ণে বিভক্ত নয়, তারা আর্য, অনার্য ও সংকর জাতিতে বিভক্ত।

নিজেদের বর্ণবিষয়ে পূবের আর্যদের সাথে পশ্চিমে মধ্যদেশের আর্যদের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। সিন্ধুনদ অতিক্রম কালে এইটি ছিল যুদ্ধরত উপজাতিদের রাজ্যগুলির জোট এবং এই নদীর পশ্চিমে তাদের ফেলে যাওয়া উপনিবেশে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ তাদের জীবনের প্রধানতম অঙ্গ ছিল। সুতরাং মধ্যদেশের ব্রাহ্মণগণ চতুর্বর্ণ বিন্যাসকালে স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমে রাজপুত সহ প্রাচীন বাহিকাদেশের অন্যান্য উপজাতিদের ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীভুক্ত করে। সিন্ধুনদ অতিক্রম করার পর যেখানে শিবির স্থাপন করা হয়, সেই দেবধামে এবং আরো পরিষ্কারভাবে অব্যাহত শান্তির ফলে শাস্ত্র-সাহিত্য বিকশিত হয়, এবং শারীরিক বা সামরিক উৎকর্ষ অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষ সম্মানের উৎস হয়ে ওঠে।[২৫] রথ-সাহেবের এক চমৎকার উক্তি অনুযায়ী, "এমনকি ঋগ্বেদের প্রার্থনাগুলিতেও ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও পবিত্র প্রথাগুলিকে সরল অসংবদ্ধ রূপ হতে এক সুসংবদ্ধ বহুমুখী রূপে বিকশিত হতে দেখা যায়, সেগুলি এখন সমগ্র জনজীবনে পরিব্যাপ্ত হয় এবং পুরোহিতদের হাতে সর্বনিয়ন্তা এক শক্তি হয়ে ওঠে।" পরবর্তী আর্যদের নিম্নবঙ্গ অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে সমাজের হর্তাকর্তা হিসাবে পুরোহিত শ্রেণী স্বীকৃত হয়, কিন্তু তখনো ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রভেদ দেখা দিয়েছিল মনে হয় না। নিম্নবঙ্গের নবাগত আর্যরা স্বাভাবিক ভাবেই নূতন বাসভূমিতে নিজেদের সর্বোচ্চ বংশজাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, ঠিক যেমন বিগত শতাব্দী জুড়ে ভারতে আগত প্রতিটি ইংরেজ নিজেকে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত হিসাবে দাবি করে।[২৬] নিম্নবঙ্গের অভিজাত বংশ ছিল আর্যরা, আর মধ্যদেশে অভিজাত বংশ ছিল ব্রাহ্মণরা; এবং পিতৃভূমিতে যখন বর্ণভেদ কঠোরভাবে চালু হয়, সুদূর উপনিবেশে অভিজাতবর্গ তখন পিতৃভূমির অভিজাতদের সমমর্যাদা ও অভিন্ন পদবি দাবি করে। সমমর্যাদা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে কখনো দেওয়া হয়নি। দক্ষিণ-পূর্বে বসবাসকারী আর্যরা ব্রাহ্মণ নামটি মাত্র সহজেই পরিগ্রহণে সক্ষম হয়, কিন্তু মধ্যদেশের ব্রাহ্মণরা কখনো তাদের নিজেদের সমমর্যাদা সম্পন্ন হিসাবে স্বীকার করেনি। কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার ভূস্বামীদের ইংল্যাণ্ডের ভূস্বামীরা যে চোখে দেখে, নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণদেরও অযোধ্যার ব্রাহ্মণরা একই ভাবে দেখত। প্রত্যেকেই অভিজাত বংশীয়, প্রত্যেকের পদবি অভিন্ন, কিন্তু তাদের সামাজিক ইতিহাসে রয়েছে বিরাট ফারাক, তাই বাস্তুত্যাগীরা সাফল্য লাভ করলেও আদিভূমির অভিজাতরা কখনো তাদের সম মর্যাদা স্বীকার করেনি। মধ্যদেশের ব্রাহ্মণরা আরো একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে যে, নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণরা শুধু সামাজিক মর্যাদায় নয়, ধর্মীয় যোগ্যতাতেও হীনতর। আজও উত্তর-ভারতের

বহু ব্রাহ্মণ নিম্ন-উপত্যকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একত্রে আহারে রাজী নয় ; এমনকি উত্তর-পশ্চিমে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরাও জেলখানায় বাঙালি ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত অন্নের চেয়ে অবাধ্যতার জন্য বারংবার বেত্রাঘাত শ্রেয় মনে করে। বহুযুগে ধরে নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণরা উচ্চতর যাগযজ্ঞ সম্পাদনে অক্ষম এবং মনে হয় যে, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ও মধ্যদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ছিন্ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে নিম্ন-উপত্যকার আর্য মহিলাদের সাথে উত্তরের ব্রাহ্মণদের কোনো প্রকার বৈধ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয় এবং এই প্রকার সম্পর্কজাত সন্তানরা অবৈধ হিসাবে পরিত্যক্ত হয়।

পণ্ডিতদের মতে নিম্নবঙ্গের জনসাধারণের রয়েছে পাচটি ভাগ এবং নিম্নলিখিত ক্রমপর্যায়ে তারা এদেশে আসে। প্রথমত আদিবাসী অনার্য উপজাতি ; দ্বিতীয়ত, প্রথম আর্য বসতি স্থাপনকারী বৈদিক সারস্বত ব্রাহ্মণরা ; তৃতীয়ত, পরশুরামের পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করার পরিকল্পনা হতে পলায়নে সক্ষম ক্ষত্রিয় উদ্বাস্তরা, বিচ্ছিন্ন কিছু বৈশ্য পরিবার—এরা কেউই বিহার অতিক্রম করে আর এগোয় নি ; চতুর্থত, আনুমানিক ৯০০খ্রীস্টাব্দে নতুন ব্রাহ্মণ দলের বসতি স্থাপন—আদীশ্বর দ্বারা কান্যকুব্জ হতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়নের কাহিনীতে এরই প্রতিফলন; পঞ্চমত, উত্তর হতে রাজপুত, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, আফগান, মুসলমান সহ বিভিন্ন জাতির সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণকারীরা ও আরো সাম্প্রতিক কালে আগত দেশান্তরীরা। এই সবের কোথাও মনু বর্ণিত কঠোর চতুর্বর্ণের কোনো চিহ্ন নেই। চতুর্থ প্রকারের নবাগতদের আগমন সম্বন্ধে দেশীয় কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ। গৌড়ের রাজা আদীশ্বর এমন এক যজ্ঞ করবেন মনস্থ করলেন যা নিম্ন উপত্যকার ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্ভব ছিল না ; তাই তিনি কান্যকুব্জ হতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। গঙ্গার পূর্বতীরে এই ব্রাহ্মণরা প্রথম বসতি স্থাপন করে এবং দেশীয় স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে বহু সন্তানের জন্ম হয় এবং এদের বারেন্দ্র নামে অভিহিত করে। ভালোভাবে এখানে প্রতিষ্ঠালাভের পর কান্যকুব্জ হতে তাদের বৈধ পত্নীরা এদেশে আসে এবং স্বামীরা তখন গঙ্গার পূর্বতীরে (ঢাকার বিক্রমপুরে) সন্তানসহ উপপত্নীদের পরিত্যাগ করে বৈধ পত্নীদের সন্তানদের নিয়ে নদীর অন্যপারে যায়। বৈধ এই সন্তানদের থেকেই রাঢ়ী অর্থাৎ নিম্নবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলির ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি। আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে, এবং শীঘ্রই পুরাতন ও নূতন বাসিন্দাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দাবি জাতীয় অশান্তির উৎস হযে ওঠে। দুই শতাব্দী পরে বাংলার শেষ হিন্দু রাজা বল্লাল সেন তাঁর আর্য প্রজাদের ব্যাপক শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে পদমর্যাদা-ক্রম সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। বহু পুরাতন পরিবারের সাথে নবাগতদের সংযুক্ত করা হয়। সর্বপ্রকারের প্রায় সকল আর্য জাতকের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়, এবং পুরাতন বাসিন্দাদের স্বীকৃত

অতি অল্প সংখ্যক বংশধররা বর্তমানে পৃথক পরিচয় রক্ষা করে।[২৭] কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদের অনুগামীদের থেকে বহু সংকর বর্ণের (যেমন কায়স্থ) উৎপত্তি ঘটে; কিন্তু দক্ষিণ উপত্যকায় মনু-বর্ণিত অপর দুই দ্বিজ বর্ণের, অর্থাৎ কায়স্থ ও বৈশ্যদের একটি মাত্রও এমন পরিবার বিরল, যাদের অতীত অনুসরণ করলে উত্তরে আদি উৎপত্তি তুলনায় সাম্প্রতিক কালের মধ্যেই নির্ণয় করা যাবে না, অথচ সমাজের মনু নির্দেশিত চতুর্বর্ণ বিন্যাস নিম্নবঙ্গে বাস্তবে অজ্ঞাত ছিল।

এই সিদ্ধান্ত ভুল বোঝার এবং সম্ভবত ভুলভাবে উদ্ধৃত করার অবকাশ সম্বন্ধে আমি সচেতন। নিষ্ঠুর ভেদাভেদ সহ প্রকৃত সামাজিক অবস্থাকে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে তুলে ধরা হবে। জগন্নাথ, গয়া, শুধু তাই নয়, খোদ বীরভূম জেলার মধ্যস্থিত পবিত্র নগরীকে নিম্নবঙ্গের হিন্দুত্বের সর্বব্যাপী চরিত্রের স্থায়ী প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হবে। মাত্র আট শতাব্দী আগে বৌদ্ধধর্মের বহিষ্কারের পর হিন্দু ধর্মের সপক্ষে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব প্রসিদ্ধ মন্দিরের অযৌক্তিক বিশ্বাসকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নবঙ্গের, ভারতের অপর যে কোনো স্থান অপেক্ষা নিষ্ঠুরতর সামাজিক ভেদাভেদের কারণ অন্যত্র নিহিত।

সংস্কৃতভাষী নবাগতদের আগমনের আগেই এই অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছে। তাদের পূর্বপুরুষদের ঘিরে আজও জাতিবিদ্যাগত রহস্য বর্তমান, এবং বীরভূমের মতো কয়েকটি মাত্র সীমান্ত জেলা ছাড়া সর্বত্র তারা নবাগতদের দ্বারা এত সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হয়েছিল যে, তাদের ভিত্তি করেই উদ্ভূত সংকর জনগণ বিগত হাজার বছরেরও বেশি নিজেদের পৃথক অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হয়েছে। একদা পৃথিবীতে অসংখ্য রকমের জীবজন্তু ছিল, আজকের জীববিদ্যায় তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই; ঠিক তেমনই বিশ্বমানব পরিবারে একদা বৃহৎ জাতিরা বর্তমান ছিল, তারা তাদের সভ্যতার বিকাশ ঘটায় এবং অবশেষে লুপ্ত হয়—ইতিহাস এখনো পর্যন্ত তাদের সম্বন্ধে নীরব। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে, আদিম যুগে বর্তমানে অবলুপ্ত অগণন বিপুলকায় রাক্ষুসে পাখিরা কানেক্টিকটের বালুকাবেলায় নিজেদের পদচিহ্ন রেখে গেছে, যে বিশাল জলাভূমিগুলি তাদের বিচরণভূমি ছিল, যেগুলি আজ শুকিয়ে শক্ত পাথরে পরিণত হয়েছে, যেসব মাছ তাদের খাদ্য ছিল সেগুলি সন্নিহিত পাথরে জীবাশ্ম হয়েছে; তাদের শত্রু ছিল আরো দানবাকৃতি জন্তুর দল—মানবজাতির জন্মের আগেই এ সকলই লুপ্ত হয়েছে। এই পক্ষীকুলের সাথে ভারতের আদিম জাতিগুলির অনেকাংশে সাদৃশ্য রয়েছে; উভয়েরই বিনাশ ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে; এবং এদের অনেকের সম্বন্ধে একটা কথাই সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায়—এরা একদা ছিল, এখন আর নেই। অন্যান্য অবলুপ্ত জাতিগুলি সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞান সুস্পষ্ট কথাবার্তা বলে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এদের সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলতে পারেনি। আজ পর্যন্ত বেওয়ারিশ, ইতর জাতি

হিসাবেই তাদের পরিচয়, এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, মহান জাতিগুলির কোনোটিই এদের সাথে কোনো রূপ সম্পর্ক স্বীকার করে না, এবং উচ্চস্তরের জীবের আবির্ভাবের প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে সর্বত্র ব্যাপী জঙ্গলের যে ভূমিকা ছিল, একই ভাবে এরা ছিল ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমি।[২৮]

সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা হলো আদিম অধিবাসীদের সাথে আর্যদের বিরোধ। এই বিরোধজাত আবেগ সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঋষিদের স্তবগানে, ধর্মগুরুদের অনুশাসনে এবং মহাকবিদের কিংবদন্তিতে। বাইবেলের ডেভিডের প্রার্থনা-গীতির মতোই বহু বৈদিক স্তোত্র উদ্ধারের জন্য প্রার্থনায় বা বিজয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরিপূর্ণ। বিবাদরত মানুষ উত্তেজনার মুহূর্তে শত্রুকে যেভাবে গালমন্দ করে এখানে তা করা হয়েছে ; সংস্কৃত লেখকদের বর্ণনা হতে আদিম অধিবাসীদের বিচার করার সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সকল চরিত্র চিত্রণ বৈরী মনোভাব জাত। বাস্তব সংগ্রাম শেষ হবার পর এবং পরাজিত জাতিরা জঙ্গলে আশ্রয় নেবার পর অন্য একটি কারণে এদের সম্বন্ধে আর্যদের বর্ণনা আরো বিকৃত হয়ে যায়। সেমেটিক ইতিহাসে 'রেফেইম'[২৯]-এর দানবাকৃতি সন্তানদের মতোই এই আদিবাসীরা সংস্কৃত সাহিত্যে রাক্ষস ও দৈত্য হয়ে দাঁড়ায়।[৩০]

সুতরাং, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নিম্নবঙ্গের জনসাধারণ দুই ধরনের উপাদানে গঠিত : প্রথমত, প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ উপাধিধারী আর্য দখলদাররা ; দ্বিতীয়ত, আদিম অধিবাসীরা, আক্রমণকারীদের আগে যারা ছিল স্থানীয় আধিবাসী এবং যাদের সামনে দ্রুত দুটি মাত্র বিকল্প খোলা থাকে— ভূমিদাসত্ব অথবা জঙ্গলে পলায়ন। বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যকার বিরাট ফারাক কখনো লোপ পায়নি ; তাই, হিন্দুসমাজের কলংকজনক সামাজিক ভেদাভেদ একই জাতির বিভিন্ন স্তরভেদ মাত্র নয়, বরং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক ও দীর্ঘকালীন বৈরীভাবাপন্ন দুই জাতির মধ্যকার প্রভেদ। মনুর চতুর্বর্ণ বিন্যাস একমাত্র সংস্কৃত কেন্দ্রিক অঞ্চলে বা মধ্যদেশে কঠোরভাবে অনুসৃত হতো ; কিন্তু নিম্নবঙ্গ সহ ভারতের অপর সকল স্থানে এর ভিত্তি ছিল দুই বর্ণে বিভাজন, যথা—আর্য বা মনুর ভাষায় দ্বিজ ও অনার্য উপজাতি সকল। খুব সীমিত অঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় কায়স্থ বা বৈশ্যদের পাওয়া যায় ; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এবং তজ্জাত সংকর শ্রেণীগুলি সারা ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু জনসাধারণের অপরিবর্তনীয় উপাদান।

কিভাবে এইসব জাতিগত প্রভেদ তিক্ত হয়ে ওঠে, তা বোঝা কঠিন নয়। আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ এত উৎকট ছিল যে, তারা আদিম অধিবাসীদের নিম্নস্তরের জীব হিসাবে গণ্য করত ;[৩১] একইভাবে সন্নিহিত সাঁওতাল অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চলবাসী বীরভূমের ব্রাহ্মণরা নম্র উপজাতিদের আজও ঘৃণা করে ; কিছু

দিন আগে পর্যন্ত এদের ক্রীতদাস গণ্য করত। প্রত্যেক অঞ্চলে যেখানে দুটি জাতির পারস্পরিক তুলনা সম্ভব, সেখানেই সংস্কৃত সাহিত্যে দাস বলে কথিত আদিবাসীরা যন্ত্রণাদায়কভাবে হীনতর। তাদের ভাষা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, অসম্পূর্ণ। আর্য যোদ্ধারা বিজয়প্রার্থনার সময় তাদের 'অস্পষ্ট উচ্চারণ সম্পন্ন লোকরা'[৩২] বা 'অদ্ভুত ভাষার লোক'[৩৩] হিসাবে উল্লেখ করত। আর্যযুগে উচ্চারিত ভাষায় ছিল শক্তি ও মাধুর্যের স্বাভাবিক সমাহার; এমন এক ভাষা যাতে রয়েছে বিভক্তি ও প্রত্যয়ের সমৃদ্ধতম ভাণ্ডার এবং ব্যাকরণগত রূপবৈচিত্র্যের সমগ্র সংগঠিত ব্যবস্থা; এমন এক ভাষা যা মানুষের যে কোনো যন্ত্রণা, যে কোনো অনুভব স্পষ্টভাবে প্রকাশে সক্ষম, এবং যে ভাষা লিখিত ইতিহাসের আদিকাল হতে যে কোনো রূপেই হোক মানুষের সর্বোচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রচেষ্টার প্রকাশ মাধ্যম হয়েছে। সহজেই অনুমেয় যে, প্রাচীন দাসদের বা তাদের বর্তমান বংশধর উত্তর সীমান্তের পাহাড়ি উপজাতিদের ভাষার মতো এত সীমিত ও বৈষয়িক ধাঁচের আড়ষ্ট ভাষাকে সংস্কৃতভাষী তৎকালীন দিগ্বিজয়ীরা তীব্র ঘৃণাভরে দেখত। এই ভাষার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, দর্শনযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি বস্তুর জন্য বহু শব্দরাজির সমাহার, এবং বুদ্ধিগত প্রতিবর্তী ধারণাগুলির অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে এর চরম অক্ষমতা[৩৪]; সাধারণ ভাবে আন্তঃসম্পর্ক ও বিশেষভাবে কার্য-কারণ আন্তঃসম্পর্ক প্রকাশক্ষম শব্দাবলীর অনুপস্থিতি[৩৫]; আবেগ ও চিন্তার সুষম চিত্রণে চেতনার সেই উচ্চরূপ, যার নাম অনুভূতি—তা ব্যক্ত করতে এই ভাষার দৈন্য; এবং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সংক্রান্ত রহস্যের অবিকল প্রতিরূপ সদৃশ কোনো অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে[৩৬] এই ভাষা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যা;—এই ভাষা বোধভিত্তিক নয়; ইন্দ্রিয়গত, অতীন্দ্রিয় নয়; বর্তমান সর্বস্ব, অতীত ও ভবিষ্যৎহীন।

জাতিগত পার্থক্য তীব্রতর করার প্রবণতা, গাত্রবর্ণের পার্থক্যের কারণে আরো বেশি বেড়েছে।[৩৭] নবাগত হানাদাররা উত্তরের বাসিন্দা ছিল এবং সর্বত্র কালো চামড়াদের প্রতি শাদা চামড়াদের যে বিতৃষ্ণা দেখা যায় তারা তা গভীরভাবে পোষণ করত। প্রাচীন গীতিকার সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করেছে যিনি 'দাসদের ধ্বংস করে আর্যগাত্রবর্ণকে[৩৮] রক্ষা করেছেন' এবং 'বজ্রপাণি দেবতা যিনি তাঁর শ্বেতকায় মিত্রদের জমি, সূর্য, জল দান করেছেন।'[৩৯] শেষোক্ত পংক্তিটিকে যতই দুর্বোধ্য বলা হোক, গায়করা যে বারংবার কালো চামড়াদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।[৪০] তারাই শুনিয়েছে, উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো ধেয়ে এসে কালো চামড়াদের ছত্রভঙ্গ করে'; এবং কৃষ্ণকায়রা, ইন্দ্র যাদের ঘৃণা করতেন', স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়।[৪১] আর একটি লেখায় রয়েছে, 'ইন্দ্র তাঁর আর্যভক্তদের রক্ষা করতেন, মনুর অমান্যকারীদের দমন করতেন, তিনি কৃষ্ণকায়দের পরাজিত করেন,[৪২] এবং কৃষ্ণকায়দের বংশধর

ক্রীতদাসের দলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ও 'দাসদের ইতর গাত্রবর্ণকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য' যাগযজ্ঞের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হতো।[৪৩]

আদিবাসীদের প্রতি আর্যদের বিরাগের তৃতীয় কারণ ছিল তাদের ঘৃণ্য খাদ্য অভ্যাস। অনার্যরা প্রাণী জীবনকে মূল্য দিত না; তাদের অনেকে ঘোড়ার মাংস খেত; অন্য অনেকে নরমাংস; বাকি অনেকে আবার মৃত জীবজন্তুর শবদেহ কাঁচা খেত; এবং তারা এমন মাত্রায় মাংসাশী ছিল যে আর্যদের কোমল অনুভূতিকে পীড়িত করত। বৈদিক স্তোত্রকারদের মতে, ওরা ছিল স্থূল রুচি সম্পন্ন, পেটুক অসভ্যের দল, এবং একটি মাত্র মর্মভেদী বিশেষণে আর্যদের ঘনীভূত জাতীয় ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে—'কাশখেগো'।[৪৪]

দাসদের পৌত্তলিকতা ছিল আর্যদের গভীর ও স্থায়ী বিতৃষ্ণার আর একটি উৎস। আর্যরা সাথে আনে উচ্চ বিকশিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রকরণের এক রাজকীয় সমাহার।[৪৫] তারপর তারা এমন একদল লোকের মধ্যে পড়ে যাদের ধর্ম অবোধ্য ও স্থূল ভয়ের বন্ধনে আবদ্ধ। একেশ্বরবাদ বা আত্মার অবিনশ্বরতা—খ্রীস্টধর্মপূর্ব এই দুই মহান মতবাদ আদিতম সংস্কৃত রচনাতেও পাওয়া যায় এবং শত শত বৎসরের পরাজয় ও রাজনৈতিক অধঃপতনের মধ্যেও সংস্কৃতভাষী জাতি ক্ষণেকের জন্যও এগুলি বিস্মৃত হয়নি। সত্য বিকৃত হয়েছে ও ভুলভ্রান্তিতে কলংকিত হয়েছে, কিন্তু সর্বদা সত্যের অস্তিত্ব বজায় থেকেছে। একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ে, ঈশ্বরের অতি জীবন্ত ও আনুষ্ঠানিক রূপকে স্বীকৃতি দিয়ে তারা কার্যত কল্পনাপ্রবণ জাতিসুলভ বহু ঈশ্বরবাদের ভ্রান্তিতে পড়ে কার্যত তাঁর স্থলে তাঁর কর্ম অর্থাৎ স্রষ্টার স্থলে সৃষ্টি পূজিত হয়। কিন্তু বেদের বহু দেবতা বন্দনা ও পরবর্তীকালে অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে একেশ্বরবাদের বুদ্ধিগত স্বীকৃতি সমভাবে প্রকাশিত। প্রাচীন আর্যদের ধর্মের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমাত্মার সাথে আত্মার সংযোগ পুনঃস্থাপন করা;[৪৬] এবং বহু ঈশ্বরবাদ নিয়ে মিশনারিদের অভিযোগে আধুনিক পণ্ডিতদের উত্তর: 'ওঃ, এটা এক ঈশ্বরের বহুরূপে প্রকাশমাত্র, যেমন আকাশে একটিই সূর্য, সরোবরে প্রতিফলনে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। বিভিন্ন ধর্মমত একই নগরীতে উপনীত হবার জন্য বিভিন্ন প্রবেশদ্বার মাত্র।'[৪৭]

আর্যদের মনে হয় যে, অনার্যদের একেশ্বরবাদের কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা দূরে থাক, ঈশ্বরের কোনো ধারণা আদৌ ছিল না। তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় অনুভূতি ছিল অস্পষ্ট ভীতি; এবং অন্যান্য আরো বহু বিতৃষ্ণামূলক বিশেষণের মধ্যে চারটি বিশেষণে অনার্যদের চিত্রায়ণ উল্লেখযোগ্য—'অনিন্দ্র', 'অযজ্যু', 'অদেব', 'অব্রত'।[৪৮]

আরো একটি ব্যাপার রয়েছে—যে ব্যাপারকে কেন্দ্র করে মানুষের সাথে বিলুপ্ত সমস্ত প্রাণীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য রচিত। সেইটি হলো: নবাগতদের চিত্রায়ণ অদ্ভুতভাবে পরিপূর্ণ আলোকময়, অথচ আদিবাসীরা আদিমরাত্রির

আঁধারে নিমজ্জিত। আর্যদের ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের এক দ্বিধাহীন নিশ্চয়তা। বস্তুত, প্রথম যে রহস্যগুলি নিয়ে সমগ্র জাতির চিন্তা আন্দোলিত হয়েছিল, দেহত্যাগের পর আত্মার নিঃসঙ্গ যাত্রা ছিল সেগুলির অন্যতম, এবং পুরাকালের সকল কল্পনাপ্রবণ জাতিগুলির মতোই, অন্ধকারে পথনির্দেশের জন্য আর্যরা, প্রাথমিক ভাবে দেবতাদের সমকক্ষ না হলেও মানুষের চেয়ে আরো দেবগুণ সম্পন্ন সত্তা সৃষ্টি করে। পিরামিডের নিচে মিশরের সম্রাটের আতরাবৃত দেহ শায়িত, আর তাঁর আত্মা থীউটের নির্দেশমতো বিচারের সম্মুখীন হতে চলেছে। এই কাজের জন্য গ্রীকদের ছিল হারমিস্, আর রোমানরা হারমিসের মারকিউরির হাতে। বিভিন্ন নাম নিয়ে আজরাইল সকল যুগে সকল মতের সেমেটিক্ জাতি-সমূহকে অভিন্ন এক চূড়ান্ত নিরপেক্ষ জায়গায় হাজির করেছে। আর্যদের মৃত্যু-রাজ যম। হিমালয় সানুদেশে, পারস্যে, তার কাহিনীর আদিরূপ রক্ষিত আছে। জেণ্ড্ কিংবদন্তি অনুসারে যখন দুঃখ, ব্যাধি, মৃত্যু অপরিচিত ছিল, সেই আদিমকালে যিমা ছিলেন সম্রাট। পৃথিবীতে ধীরে ধীরে পাপ ও ব্যাধি প্রবেশ করল, ধীরে ধীরে মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা এতে দ্রুত বেগ সঞ্চার করল, এবং বৃদ্ধ সম্রাট এই কলুষিত পৃথিবী ত্যাগ করে মনোমতো একদল সঙ্গীর সাথে এক নতুন রাজ্যে চলে গেলেন এবং সেখানে আজও রাজত্ব করছেন। এর সংস্কৃত রূপান্তর পরবর্তী মনোগতবাদী পর্যায়ের ঘটনা—মৃত্যু অতিক্রম করে যম প্রথম অমরত্ব লাভ করেন। পরলোকের পথ আবিষ্কারের জন্য সেখানে তিনি এক রাজ্য লাভ করেন, তাই ঋগ্বেদের দশম খণ্ডে তিনি পরলোকের পথ প্রদর্শকরূপে বর্ণিত। একটি শ্লোকে, তিনি পত্রবহুল এক বৃক্ষের নিচে ভোজনরত;[৪৯] অন্যগুলিতে, তিনি স্বর্গের একেবারে অভ্যন্তরে সিংহাসনে সমাসীন, পুণ্যাত্মাদের স্বর্গবাসের ব্যবস্থায় রত।[৫০] ইতিমধ্যে তার দুই বাদামি কুকুর, 'প্রশস্তনাসা, সদা ক্ষুধার্ত,—নরলোকে বিচরণরত,'[৫১] অথবা, নরকের দ্বাররক্ষী সারবেরাসের মতো, যমরাজের প্রাসাদপথে প্রহরারত—যে পথে যত শীঘ্র সম্ভব মৃতের আত্মা আনীত হয়। 'যম, যিনি মৃত্যু তাঁকে প্রণাম; যিনি প্রথম (পাতাল) নদীতে পৌছান, বহুলোকের জন্য (পরলোকের) পথ বের করেন, তাঁকে প্রণাম; যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সমস্ত প্রাণীর প্রভু'।[৫২] 'সকল মানুষকে যিনি একত্রিত করেন, যিনি বিশাল বারিধি অভিমুখে যাত্রা করেন, যিনি বহু লোকের পথ আবিষ্কার করেন, সেই যমরাজকে নৈবেদ্য সহকারে ভজনা কর'।[৫৩]

শবদেহ দাহকে মৃতের মরদেহ হতে অবিনশ্বর অংশকে ছিন্ন করা সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় হিসাবে ধার্মিক আর্যরা মনে করত। আমাদের মতোই তাদের ধর্মবিশ্বাস শিখিয়েছিল যে, মৃত্যু সত্তার লয় নয়, বরং মৃত্যু হচ্ছে নবজন্ম; এবং তাদের কাছে অগ্নির ভূমিকা ছিল মুক্তিদাতার, ধ্বংসকর্তার নয়। যেমন, পিতামাতা হতে প্রত্যেকের স্বাভাবিক জন্ম হয়, ধর্মীয় কর্তব্য পালনের মাধ্যমে

আংশিক পুনর্জন্ম বা দ্বিজত্ব হয়, তেমনি চিরশায়িত মরদেহ হতে আত্মাকে মুক্তি দিয়ে অগ্নি তৃতীয় বা স্বর্গীয় জন্ম নিশ্চিত করে। আঁতুড়ে জন্মের সময়ের মতো চিতার চারপাশে মৃতের বন্ধুরা দণ্ডায়মান, তার দৃষ্টি সূর্যাভিমুখী করা হয়েছে, তার নিশ্বাস বায়ুমুখী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মৃত্তিকা, জল ও তরু, অর্থাৎ যা হতে সকল কিছুর উদ্ভব, সেই অভিমুখে রাখা হয়। 'কিন্তু তার সে অংশ এখনো আবির্ভূত হয় নাই, হে দেবতা (অগ্নি), তোমার দাহনে তার আবির্ভাব ত্বরান্বিত কর; তোমার শিখা ও দীপ্তি একে প্রজ্বলিত করুক; পুণ্যাত্মাদের জগতে একে প্রেরণ কর।'[৫৪]

তেরো বৎসর আগে অধ্যাপক ম্যূলার ব্রাহ্মণদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; মরদেহ চিতায় শায়িত থাকাকালীন, গির্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানের ঢঙে, বন্ধুদের নিকট হতে আর্যদের বিদায় গ্রহণের রীতি এতে বর্ণিত আছে। 'তোমাকে বিদায়, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে প্রাচীন পথ ধরে যে স্থানে উপনীত হয়েছেন, তুমিও সেখানের উদ্দেশ্যে বিদায় গ্রহণ কর। পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হও;[৫৫] মৃত্যুরাজের সাথে মিলিত হও; স্বর্গে তোমার ইচ্ছা পূরিত হোক; তোমার সকল অসম্পূর্ণতা পরিত্যাগ করে স্বগৃহে গমন কর। নবদেহ ধারণ কর; উজ্জ্বল পোশাকে বিভূষিত হও। গমন কর; বিদায় গ্রহণ কর; সত্বর এই স্থান ত্যাগ কর'।[৫৬] এর উত্তরে যথাযোগ্য ভাবে ধুয়া উঠত: 'যাদের জন্য অমৃতের নদী প্রবহমান, তাদের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা শুরু হোক। তপস্যার মাধ্যমে যারা জয়যুক্ত হয়েছে, ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর থেকে স্বর্গলাভ করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা শুরু হোক…রণে দুর্মদ, পরার্থে জীবনদানকারী বীরদের উদ্দেশ্যে, আর্তের জন্য সর্বস্ব অর্পণকারীদের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা শুরু হোক'।[৫৭] আবার প্রত্যক্ষ সম্বোধনে প্রত্যাবর্তন: 'তোমার উপর মন্দ মধুর বায়ু প্রবাহিত হোক, বারুণি দেবদূতরা তোমায় ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাক, বায়ুমধ্যে তাদের তীব্র গতিতে ও শিশির সিঞ্চনে তুমি শীতল হও'। 'তোমার আত্মা স্বীয় সত্তা লাভ করে সত্বর পূর্বপুরুষদের সন্নিকটে যাক'। বৈদিক এক সমবেত প্রার্থনা দিয়ে এই ক্রিয়াকর্ম যথাযোগ্য ভাবে সমাপ্ত হতো: "তাকে ধারণ কর, বহন কর, সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করে তাকে পুণ্যধামে যেতে দাও। চারপাশের নিঃসীম অন্ধকার উপত্যকা অতিক্রম করে অজাত আত্মা স্বর্গারোহণ করুক…পাপ-কলুষিত তার পদদ্বয় ক্ষালন কর; শুভ্র চরণে তার উত্তরণ শুরু হোক। সমস্ত অন্ধকার অতিক্রম করে, বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চতুর্দিক অবলোকন রত তার অজাত আত্মা স্বর্গারোহণ করুক'।[৫৮]

বেদের আদিপর্বে দেহান্তরবাদের কোনো চিহ্ন নেই। চিতার চারপাশে প্রার্থনারত বন্ধুদের স্থির বিশ্বাস থাকত যে, মৃত বন্ধু সরাসরি তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হবে এবং পূর্বে গত প্রিয়জনদের সাথে পুনর্মিলিত হবে। 'আমাদের

স্বর্গে উত্তরণ কর (হে প্রভু), দারাপুত্র কন্যার সাথে আমাদের মিলিত কর' ।[৫৯] 'স্বর্গে, মরদেহের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে, সকল পঙ্গুত্ব, দেহগত সকল বিকৃতি মুক্ত হয়ে যেখানে আমাদের পরিজনরা সুখে বসবাসরত, সেখানে আমাদের পিতামাতা ও পুত্রকন্যাদের দেখানো হোক ।[৬০] পত্নীকেও পতির সাথে মিলিত হতে দিতে হবে ।[৬১] হে পূতাত্মা, আলোকিত ও গৌরবময় সেই চিরন্তন অপরিবর্তনীয় জগতে আমাকে স্থান দাও । সেখানে আনন্দ, সুখ ও প্রশান্তি সদাবিরাজমান, সকল বাসনা পূরিত হয়, সেই জগতে আমাকে অমরত্ব দাও' ।[৬২] রথ্ বলেন, "বাস্তবিক বিস্ময়ের সাথে আমরা এখানে অমরত্ব সম্বন্ধে চমৎকার ধারণা সরল ভাষায় শিশুসুলভ বিশ্বাসে প্রকাশিত হতে দেখি ।"

অবশ্য, পৃথিবীতে যারা সৎভাবে জীবন যাপন করেছে, তাদের জন্যই শুধু এই সুন্দর জগতের দ্বার অবারিত। পূর্বোক্ত শ্লোকগুলি রচনার সময়ে জীবনোত্তর ভবিষ্যতে প্রতিদানের ধারণা বিকশিত হয়নি,এগুলি পরবর্তীকালে পুরোপুরি বিকশিত হয় ; কিন্তু এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যামূলক এক ধর্মগ্রন্থে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বাক্যগুলি রয়েছে: 'পরলোকে প্রত্যেকের ভালো ও মন্দ কাজ নিক্তিতে চড়ানো হয়। ভালো বা মন্দ যেদিকে নিক্তির কাঁটা ঝোঁকে, সেইমতো প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ধারিত হয় । এখন, একথা যে জানে সে এই জগতেই নিজের কাজের বিচার করে, এবং পরলোকের বিচার হতে নিজেকে রক্ষা করে' ।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে উল্লিখিত বৈদিক গ্রন্থগুলিতে অমরত্বের প্রতি যে সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়, তা সেমেটিক রচনাবলীতে বা গ্রীস ও রোমে পরবর্তী আর্যরচনায় দেখা যায় না । বেদ অনুযায়ী, বিদেহী আত্মা আরো মহিমান্বিত নব কলেবর ধারণ করে, এবং পুরাতন বন্ধু-পরিজনদের সাথে পুনর্মিলিত হয়ে স্বর্গসুখে বসবাস করে । হোমারের জগৎ অসুখী অশরীরীদের এক অস্পষ্ট অনিশ্চিত দুনিয়া ; এই জগৎ জীবন ও আনন্দের প্রতি আমাদের সহজাত ভালোবাসার কট্টর বিরোধী—তাই অ্যাকিলিস্ ইউলিসিস্‌কে বলেন যে, সকল মৃতাত্মাদের উপর প্রভুত্ব করার চেয়ে পৃথিবীতে সামান্য দাস-জীবনও বেশি কাম্য । জুলিয়ানের রাজসভার দার্শনিকরা সেন্ট পলের আলোকে প্লেটোর রচনায় পৌত্তলিকতার পতনের মধ্যে নশ্বরতার পক্ষে অনেক কিছু দেখেন । কিন্তু গ্রীস বা রোমের অনুদ্বুদ্ধ দর্শন যে তার কট্টর অনুসারীদেরও অমরত্বের কোনো নিশ্চিত ভরসা দিতে পারেনি, তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে । গিবন লিখেছেন, 'সিসেরো ও প্রথম সিজারদের যুগে যেসব ব্যক্তি তাঁদের কর্মে, চরিত্রে, উদ্দেশ্যের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের জানার ভিত্তিতে এটুকু নিশ্চিত বলা যায় যে, তাঁদের ইহজীবনের কাজকর্ম জীবনোত্তর ভবিষ্যতে পুরস্কার বা সাজা প্রাপ্তি, গভীর বিশ্বাস দ্বারা কখনো নিয়ন্ত্রিত হয়নি ।' টাসকিউলান তর্কবিচারে চিরন্তন স্বর্গীয় অবস্থার পক্ষের যুক্তিগুলি উভয়সংকট জাত ভুল ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সিসেরো এক স্থানে যে যুক্তিগুলিকে সম্মান দিয়েছেন, অন্যত্র সেগুলিকেই বিদ্রূপ করেছেন। মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই এক পরিবর্তিত রূপভেদ মাত্র – দার্শনিক অপধর্মীদের এই বিশ্বাসের যুক্তিগুলি বা সিপিওর স্বপ্ন – কোনোটাই আমাদের আচ্ছন্ন রাখতে পারে না, এবং অবশেষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক বন্ধুর[৬৩] সমর্থনে সিসেরোর বক্তৃতায় আমরা দেখি যে, জীবনোত্তর ভবিষ্যৎ হচ্ছে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীদের নিজেদের মনোরঞ্জনের উপায়, কিন্তু কোনো সংসারী লোক এর ভিত্তিতে তার দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হতে দেবে না।

এইটি এক গভীর আকর্ষণীয় এক প্রশ্ন। গ্রীস বা রোমের দার্শনিকদের অপেক্ষা উত্তর-ভারতের এইসব প্রাচীন গীতিকারদের মানুষের নিয়তি সম্বন্ধে স্বচ্ছতর ও গভীরতর থাকা কিভাবে সম্ভব? পিতা অপেক্ষা শিশু জ্ঞানী হয় কিভাবে, কিভাবেই বা প্রকৃতির আলো বৃদ্ধি পেয়ে আরো নিষ্প্রভ হতে হতে অবশেষে নির্বাপিত হতে পারে? শান্ত শীতল দিনে আদমশ্রুত স্বর্গীয় বাণী প্রতিধ্বনি স্বরূপ সুদূর অতীতের দৃঢ় সরল বিশ্বাসগুচ্ছ, যা ছিল আদিম মানবজাতির নিকট ঐশ্বরিক সত্যের সাধারণ ভাণ্ডার স্বরূপ – প্রাগৈতিহাসিক অসংখ্য মানব প্রজন্মকে যুগে যুগে আশ্বাস জুগিয়ে এগুলিই কি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশ বিবদমান বিভিন্ন ধারার আস্ফালনের এবং বিশুদ্ধ যুক্তির অহমিকার মরুভূমিতে অবশেষে বিলুপ্ত হয়েছে? এই অভিমত কোনো নির্ভরযোগ্য ঈশ্বরতত্ত্ব বিরোধী নয়। ডাঃ স্টানলি বলেন – "বালামের কীর্তিকাহিনীতে পয়গম্বরদের ছাড়াও ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার স্বীকৃতি দেখা যায়; আধুনিক মননের সংকীর্ণতা সাগ্রহে একে অস্বীকার করলেও, এর স্বীকৃতিতে ধর্মশাস্ত্র সদা প্রস্তুত, এবং এই স্বীকারের মাধ্যমে প্রতি যুগের ও প্রত্যেক জাতির উচ্চতর চেতনাসম্পন্ন মনীষীরা সর্বজনীন খ্রীস্টধর্মের পরিসরের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।'[৬৪]

উত্তর সীমান্তের অনার্য উপজাতিরা যে কথা বলে মৃতদের এই দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়, আর্যদের অমরত্বে দৃঢ় প্রত্যয়ের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর; অমরত্ব সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই; তাদের ভাষাগুলির কয়েকটিতে মানুষের জীবৎকালের চেয়ে দীর্ঘসময় প্রকাশ করা যায় না; এবং একটি আদিবাসী ভাষার সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে সাত।[৬৫] মৃতদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা এইসব আদিবাসীদের প্রধান উদ্দেশ্য। উত্তর-পূর্বের পাহাড়িয়ারা মৃত্যুর সাথে সাথে মৃতদেহ গর্তে লুকিয়ে ফেলে। রাজকীয় কোনো অনুষ্ঠান পালিত হয় না। নিকটতম নদীতে মৃতের পরিজনরা স্নান করে এবং সমাহিত করার পর প্রাত্যহিক কাজে অবিলম্বে ফিরে আসে। যেসব উপজাতিদের মধ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রথা বিকশিত হয়েছে, সেখানেও এটা অতি পানাহারের একটা উপলক্ষ মাত্র। পানাহারের ব্যবস্থা হবার পর সকলে সদ্য খোদিত কবরের নিকট যায়, মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয় অর্পণ করে এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি

বলে বিদায় নেয় : 'নাও এবং খাও'। এখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে তুমি পানাহার করেছ ; অতঃপর পারবে না। তুমি আমাদের একজন ছিলে ; অতঃপর থাকবে না। তোমার কাছে আমরা আর আসব না ; তুমি আর আমাদের কাছে এসো না'।[৬৬] এই বিচ্ছেদ চূড়ান্ত। আর্য শ্রাদ্ধশান্তিতে স্বর্গে পুনর্মিলনের প্রত্যাশা থাকে ; কিন্তু অনার্য উপজাতিদের কাছে মৃত বা অজানা বিভীষিকা এবং তাই, এরপর সাক্ষাতের কথা বলা দূরে থাক, মৃতদের আগমনের আতংক থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য তারা অনুনয় বিনয় করে।

আর্য ও অনার্যদের আলোক প্রাপ্তির অসম মাত্রা সম্বন্ধে এত বিশদ আলোচনার কারণ, আমার মতে, ভারতের বর্তমান জনসাধারণকে যেসব নিষ্ঠুর সামাজিক ভেদাভেদ বিভক্ত করে রেখেছে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা এখানেই নিহিত রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও দাসদের আবির্ভাব প্রথমে শত্রু হিসাবে, তারপর ভূত-প্রেতাকারে, পরে ইতর প্রাণী আকারে এবং পরিশেষে উচ্চ জাতিগুলির দাস হিসাবে।[৬৭] পুরাকালের অন্যান্য জাতির বিভিন্ন অংশের মাঝে যে পার্থক্য দেখা যায়, এক্ষেত্রে সে পার্থক্য বহুগুণে বেশি ছিল ; একই ভাবে হীনতর জাতির প্রতি শ্রেষ্ঠতর জাতির ঘৃণাও ছিল বহুগুণে বেশি। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে এই ঘৃণার প্রকাশ, এবং এটা সহজেই বোঝা যায় যে, উদ্ধত প্রাকৃতভাষী প্রভুর নিত ক্রীতদাসের ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দগুলির প্রতি—তার গো-হো (মানুষ্য), গো-তুম (গো), পো-তা (পেট)[৬৮]—যে ঘৃণা ছিল তা প্লেবিয়ানদের প্রতি প্যাট্রিসিয়ানদের প্রশান্ত ঘৃণার, এমনকি হীলটের প্রতি হেলেনিদের গভীরতর ঘৃণার তুল্য নয়, বরং সুইফটের হুইনহিসদের তাদের ইয়াহুদের ভাষার প্রতি যে প্রবল ঘৃণা ছিল, তার সাথেই এর সাদৃশ্য রয়েছে।

তথাপি যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করে দুইটি জাতি একে অন্যকে প্রভাবিত না করে পারে না। শ্রেষ্ঠতর জাতি নিজের ধরনে হীনতর জাতিকে গড়তে পারে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় নিজেও প্রভাবিত হয় ; এবং অনার্য উপজাতিগুলি বিজয়ী আর্যদের ভাষা, ধর্ম এবং রাজনৈতিক পরিণতি বহুলাংশে পরিবর্তিত করেছে। একেবারে আদিপর্বে অনার্যদের প্রভাব অনুভূত হয় অপভ্রংশের অর্থাৎ নিম্নবর্ণ জাতদের ব্যবহৃত সংস্কৃতের দেশীয় কথ্যরূপের মাধ্যমে। কোলব্রুকের অনুসরণে ডোনাল্ডসন এইটিকে চিহ্নিত করেছেন 'এক প্রাদেশিক দুর্বোধ্য ভাষা' হিসাবে এবং ডাঃ ম্যুর এই সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা করেছেন।[৬৯] ভারতবর্ষের মাতৃভাষাগুলিকে দেশী বৈয়াকরণেরা দুই ভাগে ভাগ করেছেন, একটি সংস্কৃত ভাষাজাত, অপরটি অনার্য ভাষা হতে সৃষ্ট। বাংলায় এই অনার্য উপাদানের নাম ভাষা, দক্ষিণ-ভারতে এইটি বহুনামে পরিচিত, যেমন অত্‌সু—তেলেগু, বা আরো সাধারণভাবে দেথিয়া। নিম্নবঙ্গের আঞ্চলিক কথ্য ভাষাগুলিতে বিশেষভাবে বীরভূমসহ, বিভিন্ন জাতির মিলন সীমান্তে অন্যান্য জেলাগুলির কথ্য

ভাষাগুলিতে বহু শব্দ রয়েছে যেগুলি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয়; এবং যদিও লিখিত বাংলায় এই শব্দগুলিকে সযত্নে পরিহার করা হয়, তবু কৃষকদের, রাখালদের ও জঙ্গলবাসীদের কথায় এইগুলি সদা উপস্থিত, এবং এইগুলি দিয়েই ঘরোয়া স্নেহসিক্ত ভাষা, যে ভাষায় মাতা তার শিশুকে আদর করেন, গঠিত হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে, নিম্ন উপত্যকার আর্যরা পিশাচ-পূজার বিষয়ে বহুলাংশে অনার্যদের কাছে প্রশ্নাতীত ভাবে ঋণী; উপকারী দেবতাদের আরাধনা অপেক্ষা অপকারে সক্ষম দেবতাদের তুষ্ট রাখার যে মানসিকতা বর্তমান হিন্দু কুসংস্কারের অন্যতম লক্ষণীয় ও সম্মান হানিকর বৈশিষ্ট্য, সেইটিও অনার্যদের দান। বিগত ছয় শতাব্দীকাল যে সম্প্রদায় ভারতীয় জনগণের এক প্রধান অংশকে নিজেদের আওতায় এনেছে, সেই শৈবরা নিজেদের উপাস্য বস্তুটি যে অনার্য উপজাতিদের থেকে নিয়েছে, তা আমি পরে প্রমাণ করব। শিব বা রুদ্রের আদি উপাখ্যান যাই হোক, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিম্নবঙ্গে যে শিবপূজা হয়, তা আর্য ভক্তিচেতনা বিরোধী, বরং তা কৃষ্ণকায়দের কুসংস্কারের প্রতিনিধিত্ব করে। পুরাকালে এই ভীষণ দেবতাটি যে অনার্যদের প্রধান উপাস্য ছিল এবং নররক্ত সহকারে যে একে সন্তুষ্ট রাখা হতো, সিগনর গোরেসিও তা উল্লেখ করেছেন। যে কোনো রাজ্য দখলের পর ব্রিটিশ সরকারের সর্বদা সর্বপ্রথম কাজ ছিল এই প্রকারের বলি সর্বতোভাবে বন্ধ করা; কিন্তু তিন হাজার বছর আগেও সমস্ত বন্য উপজাতিরা যে দেবতা সম্বন্ধে আতংকগ্রস্ত ছিল, চির অতৃপ্ত সেই দানবের কাছে নিম্নবঙ্গের পুরোহিতরা অভাবের মরশুমে এখনো শিশুবলি দিয়ে থাকে।

১৮৬৫-৬৬ সনে দুর্ভিক্ষ পরিহারের উদ্দেশ্যে এই প্রকার নরবলির আশ্রয় নেওয়া হয়। পুলিশ বিশেষভাবে সজাগ থাকায় এবং এই ধরনের যে দুইটি ঘটনা প্রকাশিত হয়, তা সংবাদপত্রে প্রচারের কারণে কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকায়, এই প্রকার নরবলির ঘটনা বিরলপ্রায় ছিল। নিম্নে একটি নরবলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো। এইটি ১৮৬৬ সনে, বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও আলোক প্রাপ্ত জনপদ হিসাবে পরিচিত যশোহর জেলায় ঘটে: 'লক্ষীপাশা গ্রামে কালীমন্দিরের সন্নিহিত বলিস্থানে প্রায় সাত বছর বয়সী এক মুসলমান বালককে পাওয়া যায়, তার গর্দান হাঁড়িকাঠে, হাড় ছিন্ন। দাঁতের মাঝে জিহ্বা নিশ্চল, চক্ষু উন্মীলিত, অনাবৃত শরীরে জমাট রক্ত, ঘাড়ের দুই জায়গায় খাঁড়ার কোপের দাগ দৃশ্যমান। মনে হয়, বলি সম্পূর্ণ হতে পারেনি কারণ এই সব ক্ষেত্রে ধড় হতে মুণ্ডকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে ফেলা লক্ষ্য হয়ে থাকে। হুগলিতে পরবর্তী ঘটনায় মূর্তির সামনে নরমুণ্ডটি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল'।[৭০] দক্ষিণ-পশ্চিম বীরভূমে আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে বর্ষার আশু আগমন সুনিশ্চিত করার জন্য বনমধ্যে নরবলির ঘটনার আভাস আমি পেয়েছি।

পিশাচ-পূজার এবং দেবতুষ্টির রীতির এই একই প্রবণতা ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখা যায় এবং যেখানে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অনার্য উপাদান যত বেশি, সেখানে এই প্রবণতা সর্বদাই তত বেশি শক্তিশালী। উত্তর-ভারতে, অর্থাৎ মনু-কথিত সমগ্র মধ্যদেশে, আর্যদের কাছে অনার্যরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়, তাই এখানে পিশাচ-পূজা বিরল। নিম্নবঙ্গে আর্যরা অনার্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে পারেনি, তাই এখানে একটু নমনীয়রূপে পিশাচ-পূজা প্রথা হিসাবে প্রচলিত; মধ্যভাগে মালভূমিতে আর্যরা কখনো বসতি স্থাপন করেনি, এখানে বন্য উপজাতিদের মধ্যে এটাই একমাত্র ধর্ম হিসাবে পরিচিত; এবং সিংহলে আর্য বসতি ছিল তুলনায় স্বল্প, এখানে সমগ্র গ্রামীণ পূজার্চনার মূলে রয়েছে এই পিশাচ-পূজা। সিংহলের কট্টরতম হিন্দু রাজাও সরকারি খরচে গ্রামে প্রেত-নৃত্যের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মকে পরাজিত করলেও বৌদ্ধ-ধর্ম কিন্তু প্রেতপূজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিশেষে এতে সহ-যোগিতা করতে বাধ্য হয়, পোর্তুগিজ ও ডাচ্ যাজকরা বৌদ্ধধর্ম হতে মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু প্রেতপূজায় সিংহলিদের আসক্তি দুর্বল করার ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়; এবং সিংহলে ওয়েস্লিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা এমনকি রোমান ক্যাথলিকদেরও প্রোটেস্টান্ট বানাতে সক্ষম হয়, কিন্তু সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শিষ্যদেরও অনার্যসুলভ এই কুসংস্কার হতে শুদ্ধিকরণে তারা ব্যর্থ হয়।[৭১]

নিম্নবঙ্গে গ্রাম্য ও গৃহদেবতার পূজা প্রসঙ্গটি বরং তুলনায় মনোরম — নির্দোষ এই সংস্কার হিন্দুরা ভ্রমাতীতভাবে অনার্য উপজাতিদের থেকে গ্রহণ করেছে। পাহাড়ি উপজাতিরা কিভাবে এই পূজা করে, আমি পরে বর্ণনা করব। সমতলে সংকর নিম্নবর্ণের লোকরা চিরকাল গ্রাম্যদেবতাকে মান্য করে চলত; ব্রাহ্মণদের মধ্যে সেইরকম ভাবে এই পূজা প্রচলিত ছিল না এবং বহু স্থানে উচ্চবর্ণের মাঝে এই পূজা লুপ্ত হয়েছে। বুকানন্ অবশ্য এই শতকের সূচনায় নিম্নবঙ্গের সমগ্র উত্তর-পশ্চিম জেলা ব্যাপী সর্বত্র এর প্রচলন লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন, 'সাধারণ জন কখনো গ্রাম্য-দেবতার পূজা সম্পূর্ণত পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি। এবং তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে, তারা হয় গ্রামরক্ষার দায়িত্ব সম্পন্ন কোনো নামহীন দেবতার উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত পূজা (পান, সিঁদুর, অন্ন, জল) দিত, আর নচেৎ ইতিমধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নানাপ্রকার ভূত-প্রেতের নামে বা হিন্দু দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দিত। বস্তুত বিপদের সময়ে সর্ব বর্ণের লোক সচরাচর ভূতপ্রেত ও অন্যান্য কথিত গ্রাম্য দেবতাদের শরণ নিত ও তাদের মনস্তুষ্টির জন্য বলিদান ও অন্যান্য ভোগ দিত। সাধারণত এদের কোনো মূর্তি থাকত না, মন্দিরও থাকত না এবং দেবতার প্রতীক হতো এক মাটির বেদী, কখনো বা সেইটি থাকত কোনো গাছের নিচে, থাকত নীচু জাতের কোনো

এক পুরোহিত',[৭২] – জনসাধারণের অনার্য উপাদান উদ্ভুত। এই গ্রাম্য দেবতাগুলির বেশ কয়েকটি আর্য বসতির চেয়ে প্রাচীন, অনার্য উপজাতি উদ্ভুত বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপরে দেবত্ব আরোপের মাধ্যমে এদের সৃষ্টি; এমনকি সেই সব জেলাতেও যেখানে এদের প্রতিভূ লোকজন আজও পূজা পায়, সেখানেও এদের নির্দিষ্ট জাতিগত অবস্থা সকলে বহুযুগ আগেই বিস্মৃত হয়েছে। সর্বত্র অনুষ্ঠানগুলিতে রয়েছে প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতংকের ছাপ এবং কৃষ্ণকায় সুলভ মাংসাশী, অতি ভোজনের অভ্যাস। বস্তুত, বুকানন তাদের ঠিক বর্ণনাই দিয়েছিলেন যে, 'বলিদানের আংশিক কারণ ছিল ভয়, আর আংশিক কারণ ছিল মাংস ভক্ষণের ইচ্ছাপূরণ'।[৭৩] হিন্দুধর্মের অনুশাসন সর্বাধিক যারা স্বীকার করেছে, আর্যোপম সেই বর্ণ সংকরদের মধ্যেও তীব্র অনার্য প্রবৃত্তি উৎসবের সময়ে বন্ধনমুক্ত হয়; রাখালদের গোগ্রাসে শূকর মাংস খেতে দেখা গেছে – অথচ অন্য সকল সময় এইটাকে তারা ঘৃণ্য মনে করে। বীরভূমে, বিশেষভাবে পশ্চিম সীমান্তে, এই পূজা অত্যন্ত জনপ্রিয়, এবং বৎসরে একবার সমগ্র রাজধানী জঙ্গল মধ্যে এক দরগায় হাজির হয়, এবং এক বেলগাছে বাস রত জনৈক প্রেতের উদ্দেশ্যে মামুলি পূজা দেয়।[৭৪] যদিও গাছটির বয়স খুব বেশি হলে সত্তর বৎসর, তবু সাধারণ মানুষ এই দরগাকে প্রাচীনতম মনে করে; এবং কিংবদন্তি অনুসারে, যে তিনটি বৃক্ষ বর্তমানে এই স্থানকে চিহ্নিত করছে সেইগুলি কখনো দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে বাড়ে না – চিরকাল একরূপ আছে। অনার্যদের সকল পূজা অনুষ্ঠানের মতোই এখানেও প্রচুর বলিদান হয় এবং বলির শিকারগুলি দিয়ে ভোজের পরদিন শেষ হয়। যেসব উপজাতি হতে এই কুসংস্কারের উৎপত্তি, নৈবেদ্য আকারে উৎসর্গীকৃত বস্তুগুলি তাদের আদিম অবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। ধনীরাই শুধু ছাগ বলি দেয়, সাধারণ নৈবেদ্য হচ্ছে দেবস্থানে একমুঠো মাটি নিক্ষেপ, সাথে থাকে হয়তো কয়েকটি অন্নকণা, সক্ষম হলে একটি তামার পয়সা।

অনার্যদের শিবপূজা এবং গ্রাম্য দেবপূজার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমটি বিশুদ্ধ আর্য বংশ সম্ভূত হিন্দু বা ব্রাহ্মণদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি মূলত বাপক মিশ্র জন সমুদায়ের মাঝেই থেকেছে। কিন্তু যে শিবপূজা বর্তমানে সমগ্র গাঙ্গেয় নিম্ন উপত্যকা ব্যাপী সর্বজনীন, পুরাকালে ব্রাহ্মণদের কাছে তা বর্তমান গ্রাম্য দেবতাগুলির মতোই অচ্ছুৎ ছিল। অবশ্য, পুরাকালের ভগ্নাবশেষ এই গ্রাম্য দেবতাগুলির ঘৃণ্যতমটির মন্দিরেও সেবার জন্য উচ্চবর্ণের গরিব পুরোহিত আজও জুটে যায়। বস্তুত, বাংলার মিশ্র জনগণের মধ্যে একমাত্র অনার্য দেবতা হিসাবে শুধু শিবই মর্যাদা লাভ করেন নি;[৭৫] কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি বিশেষ এক আর্যদেবতা সদৃশ ছিলেন, পরে উভয় দেবতাকে অভিন্ন গণ্য করা হয় এবং বর্তমানে ঐ দেবতার নামেই তিনি পরিচিত। লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রেতপূজা ও গ্রাম্যদেবতা পূজার মতোই জনগণের উপর

শিবপূজার প্রভাব সর্বদা অনার্য উপাদানের অনুপাতে বাড়ে বা কমে। আর্য সভ্যতার সীমান্তে বা আর্যদের থেকে অনার্যদের পৃথক রেখেছে যেসব পাহাড়, সেইখানেই বিখ্যাত শিব মন্দিরগুলি অবস্থিত। হিমালয় তার কীর্তি-কাহিনীর রঙ্গভূমি এবং বীরভূমের পার্বত্য অঞ্চলে তার বেদীতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সমবেত হয়। অধ্যাপক উইলসন সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন, শিবপূজা সর্বদা রহস্যাবৃত থেকেছে; সুসংস্কৃত জাতিগুলির আরাধ্য দেবতাদের ঘিরে যেসব মনোহর কিংবদন্তি প্রচলিত, শিবপূজায় তা অনুপস্থিত এবং এই পূজার একমাত্র দৃষ্টিগোচর উপাস্য হচ্ছে এক অমার্জিত প্রতীক চিহ্ন।[৭৬] কিন্তু তবুও নিম্ন উপত্যকায় জনগণের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী একমাত্র ধর্ম হচ্ছে শিব-ভজনা। কৃষ্ণ বা বিষ্ণু উচ্চবর্ণ জাতদের দেবতা, এবং তাঁর পূজা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাচরণ নয়, বরং দৃষ্টিনন্দন উৎসব হিসাবে বিবেচিত। প্রয়োজনের মুহূর্তে বাঙালি জনসাধারণ সর্বদা শিবকেই শরণ করে—যে দেবতার কথা প্রাচীন আর্য ঋষিদের অজ্ঞাতপ্রায় ছিল।

মনে হয়, হিন্দুধর্মের উপর অনার্য কুসংস্কারের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার তাগিদে আমি সত্য-অতিরঞ্জনে প্ররোচিত হইনি। নিম্নবঙ্গের বর্তমান ধর্মের সাথে শাস্ত্র বর্ণিত সনাতনী আর্য ধর্মবিশ্বাসে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হওয়ায় প্রথম এই বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। পণ্ডিতদের সাথে আলোচনায় মনে হয় যে, তাদের নিজেদের মতবাদের সাথে এমনকি সবচেয়ে গোঁড়া মতবাদের সাথে হিন্দু ধর্মমত সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাসের যে বিরাট পার্থক্য, তা শুধু মাত্রাগত নয় বরং গুণগত—এইটি শুধু শিক্ষাগত পার্থক্য নয় বরং জাতিগত পার্থক্য। হিন্দুদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য, উভয় প্রকার ধর্মের ব্যাখ্যাও এই পার্থক্যে নিহিত; আর্যরা শুদ্ধ বংশজাত আপন বংশধরদের যে ধর্মবিশ্বাস হস্তান্তরিত করে, প্রথমটি তারই দ্যোতক; এবং পরবর্তীটি হচ্ছে কৃষ্ণকায়, নরবলিতে বিশ্বাসী, মাংসাশী জংলি উপজাতিদের কুসংস্কারের এক খিচুড়ি। সংস্কৃত লেখকদের মতে, দুই জাতির মেলামেশার আশু ফল হিসাবে আর্য ধর্মবিশ্বাসে যে ব্যাপক বিকৃতি ঘটে এবং তার ফলে যে মিশ্র বর্ণ বা বর্ণসংকর বিকশিত হয়,[৭৭] সেটাই এই অভিমতের পক্ষে সুদৃঢ় প্রমাণ, এবং পোর্তুগিজ, ডাচ্, ফরাসি, ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমান পিতা-মাতা হতে বাছবিচার হীন ভাবে জাত ইতর ইউরেশিয়ানদের ধর্ম প্রাচীন ভারতে বর্ণ-সংকরদের মতো ততখানি পৌত্তলিক যদি বা না হয়, তবুও সমান ঘৃণ্য। কিন্তু সাধারণ প্রচলিত মত হতে আমার মতের এত বিরাট পার্থক্য পরিশেষে এসেছে হিন্দু ও আদিবাসীদের সীমান্তে তিন বৎসর বসবাস করার অভিজ্ঞতা থেকে। নিজ নিজ প্রথা, বিশ্বাস ও কুসংস্কার নিয়ে পাহাড়ের ও সমতলের জনসাধারণ একে অন্যের সংস্পর্শে এসেছে। পাহাড়ের চূড়ায় বাস করে যে কৃষ্ণকায় শক্ত সমর্থ উপজাতিরা আর বাদামি বর্ণ,

প্রশান্ত দৃষ্টি, বুদ্ধিদীপ্ত ভ্রূভঙ্গি ও দীর্ঘ কিন্তু অপ্রশস্ত মস্তক সহ বীরভূমের রাজধানী নিবাসী ব্রাহ্মণের মাঝে রয়েছে পাহাড়ের ঢালের আদিবাসী ও উপত্যকার নিম্ন বর্ণসহ শতেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ।[৭৮] তাদের ধর্মের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এমন বহু কুসংস্কার সহজেই দেখানো যায়, যেগুলি কিছু অঞ্চলে সম্পূর্ণত আদিম হিসাবে পরিগণিত ও ব্রাহ্মণদের কাছে চরম ঘৃণ্য, কিন্তু অন্য অঞ্চলে আবার এইগুলিই উভয় ধর্মের কাছেই প্রায় গ্রহণীয় অবস্থানে রয়েছে। গ্রাম্য-দেবতার উপাসনায় এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেখানে জনসাধারণ সম্পূর্ণ আদিবাসী সেখানে এই নীতিগুলি সম্পূর্ণ আদিবাসী সুলভ হিসাবে গণ্য এবং সৎ ব্রাহ্মণ এর পৌরোহিত্য গ্রহণ করে কলংকিত হবে না। কিন্তু যেখানে মিশ্রিত জনসাধারণের বাস, এবং আধা-আর্য জন সমুদায় গ্রাম্য-দেবতার বা বনদেবতার পূজা করে, সেখানে এই পূজাকে আধা-হিন্দু মনে করা হয় এবং প্রয়োজনের সময় কোনো-না কোনো পুরোহিত ঠিক জুটে যায়। আরো বেশি হিন্দু জেলাগুলিতে একদল ব্রাহ্মণকে জনপ্রিয় গ্রাম্যদেবতার সাথে যুক্ত দেখা যায়, এবং কোনো কোনো অঞ্চলে এই প্রকার দেবতা সমগ্র হিন্দু জনসাধারণের উপাস্য। বীরভূমের জঙ্গলে ভূতপূজা ও বিহারের মালিক বায়া বা অনুরূপ দেবত্বে উন্নীত ব্যক্তিত্বের পূজা হতে শিবের আরাধনায় উত্তরণ একটি পদক্ষেপ মাত্র; এবং সীমান্ত জনগণের পর্যালোচনার অপরিহার্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, বর্তমান বাঙালি সমাজে সর্বজন পূজিত, প্রত্যেক নগরে যার উপাসক পুরোহিতবৃন্দ বর্তমান, প্রতিটি পথপার্শ্বে যাঁর শঙ্কুবৎ মন্দির-চূড়া এবং পবিত্র নদী গঙ্গায় কয়েক মাইল অন্তর যাঁর নামে ঘাট, সেই দেবাদিদেব শিব হচ্ছেন আসলে দুই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কারী কুসংস্কার গুলির অব্যাহত ধারার শেষ এবং সর্বোচ্চ যোগসূত্র।

বাংলা ভাষার উপর আদিবাসী উপজাতিদের প্রভাব যদিও লক্ষ্যণীয় ছিল, এবং যদিও এখানে ধর্মের উপরে এই প্রভাব আরো লক্ষণীয় ও ক্ষতিকারক ছিল, তবু এইগুলি জনগণের সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক ভাগ্যের উপর অনেক বেশি স্থায়ী ও শুভ প্রভাব বিস্তার করেছে। মিশ্র বংশজাত বিভিন্ন প্রকারের জনসাধারণের উপস্থিতির কারণেই মূলত বাঙালিরা স্বীকার করে যে, তারা কখনো একটিমাত্র জাতি ছিল না; কারণ একটি প্রভুদের ও আপরটি দাসদের —এরূপ দুইটি জাতি পারস্পরিক মিলনে একটিমাত্র জাতির উদ্ভব সহজে সম্ভব নয়। বিশেষ অধিকারদান এই প্রকার মিলনের পূর্বশর্ত এবং সামাজিক ঐক্য সম্ভব না হলে রাজনৈতিক ঐক্য অর্জিত হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত প্রবক্তারা আদিবাসীদের প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাদের থেকে ঘৃণাভরে দূরে থেকেছে। মতদানের বা সামাজিক সম্মানের অধিকার দূরে থাক, হীন জাতিদের ব্যবসার অধিকারের

ক্ষেত্রেও কঠোরতম বিধিনিষেধ ও অত্যন্ত প্রতিকূল শর্তাদি আরোপ করা হতো। তাদের শুধু হীনতম ব্যবসাদির অনুমতি দেওয়া হতো; শিল্পের অধিকতর লাভদায়ক ও সম্মানজনক শাখায় দ্বিজ বর্ণের পুরুষানুক্রমিক অধিকার তো ছিলই, আবার তারা প্রয়োজনে বা সুবিধার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নিম্ন বর্ণের ঈপ্সিত বৃত্তিও যে কোনো সময়ে গ্রহণ করতে পারত। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন আর্যদের জন্য ছিল একপ্রকার, অনার্যদের-জন্য অন্যপ্রকার;[৭৯] এবং বৈরীভাবাপন্ন জাতিগুলির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে যে মানবিক প্রভাব থাকে, তাও অজ্ঞাত ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিত বর্ণের মধ্যে সহবাস, ধর্মনাশ ও নিষিদ্ধ যৌন সংসর্গের ন্যায় সমদণ্ডনীয় ছিল; এবং আজও সর্বোচ্চ আলোকপ্রাপ্ত হিন্দুগণ এই প্রকারের মিলনকে চরম ঘৃণার চক্ষে দেখে, যা রোমান সম্রাটের সাথে জার্মান রাজকুমারীর বিবাহে রোমানদের ঘৃণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—সম্রাট গ্যালিনাসের জার্মান পত্নী আন্তর্জাতিক সমতায় পত্নীর স্বীকৃতি পেলেও ইতিহাসে সম্রাটের রক্ষিতা হিসাবে চিহ্নিত।

এই ঘৃণার জন্য নিম্নবঙ্গের আর্যদের চরম মূল্য দিতে হয়। তিন হাজার বৎসর ধরে অন্যদের দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেওয়া একটি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। কায়িক শ্রমের প্রতি সহজাত বিরাগ ও ঘৃণার জন্য হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণী ধনবান ও শক্তিশালী হতে অক্ষম হয়, এবং যুগ যুগ ধরে যারা দেশের কর্মভার বহন করেছে এবং বর্তমানে নিরপেক্ষ সরকারের ছত্রছায়ায় এই সর্বপ্রথম যাদের নিজেদের শ্রমের ফল নিশ্চিত হয়েছে, সেই ঘৃণিত মিশ্র জনসমুদায় বর্তমানে লোভনীয় চাকুরি হতেও বর্ণ হিন্দুদের উৎখাত করছে। অবিস্মরণীয় কাল হতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, এমনকি সেখানেও অনার্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হচ্ছে। নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগে যে তিনশত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়,[৮০] বীরভূমের সরকারি স্কুল দিয়ে তার সূত্রপাত—অত্যন্ত নিম্নবর্ণজাত এক ব্যক্তি সেখানে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক, এবং সমগ্র দেশব্যাপী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তনয়ের শিক্ষার ভার যাদের উপর ন্যস্ত, তাদের পদবি (দাস) ঘোষণা করেছে যে, তারা দাসত্বে আবদ্ধ অনার্য উপজাতি (দাস্যু) বংশধর। কায়িক পরিশ্রমকে দাসত্বের চিহ্ন হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হিন্দুরা কখনো প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রম করেনি। তাই পুঁজি, অর্থাৎ ভোগের অতিরিক্ত উৎপাদন কখনো ছিল না; এবং পুঁজির অনুপস্থিতিতে বস্তুগত সভ্যতার কোনো উচ্চ বিকাশ অসম্ভব। অগ্রগতির অপর এক উপাদান সহযোগিতাও অজ্ঞাত ছিল। কর্মবিভাজন, আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি মানুষের জন্য স্বতন্ত্র কর্ম, চরমভাবে করা হতো; কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতার পদ্ধতি আকারে অর্থনৈতিক তাৎপর্যবাহী কর্মবিভাজন মানুষে মানুষে ভেদাভেদের জন্য

অসম্ভব ছিল। এই বিষয়ে বহু লেখকই বাহ্যিক আপাতরূপ ও তার ভুল নামকরণ দ্বারা বিপথচালিত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পরিভাষা হিসাবে কর্মবিভাজনের অর্থ অন্তিম ফলাফলগুলির চরম সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া বিভাজন। ভারতীয় শিল্পকলা বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মবিভাজনের অর্থ প্রক্রিয়াগুলির সমন্বয় সাধনের (একটি নির্দিষ্ট কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে একজন মাত্র ব্যাক্তি) ফল হিসাবে অর্জিত ফলাফলগুলির বিভাগ (একজন ব্যক্তি মাত্র একটি কাজই করতে পারে) নিকৃষ্টতর দেশবাসীদের হতমান করার জন্য ভারতীয় আর্যদের নিশ্চলতার ও জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে অক্ষমতার মূল্য দিতে হয় এবং এর দ্বারাই এদের সাথে অপরাপর ধারার সবচেয়ে লক্ষণীয় পার্থক্য সূচিত হয়েছে। অন্ধকারে নিমজ্জিত জনতাকে নিজেদের আলোর ভাগীদার করতে তারা অস্বীকার করে, ফলে যুগ যুগ ধরে তারা নিজেরাও নতুন আলো হতে বঞ্চিত হয়।

কিন্তু এইটাই তাদের একমাত্র শাস্তি ছিল না। বুদ্ধিমত্তার অহমিকায় তারা, শক্তিশালী কিন্তু অল্পবুদ্ধি এক সম্প্রদায়কে জীবিতাবস্থায় চিরকালীন দাসত্বে এমনকি মরণেও নরকে নিক্ষেপ করে। এইটাই বাঙালি জনগণের সংযমের উৎস, প্রত্যেক বর্ণের সবটুকু মমতা স্ববর্ণের জন্য রক্ষিত, নিজেদের থেকে উচ্চশ্রেণীর প্রতি ছিল বিজয়ী বা অত্যাচারীদের প্রতি স্বাভাবিক ভয়, আর নিম্ন শ্রেণীগুলির প্রতি ছিল অবজ্ঞা জনিত অনাস্থা। অন্যদিকে, ভারতীয় আর্যরা বারংবার তাদের থেকে বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন, কিন্তু অসি-দক্ষতায় অধিকতর দক্ষ দ্বিগ্বিজয়ী হানাদারদের হাতে পরাজিত হয়েছে—জীবনধারণের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল জাতির পক্ষে এই পরাজয়ই স্বাভাবিক। আফগান, তাতার ও মোগলদের চোখে ভারতীয় আর্যরা ছিল দীর্ঘ আলস্যে পৌরুষহীন, অনৈক্যে জীর্ণ, কোনো প্রকার জাতীয়তা বোধহীন। ফলে, নিয়তির নির্দেশে হিন্দুয়ানির উন্নাসিকতায় বর্বর হানাদারদের পদতলে সাত শতাব্দী ধরে পিষ্ট হয়, নরকের ঘানিতে যেন চূর্ণ হয়ে একাকার হতে থাকে সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়, এবং ভবিষ্য পুরাণের[৮১] ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে, সেই সময়ে যেন ধীরে ধীরে আসন্ন হয়ে ওঠে যখন, সকল ভারতবাসী হবে একজাত, এক জাতি। সেই সময় যে আসন্ন, আজকের বাঙালিদের দেখে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাদের রয়েছে এক মহান জাতির সম্ভাবনা। তাদের বর্তমান প্রয়োজন হচ্ছে সামাজিক সমন্বয় সাধন, অবশ্যই সংস্কৃত ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভারতীয় জাতিগুলির ক্রমান্বয়ে কলুষিত হবার ফলে নয়, বরং খ্রীস্টানরা ভক্তিভরে যা আশা করে সেই পথে—তাদের সর্বজনীন পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে।[৮২]

যে ভিত্তিতে আর্য ও অনার্য জাতিগুলি সম্মিলিত হয়ে নিম্নভূমির মিশ্র হিন্দু জনসমুদায় গঠিত, সেইটি আমি এখানে পর্যালোচনা করলাম। এখন যে

আদিবাসী উপজাতিরা 'পাহাড় ও পশ্চিমি পরিবেশের মধ্যে তাদের আদিম বংশধারা অবিকৃতভাবে বজায় রেখেছে, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. এম. মাইকেলের 'Bible de l 'Humanite' (Paris i Chamerot, 1864)-র সমালোচনা প্রসঙ্গে *Saturday Review* পত্রিকায় বলা হয়, "এম. মাইকেলের সম্মুখে বৈদিক ভারত বিশুদ্ধতা, মর্যাদা ও মাধুর্যের এক ঘনিষ্ঠ চিত্র হাজির করেছে।" সংস্কৃত ইতিহাস সম্বন্ধে খুব কম জানা গেলেও, আজ পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তার ভিত্তিতে, লক্ষ লক্ষ আর্য ঋষিদের তিন-চার হাজার বৎসর ধরে রামায়ণের শ্লোক আবৃত্তি করার যে অলীক চিত্র এম. মাইকেল হাজির করেছেন, তাকে সহজেই খণ্ডন করা যায়।

২. ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, বেদ রচনায় স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার দাবি শ্লোক রচয়িতাদের নয়, বরং তা বহুলাংশে টীকাকারদের। নিঃসন্দেহে টীকাকাররা এই দাবিকে শক্তিশালী করেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম সর্বদাই দাবি করেছে যে, এই পবিত্র পুঁথিগুলি স্বর্গীয় প্রেরণার ফলশ্রুতি। নিম্নলিখিত মতো বেদের শ্লোকগুলি অসংশয়ী ভক্ত পণ্ডিতদের মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেনি। "পুরাকালে ঋষিরা, যাঁরা স্বর্গীয় সত্য সম্বন্ধে দেবতাদের সাথে আলোচনা করতেন।" —ঋকবেদ, ১ম, ১৭৯।·"পরম জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, আমাদের শিক্ষাদাতা, তিনিই স্বর্গীয় রহস্য ঘোষণা করেছেন।" —ঋকবেদ, ৭ম, ৮৭। "দেবতারা সর্বপ্রথম স্তোত্রগুলি, তারপর অগ্নি ও তারপর নৈবেদ্য সৃজন করেন।" —ঋকবেদ, ৮ম, ৮৮। ম্যুরের *Sanskrit Text* গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, লণ্ডন ১৮৬১) এই প্রশ্ন সংক্রান্ত ব্যাপক সমালোচনা আছে।

৩. পরিষ্কার বোঝা যায় যে 'হপ্ত হেন্দু' বৈদিক স্তোত্রের 'সপ্ত সিন্ধু'র সমার্থক। বর্তমানে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন ধর্ম দুটির মাঝে একদা ঐক্য নির্দেশক বহু সাদৃশ্যের মাঝে এইটি অন্যতম। হগ, নির্দেশ করেছেন যে, সম্পূর্ণ সংস্কৃত মন্ত্র জেন্দাভেস্তায় 'মানথ্রু' নামে রয়েছে, এবং জরথুস্ত্রর নাম মানথ্রান, বা অভেস্তা সংক্রান্ত 'মানথ্রা' দাতা। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্, ২ খণ্ড, ট্রুবনার, ১৮৬৩)। স্পিগেল তাঁর *Introductory Discourse to the*

Avestas গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, 'যিমা' ও সংস্কৃত 'যম' অভিন্ন। cf. *Muir's Sanskrit Texts*, vol. 2, p. 293, 294 এবং তাঁর প্রশংসনীয় পুস্তিকা, *Yama*, ৮ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৬৫।

৪. *Sanskrit Texts*, vol. 2, 1860, p. 338

৫. উমার চমৎকার কিংবদন্তি নিয়েই কুমারসম্ভবের ভূমিকা রচিত, এবং বর্তমানে শুধু এইটিই অবশিষ্ট আছে।

৬. কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', প্রথম সর্গ।

৭. মহাদেব। "উত্তর কুরু, সুদূরতম উত্তরের দিব্যধাম, বোধহয় কল্পনায় সঠিকতম ভাবে প্রশান্ত সুখী জীবনের আদর্শ স্থান হিসাবে বিবেচিত।" —ল্যাসেন, *Indian Antiquary*, vol. 1, p. 511

৮. মানস সরোবর ও রাবণ-হ্রদ।

৯. সরস্বতী।

১০. সরস্বতী ও দৃষদ্বতী।

১১. দেবনির্মিতম্ দেশম্ ব্রহ্মাবর্তম্। মানব ধর্মশাস্ত্র, ২য় গ্রন্থ, শ্লোক ১৭, ককস ও বেইলিস্, ১৮২৫। *Muir's Sanskrit Texts*, vol. 2, p. 418

১২. ব্রহ্মর্ষিদেশ।

১৩. মানব-ধর্মশাস্ত্র, ২য়, ২০

১৪. মধ্যদেশ, ঐ, ২য়, ২১

১৫. গীবন।

১৬. মনু, ২য়, ২২

১৭. হগ, এমনকি সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞের কথা বলেছেন ও উদাহরণ হিসাবে মহাভারতের উল্লেখ করেছেন। —ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ ও তৎসহ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৮. আমার উপরিউক্ত মন্তব্য মগধের (বিহার) দক্ষিণ-পূর্বের প্রদেশ মূল বাংলা সম্বন্ধে আমি সীমিত রাখছি, কারণ মধ্যদেশের সন্নিহিত হবার কারণে মগধে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী ছিল। খ্রীস্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বুদ্ধদেবের বিখ্যাত দাঁত জগন্নাথধামে রক্ষিত ছিল—জগন্নাথধাম বর্তমানে যেমন হিন্দুদের তৎকালীন যুগে তেমনই বৌদ্ধদের নিকটও 'জেরুজালেম' বিশেষ ছিল। অংশত পাণ্ডুলিপি হতে এবং প্রধানত শিলালিপি হ'তে, প্রিন্সেপ, ল্যাসেন ও বার্নউফ্ প্রমাণ করেছেন যে, খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ সন হতে ৪০০ খ্রীস্টাব্দ অবধি ভারতবর্ষের বহু স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই ধর্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্য চৈনিক অভিযাত্রীদ্বয় ফা-হিয়েন ও হিউয়ান-সাং হতে পাওয়া যায়। বাংলার যে রাজবংশ গৌড় নগরে রাজধানী স্থাপন করে ৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ

হতে ১০৪০ খ্রীস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন, তাঁরা অন্তত ৯০০ খ্রীস্টাব্দ অবধি বৌদ্ধ ছিলেন ; এবং ইংরেজ রাজবংশের আগমন পর্যন্ত বীরভূম ও উড়িষ্যার মতো বহু অখ্যাত অঞ্চলে এই ধর্মমত থেকে যায়। বৌদ্ধধর্ম হতেই বর্তমান বীরভূম জেলার প্রধান মন্দিরের উৎপত্তি। —রাজমহল, পৃ. ১৯ ইত্যাদি। *Notes and Queries suggestd by a visit to Orissa*, পুস্তিকা, পৃ. ২। The History, etc of Eastern India, বুকানন নথিপত্র, খণ্ড ১ ও ২। বীরভূমের জরিপ রিপোর্ট, ক্যাপ্টেন শেরউইল লিখিত, কলিকাতা, ১৮৫৫, পৃ ১৪,। 'Le Bouddha et sa Religion' – Saint-Hilaire, প্যারিস, ১৮৬২। Sir E Tennent, *Ceylon*, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ।

১৯. পুরুষ-সূক্ত (ঋকবেদ, শ্লোক ৯০)। এই শ্লোকের রূপক চরিত্র *Sanskrit Texts*, প্রথম ভাগে বলা আছে। অবশ্য, ড ম্যুর আমায় ২য় সংস্করণের প্রুফ অনুগ্রহ করে দেখিয়েছেন—সেখানে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কিছু লোকের যেমন ধারণা রয়েছে, ঋকবেদ বর্ণভেদ সম্বন্ধে তত অচেতন ছিল না।

২০. এই বক্তব্য আমি একমাত্র কাশ্মীরের আর্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সীমিত রাখছি : সারা ভারতবর্ষব্যাপী অন্যান্য সকল অঞ্চলের মতো এখানেও আদিম অনার্য জাতির এক অবশেষ এবং এদের থেকে উদ্ভূত এক বর্ণসংকর সম্প্রদায় বিদ্যমান।

২১. কিভাবে নিম্নবর্ণের রাজাদের ব্রাহ্মণ বর্ণে গ্রহণ করা হয়, সে সম্বন্ধে একাধিক সংস্কৃত কিংবদন্তি বিদ্যমান। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনে ব্রাহ্মণরা এই কাহিনীগুলির উল্লেখ করে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, মধ্যদেশের- বর্ণপ্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ব্রাহ্মণ-সভ্যতার বিস্তার এইগুলিতে সামান্য ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। .

২২. ক্ষত্রিয়দের সাথে পরশুরামের বিরোধ এবং তাঁর পূর্ণ বিজয়লাভ। গ্রীসদেশে দীর্ঘকালীন যে সংগ্রামের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংস স্তূপের উপর সাধারণতন্ত্র গড়ে ওঠে, সেই সংগ্রামের সাথে এই বর্ণভিত্তিক যুদ্ধকে ম্যুলার তুলনা করেছেন।

২৩. যবন ও পহ্লব। বিষ্ণুপুরাণের অভিমতও অভিন্ন।

২৪. ক্ষত্রিয়রা বিহারে বর্তমান, কিন্তু তারা সর্বদা দাবি করে যে, তুলনায় সাম্প্রতিক কালে ছোট ছোট দলে তারা উত্তর হতে এসেছে। উদাহরণ হিসাবে, The History, Antiquities, etc. of Eastern India, বুকানন পাণ্ডুলিপি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১ দ্রষ্টব্য। বিহারের ক্ষত্রিয়রা নিম্নবঙ্গের বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলির যে কোনোটি অপেক্ষা প্রাচীনতার দাবি করে।

২৫. "আর্যজাতি দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়ে মধ্যভারতের উর্বর সমতলভূমি ও সমৃদ্ধ বাগিচাগুলি নিরুপদ্রবে অধিকার করার পরই শুধু তারা পারলৌকিক জগৎ ছেড়ে মরজগতের সুন্দরতর প্রকৃতিতে তাদের সকল শক্তি ও চিন্তা নিক্ষেপ করে।"—Max Muller, ***History of Sanskrit literature***, লণ্ডন, ১৮৫৯, পৃ. ২৫

২৬. ১৭৮৯ সনের ১৫ জানুয়ারির ক্যালকাটা গেজেটে 'The Humble Petition of Mr.—' রচনা দ্রষ্টব্য। কলিকাতার এক পুরাতন সংবাদ-পত্রের এক বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি—সেখানে জনৈক সামরিক ব্যক্তি 'এসকোয়ার' পদবি বর্জনের কথা ঘোষণা করেছে।

২৭. এই বিবরণ আমার পণ্ডিতদের বক্তব্য ও পেশাদার হিন্দু কুলাচার্যদের বিবরণের সংক্ষিপ্তরূপ। কোলব্রুকের *Examinations of the Indian Classes*, vol. 5 এবং *Essays*, vol. 2, 1837, pp. 187-90, দ্রষ্টব্য।

২৮. তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হতে ল্যাসেন কোনোক্রমে বিরত থেকেছেন।

২৯. প্যালেস্টাইনের দানবাকৃতি আদিবাসীরা, 'তারা এত সপূর্ণরূপে সুদূর অতীতের বস্তু যে তাদের নাম রেফেইম' পরবর্তীকালে বিশাল 'অভিভাবক' বা অধোলোকের কায়াহীন প্রেত বোঝাতে ব্যবহৃত হতো'। Arthur Penrhyn Stanley, D. D., ***Lectures on the History of the Jewish Church***, 1863, p. 208; Shepherd Tribes of Egypt (Milman's History of the Jews, vol. I, এবং Osburne's Monumental History of Egypt, vol. I, 1854, p. 350, গ্রন্থগুলিও দ্রষ্টব্য।

৩০. রাক্ষসগণ, যাদের শক্তি হতে প্রাচীন যজ্ঞে সংস্কৃত দেবতাদের আশ্রয় ভিক্ষা করা হতো, এবং আজও বাংলা থিয়েটারে রাবণ (অর্থাৎ রাক্ষসেন্দ্র) ও তার অনুচররা এদের প্রতীক। সিংহলের আদিবাসীরাও একই নামে অভিহিত—চৈনিক অভিযাত্রীদের ও সিংহলি লেখকদের রচনা তার সাক্ষ্য। স্যার এমার্সন টেনেন্ট 'যক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন; স্পষ্টত এটি 'রক্ষ' শব্দের একরূপ এবং সংস্কৃত 'রাক্ষসি' শব্দের চলিত রূপ। —মহাবংশ, ৭ম অধ্যায়; রাজাবলী, পৃ. ১৭২; স্যার এমার্সন টেনেন্টের ***Ceylon*** গ্রন্থের ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২-এ উদ্ধৃত; এবং ৩য় সং পৃ. ৩২৮, ৩৭০ দ্রষ্টব্য।

৩১. মহাকাব্যে তারা বানর জাতি হিসাবে আবির্ভূত; হিমালয় পার্বত্যাঞ্চলে ও সিংহলে সর্প (নাগ) রূপে বর্তমানেও হিন্দু নাটকে এইরূপে তাদের

দেখা যায়। পাতালবাসী দৈত্য হিসাবে তারা মঞ্চে আসে--তাদের মুখ মানুষের মতো, সাপের মতো লেজ এবং কখনো কখনো গোখরো সাপের মতো ফণা থাকে।

৩২. মৃধ্র্ ভাক।

৩৩. ম্লেচ্ছ।

৩৪. বস্তু, আত্মা, আয়তন বা আকাশ, সহজ প্রবৃত্তি, যুক্তি, চেতনা, পরিমাণ, মাত্রা বা এই জাতীয় কিছু প্রকাশ করার জন্য কোচ্, বোড়ো বা ধীমল ভাষায় একটি মাত্রও আদি শব্দ নেই। B. H. Hodgson, Esq, *Essays on the Kocch, Bodo, and Dhimal Tribes*, p. 11

৩৫. বোড়ো ও ধীমল ভাষায় কার্য-কারণ আদৌ প্রকাশ করা যায় না এবং কোচ ভাষায় সংস্কৃত হতে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।—ঐ, পৃ. ১৩

৩৬. এই ভাষাগুলিতে পৃথিবী, স্বর্গ, নরক, ইহলোক বা পরলোক ইত্যাদির জন্যও কোনো শব্দ নেই। এই ধারণাগুলি প্রকাশের জন্য ধীমলভাষী উপজাতিরা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে। দৃশ্যমান আকাশ বোঝাবার জন্য বোড়োদের একটি শব্দ রয়েছে, কিন্তু তারপর আর তাদের কল্পনা প্রসারিত হয় না।

৩৭. *Muir's Original Sanskrit Texts*, vol. 1, p. 43; vol. 2, p. 284, 323 ইত্যাদি।

৩৮. ঋকবেদ, ৩য়; ৩৪, ৯

৩৯. ঐ, ১ম; ১০০, ১৮

৪০. 'কৃষ্ণস ত্বচ্ম', ঋকবেদ, ৯ম; ৪১, ১ ইত্যাদি; ম্যুর বলেন, এই আখ্যাটি সামবেদেও, ১ম, ৪৯১ এবং ২য়, ২৪২-এ দেখা যায়।

৪১. ঋকবেদ, ৯ম; ৭৩, ৫

৪২. ঐ, ১ম; ১৩০, ৮

৪৩. ঋকবেদ, ২য়; ২০, ৭, এবং ২য়; ১২,৪,'দাসম্ বর্ণম আধারম্' শ্লোকাংশটি এখনো বহু পণ্ডিতদের মুখে প্রায় শোনা যায়, যদিও এঁরা বেদ কখনো চোখে দেখেন নি।

৪৪. অমদ্। এই প্রকার বিতৃষ্ণা প্রকাশকারী অন্যান্য শব্দাবলীর জন্য, দ্র. *Muir's Original Sanskrit Texts*, vol. 2, p. 435

৪৫. আদি আমলের ভারতীয় চিন্তানায়করা আধুনিক নীতিশাস্ত্রের সমস্যাগুলিকে কত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন, সেকথা যাঁরা বুঝতে ইচ্ছুক তাঁরা,—আমাদের প্রিয় বস্তুগুলিকে আমরা সেই বস্তুগুলির জন্য নয়, বরং পরমাত্মার বাসস্থান হিসেবে ভালোবাসি—হিন্দুদের এই চমৎকার

বিশ্বাসের সাথে, জোনাথান এডওয়ার্ডের *Theory of Degrees of Being* গ্রন্থটির তুলনা করে দেখতে পারেন।

৪৬, ম্যুলারের *History of Ancient Sanskrit Literature,* দ্রষ্টব্য।

৪৭. মিঃ লং তাঁর *Notes on Visits to Pandits* পুস্তিকার পৃ. ১-এ এই উত্তরের উল্লেখ করেছেন। আমি একাধিকবার এই একই উত্তর পেয়েছি। বহুদেবতার দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য, 'Whately's Dissertation', *Encyclopaedia Britannica*, 8th ed., vol. 1, p. 465, দ্রষ্টব্য।

৪৮. পরবর্তী অধ্যায়ে বোঝা যাবে যে, এই আখ্যাগুলি সকল অনার্য জাতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

৪৯. ঋকবেদ, ১০ম ; ১৩৫, ১। অথর্ববেদ ; ১৮শ, ৪, ৩

৫০. ঋকবেদ, ৯ম ; ১১৩, ৭, ৮। ঐ, ১০ম ; ১৪, ৮, ৯ ও ১০

৫১. ঋকবেদ, ১০ম ; ১৪, ১১, ও ১২। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কুকুরগুলির রং কালো ও গায়ে ছোপ ছোপ দাগ। অথর্ব বেদ, ৮ম ; ১, ৯

৫২. অথর্ববেদ, ৬ষ্ঠ ; ২৮, ৩। কিন্তু ম্যাক্সমুলারের ভাষণ, ২য় কিস্তি, পৃ. ৫১৫

৫৩. ঋকবেদ, ১০ম ; ১৪, ১। Muir's 'Yama,' *Journal of the Royal Asiatic Society*, pt. 9, 1865

৫৪. শেষকৃত্য কালীন অগ্নিস্তোত্র, দেহ দাহকালীন উচ্চারিত হয়।

৫৫. পিতৃপুরুষ।

৫৬, ঋকবেদ, ১০ম ; ১৪

৫৭. ঐ, ১০ম ; ১৫৪

৫৮. অথর্ববেদ, ৯ম ; ৫, ১

৫৯. ঐ, ১২শ ; ৩ , ১৭

৬০. ঐ, ৬ষ্ঠ ; ১২০, ৩

৬১. কোলব্রুকের *Essays*, vol. 1, 1837, p. 116 ইত্যাদি; অথর্ববেদ, ৯ম ; ৫, ২৭

৬২. তরল নৈবেদ্যের বিমূর্ত দেবরূপ সোমদেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা—ঋকবেদ, ৯ম ; ১১৩, ৭ ও ১১

৬৩. রোমান নাগরিক ক্লুয়েনটিয়াসের পক্ষে সিসারোর ভাষণ।

৬৪. Whately, *Lectures on the History of the Jewish Church*, p. 190 ; Balaam *Dissertation on the Rise, Progress and Corruptions of Christianity.*

৬৫. বোড়ো ভাষার জন্য, দ্র. B. H. Hodgson, *Essays on the Kocch, Bodo, and Dhimal Tribes*, Calcutta, 1847, p. 117

৬৬. *Ibid*, p. 180. দক্ষিণের আদিবাসীদের শেষকৃত্য প্রথা উচ্চমার্গের।

৬৭. কয়েকটি অনার্য জাতি (তথাকথিত বানর উপজাতি) আর্য দেশান্তরীদের বন্ধুভাবে এই দেশে বরণ করেছিল ; এই কারণেই আজও হিন্দুরা বানরদের সম্মান করে। পরে এই অনার্যরা আর্যদের দাসে পরিণত হয়। বানর জাতি সম্বন্ধে, Signor Gorresio তাঁর *Dissertations on and Notes to the Ramayana* গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। সিংহলের আর্যদের দ্বারা অনার্যদের নিম্নলিখিত বিন্যাস সুনির্দিষ্টভাবে করা আছে—ক. শত্রু, খ. দানব, গ. ইতর প্রাণী, ঘ. দাস—*Mahawanso*, ৩৭-তম অধ্যায়। রাজাবলী, পৃ. ২৩৭ ; রাজ-রত্নকারী, পৃ. ৬৯ Tennent's *Ceylon*, vol. I, 3rd ed , p. 370 etc. note.

৬৮. অনার্য শব্দাবলীর মূল্যবান এক তালিকা, *Sanskrit Text* গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

৬৯. *Asiatic Researches*, vol. 6, পুনর্মুদ্রণ। New Cratylus, 1839, p. 85

৭০. ১৮৬৬ সনের ১৯ মে তারিখের *The Englishman* পত্রিকা, কলিকাতা।

৭১. Sir Emerson Tennent's *Ceylon*, vol I, 3rd ed., p. 542

৭২ The History etc. of Eastern India—বুকানন পাণ্ডুলিপি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০

৭৩. ঐ, ১ম খণ্ড. পৃ. ১৯৪

৭৪. পত্রগ্রাম ও নগরী গ্রামের মধ্যে বাতাসপুরের কিছু দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে তিনটি গাছ রয়েছে : বাঁয়ে একটি বেলগাছ, যার গুঁড়িতে রক্তচিহ্ন, এখানে প্রেতের বাস ; মাঝে একটি কাচমূলা গাছ ও দক্ষিণে একটি স্যাওড়া গাছ। ভক্তরা গাছগুলির সামনে মাটি, চাঁউল ও পয়সা পূজা হিসেবে ছুঁড়ে দেয়, যে কোনো বলি এক কোপে মস্তকচ্যুত করে, বাকিটা আশীর্বাদসহ ভক্তদের ফেরৎ দেবার জন্য সদাপ্রস্তুত এক পুরোহিত পাশে দণ্ডায়মান থাকেন।

৭৫. মালিক বাগ্না নামে বেশ আধুনিক কালে আবির্ভূত এক গ্রাম্যদেবতার কথা বুকানন উল্লেখ করেছেন—বিহারসহ সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে এই দেবতা সর্বজন পূজিত।

৭৬. H. H. Wilson, *Essays and Lectures on the Religion of the Hindus*. Trubner, *Collected Works*, 1862, p, 189. পরবর্তী পরিচ্ছেদে শিবপূজার উৎপত্তি বিশদভাবে আলোচিত হবে।

৭৭. মিশ্র বর্ণজাতরা 'বর্ণসংকর' নামে পরিচিত। Halhed, *Gentoo Code*, 1781, preface, p. 103

৭৮. পাহাড় ও সমতল, উভয় স্থানেই বাউড়ি, বাগদি প্রভৃতিদের দেখা যায়। আদালতে এই বর্ণের লোকদের সর্বদা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তারা হিন্দু না সাঁওতাল (অনার্য)।

৭৯. মানব-ধর্মশাস্ত্র, ৯ম ; ১৮২৫, পৃ. ১৫৬, ১৫৭।

৮০. সরকারি নির্দেশ সম্বন্ধে বিবরণ, নিম্ন প্রদেশগুলি, ১৮৬৫-৬৬ ; পরিশিষ্ট, পৃ. ২৩৫

৮১. ভবিষ্যপুরাণ।

৮২. এই সমগ্র অধ্যায়ে আমি নিজের মতামত ব্যক্ত করেছি, ভিন্ন মতামতের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করিনি। ভিন্ন মতামত সম্বন্ধে শ্রদ্ধার অভাবের জন্য নয়, বরং ঐসব মতামত হতে যে আলোচনা নিশ্চিত আসবে, তা বর্তমান রচনার চরিত্র বিরোধী বলেই এই অনুল্লেখ। উদাহরণস্বরূপ, 'দাসায়ু' শব্দার্থ নিয়ে বেদজ্ঞদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে, কেউ অর্থ করেন 'দৈত্য,' অন্যরা এটি দ্বারা আদিবাসীদের উল্লেখ করা হচ্ছে বোঝেন। কোনো প্রকার মন্তব্য ব্যতিরেকে আমি শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছি; এবং এখন দেখছি যে ম্যাক্সমূলার তাঁর 'Chips'···গ্রন্থে এই মতামতকে সমর্থন করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, অই অধ্যায় মুদ্রিত হবার আগে তাঁর প্রশংসনীয় কাজ আমি পাইনি, সেকারণে আমি সেটি ব্যবহার বা উল্লেখ করতে পারিনি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী

'বিশাল ভারতীয় মহাদেশ জুড়ে প্রতিটি বিস্তৃত জঙ্গল মহাল বা পাহাড়ি ভূখণ্ডে যে লক্ষ-লক্ষ মানুষের বাস, তাদের অবস্থা টাসিটাস বর্ণিত জার্মানদের অপেক্ষা বস্তুগত ভাবে ভিন্ন নয়।"[1] ভারতীয় আদিবাসীদের বিষয়ে গবেষক এই কথাগুলি দিয়ে বাংলার কৃষ্ণকায় জাতিগুলি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড শুরু করেন। মানবজাতির এক অংশ সংখ্যায় তিন কোটি, শতাব্দী ব্যাপী ব্রিটিশ শাসনাধীন থেকেছে, এবং তাদের উদ্ভব, ভাষা ও জীবনযাত্রা প্রণালী এখনো সভ্য জগতের অজানা—এ বিষয়ে ভাবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বলপূর্বক সমতল ভূমি অধিকার করেছে যে শ্বেতকায় জাতি, তারাই আধুনিক পণ্ডিতদের আনুকূল্য পেয়েছে, আর কৃষ্ণবর্ণ আদিম এদেশের প্রকৃত উত্তরাধিকারীরা আজকের মতোই অযত্ন লালিত, ঘৃণিত, মান্ধাতা আমলে বনে-জঙ্গলে পর্বত-কন্দরে লুকিয়ে থেকেছে। মানব ইতিহাস ব্যাখ্যার জন্য আর্য ভাষার পর্যালোচনা সম্বন্ধে অর্ধ শতাব্দীর কাজ পূর্ববর্তী পঞ্চাশ প্রজন্মের পণ্ডিতদের কাজকে ম্লান করেছে। সংস্কৃতের আবিষ্কার হতে মানবচিন্তার নবযুগের সূচনা। সংস্কৃত ব্যাকরণ ভাষা-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি এবং আধুনিক দর্শনের উপর সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রের প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত। কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলির ইতিহাস প্রাচীনতর হওয়া সত্ত্বেও এবং কোনো অংশে কম শিক্ষাপ্রদ না হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণত উপেক্ষিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে কয়েকজন মাত্র অনুসন্ধিৎসু এই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা হয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, অথবা এই কাজে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বা আকর্ষণ যোগ্য অগ্রগতি অর্জনের আগেই; এবং সরকারও বাংলার আদিবাসীদের ভবিষ্যতহীন এক উপজাতি হিসাবে দেখেন—এমন এক উপজাতি

যাদের সম্বন্ধে একমাত্র প্রত্যাশা ছিল তারা যেন মৃত্যু অবধি নীরব শান্তি অটুট রাখে।

দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসীরা তুলনায় বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু তাদের অতীত অদ্যাপি অপরীক্ষিত। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মাতৃভাষাগুলিতে বিশুদ্ধ আদিবাসী শব্দাবলীর আধিক্য খুব বেশি—সমগ্র তেলেগু শব্দভাণ্ডারে তিন-চতুর্থাংশ আদিবাসী ভাষা উদ্ভূত; এই আধিক্য এত বেশি যে, যে জাতি হতে এইগুলি উদ্ভূত সেই জাতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল।[২] সেখানে অনার্য ভাষাবিজ্ঞানের সাথে কিয়ংমাত্রার পরিচিতি রাজনৈতিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত ভাষা আদিবাসীদের চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করেছিল; তাই আদিম উপজাতিদের বিষয়ে যে কোনো গবেষণায় কোনো প্রকার স্বার্থ প্রণোদিত উদ্দেশ্য ছিল না। সেই কারণেই মিঃ হজসন এবং যে কয়েকজন গবেষক দূর হতে তাঁকে অনুসরণ করেছেন, তাঁদের প্রাপ্ত ফলাফল-নিরপেক্ষ ভাবে, তাঁরা আরো বেশি সম্মানযোগ্য।

আমি বীরভূমের পাহাড়িয়াদের ইতিহাস, ভাষা, চালচলন ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি, পণ্ডিতবর্গ ও রাষ্ট্র নায়কদের উভয়কেই এই হতগৌরব জাতিদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করার উদ্দেশ্যে আমি তা নিম্নলিখিত অধ্যায়ে প্রকাশ করতে চাই। পণ্ডিতরা দেখবেন যে, আমাদের জাতির ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায়ে তাদের ভাষা ও ঐতিহ্য নতুন তাৎপর্যময় আলোকপাত করবে। ভারতীয় রাষ্ট্রনায়করা আবিষ্কার করবেন যে জগতসভায় এই অরণ্য সন্তানরা ঠিক ততখানি অবহেলিত নয়, তারাও একই স্বার্থচিন্তা তাড়িত, আবার অন্যান্য জাতির মতোই সৎপ্রভাবে সংবেদনশীল এবং তাদের সভ্য হবার ক্ষমতার উপর বাংলায় ইংরেজ প্রতিপত্তি বিস্তার বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সাধারণ ক্ষেত্রে, ভারতীয় জাতিগুলির আর্য ও অনার্য এই দুইভাগে বিভাজন পর্যাপ্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে, একমেবাদ্বিতীয়ম্ নামে সমগ্র আর্যদের অভিহিত করা গেলেও অনার্য নামে অন্তত বেশ কয়েকটি জাতির সমাহারকে বোঝায়—এদের একের সাথে অন্যের পার্থক্য জাপানিদের সাথে মিশরিয়দের বা ডেনমার্কের অধিবাসীদের পার্থক্যের সাথে তুলনীয়। অবয়ব ও শারীরিক গঠন বিচার করে শরীরতত্ত্ববিদ ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় অনার্য উপজাতিগুলির কয়েকটির মালয় জাতির সাথে প্রবল সাদৃশ্য রয়েছে, কয়েকটি আবার সমান অন্তরঙ্গভাবে চীনাদের অনুরূপ; অন্যেরা আবার উভয়ের সঙ্গেই কোনো প্রকার সম্পর্ক রহিত বা বহু দূর সম্পর্কিত। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞার কোনো নিশ্চিত বক্তব্য নেই; এবং বস্তুত, একগুচ্ছ ভাষা একের অন্যের সাথে আপাত বৈসাদৃশ্য তুলে ধরে সমগ্র ব্যাপারটিকে আরো রহস্যাবৃত করাই ভাষাগত গবেষণার একমাত্র অবদান দাঁড়িয়েছে। একটিমাত্র বিরল-বসতি অঞ্চলেই জনৈক গবেষক

২৮টি সুনির্দিষ্ট স্থানিক ভাষার সন্ধান পান—যেসব বিভিন্ন উপজাতি এইগুলি ব্যবহার করে, তাদের পরস্পরের কাছেও এইগুলি অবোধ্য ;[৩] এবং সমগ্র ভারত-ব্যাপী সকল অনার্য ভাষার মোট সংখ্যা দুই শতের কম নয়। প্লিনি বলেন যে, কোলচিয়ান বাজারে ১৩০টি ভাষা ব্যবহৃত হতো, অনুরূপভাবে, এই ভাষাগুলি পরস্পর হতে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হলেও আসলে অভিন্ন উৎসজাত, তা কোনোদিন প্রমাণ করা যাবে কিনা, সেকথা আজকের জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে কেউই বলতে পারে না, কিন্তু প্রতিটি বিচ্ছিন্ন ভাষার সযত্ন সমীক্ষার মাধ্যমে এই প্রকার সংযুক্তি সম্ভব।

চার বৎসর আগে যখন এই অধ্যায়টি শুরু করা হয়, তখন ভারতীয় অনার্য জাতিগুলির সঠিকতর পরিচিতি জ্ঞাপনের জন্য বীরভূমের পাহাড়িয়াদের ভাষা সহ ছয়টি অনার্য ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার যোগ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গবেষণাকালে, হিমালয়ের উপজাতিগুলির মধ্যে মিঃ হজসনের ৩০ বৎসরের পরিশ্রমের ফসল, বিরাট দুই বাক্স পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। অপ্রকাশিত এই রচনা-সংগ্রহ বর্তমান অধ্যায়ের সাথে যুক্ত করার কথা প্রাথমিক ভাবে ভাবা হয়েছিল ; কিন্তু আমি দেখলাম যে, মিঃ হজসনের আবিষ্কারকে যথাযথ মর্যাদা দেবার পক্ষে বর্তমান সমগ্র গ্রন্থটিও অপর্যাপ্ত। সুতরাং, মিঃ হজসনের গবেষণার ভিত্তিতে উত্তর-ভারতের আদিবাসীদের নিয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ সংকলন করা স্থিরীকৃত হয়েছে ; এবং প্রস্তাবিত এই সংকলনে ৮০টি অনার্য ভাষার সাথে যে শব্দ-ভাণ্ডার যোগ করা খুব সংগত হবে, এখানে সেইগুলির অহেতুক সন্নিবেশে বর্তমান গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

আদিবাসীদের যে অংশের সাথে চৈনিক বা মালয়ী কোনোটিরই সাদৃশ্য নেই, বীরভূমের পশ্চিমভাগের সাঁওতাল বা পাহাড়িয়া উপজাতিরা সেই আদিবাসীদের অংশ বিশেষ। সাঁওতালরা সুগঠিত পুরুষ, উচ্চতায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, ৮ স্টোন ওজন, মুখমণ্ডলে আর্যসুলভ কমনীয়তা অনুপস্থিত ; কিন্তু চৈনিক তির্যক চক্ষু বা মালয়ীদের ভারি চেহারা দ্বারা কলংকিত নয়। তার মস্তক গোলাকার, চওড়া বা সরু নয়, মুখমণ্ডলও গোলাকার, লম্বাটে ও চওড়া নয়, হালকা চোয়াল, নাক চ্যাপটা ; আর্যদের তুলনায় ওষ্ঠ পুরু, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো নয়, হিন্দুদের তুলনায় চোয়ালের হাড় উঁচু, কিন্তু মোঙ্গলীয়দের ধারে-কাছে যাবার মতো নয়, বরং ইংরেজদের তুলনায় স্কটল্যাণ্ড বাসীদের তুল্য। উচ্চতায় প্রায় সাধারণ হিন্দুদের সমান, বিশুদ্ধ আর্যবংশ জাত ব্রাহ্মণদের তুলনায় সামান্য হ্রস্ব, হিন্দুদের তুলনায় ভারি, শক্ত-সমর্থ এবং সুগঠিত, ততখানি উন্নত ললাট না হলেও, প্রশস্ততর এবং গোলাকার ললাটমণ্ডল ; এ মানুষ শ্রমের জন্য সৃষ্ট, চিন্তা-ভাবনার জন্য নয়, বর্তমানে শারীরিক আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধিকতর

উপযুক্ত, ভবিষ্যৎ গণনার জন্য বা অতীত বন্দনার জন্য নয়।

প্রায় সমুদ্র উপকূল হতে ভাগলপুরের পাহাড় অবধি নিম্নবঙ্গের সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত ব্যাপী সাঁওতালদের বাস। তাদের অঞ্চল ঈষৎ বক্রাকার, ৪০০ মাইল দীর্ঘ, শত মাইল বিস্তার—৪০ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত অঞ্চল। পশ্চিমের জঙ্গলে তারা একমাত্র অধিবাসী; উত্তরের দিকে এক বিশাল অঞ্চলে বিশ ভাগের তারাই ১৯ ভাগ; সমতলে এই অনুপাত অনেক কম, এবং বস্তুত এই জাতি ক্রমান্বয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে একীভূত। সংখ্যায় তারা অবশ্যই ১৫ লক্ষাধিক এবং সম্ভবত প্রায় ২০ লক্ষ—সকলেই অভিন্ন বংশজাত, এক ভাষা, একই প্রথা অনুসারী, একই দেবতার পূজারী এবং মূলগত সকল বিচারে আদিবাসী জাতিগুলির মধ্যে এরা এক সুনির্দিষ্ট জাতিগত গোষ্ঠী।

পূর্বপুরুষেরা কোথা হতে এসেছিলেন, সে সম্বন্ধে সাঁওতালদের বর্তমান বংশধরদের কোনো নির্দিষ্ট ধারণা নেই। এই জাতির ঐতিহ্যের আস্তরণ অগভীর ও দুর্বল। লিখিত দলিল আকারে তাদের কিছুই নেই। যে কোনো গ্রামে চলুন, আপাত দৃশ্যমান সকল কিছু লক্ষ্য করুন, কান পেতে শুনুন তরুণদের গান, স্বল্প যে কয়েকটি উপকথা মাত্র রয়েছে—সায়াহ্নে সন্নিহিত শালবীথি ছায়াতলে বৃদ্ধদের মুখে সেইগুলি শুনুন, কিন্তু পরবর্তী গভীর অনুসন্ধানেও প্রাথমিক ধারণা বাস্তবে বিশেষ পরিবর্তিত হবে না।

প্রাচীনতম যে তথ্য সম্বন্ধে এই জাতি সচেতন, সেইটি হলো বিশাল পর্বতমালার সান্নিধ্য। মানুষের উৎপত্তির আগে একান্ত নির্জনে মহাপর্বত নিজমনে কথা বলতেন। মানুষের জন্মলগ্নে তিনি মহাপর্বত স্রষ্টার সাথে কথা বলেন, তিনি মানুষকে পরনের কাপড় দেন এবং জীবনধারণের প্রাথমিক উপকরণ উৎপাদন শেখান। আদি যুগলের বিবাহ সম্পন্ন করে মহাপর্বতই এই জাতির উৎস ও আদিমূলের কাজ করেন। সাঁওতালদের সৃষ্টিরহস্য কথা নিম্নরূপ।

বর্তমান সময়ের পূর্বে ছিল পুরাকাল, তখন চতুর্দিকে জলরাশি-মধ্যে একমাত্র মহাপর্বত দণ্ডায়মান। তারপর, মহাপর্বত জলের বুকে আকাশে সঞ্চরণরত পাখিদের ছায়া দেখলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, এই পাখিদের আমরা কোথায় রাখি? চতুর্দিক ব্যাপ্ত এই জলরাশি-মধ্যে জলপদ্মের উপর এদের রাখা যাক এবং সেখানেই এরা বিশ্রাম করুক। তারপর বিরাটাকার চিংড়িদের সৃষ্টি করা হলো এবং এই চিংড়ি মাছরা জলপদ্ম সহ নিমজ্জিত পাহাড়গুলিকে জল হতে ওঠালো। তারপর পাহাড়গুলি হরেক রকম লতাপাতায় আবৃত হলো; এবং মহাপর্বত বললেন, লতাপাতারা পাহাড়গুলিকে মাটি দিয়ে ঢাকা দিক এবং তারা সেইগুলিকে ঢাকা দিল। এবং পাহাড়গুলিকে মাটি দিয়ে ঢাকা দেবার পর দেবাদিদেব মহাপর্বতকে ঘাস বোনার আদেশ দিলেন; এবং ঘাস বড় হওয়ার পর, আদি নর ও নারীর জন্ম—জলপদ্মের উপর দুইটি হাঁসের ডিম হতে এদের জন্ম! তারপর

দেবাদিদেব মহাপর্বতকে প্রশ্ন করলেন, এইগুলি কি ? এবং মহাপর্বত উত্তর দিলেন, এরা নর ও নারী ; যেহেতু তারা জন্মগ্রহণ করেছে এদের রাখা হোক। তারপর দেবাদিদেব মহাপর্বতকে এদের আর একবার দেখার আদেশ দিলেন এবং দেখ, সেই নর ও নারী বড় হয়েছে, কিন্তু তারা উলঙ্গ। সুতরাং দেবাদিদেব মহা-পর্বতকে তাদের পোশাক দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন, এবং মহাপর্বত তাদের পোশাক দিলেন—পুরুষের জন্য দশ হাত এবং নারীর জন্য বারো হাত পরিমাণ ; পুরুষের জন্য তা যথেষ্ট হলো, কিন্তু নারীর জন্য তা যথেষ্ট হলো না।

তারপর সেই পুরুষ ও নারী বলহীন থাকায়, মহাপর্বত তাদের মদ প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন। তিনি তাদের একমুঠো খমির দিলেন ও বললেন, জলপূর্ণ কলসিতে এইটি রাখো এবং চারদিন পর আবার এসো। সেইমতো তারা এইটি একটি কলসিতে রাখলো এবং চারদিন পর ফিরে এলো এবং দেখলো সেই জল সাঁওতালদের মদে পরিণত হয়েছে। তারপর মহাপর্বত পেয়ালা তৈরির জন্য তাদের গাছের পাতা দিলেন, কিন্তু পান করার আগে তাঁর উদ্দেশ্য নিবেদনের জন্য কিছুটা ফেলে দিতে আদেশ দিলেন।

তারপর মহাপর্বত বললেন, মাটি আছে, পুরুষ আছে, এবং নারী আছে, কিন্তু মাটি হতে পুরুষ ও নারীর মৃত্যু হলে কি হবে! মদের সাহায্যে তাদের আনন্দোচ্ছল করা যাক এবং শিশুদের জন্ম হোক। সেইমতো মহাপর্বত মদের সাহায্যে তাদের বেসামাল করলেন এবং সাত-সাতটি শিশুর জন্ম হলো।[৪]

এইভাবে পুরুষ ও নারীর বংশবৃদ্ধি হতে থাকলো ও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলো এবং জাত সমস্ত শিশুদের স্থান সংকুলানের সমস্যা হলো। এই সময়ে তারা হিহিড়ি-পিপিড়িতে বাস করত, কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়াতে তারা চাঙ্গ-চম্পার দিকে যাত্রা করল, এবং যখন চাঙ্গ-চম্পাতেও সংকুলান হলো না, তখন তারা শিল্‌দার দিকে যাত্রা করল ; এবং যখন শিলদাতেও জায়গা কম পড়লো, তারা শিকারের দিকে যাত্রা করল ; এবং শিকার হতে তারা নাগপুরের দিকে গেল, এবং নাগপুর হতে উত্তরে, এমনকি সার অবধি ছড়িয়ে পড়ল।

এই হচ্ছে আদিসৃষ্টির ও ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী—একবর্ণ বাংলা জানে না যারা, গ্রামে হিন্দুদের আগমনে বাঘ বা চিতার নৈশ আক্রমণের চেয়েও বেশি ভীত যারা, সেই মানুষরাই বীরভূমের পশ্চিমের জঙ্গলে এই কাহিনী সবিস্তারে বলে। বর্ণে বর্ণে প্রায় একই কাহিনী বলে দক্ষিণের সাঁওতালরা এবং উত্তরের সাঁওতালরা, এবং যদি অজ্ঞতা ঘৃণা ও বিদেশি ভীতি দ্বারা কোনো জাতির উপকথাগুলিকে বিদেশি প্রভাবমুক্ত রাখা সম্ভব হয়, তাহলে এইগুলিই বিশুদ্ধ আদিবাসী ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। আমি অবশ্য, চরম স্বাতন্ত্র্য সম্ভব একথা বিশ্বাস করি না ; এবং টুকিটাকি যেটুকু ইতিহাস বর্তমান, তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার এবং তাদের ভাষার সযত্ন বিচারের পর, আমার ধারণা হয়েছে যে মূলত বিশিষ্ট ভাষার সযত্ন

বিচারের পর আমার ধারণা হয়েছে যে, মূলত বিশিষ্ট আদিবাসী উপকথার সাথে তারা অচেতনভাবে সংস্কৃত ভাষার ঘটনা ও দৃশ্যাবলী জুড়ে দিয়েছে।

আমি পরিশিষ্টে[৫] ছয়টি উপকথার আক্ষরিক অনুবাদ যুক্ত করেছি; রেভারেণ্ড মিঃ ফিলিপস-এর নিকট এইগুলি উড়িষ্যার সাঁওতালদের দ্বারা কথিত—এই সাঁওতালরা পূর্বোক্ত স্বজাতিদের থেকে ২০০ মাইল দূরে থাকে, মাঝে রয়েছে বহু জঙ্গল, অনেক নদী এবং লিখিত যোগাযোগের কোনো উপায় অনুপস্থিত।

মোজেস্ বর্ণিত এবং সংস্কৃত ভাষাতে বর্ণিত আদি সৃষ্টির বিবরণের সাথে এই কিংবদন্তির সাদৃশ্যে যে-কেউ বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। জলমগ্ন পৃথিবী, ভূমির উত্থান, মানব জাতির জন্য এর প্রস্তুতি, আমাদের আদি পিতা-মাতার বিবস্ত্র নগ্নতা, তাদের পরিধানের জন্য স্বর্গীয় ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়া—এই সবগুলিই সাধারণ ভাবে বর্তমান। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আর্য ও সেমেটিয় বংশোদ্ভূত ব্যতীত অন্যান্য অল্পবুদ্ধি জাতিগুলির মতো প্লাবনের মাধ্যমে সৃষ্টি যদিও বা সূচিত না হয়, তবু সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বেও, সৃষ্টির ঐতিহ্য এক মহাপ্লাবনের ধারণার সাথে জড়িয়ে পড়েছে। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর্যদের রয়েছে পৃথক পৃথক কাহিনী, তারা উভয়ের বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষায় কথা বলে। তাদের আদি সৃষ্টির কিংবদন্তি মোজেসের সংক্ষিপ্ত মহিমামণ্ডিত শ্লোকগুলির সমান ভাবগম্ভীর রহস্যে আবৃত, কিন্তু তাদের মহাপ্লাবনের কিংবদন্তি বাস্তব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সমন্বিত। আদিসৃষ্টির বৈদিক বিবরণ অনুযায়ী, "তখন অস্তিত্বও ছিল না, অনস্তিত্বও ছিল না, না ছিল বাতাস, না ছিল তার বাইরে আকাশ। তখন মৃত্যু ছিল না, ছিল না অবিনশ্বরতা; দিবস আর রজনীতে কোনো প্রভেদ ছিল না। একমেবাদ্বিতীয়ম্ তিনি পরম শান্তিতে প্রকৃতির সাথে একাত্ম ছিলেন; ইহলোকে বা পরলোকে কোনো পার্থক্য ছিল না। ছিল শুধু অন্ধকার।" অপরদিকে, মহাপ্লাবনের সংস্কৃত গল্পে, পেন্টাটিউকের মতোই, রহস্যের কোনো অবকাশ ছিল না। এক জাহাজ তৈরি হলো, জাহাজে বীজ তোলা হলো, কিছু সময় জাহাজটি একটি মৎস্য দ্বারা বাহিত হলো এবং অবশেষে হিমালয়ের এক চূড়ায় জাহাজ ভিড়ল।

সাঁওতাল কিংবদন্তি আদি সৃষ্টির চেয়েও জোর দেয় মহাপ্লাবন প্রশমনে ক্রমাগত জল সরে যাওয়ার বর্ণনায় এবং এর বিশিষ্ট দিকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ সঠিকতায় বর্ণিত। প্রথমে, জলপৃষ্ঠে সামুদ্রিক পাখিরা আর জলজ উদ্ভিদরা ছাড়া, একমাত্র মহাপর্বত সমুদ্রবক্ষে দণ্ডায়মান। বন্যা প্রশমিত হওয়ার পর পাহাড়গুলির আবির্ভাব, সাথে শামুক, চিংড়ি ও অন্যান্য শক্ত বহিরাবরণ যুক্ত প্রাণীরা। জল আরো কমে যাওয়ার পর পৃথিবী জুড়ে থাকবে পোকামাকড় আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অপসৃয়মান নদীর ক্রম বিস্তারমান পলিমাটির বুকে যা স্বাভাবিক সেই অসংখ্য লতাগুল্মরাজী। তারপর আবির্ভূত হবে এক বিপুল তৃণাস্তরণ, আর পৃথিবী

মানুষের আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে। মোজেসের গাথা আর সাঁওতালি কিংবদন্তি উভয় ক্ষেত্রে মদের ব্যবহার সম্বন্ধে এবং এর প্রভাবে অসভ্য আচরণ সম্বন্ধে লক্ষণীয় উল্লেখ নিশ্চিতরূপে অদ্ভুত এক কাকতালীয় ব্যাপার—সম্ভবত এর বেশি কিছু নয়।

আর একটি সমাপাতন—আমি সাদৃশ্য বলতে ভরসা পাই না—দেখা যায় আদি যুগলের সন্তান সংখ্যায়। সাঁওতাল কিংবদন্তি যেমন মানবজাতিকে সরাসরি সাতটি পরিবারে ভাগ করে, সংস্কৃত ঐতিহ্য সেইভাবেই বলে যে প্লাবনের পর সাতজন ঋষি হতে মানবজাতির উৎপত্তি।

সাঁওতালদের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের নির্দেশমতো একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, তাদের আদি পার্বত্য বাসভূমি ছিল হিমালয় পর্বতমালার মাঝে। সাঁওতাল মানসিকতায় এত স্থায়ী প্রভাব ফেলার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য মধ্য-ভারতের পাহাড়গুলির বা সঠিকতর ভাবে মালভূমিগুলির নেই এবং সুউচ্চ বিন্ধ্য পর্বত-মালার সন্নিকটে তাদের কখনো যাওয়ার কোনো প্রমাণও নেই। উত্তর দিক হতে ছাড়া তাদের যে মধ্য-ভারতের মালভূমিতে পৌছানোর অপর কোনো পথ নেই, সেইকথা বোঝা খুব দুঃসাধ্য নয়। মালয়ীদের সাথে বা মালয় ভাষার সাথে তাদের চেহারাগত বা ভাষাগত কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই; তাদের ঐতিহ্যের মধ্যেও কোথাও সমুদ্র বা সামুদ্রিক বৃহৎ মৎস্যকুলের কোনো চিহ্ন নেই; যদি আমরা স্বীকার করি যে, বাকি মানবজাতি আদি পিতামাতা হতে নয় বরং পৃথক জাতি হিসাবে মধ্য-ভারতের পাহাড়গুলির মাঝে তাদের উৎপত্তি, একমাত্র তবেই কিংবদন্তি অনুযায়ী তাদের আদি পার্বত্য বাসভূমি উত্তরের বদলে দক্ষিণে হতে পারে।

কিন্তু সাঁওতালদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসে মহাপর্বত ছাড়াও অপর একটি প্রাকৃতিক ঘটনার প্রভাবের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। বিশাল নদী, তীরবর্তী জনগণের উপর, সর্বদাই অল্পবিস্তর প্রভাব ফেলে এবং এইরূপ একটি নদীর উপস্থিতি হচ্ছে বহির্জগতের দ্বিতীয় সেই ঘটনা যা সম্বন্ধে সাঁওতাল জাতির চেতনা সদা জাগ্রত। বর্তমান যেসব অঞ্চলে তাদের বাস, এবং বহুযুগ ধরে যেখানে তারা বাসরত, সেইখানে অসংখ্য পাহাড়ি নদী বর্তমান; কিন্তু তাদের কোনোটিরই বৃহৎ নদীর মর্যাদা প্রাপ্য নয়।[৬] এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ দামোদর নদও বৎসরের বহু মাসই এমন কি গাড়িতেও অতিক্রম যোগ্য। সেই কারণেই বৃহৎ নদনদী অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আদিবাসী অঞ্চল, যা নদীরূপ দেব ও দানবের মন্দির আকীর্ণ,[৭] সেইখানে সাঁওতাল অঞ্চলের আদিবাসীরা কিন্তু জাতীয় দেবতার স্তরে উন্নীত করার যোগ্য একটি মাত্র নদী লাভেও সক্ষম হয়নি। তবুও সুদূর অতীতে, বৃহৎ নদীর তীরে যখন ছিল তাদের নিবাস, সেই বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির প্রভাব এখনো বর্তমান। তাদের বর্তমান বাসভূমির একমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী দামোদরের

প্রতি যে শ্রদ্ধা তারা প্রদর্শন করে, নদীটির আকার কোনোক্রমেই তা উদ্রেক করে না। তাদের মুনি ও ঋষিদের সাথে পরামর্শের জন্য সেইখানেই তারা যায় এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণার্থে বৎসরে একবার সমস্ত উপজাতিরা এই নদীতীরেই তীর্থযাত্রা করে। এই উৎসরের নাম 'মৃতদের পবিত্রকরণ'; এবং প্রাচীনকালে সাঁওতাল বিশ্বাসের উপর বৃহৎ নদীগুলির প্রভাব এত স্থায়ী চরিত্রের ছিল যে, আজও বৎসরে একবার অন্তত তাদের একমাত্র নদীতে না গেলে, বীরভূম পার্বত্যাঞ্চলে কিছু পরিবারের মধ্যে সামাজিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে হয়। যে হৃদয়স্পর্শী ও সুন্দর প্রথার মাধ্যমে তারা মৃতদের পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত করে, সেইখানেও এই প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান। যত গহীন জঙ্গলেই একজন সাঁওতালের মৃত্যু হোক, তার নিকটতম আত্মীয় মৃতের অন্তত এক ক্ষুদ্র দেহাস্থিও নদীতে নিয়ে যায়, এবং যে সুদূর পূর্বদেশ হতে তাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন সেইখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই অস্থিখণ্ডকে নদীর স্রোতোধারার মধ্যে বিসর্জন দেয়। এমন ঘটনাও জানা গেছে যে পিতার দেহাস্থি বিসর্জনের জন্য পুত্র দিনের পর দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা ব্যতিরেকে আততায়ী বন্য জন্তুর চিহ্ন অনুসরণ করেছে এবং সুযোগমতো তাকে মেরে ফেলে পিতার দেহাস্থি নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়েছে।

বর্তমান সাঁওতাল বংশধরদের এই প্রথার উৎপত্তির কোনো বিবরণ দিতে অক্ষমতার কারণে বা পূর্বের সেই নদী খুব সম্ভবত যেটি অনুসরণ করে তাদের পূর্বপুরুষদের যাত্রারম্ভ,তার সাথে যে কখনো দামোদর মিলিত হয় না—এই সত্যের কারণে সৌন্দর্যহানি ঘটলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে প্রথাটির কোনোরূপ অবমূল্যায়ন ঘটে না। একদা এই জাতির উপর বৃহৎ নদীর উপস্থিতির প্রভাব এই প্রথাগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণা করে; এবং মাতাপিতার প্রতি সন্তানের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ দামোদরের জলধারা অবশেষে সাগরে এসে পূবের সেই বিশাল নদীর জলধারার সাথে মিলিত হয়, যে জলধারায় সুদূর অতীতে তাদের পূর্বপুরুষদের অস্থি বিসর্জিত হতো।

সাঁওতালদের বর্তমান বাসভূমিতে আসার পথে তারা যে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করেছে বলে থাকে, আমি সেইগুলির নাম উল্লেখ এই আশায় করেছি যে, অন্যান্য গবেষকরা সেইগুলি সনাক্ত করে চূড়ান্তভাবে সাঁওতালদের সেদিনের যাত্রাপথ চিহ্নিত করতে পারবেন—আমি নিজে এইগুলি থেকে খুব একটা তথ্য আহরণে সক্ষম হবো না। হিহিড়ি-পিপিড়ি কোথায়,আর চাঙ্গ চম্পা বা শিল্দাই বা কোথায়, তা আমি নিশ্চিতরূপে জানি না, কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে, সাঁওতালি ভাষায় পিপিড়ি-আম শব্দের অর্থ প্রজাপতি এবং হিহিড়ি এরই দ্বিত্ববোধক শব্দ বিশেষ। হিহিড়ি-পিপিড়ির অর্থ প্রজাপতি-দেশ হলে সেইটির অবস্থিতি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে হওয়া উচিত। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি বা উর্দু ভাষায় হিহিড়ি বা পিপিড়ি শব্দ দুইটির কোনোটিই নেই। দ্বিতীয় দেশ চাঙ্গ চম্পা—এখানে সাঁওতালদের

সর্বপ্রথম সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে ; চম্পা এক প্রকার ফুল গাছের নাম হওয়ায় এবং চাই চম্পা সেইটিরই দ্বিত্ববোধক বহুবচন হওয়ায়, এই পদের অর্থ দাঁড়ায় ফুলগাছের দেশ। ব্রহ্মপুত্রের উঃ উপত্যকায় এর অবস্থিতি সম্ভব ছিল। তালিকার চতুর্থ নাম শিকার—এই প্রথম অনুমান নির্ভরতা ছেড়ে আমরা বাস্তব তথ্যের সাক্ষাৎ পাই। এই দামোদরের তীরে, প্রায় প্রাচীন বীরভূম জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং বর্তমানে এই জাতির অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। একদিকে, দামোদরের দক্ষিণ তীরের সাঁওতালরা নিজেদের উত্তরাগত বলে, অন্যদিকে উত্তর তীরবর্তীরা নিজেদের দক্ষিণাগত বলে দাবি করে ; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, উত্তর বা দক্ষিণ হতে নয়, বরং পূব বা পশ্চিম হতে তারা ঐ নদী-উপত্যকায় উপস্থিত হয়। যেহেতু ইতিহাসকালের মধ্যে তারা শিকার হতে নাগপুরে পশ্চিম অভিমুখে যায়, তাই একমাত্র পূবদিক থেকেই তাদের আসা সম্ভব—হিন্দুদের অগ্রগতির চাপে ক্রমশ তারা সমতলভূমি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে সরে আসে। এইটাই যে ছিল তাদের সাধারণ যাত্রাপথ, তা তাদের জীবনযাপন প্রণালী ও অভ্যাস পরীক্ষা করলে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয়। মধ্যভারতের সুপ্রাচীন পাহাড়ি উপজাতিদের মতো তারা গোমড়ামুখোও নয় অলসও নয় ; সমতলভূমি হতে তারা সাথে করে এনেছে, এক ধরনের শৃংখলা পরায়ণতা, অমায়িক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ কিছু পরিমাণে সভ্যতা ও কৃষিকাজের অভ্যাস—শত শত বৎসরেও যা ম্লান হয়নি। তাদের ত্রুটিগুলির চরিত্রও অসভ্য জনোচিত নয়, বরং অত্যাচারিত, বিতাড়িত, অধঃপতিত জাতিসুলভ।

যে কোনো জাতির অতীত ইতিহাস তাম্রফলক বা প্রস্তরলিপির চেয়েও গভীর ভাবে খোদিত থাকে তার ভাষায়—সাঁওতালদের ঐতিহ্য যতই সামান্য এবং বন্ধ্যা হোক, তাদের ভাষা অনুসন্ধানের এক সমৃদ্ধক্ষেত্র। এইটি সেই শ্রেণীর ভাষা যেখানে একস্বরা শব্দমূলকে ভিত্তি করে সর্বনামগত বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে শব্দ বা ধাতুর রূপ পরিবর্তন করা হয়। চীনা ভাষা থেকে এইটি স্বতন্ত্র, কারণ চীনা ভাষায় বিভক্তি ও প্রত্যয়গত গঠন পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেই এবং তিন অক্ষর দ্বারা গোঠিত[৮] বিশিষ্ট ক্রিয়ামূল থেকে সূচিত সেমেটিয় ভাষার থেকে এর পার্থক্য আরো বেশি। যেহেতু এর মূল পদগুলি অনমনীয়, সেই কারণে দুই ধরনের অক্ষর বিশিষ্ট নমনীয় ভিত্তির ভাষাগুলির বিশাল পরিবার হতে এই ভাষা নির্বাসিত, আমাদের ভাষা এই পরিবারের অন্যতম এবং সংস্কৃত ভাষাতেই এর চরম বিকাশ। কখনো লিখিত দলিলের স্বাভাবিক রক্ষণশীল প্রভাবাধীন না হওয়ার ফলে এবং বস্তুত কোনো প্রকার লিখিত রূপ না থাকার ফলে বর্তমান প্রজন্মের সম্মুখে এই ভাষারূপে যা এসেছে, তা সেই প্রাচীন ভাষা নয়, বরং প্রাচীন ভাষার এক বিকৃত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তবুও অতল অতীতের সাথে বর্তমানের সেতুবন্ধন

রচনা করে এবং পাণিনি অপেক্ষা বহুগুণে জটিল ও অসংখ্য ব্যাকরণগত রূপ-বৈচিত্রের ইঙ্গিত জুগিয়ে, কোনোক্রমে জীবিত এই ভাষা আজও টিঁকে রয়েছে।

পরিশিষ্টে[৯] সাঁওতালি ব্যাকরণের এক রূপরেখা পাওয়া যাবে ; ভাষাবিজ্ঞান গবেষণার হাতিয়ারে সমৃদ্ধ যেসব পণ্ডিতরা সুযোগ সুবিধামতো কাজ করেন, এইটা হতে তাঁরা ব্যাপকতর ও সঠিকতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। সাঁওতাল জাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে জনাকয় বিচ্ছিন্ন গবেষকের লব্ধ ফলাফলকে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে একটি সাধারণ কেন্দ্রভূমিতে আনা হয়েছে ; এবং আমার কিছু সিদ্ধান্ত যদি ভুলও প্রমাণিত হয়, তবু যাঁরা এইগুলিকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন, তাঁদের জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলি রয়ে যাবে।[১০]

সাঁওতাল ভাষাবিচারে প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই ভাষার কোনো বর্ণ বা লিখিত অক্ষর না থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত বর্ণমালা এর সকল ধ্বনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে। বর্ণমালা যতই বিশদ হোক, একজাতির বর্ণমালা কখনো অন্য জাতির ভাষার উপযোগী হয় না। সেই কারণেই অদ্যাবধি রচিত সর্বাপেক্ষা বিশদ বর্ণমালাগুলির মধ্যে অন্যতম ফারসি আরবি বর্ণমালাতেও সংস্কৃত স্বরবর্ণের অন্তত দুইটি, সংস্কৃত অনুনাসিক বর্ণের দুইটি এবং সম্ভবত সংস্কৃত 'ভ' ধ্বনির সমতুল্য কিছু নেই। অপরদিকে, সংস্কৃত বর্ণমালাতেও সেমেটিয় ভাষার পাঁচটি 'Z' ধ্বনির সমতুল্য কিছু নেই এবং সেই কারণেই সেইগুলি প্রকাশ করার জন্য একমাত্র 'জ' ধ্বনি ব্যবহারের গ্রাম্যতা করতে বাধ্য হয়। এইটি ছাড়াও, কড়া সেমেটিয় মহাপ্রাণ বর্ণের সমতুল্য কিছু নেই, দ্বিতীয় 'ক' ধ্বনি (কাফ্) বা 'সায়েন' ও 'গায়েন' বর্ণ দুটিরও সমান্তরাল কিছু নেই। প্রাচীন কাহিনী অনুযায়ী, প্রথমে প্রাচীন ১৬টি সেমেটিক অক্ষর নিয়ে গঠিত গ্রীক বর্ণমালাকে গ্রীকভাষা প্রকাশ করার জন্য অতিরিক্ত চারিটি চিহ্ন ধার করতে হয় ; এবং যদি কেউ মূল ১৬টি অক্ষর ব্যবহার করে একলাইন হোমার লিখে সেটি পাঠ করতে চেষ্টা করে, তখন একজাতির ভাষা অন্য জাতির জন্য গঠিত বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশ করার অসুবিধা সে সহজেই উপলব্ধি করবে। সাধারণভাবে সংস্কৃত বর্ণমালাও ভারতীয় আদিবাসীদের কথ্য ভাষাকেও সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না ; বস্তুত আদিবাসী ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সযত্নে পরীক্ষিত, সবচেয়ে বহুল প্রচারিত অন্যসকল আদিবাসী ভাষাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী যে ভাষা, তাতেও বহু উচ্চারণ রয়েছে যা দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না। দক্ষিণের আদিবাসীদের শুধু যে আর্যদের অজ্ঞাত বহু ধ্বনি রয়েছে তাই নয়, আর্য বর্ণমালায় খুব সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত অন্যান্য ধ্বনির প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করে।[১১]

বর্তমানে আমরা জানি যে, প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের ঘাটতি ছিল, এবং এই দেশের প্রাচীন বাসিন্দাদের কথা প্রকাশ করার জন্য বহু নূতন বর্ণের প্রয়োজন দেখা দেয়। চূড়ান্তরূপে বিকশিত সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে একমাত্র 'ভ'

ছাড়া সবগুলি কোনোরূপ ঘাটতি বা প্রয়োজনীয়তা ব্যতিরেকে সাঁওতালি ভাষার সাথে নিখুঁতভাবে খাপ খায়, এই ঘটনা হতে এইটিই সম্ভবপর প্রতীয়মান হয়, আর্য আগন্তুকরা প্রধানত যে অনার্য জাতির সম্মুখীন হয় এবং যাদের থেকে তাদের ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্তি ঘটে,[১২] তারা হয় বর্তমান সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ, নতুবা সাঁওতাল পূর্বপুরুষদের সগোত্র কোনো জাতি ছিল। অতি প্রাচীন প্রাকৃতে যে বহু সাঁওতালি শব্দ পাওয়া যায়, এই ঘটনায় ঐ অনুমান আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়।

দুই প্রকার পৃথক উপাদানে ভাষা গঠিত হয়—সর্বনাম ও শব্দমূল। শেষোক্তটি বস্তুগত কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে,আর প্রথমোক্তটি করে জৈব ও রূপগত নিয়মে —মানবদেহের ক্ষেত্রে জীবনীশক্তির যে ভূমিকা,ভাষার ক্ষেত্রে প্রথমোক্তটির ভূমিকা অনুরূপ। শব্দমূল বা বস্তুগত উপাদান থেকে ক্রিয়া ও বিশেষ্যের উৎপত্তি, কিন্তু ক্রিয়া বা বিশেষ্য থাকে গতিহীন অবস্থায়, সম্পর্করহিত, স্থান ও কালের অবস্থানের ধারণাবিহীন। তবুও, কোনো বস্তু সম্বন্ধে বলতে হলে সর্বপ্রথম সেইটি সম্বন্ধে একটি ধারণার প্রয়োজন—বস্তুটি স্থান বা কালের পরিপ্রেক্ষিতে কি অবস্থান গ্রহণ করে আছে, সেইটি দ্রষ্টার নিকটে অথবা দূরে, বর্তমানের অথবা অতীতের কিংবা, ভাষাবিজ্ঞানীদের সুত্রানুযায়ী সেইটি এইখানে রয়েছে অথবা ঐখানে রয়েছে। সর্বনাম শব্দটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণ করলে এর কাজ হলো চেতনা ও বস্তুর মধ্যে এই ফারাক দূর করা, এবং নিষ্ক্রিয় বিশেষ্যগুলি ও ক্রিয়াগুলিতে মানুষের ভাষাসুলভ গতি ও জীবন সঞ্চারিত করা।

যে ব্যবস্থা অনুযায়ী সর্বনাম ও শব্দমূল এই দুই উপাদান সংযুক্ত হয়, এই প্রক্রিয়ায় তাদের যে সকল পরিবর্তন ঘটে এবং সংযুক্ত হওয়ার পর তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়, সেই ব্যবস্থাকে বলে ভাষার গঠন-কাঠামো। ভাষাগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সর্বনাম ও শব্দমূল ব্যবহৃত হলে অতীতে বৈয়াকরণেরা তাদের পৃথক ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করতেন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এই প্রকার পার্থক্য প্রায়শই আপাত হয়, প্রকৃত পার্থক্য হয় না এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে এমনকি প্রকৃত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকে। ভাষাবিচারে, শব্দের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা কাঠামোতে সাদৃশ্য বা সাদৃশ্যের অভাব, যে কোনো দিক দিয়েই অনেক বেশি চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়। বস্তুত, এক ভাষার সাথে অন্য ভাষার তুলনার ক্ষেত্রে এবং ভাষার যথাযোগ্য স্থান নির্ণয়ের জন্য ভাষার গঠন-কাঠামোই একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও ভাষার শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে গঠন-কাঠামো এখনো মনে-প্রাণে গৃহীত হয়নি। বর্তমানে ভাষাগুলি চারভাগে বিন্যস্ত : ১ম, একস্বরা, বিভক্তি বা প্রত্যয়হীন ভাষা, যথা চীনাভাষা; ২য়, একস্বরা (দ্বিবর্ণ যুক্ত অর্থাৎ দুই প্রকারের বর্ণ সমন্বিত) বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে শব্দ বা ধাতুরূপ পরিবর্তনক্ষম ভাষা, যথা ইন্দো-

ইয়োরোপীয়ান ভাষা ; ৩য়, ত্রিবর্ণযুক্ত, বিভক্তি ও প্রত্যয়যুক্ত ভাষা, যথা সেমেটিক্স ভাষা ; ৪র্থ, বাকি ভাষাগুলি, যথা তুরানিয়ান, আফ্রিকান, সাথে রয়েছে আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার কথ্য ভাষা । এই বিন্যাসে কোনো একটিমাত্র বিন্যাসের নীতি মানা হয়নি। প্রথম দুইটি শ্রেণীকে এই খানে কাঠামোগত কারণে পৃথক করা হয়েছে – একটি বিভক্তি ও প্রত্যয়যুক্ত, অপরটি বিভক্তি ও প্রত্যয়হীন । দ্বিতীয় শ্রেণী হতে তৃতীয়কে পৃথক করা হয়েছে শব্দমূলগত পার্থক্যের কারণে – দ্বিতীয়টি দুই প্রকার বর্ণের ভিত্তিতে ও তৃতীয়টি তিনপ্রকার বর্ণের ভিত্তিতে গঠিত। প্রথম নীতি, অর্থাৎ কাঠামোগত কারণ অনুযায়ী, চতুর্থশ্রেণীকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর এক অশুদ্ধরূপ হিসাবে গণ্য করা যায়, কারণ চতুর্থশ্রেণীর ভাষাগুলিতে একই ধরনের বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে রূপভেদ রয়েছে। দ্বিতীয় নীতি, অর্থাৎ শব্দমূল বিচার অনুযায়ী, চতুর্থ শ্রেণীকে প্রথম বা দ্বিতীয়ের মধ্যে স্থান দেওয়া যায় ; কারণ এতে দুই প্রকার বর্ণ সহযোগে শব্দমূল ভিত্তিক রূপ রয়েছে।

এইক্ষেত্রে জার্মানি হতে নতুন আলোকপাত হয়েছে। গঠন কাঠামোকে বিন্যাসের ভিত্তি ধরে এবং আগাগোড়া এই নীতি মেনে চলে, অগাস্ট স্লেইচার সুসংবদ্ধ ভাষা বিন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন – এই পরিকল্পনা একদিন না একদিন পূর্ববর্ণিত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্থান গ্রহণ করবে।[১৩] তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোনো ভাষা নিম্নোক্ত তিন প্রকারের অন্তর্গত : ১ম, বিচ্ছিন্নকারী ভাষাগুলি যেগুলিতে রয়েছে শুধু শব্দমূলগুলি যৌগিক শব্দগঠনে অক্ষম, এবং বিভক্ত বা প্রত্যয় যোগে রূপভেদের অবকাশ অনুপস্থিত। চীনা, অ্যানামাইটিয় শ্যামদেশীয় ও বর্মীভাষা – এইগুলি এই শ্রেণীর ভাষার উদাহরণ । ২য়, যৌগিক ভাষাগুলি যেগুলিতে রয়েছে, প্রথম শ্রেণীর মতোই অপরিবর্তনীয় শব্দমূল সমূহ কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সাথে পার্থক্য হলো এই যে, এইগুলি যৌগিক শব্দ গঠনে সক্ষম, এবং 'সম্বন্ধসূচক ধ্বনি' সহকারে শব্দের রূপভেদে সক্ষম। ফিন দেশীয়, তাতারীয়, ভেখানীয় এবং বাস্ক ভাষা, আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষা, দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্টুভাষা এবং সাধারণভাবে অধিক সংখ্যক ভাষাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩য়, রূপ পরিবর্তনকারী ভাষাগুলি, এইখানে শব্দমূলগুলি বিভক্তি-প্রত্যয় যোগে পরিবর্তিত হয় এবং অনুসর্গ-উপসর্গ সহযোগে রূপভেদ ঘটে। একদিকে সেমেটিয় ও অন্যদিকে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।[১৪]

আমি খুব সংক্ষেপে এই নতুন পদ্ধতি অনুসারে সাঁওতালি ভাষার গঠন-কাঠামো পরীক্ষা করতে এবং ভাষাগুলির মধ্যে এর স্থান নির্ণয় করতে চাই। বাংলার গ্রামীণ জনগণকে ভালোভাবে বোঝার জন্য এই অনুসন্ধান যতই প্রয়োজনীয় হোক, এতে যে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে, তা কিছু পাঠকের পছন্দসই নাও হতে পারে। সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানগত এই বিশদ আলোচনায় অনাগ্রহী পাঠকেরা এই অংশ বাদ দিয়ে পরবর্তী অংশে চলে যেতে পারেন ; এই আলোচনার শেষে

সংক্ষেপে সিদ্ধান্তগুলি বলা হয়েছে।

সাঁওতালি ভাষা যে স্লেইচারের প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ বিচ্ছিন্নকামী ভাষাগুলির অন্তর্গত নয়, তা প্রমাণ করতে একটিমাত্র উদাহরণ যথেষ্ট। বাঘের সাঁওতালি প্রতিশব্দ 'কুল'; কোনো সাঁওতাল এই শব্দের দ্বিবচন রূপে চীনাদের মতো পৃথক পৃথক শব্দ ব্যবহার করে 'দুই-বাঘ' বা 'বাঘ-দুই' বলে না, শব্দমূল 'কুল'-এর সাথে দ্বিবচনসূচক উপসর্গ 'কিন' যুক্ত করে এক যৌগ শব্দ 'কুলকিন' গঠন করে। একইভাবে, বহুবচন করতে কোনো সাঁওতাল পৃথক শব্দ ব্যবহার করে 'বাঘ-বহু', বলে না, বহুবচন সূচক উপসর্গ 'কো' ব্যবহার করে যৌগ শব্দ 'কুল-কো' গঠন করে। 'কিন' ও 'কো' উপসর্গগুলির কেবল যোগসাধন হয় না। এইগুলি শব্দ-মূলের সাথে কিয়ৎ পরিমাণে একীভূত হয়, এবং ফলস্বরূপ যে যৌগিক শব্দ পাওয়া যায় সেইটি দ্বিবচন ও বহুবচন পদের বিভিন্ন শব্দ রূপের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে: যেমন, দ্বিবচন পদের সম্বন্ধপদ, 'কুলকিন্-রিনি' – দুইটি বাঘের; সম্প্রদান কার-কান্বিত বহুবচন, 'কুলকো-দেন', – বহু বাঘের দিকে বা নিকটে।

সুতরাং সাঁওতালি ভাষা অবশ্যই স্লেইচারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হবে; এবং এই দুই শ্রেণীর কোনটির অন্তর্গত তা নির্ণয় করার জন্য, কারক ও কালসূচক যৌগ গঠনের সময়ে শব্দমূলের কোনো পরিবর্তন ঘটে কিনা জানা দরকার। এই পর্যায়ে চূড়ান্ত সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পদপরিবর্তন পরীক্ষা করা দরকার এবং সাঁওতালি শব্দমূলগুলিকে বিভিন্ন সমগোত্রীয় ভাষাগুলির মধ্যে অনুসরণ করা উচিত। এই প্রকার পর্যালোচনা বহু পৃষ্ঠাব্যাপী হবে; কিন্তু কি ভাবে তা করা উচিত ও এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তের কি প্রক্রিয়ায় আমি উপনীত হয়েছি, তা বোঝাবার জন্য কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। প্রথমত, সাঁওতালি বিশেষ্যপদ সম্বন্ধে: শব্দমূলের অভ্যন্তরীণ গঠন কখনো পরিবর্তিত হয় না, এমন কি শব্দাংশ অনুচ্চারিত রাখা বা প্রান্তীয় বর্ণের ধ্বনিগত পরিবর্তনও গ্রাহ্য নয়। অনুরূপভাবে, এমনকি ব্যঞ্জনান্ত বিশেষ্য পদগুলিই যে শুধু বচন পরিবর্তনে অপরি-বর্তিত থাকে তাই নয়, সাঁওতালি ভাষা শব্দমূলে যে কোনো পরিবর্তন সম্বন্ধে এত সংবেদনশীল যে, উপসর্গ যোগে শব্দরূপ পরিবর্তনের সময়ে ওপ্রান্তিক স্বরবর্ণের সাথে উপসর্গ অগ্রে স্থিত স্বরবর্ণের সন্ধি অনুমোদন করে না। যেমন 'বড়ে' অর্থ বটবৃক্ষ, এর সাথে করণকারক সূচক 'ইয়াতে' সংযুক্ত হলে শব্দমূলটির কোনো পরিবর্তন অনুমোদিত নয়, অর্থাৎ 'বড়োয়াতে' গ্রাহ্য নয়, 'বড়ে-ইয়াতে' হয়; 'কাড়া' শব্দমূলও ঐ উপসর্গ যোগে 'কাড়েয়াতে' বা 'কাড়্যায়াতে' হয় না, 'কাড়া-ইয়াতে'-ই থাকে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার: 'তাহের' ধাতুর অর্থ থাকা – বচন, পুরুষ ও কালভেদে ধাতুর অভ্যন্তরীণ, গঠনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, শুধু উপসর্গাদি সংযুক্ত হয়। যেমন. ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে, 'তাহেন্-আই,' – 'সে থাকবে' 'তাহেন-আকিন' – 'তারা দুজন থাকবে' 'তাহেন-আকো', 'তারা থাকবে'

(বহুবচন) ঘটমান কালের ক্ষেত্রে, 'তাহেন্-এন-আই,' 'সে থাকলো,' 'তাহেন-এন-আকিন', 'তারা দুজন থাকলো' ; 'তাহেন-এন-আকো', 'তারা থাকলো'। পুরাঘটিত কালের ক্ষেত্রে, 'তাহেন-লেন-আই', 'সে থেকেছিল,' দ্বিবচনে, 'তাহেন-লেন-আকিন' ; বহুবচনে,'তাহেন-লেন-আকো'। ঘটনান্ত রূপেক্ষিত ক্রিয়াভাবের ক্ষেত্রে, 'তাহেল-বো-ই', 'সে থাকতে পারে' ; সম্ভাবনা সূচক ক্রিয়াভাবে, 'তাহেন-কোহ-আই' ; অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়াভাব, 'তাহেন-মাই' ; বচন ও পুরুষ ব্যতিরেকে ক্রিয়াভাব প্রকাশক, 'তাহেন-তে' বা উত্তরের সাঁওতালদের ক্ষেত্রে, 'তাহেন্'। কালবোধক কৃদন্ত, 'তাহেন-কাটে', 'থাকিয়া,' 'তাহেন-এন-খন' ; ধাতু হতে গঠিত নামপদের ক্ষেত্রে : 'তাহেন-এন্টে,' 'তাহেন-লেন্টে,' এবং 'তাহেন-আকানতে,' 'থাকার দ্বারা,' বা 'থাকার সাহায্যে'।

কখনো কখনো অবশ্যই খুব বিরল ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের প্রান্তীয় স্বরবর্ণের এমনকি একটিমাত্র ক্ষেত্রে প্রান্তীয় অনুনাসিকেরও ধ্বনিগত পরিবর্তন দেখা যায়।

সর্বনামগুলি আরো জটিল, কিন্তু তাদেরও শব্দমূলে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তা দ্বিবচন ও বহুবচনে ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি ব্যবহারজাত। এই পরিবর্তন মূলত উত্তমপুরুষে সীমাবদ্ধ। যেমন' 'ইগ,' 'আমি,' 'আলিম্' বা 'আলম্,' 'আমরা দুজন' ; 'আলে' বা 'আবার',[১৫] 'আমরা (বহুবচন)। 'আম্,' 'তুমি' ; দ্বিবচনে, 'আবেন' ; বহুবচনে 'আপে'। 'ওনা' 'ইহা' ; দ্বিবচনে, 'ওনাকিন' ; বহুবচনে, 'ওনাকো' বা 'ওনকো'।

সুতরাং, সাঁওতালি ভাষা পুরোপুরি রূপ পরিবর্তনকারী ভাষা, যেখানে শব্দমূলগুলি পরিবর্তিত হয়,—হতে পারে না, বরং এইটি শ্লেইচারের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত যৌগিক ভাষা। গঠন-কাঠামোর বিচারে এই শ্রেণীর ভাষা অপর দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী। বিচ্ছিন্নকারী ভাষাগুলি সরলতম—এখানে শব্দমূলগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন, যৌগিক শব্দ গঠন করে বা বিভক্তি প্রত্যয়াদি যুক্ত করে হয় না, বরং সরাসরি অন্যান্য শব্দমূল যুক্ত করে পরিবর্তন করা হয়। এই ভাষার প্রতীক হলো $R+r+r$,ইত্যাদি। পরবর্তী শ্রেণীর ভাষা বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছে পর পর যৌগিক শব্দ গাঁথার ক্ষমতা, সেইটি ব্যবহার করে সরল শব্দমূলের সাথে সম্পর্ক সূচনাকারী অন্যান্য শব্দমূল, সাধারণভাবে যেইগুলি সর্বনাম বা সর্বনামগত অব্যয় নামে পরিচিত, সংযুক্ত করা হয়। এই সর্বনামগত পদগুলিকে যদি শব্দমূলের ভগ্নরূপ হিসাবে গণ্য করা হয়, এবং শব্দমূলকে R এবং তজ্জাত সর্বনামগত পদকে r দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার সূত্র দাঁড়ায় Rr—এইটি একটি যৌগিক শব্দ। কখনো কখনো এই ভগ্ন শব্দমূলে পরিবর্তন ঘটে ; 'r'-এর উপর 'x' বসিয়ে সেইটি চিহ্নিত করা যায় ; সুতরাং শ্লেইচারের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক দাঁড়ায় বা Rr বা Rr^x। শ্লেইচারের তৃতীয় শ্রেণীতে

শব্দমূলগুলি, অর্থাৎ মূলপদ এবং সর্বনামগত অব্যয়াংশ, আরো ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ এবং উভয় প্রকারের শব্দমূলই পরিবর্তনক্ষম ; এই ক্ষেত্রে সূত্র দাঁড়ায় $R \times .r^{\times}$।

সুতরাং, গঠন-কাঠামোর বিচারে, মনুষ্য কথিত বিভিন্ন প্রকার ভাষাগুলির মধ্যে কোনো প্রকার ফাঁক বা ধারাবাহিকতার অভাব পাওয়া যায় না। একের উপর আর এক—এভাবেই তাদের সহজ ক্রমবিন্যাস, প্রতিটি শ্রেণী তার নিচের শ্রেণীর তুলনায় উন্নততর মাত্রায় সক্রিয়। বিচ্ছিন্নকারী ভাষাগুলি যৌগিক শব্দ গঠনে অক্ষম এবং সদা বিচ্ছিন্ন শব্দমূলের অন্তহীন মালার মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্ত করে ; অতএব, $R+r+\cdots$ অসীম পর্যন্ত। যৌগিক ভাষাগুলির কিছু পরিমাণে শব্দ গ্রন্থনের ক্ষমতা রয়েছে, এখানে সর্বনামগত পদগুলি অর্থাৎ সম্পর্ক প্রকাশকারী শব্দ মূলগুলি শব্দের প্রধান শব্দ মূলগুলির সাথে মিলিত হয়, কিন্তু প্রধান শব্দমূলে কোনো পরিবর্তন ঘটে না ; অতএব Rr বা $Rr^{\times}$। রূপভেদী শ্রেণীর ক্ষেত্রে আসঞ্জন শক্তি আরো প্রবল, সম্পর্ক প্রকাশকারী শব্দ মূলগুলি পদের প্রধান শব্দমূলের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ এবং ক্রিয়াভাব ও কারক প্রকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন মারফৎ নিজের রূপভেদের ক্ষমতা প্রধান শব্দমূলের থাকে ; অতএব, $R^{\times} r^{\times}$। এই তিন শ্রেণীই সৃজনশীল সক্রিয়তার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে ; এবং তুলনার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ না করেও কৌতূহলজনক এই তথ্য লক্ষ্য করা যায় যে, মহান মানব জাতিগুলি নিজ নিজ ভাষার সৃজনী ক্ষমতার অনুপাতে কম-বেশি রাজনৈতিক ও সামাজিক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। বর্মী, চীনা ও অ্যানামাইটিয় জাতিগুলির রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা এবং জাতিগত জীবনীশক্তির অভাব নিখুঁতভাবে তাদের একস্বর বিচ্ছিন্নকারী ভাষার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাদের উপরের শ্রেণীতে রয়েছে তাতার উপজাতি ; তারা বারবার দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইয়োরোপ আর দক্ষিণ এশিয়ার উপর সংগঠিত প্রয়াসের বৃহত্তর ক্ষমতাসম্পন্ন এই উপজাতি উন্নততর সক্রিয়তা অর্জন করেছে—তাদের ভাষাতেও অনুরূপ ভাবেই চীনাদের চেয়ে বৃহত্তর সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত আর্য ও সেমেটিয় জাতিগুলি সামাজিক ও ভাষাগত উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে ; তারা নিজেদের জন্য ইহজগতে যেমন আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে এবং তাদের ভাষার মতোই কি রাজনৈতিক ইতিহাসে, কি বাস্তব জীবনে, প্রবল জীবনীশক্তির পরিচয় রেখেছে। এই প্রকার তুলনার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করা সহজ, এবং উদাহরণস্বরূপ, যৌগিক শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে, দেখানো যায় যে, দুনিয়ার যে জাতিগুলি সবচেয়ে সক্রিয়, তাদের ব্যাকরণও সমৃদ্ধতম। টুঙ্গুসীয় জাতি কি রাজনৈতিক আন্দোলনে, কি তাদের ভাষায় কোনো প্রকার সজীবতা প্রদর্শন করেনি ; মোঙ্গোল জাতি উভয় ক্ষেত্রেই এক ধাপ অগ্রসর ; এবং ইয়োরোপ যে কারণে অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে ঋণী, যে ভাষা

এবং সৃজনীশক্তির বিচারে তুর্কি ও ফিন দেশীয়রা তুরানিয়ান জাতিগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য।

ভারতে এই তিনশ্রেণীর ভাষাই যেন এক সাধারণ মঞ্চে মিলিত হয়েছে। বাংলা এবং তার অধীন অঞ্চলগুলি মিলে যেন এক বিশাল পাত্র গঠন করেছে—সেইখানে পুরাকাল হতে সকল প্রকার ভাষা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সমগ্র ভাষাগত শ্রেণী এইখানে পাওয়া যায়,—ক্রমপর্যায় অনুযায়ী স্তরে স্তরে বিন্যস্ত; সেই কঠোর প্রাথমিক গঠন সম্পন্ন বিচ্ছিন্নকারী ভাষা থেকে, যৌগিক শ্রেণীর মধ্যবর্তী আস্তরণের মধ্য দিয়ে, রূপভেদী ভাষার সাম্প্রতিকতম সঞ্চয় উর্বর বাংলা ও হিন্দি ভাষা পর্যন্ত প্রসারিত। অতএব—

প্রথম শ্রেণী : R+r ভাষাসমূহ।

বর্মীভাষা [১৬] : বড় শহরের বাসিন্দাদের কথ্য চীনা ভাষা : বাংলার পূব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে কিছু সংখ্যক উপজাতিদের কথ্য ভাষা।

দ্বিতীয় শ্রেণী : Rr এবং $Rr^{\times}$ ভাষাসমূহ।

হিমালয়ের কথ্য ভাষাগুলি [১৭] : সাঁওতালি, কোল এবং যতদূর জানা গেছে সাধারণ ভাবে সমগ্র বাংলা ও দক্ষিণ-ভারতের পাহাড়িয়া উপজাতিদের ভাষাসমূহ।

তৃতীয় শ্রেণী : $R^{\times} r^{\times}$ ভাষাসমূহ।

আর্য শাখা : সংস্কৃত, হিন্দুস্থানি, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি ;

সেমেটিয় শাখা : মুসলমান মৌলভিদের আরবি ভাসা ইত্যাদি ;

আধা আর্য : আধা আরবি-ফারসি ভাষা [উর্দু-অ. চ.] সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত যা ; সরকারি ভাষা ছিল, এবং এখনো উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষা।

উত্তর-ভারতে সংস্কৃত চর্চা দীর্ঘদিন-বিচ্ছিন্ন, রূপভেদী আর্য ভাষাগুলির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করেছে, এবং সভ্য জাতিসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ যে একই বংশোদ্ভূত, সেকথা প্রমাণ করেছে। কিন্তু দুনিয়াবাসীর একটিমাত্র শাখা এইটি নিয়ে গঠিত। বাংলার আদিবাসীদের কথ্যভাষার চর্চা আমার বিশ্বাস, বিশাল অবশিষ্ট জাতিসমূহের ক্ষেত্রে অভিন্ন ফলাফলে উপনীত হতে বাধ্য ; ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি হতে একটি পরস্পর সংযুক্ত শ্রেণী গঠন করা এবং সম্ভবত দূর ভবিষ্যতে এই তিন শ্রেণীর ভাষার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যাবে। ক্ল্যাপরথ্, এ. রেমুসাট্ ও ক্যাস্ট্রেন্ প্রভৃতির মতো ইয়োরোপীয় তুরানিয়ান পণ্ডিতদের যে তথ্যাদির সংগ্রহে শ্রমসাধ্য গবেষণা বা বিপদসংকুল ভ্রমণ করতে হয়েছে, সেই সকলই ভারতীয় মিশনারি আর শাসকদের দোরগোড়ায় পড়ে আছে, এবং বাংলার সমগ্র অনার্য ভাষাগুলি তথ্য আহরণ সরকারি যন্ত্রের সহায়তায় সহজেই ও স্বল্প ব্যয়ে করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য রয়েছে—শব্দভাণ্ডার সংগ্রহ করা, এবং প্রতি গোষ্ঠীর কথ্য ভাষার ব্যাকরণ সংকলন করা। যতদিন একটি ব্যাপক তুলনামূলক অভিধান

না রচিত হয়, ততদিন যৌগিক শ্রেণীর ভাষাগুলির বর্ণগুলির ধ্বনি-পরিবর্তন সম্বন্ধে কোনোরকম রায়দান অসম্ভব, এবং সেই কারণেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহুরূপে প্রচলিত একই শব্দমূলকে নিশ্চয়তার সাথে চেনা অসম্ভব। আর্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, এবং কোনো নির্দিষ্ট রূপভেদই ভাষার প্রতিটি বর্ণে কি কি পরিবর্তন ঘটে, তা বর্তমানে পণ্ডিতরা মোটামুটি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন।[১৮]

আদিবাসী ব্যাকরণ সংকলনে এবং সেইগুলির বিন্যস্তকরণে, স্লেইচারের পদ্ধতি মূল্যবান ইঙ্গিত দেয়। তাঁর কাজের ক্ষেত্রে একমাত্র রূপভেদই শ্রেণীর ভাষা, কিন্তু তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যৌগিক ভাষাগুলি শব্দমূলের সাথে বিভক্তি, প্রত্যয় ও উপসর্গের মিলনে গঠিত— ভারতীয় আদিবাসীদের কথ্যভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য মধ্যবর্তীগুলিকে বাদ দিয়ে, অবশিষ্ট দুইটি হতে দুইটি সরল ও চারটি জটিল বিন্যাস পাওয়া যায়। যেমন, ক. প্রধান শব্দমূলের সাথে অপরিবর্তিত অন্ত্য বিভক্তি প্রত্যয়াদি যুক্ত সর্বনামগত মূল, Rr ; খ. অথবা, সর্বনামগত মূলটি পরিবর্তিত, $Rr^{\times}$; গ. প্রধান শব্দমূলের সাথে অপরিবর্তিত অগ্র বিভক্তি প্রত্যয়াদি যুক্ত সর্বনামগত মূল, rR ; ঘ. অথবা সর্বনামগত মূলটি পরিবর্তিত $r^{\times} R$ । প্রধান শব্দমূলের সাথে একটি অগ্র বিভক্তি প্রত্যয়াদি ও একটি অন্ত্য বিভক্তি প্রত্যয়াদি যুক্ত করে সম্ভাব্য যৌগিক প্রকারভেদ গঠিত হয় ; যেমন, ঙ. r Rr ; চ. $r^{\times}$ Rr ; ছ. $r Rr^{\times}$; জ. $r^{\times} Rr^{\times}$ । সুতরাং, এখানে রয়েছে বিন্যাসের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিচ্ছিন্নকারী ভাষার মতো নির্জীবপ্রায় শ্রেণী হতে যার শুরু, এবং যার শেষে রয়েছে রূপভেদী ভাষার প্রায় সমগোত্রীয় এক ভাষা। যদি ভারতের আদিবাসী জাতিগুলি সম্বন্ধে গবেষণারত বিক্ষিপ্ত গবেষকবৃন্দ এই পদ্ধতি বা যে কোনো অভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং এইভাবে অর্জিত ফলাফলগুলি একত্রে সন্নিবেশিত করেন, তাহলে অনার্য ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা অপসারিত হবে। প্রতীকী বর্ণগুলির সমাহার দ্বারা সম্ভাব্য সকল প্রকারভেদের সমগ্র সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে। ভারতীয় ছাত্রদের একমাত্র কাজ হবে প্রতিটি ভাষাকে তার উপযুক্ত শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা— অন্যান্য প্রকারের অনুমান নির্ভর অস্তিত্ব এবং সকল প্রকার অনুমানের বিষয়গুলি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের উপর অর্পণ করলেই হবে।

যদিও গঠন-কাঠামোর বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাঁওতালি ভাষা যৌগিক শ্রেণীর ভাষাগুলির, এবং সেই শ্রেণীর দ্বিতীয় অর্থাৎ $Rr^{\times}$ প্রকারের অন্তর্গত, তবু রূপভেদী ভাষাগুলির বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার সাথে এই ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। সংস্কৃতভাষী জনগণের সংস্পর্শ দিয়ে এই সাদৃশ্যের অনেকগুলি ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু সবগুলিরই ব্যাখ্যা মেলে না। তিনটি সাঁওতালি সর্বনাম ও তিন প্রকারের বিশেষ্য নিয়ে আলোচনাই যথেষ্ট।

সংস্কৃতে রয়েছে এক অদ্ভুত, প্রত্যয় 'চিৎ' – এইটি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম হিসাবে কখনো নিজে থাকতে পারে না, আপেক্ষিক অনির্দিষ্টতা আরোপ করার জন্য এইটি ব্যবহৃত হয়। যেমন,'কস্' অর্থাৎ' 'কে' শব্দের সাথে চিৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'কশ্চিৎ' অথাৎ 'কেউ'। ঐ একই প্রত্যয় হতে অনির্দিষ্ট সংযোজক 'চেৎ' অর্থাৎ 'যদি' পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার এই প্রত্যয়টি স্বনির্ভর সর্বনামগত পদ হিসাবে অচলপ্রায় হলেও এবং প্রত্যয় আকারে প্রধানতর শব্দমূলের সাথে সদা যুক্ত থাকলেও, সাঁওতালি ভাষায় এইটি স্বনির্ভর অনির্দিষ্টতা সূচক সর্বনাম আকারে বর্তমান এবং বহুসংখ্যক শব্দাবলীর জনক। যেমন, সাঁওতালি ভাষায়, 'চেৎ','কি'; 'চেৎ-হোঙ', 'যা কিছু'; 'চেৎ-চো', 'বোধহয়,' 'কে জানে'; 'চেৎ-লেকো," 'কিসের মতো' ইত্যাদি।

সাঁওতালি বিশেষণ 'জো-তো', 'সব',-এর সাথে অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ 'সর্ব'-এর নিশ্চিত কোনো সাদৃশ্য নেই। কিন্তু 'জো-তো', সাধারণ নিয়মানুসারে 'জা-উতা' শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ; এবং প্রাপ্ত নগ্ন শব্দমূল 'জা' সংখ্যা, পরিমাণ বা ধারাবাহিক কালসূচক বহু সাঁওতালি যৌগিক শব্দের ভিত্তিমূল। অনুরূপভাবে, 'জা-আগে' ও 'জা-যুগ', 'বহুবার', 'চিরকাল'; জা-উহিলো', 'সর্বদা'; 'জা-আরাতে', 'বিশাল পরিমাণকে একত্রিত করা,' 'সংগ্রহ করা'; বিশেষণ 'জাক্' 'বহু', 'জনাকীর্ণ', যেইটি নীচু শ্রেণীর বাংলা ভাষায় অপরিবর্তিত রূপে গৃহীত হয়েছে। অবিকৃত অবস্থায় এই শব্দমূলটি রক্ষিত রয়েছে একটিমাত্র সংস্কৃত ক্রিয়া-বিশেষণে। সংস্কৃত 'জা-তু', 'সদা', 'কখনো কখনো' এবং এর না-সূচক রূপ, 'না-জা-তু', 'কখনো না', 'কোনো সময়ে না,' – যে প্রাচীন ভাষা হতে সাঁওতালি সহ সমগ্র ইন্দো-জার্মান ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছে, সেই ভাষায় ইন্দো-আর্য সর্বনামগত পদের মধ্যে এই শব্দদ্বয় শক্তিশালী ও উর্বর শব্দ মূলগুলির প্রায় একমাত্র অবিমিশ্র প্রতিনিধিত্ব করে।

একটি সাঁওতালি সর্বনাম হচ্ছে 'না-ই'[১৯] – বিভিন্ন যৌগিক শব্দে এট দেখা যায়, যেমন 'না-হারি', 'ইহাতে', 'পর্যন্ত', 'এখন'; 'না-তে', 'এই দিকে', 'এখানে'; 'না-অঁতে', 'এখানে', ইত্যাদি। এর একটি প্রকৃতি প্রত্যয়জাত শব্দ হচ্ছে 'না-সে', এইটি কখনো এককভাবে ব্যবহৃত হয় না, সর্বদা দ্বিত্ব রূপে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, 'না-সে না-সে', 'কিছু'। সংস্কৃতে বিভক্তিযোগে অপরিবর্তিত অব্যয় 'না-না', 'নানাবিধ' শব্দের সাথে তুলনীয়। সাঁওতালি সর্বনামের প্রথম পুরুষের রূপ, কারো কারো মতে, ড. ডোনাল্ডসনের অনুমানের প্রমাণ জোগায়। তিরিশ বৎসর আগে এই অসাধারণ ভাষাবিজ্ঞানী সর্বনামের প্রথম পুরুষে ব্যবহারের জন্য চারটি ভিন্ন ভিন্ন অব্যয়, 'টা', 'না', 'সু' এবং 'নি' উল্লেখ করেছেন – এদের মধ্যে মাত্র দুইটি তাঁর দ্বারা পরীক্ষিত ভাষাগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় চারটিই

পাশাপাশি, অনাবৃতভাবে, ডোনাল্ডসন- বর্ণিত রূপে বর্তমান। যেমন, 'টা-ই', 'তাহার'; 'না-ই', 'এই ব্যক্তি'; 'নু-আ', ও 'নি-আ', 'এই বস্তু'। কাকতালীয় হলেও এইটি খুবই বিস্ময়জনক।

বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে, সাঁওতালি শব্দকোষ সংস্কৃত হতে গ্রীক বা ইংরেজি অপেক্ষা বহু বেশি মাত্রায় পৃথক, সম্ভবত এই পার্থক্যের মাত্রা আরবি ভাষার সমান। অবশ্য, সরল ভাব প্রকাশকারী বহু শব্দমূলের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাদৃশ্য প্রকাশমান। যেমন, সময় বিভাজনের ব্যাপারটা ধরা যাক—এখানে দিন ও রাত্রির পার্থক্য সবচেয়ে সহজবোধ্য। দিন হচ্ছে সর্বকালে সর্বদেশে এক বিশ্বজনীন ঘটনা; এবং এইটি প্রমাণ করার জন্য ভারতে সংস্কৃতভাষী দিগ্বিজয়ীরা, ইয়োরোপে রোমান দিগ্বিজয়ীরা এবং নব্য দুনিয়ার স্যাক্সন পুনর্জয়ীরা একই শব্দমূল ব্যবহার করেছে। এই শব্দমূল, 'দিভ্' প্রাথমিক ভাবে 'আলো' বা 'ঔজ্জ্বল্য' বোঝায়; কিন্তু সংস্কৃতে রয়েছে একই রকমের আর একটি শব্দমূল, যা এই শব্দমূলেরই প্রাচীন কোনোরূপ, বা সম্ভবত একটি পৃথক শব্দমূল—'দিন' হলো সেই শব্দমূল। প্রথম শব্দমূলটি, 'দিভ' ইন্দো-জার্মান ভাষায় সর্বজনীন ভাবে গৃহীত হলেও সাঁওতালিতে তার কোনো চিহ্ন নেই; কিন্তু দ্বিতীয়টি, 'দিন' তুলনায় ব্যাপক সংখ্যক ভাষায় ব্যবহৃত না হলেও, সংস্কৃত ও সাঁওতালিতে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য, উভয় ভাষাতেই এই শব্দটি প্রাচীনতা ও দুর্বলতায় আকীর্ণ এবং আরো শক্তিশালী শব্দের উপর নির্ভরশীল। এর আসল ক্ষেত্র হলো লিখিত রচনা—এখানে এইটি অপর সংস্কৃত শব্দমূলটির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং সাঁওতালিতে সমার্থক অপর সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত শব্দমূল, 'দিন', 'দিবস'; সাঁওতালি, 'দিন কালোম', 'গত বৎসর'; 'দিন-তালাউতে', 'সময় অতিবাহিত করা', 'ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করা'; 'দিন-হিলোহ', 'দৈনিক,' 'প্রতিনিয়ত'। বিশুদ্ধ সাঁওতালিতে 'দিন' শব্দটি স্বনির্ভরভাবে ব্যবহৃত হয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু উপরিউক্ত যৌগিক শব্দগুলি আদিবাসী মাতৃভাষার সহজাত ও অকৃত্রিম অংশ। সাঁওতালিতে দিন বোঝাতে আরো কয়েকটি শব্দ রয়েছে, সবচেয়ে প্রচলিত হচ্ছে 'মাহা'।

সাঁওতালি ভাষায় বিমূর্ত শব্দাবলী না থাকায় 'সময়' সূচক কোনো শব্দ নেই; কিন্তু 'কাল্' শব্দমূল হতে সময়জ্ঞাপক বহু যৌগিক শব্দ রয়েছে: যেমন, 'কাল্-ওম্', 'আগামী বৎসর'; 'দিন-কাল-ওম্', 'গত বৎসর'; 'হল্-কাল-ওম্', 'দুই বৎসর আগে'; 'মাহাঙ-কালোম', 'তিন বৎসর আগে'। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, শব্দমূল 'কাল' হতেই 'সময়'-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কাল্-অ'-এর সৃষ্টি।

অপর উদাহরণ: একই জাতির বিভিন্ন শাখা, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম সাধারণত একই মূলজাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। প্রতিটি ভাষায় মাথার

প্রতিশব্দ অতিরিক্ত অপর একটি বহন করে—যেমন, প্রাধান্য বা সর্বোপরি। অনুরূপভাবে, সংস্কৃত শব্দমূল 'শির' অর্থাৎ 'মাথা'র অর্থ দাঁড়ায় বৃক্ষের শীর্ষদেশ, সেনাবাহিনীর অগ্রগামী অংশ, ইত্যাদি। সাঁওতালি 'শির' শব্দমূল কখনো একক ভাবে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু অসংখ্য শব্দগোষ্ঠীর ভিত্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়; যেমন, 'শির-ওম্' 'ঘাড়' অর্থাৎ মাথার নিম্নভাগে—'ওম্' বা 'উম্' সাঁওতালি অবস্থানগত সর্বনামের কাজ করে; 'শির-শির-আউতে', 'কাঁপা', 'রাগে মাথা নাড়া'; 'শির-অরিতে', 'লেগে-থাকে'—ইংরেজি 'হেডস্ট্রং', 'গোঁয়ার' শব্দের অনুরূপ; 'শিরাহ্-বড়াহ', 'চমৎকার', সর্বোৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে মাংসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; 'শির-হিটে', 'ঘরের চালা ছাওয়া'। গলার সংস্কৃত শব্দমূল 'গল্'—এইটি হতেই খাওয়া, বলা ও গলে যাওয়ার শব্দগুলি উদ্ভুত। সাঁওতালি ভাষায় গলা ও খাওয়ার জন্য প্রতিশব্দ ভিন্ন ভিন্ন উৎসজাত, কিন্তু রচনায় বলা ও গলে যাওয়া প্রকাশ করার জন্য এই একই শব্দমূল 'গল্' ব্যবহৃত হয়; যেমন, 'গল্-মারাউতে', 'কথোপকথন করা', 'গল্প করা'; 'গলাম্-গলাম্', 'অস্পষ্ট'; 'গল্-আউতে', 'নরম হওয়া', যেমন জলের সাহায্যে চুন নরম হয়।

ঘাড়ের পরই বাহু; এবং এই অঙ্গের ইন্দো-জার্মান প্রতিশব্দ 'হস্ত' বা এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'হাত',—একক ব্যবহৃত শব্দ হিসাবে সাঁওতালিতে অজ্ঞাত হলেও, এইটি রচনায় দেখা যায়। যেমন, 'হাত-লাহ', 'বগল'; 'হাত-আউতে', 'কেড়ে নেওয়া'; 'হাত-ওআতে' 'অন্ধকারে হাতড়ানো', 'খোঁজা'; 'হাত-আরাওতে', 'জলে হাতড়ানো', 'জলে হাত দিয়ে মাছ ধরা'। যে ইন্দো-জার্মান শব্দমূল হতে সংস্কৃত 'গর্ভ' শব্দ গঠিত, সেইটির সাঁওতালি রূপ দেখা যায় সাঁওতালি ক্রিয়ায়—'গররাউতে', 'গর্ভপাত'।

সমাপ্তিতে আরো সন্দেহজনক সাদৃশ্যগুলির তুলনা। যে শব্দমূল হতে ইংরেজি জোরালো শব্দ 'ম্যান' সৃষ্ট, মানুষ প্রজাতি বোঝাতে সেই একই শব্দমূল হতে ইন্দো-জার্মান ভাষাগুলির অধিকাংশের প্রতিশব্দ আহরিত হয়েছে। 'ম্যান' শব্দটি প্রাথমিক ভাবে চিন্তাশীল জীব বোঝায়, এইটি 'মন্', 'চিন্তা করা' শব্দমূল জাত এবং সাঁওতালি ভাষায় এই একই শব্দমূল মনুষ্যজাতি ও মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তির কাজকর্ম সম্বন্ধে ব্যাপক, বিচিত্র শব্দগুচ্ছের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যেমন—

শব্দমূল, 'মন্', 'চিন্তা করা'।

ইংরেজি	গ্রীক	সংস্কৃত	সাঁওতালি
man ইত্যাদি	us´vos, মনন US´UOVA আগ্রহান্বিত হওয়া	[২০]মন্, উপলব্ধি করা মনু, আদি মনুষ্য মানব, মানুষ	'মন্-এতে', চিন্তা করা 'মন্-এ', আত্মা 'মানি কো' প্রথম মানুষ 'মান্ জনম্', বা 'মনই-জনম্', মনুষ্য জাত

সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন অংশের ভাষা সম্বন্ধে যে পাদরিটি ব্যাপকতম গবেষণা করেন, তিনি এই শব্দগুলি সংস্কৃত হতে গৃহীত হিসাবে চিহ্নিত করেন নি ; কিন্তু সংস্কৃত অনুরূপ শব্দগুলির সাথে এদের সন্দেহজনক সাদৃশ্য রয়েছে। এইগুলি প্রকৃত আদিবাসী হলেও এদের ভিত্তি করে কোনো তত্ত্ব খাড়া করা নিরাপদ নয়। অতি প্রাচীন ভাব প্রকাশে সাঁওতালি ও সংস্কৃতে সাধারণ শব্দমূলের অস্তিত্ব পূর্বোক্ত উদাহরণগুলিতে নির্দেশিত হয়েছে ; কিন্তু রূপভেদী ও যৌগিক ভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য এতবেশি ও এত চরম ব্যাখ্যাবিহীন যে, এইগুলি হতে কোনো সাধারণ বা এমনকি সমগোত্রীয় উৎস খোঁজার প্রচেষ্টা অর্থহীন।

পুরাকালে ভারতের আর্য হানাদাররা যে সাঁওতালদের বা সমগোত্রীয় কোনো জাতির সংস্পর্শে আসে এবং সংস্কৃত ভাষার এক অতি প্রাচীন রূপ প্রাকৃত ভাষার মধ্যে যে বিশুদ্ধ সাঁওতালি শব্দাবলী গৃহীত হয়, বর্ণমালা চর্চাকালে আমরা এই অনুমানের যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি পেয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ, আর্য শব্দ 'স্তম্ভ', ব্যবহার করার বদলে সংস্কৃতভাষীরা একটি অনার্য শব্দ 'খুঁট-আ' ব্যবহার করে।[২১] এই 'খুঁট-আ' অবিমিশ্র সাঁওতালি শব্দ একমাত্র অন্ত্য স্বরবর্ণটির পরিবর্তন ঘটেছে ; যেমন, প্রাচীন প্রাকৃতে, 'খুঁট-আ', আধুনিক সাঁতালিতে 'খুঁট-ই' খুঁটি, স্তম্ভ। এখানে সাদৃশ্য চরম, এমনকি ব্যবহৃত তালব্য বর্ণ দুইটি 'ট' এবং অনুনাসিক বর্ণটি উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন। আর একটি উদাহরণ, 'ভেড়া'। এইটি বর্তমানে সাঁওতালি ভাষায় ব্যবহৃত একটি শব্দ ; সংস্কৃতে এর একক ব্যবহার ঘটে এবং এর উৎস স্পষ্ট নয়। বানানে তালব্য 'ড়'-এর উপস্থিতি হতে অনুমিত হয় যে, শব্দটি একটি প্রকৃত আদিবাসী শব্দ—আর্যরা এইটি দেশের আদি বাসিন্দাদের কাছ হতে গ্রহণ করে। আবার, সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মতে, 'পোতা'[২২] (অর্থাৎ পেট) শব্দটি একটি আদিবাসী শব্দ—প্রাকৃতে এইটির অনুপ্রবেশ ঘটে। এখন,

প্রাকৃতে 'পোতা' তালব্য বর্ণ ব্যবহার করে বানান করা হতো, সাঁওতালিতে আজো তাই হয়, এবং প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কোনো-না কোনো মোটা লোকের ডাক নাম 'পোতিয়া', 'পেট মোটা'।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে, আদিবাসী কথ্যভাষা হতে বিজয়ী আর্যদের কথ্যভাষায় এইভাবে গৃহীত শব্দের পেছনে রয়েছে অকথিত অতি করুণ কাহিনী। উদাহরণ-স্বরূপ, সাঁওতালি সংখ্যা 'পোন্-এয়া' বা রচনায় 'পোন্' (অর্থাৎ 'চার') শব্দটিকে নেওয়া যাক। সংস্কৃত 'চতুর' বা আধুনিক বাংলা ভাষায় 'চারি' (অর্থাৎ চার) থেকে উচ্চারিত কোনো শব্দই পৃথকতর হতে পারে না। অবশ্য 'এক-চতুর্থাংশ কম' বোঝাতে বাংলার নিম্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে এক অদ্ভুত শব্দের প্রচলন আছে। যেমন দুই ও আরো এক-চতুর্থাংশ বোঝাতে তারা বলে পৌনে-তিন অর্থাৎ তিন হতে এক চতুর্থাংশ কম; একই ভাবে পঁচাত্তরকে বলা হয় 'পৌনে শত' এবং সাতশত পঞ্চাশকে বলা হয় পৌনে হাজার। শব্দটি কখনো সংখ্যা আকারে বাংলায় আসে না, অদ্ভুত এই 'এক-চতুর্থাংশ কম' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এইটি সাঁও-তালি 'চার' সংখ্যার সদৃশ। যেমন, বাংলা 'পৌন-এ', 'এক-চতুর্থাংশ কম'; সাঁওতালি 'পোন্-এয়া', 'চাব'। আবার, প্রাচীন বাংলায়—'পো-ইয়া', 'এক-চতুর্থাংশ'—একটি শব্দ ছিল, আজও এইটি গ্রাম্য হাট-বাজারে চালু; শব্দটি সংস্কৃত 'পদ', 'যাওয়া' শব্দমূল হতে 'পাদ্' বা 'পায়', 'চরণ' রূপের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে বলে বৈয়াকরণরা ভান করেন। কবিতার চরণ অর্থাৎ কবিতার চতুর্থ স্তবক হতে বা বীজগণিতীয় পরিমাপ ফুট হতে সিদ্ধান্ত টানা হয়। 'পোয়া' এবং 'পদ'—এই দুইটির সংযুক্তি করণে বৈয়াকরণরা সম্ভবত সঠিক; কিন্তু 'পদ' হতে সরাসরি 'পোয়ার' উদ্ভব নির্ণয়ে তারা নিশ্চিত রূপে ভ্রান্ত। বাংলা 'পৌনে' এবং 'পোয়া' অবিসংবাদিত ভাবে আদিবাসীদের মাতৃভাষা হতে, 'পোন-এয়া' হতে গৃহীত হয়েছে। প্রথম পরাজিত উপজাতিরা তাদের প্রচলিত 'পোয়া' শব্দটি তাদের ও তাদের প্রভুদের মধ্যে চলিত মিশ্রভাষার মধ্যে সফলভাবে চালু করে; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সমার্থক চারটি সংস্কৃত শব্দ,[২৩] এবং শক্তিশালী সংস্কৃত ভাষা হতভাগ্য এই আদিবাসী শব্দটিকে বাংলাভাষা হতে বিতাড়িত করে, ঠিক যেভাবে বিতাড়িত হয়। অধিকন্তু যে সব আদিবাসী এই দেশে থেকে যায়, তাদের যেমন ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। তেমনই 'পোয়া' শব্দটি ভদ্র ভাষা হতে বিতাড়িত হয়ে ফেরীওয়ালাদের মুখে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়—আজও তাদের বেচা কেনায় 'পোয়া' ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে 'পৌনে' শব্দটির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো সংস্কৃত প্রতিশব্দ ছিল না, ফলে বাঙ্গালীদের মিশ্রভাষায় এই শব্দটি স্থান পায়।

অন্যদিকে সাঁওতালরা আর্যভাষা হতে অবাধে বহু শব্দ গ্রহন করে। তাদের শব্দভাণ্ডার সন্দেহাতীত ভাবে সংস্কৃতজাত শব্দ দ্বারা পূর্ণ, আর ও কোনো প্রাচীন কথ্য ভাষা হতে এসেছে। আমরা দেখেছি যে সুদূর অতীত হতে প্রাকৃত

ভাষার সংস্পর্শে এসে বহু শব্দ গ্রহণ করে। এবং সহজেই দেখানো যায় যে, সাঁওতালিও এই ভাবে প্রাকৃতের কাছে ঋণী। এর বিমূর্ত শব্দাবলীর ক্ষুদ্র তালিকা প্রায় অপরিবর্তিত রূপে প্রাচীন আর্য বাসিন্দাদের অপভ্রংশ হতে গৃহীত হয়েছে।

আর্যজাতির ভারতে প্রথম ঐতিহাসিক আবির্ভাব হতে গ্রামই রাজনীতিগত ভাবে তাদের সর্বনিম্ন সংস্থা এবং হিন্দুদের সমগ্র সামাজিক অর্থনীতির ভিত্তি এই গ্রামীণ সংস্থাগুলি। ইন্দো-আর্য ভাষায় এই গ্রামের অর্থাৎ রাজনৈতিক এই সর্বনিম্ন সংস্থার কোনো চিহ্ন প্রকৃত সাঁওতালিতে নেই। আদিবাসী জাতি আরো একধাপ পিছিয়ে, যাযাবর সমাজের পরিবার ভিত্তিক সরলতর ব্যবস্থা কায়েম করে। গৃহস্থালীর ইন্দো-আর্য প্রতিশব্দ, 'কুলা' সাঁওতালিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রতিটি সাঁওতাল গোষ্ঠীর ভিত্তিরূপে এইটি বর্তমান। সাঁওতাল গ্রামে, মূলত একটি মাত্র রাস্তা থাকে, রাস্তার দুই দিকেই বাড়ি; এবং মধ্যবর্তী এই পথ সমগ্র সাঁওতাল ভূমিতে'কুল-হি' অর্থাৎ পরিবারগুলির বিভাজক, নামে পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী পাহাড়িয়াদের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী-অধ্যায় গুলিতে ৫টি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট বলা হয়েছে।

প্রথম—তাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত ও রূপভেদী ভাষাগুলি হতে পৃথক এবং স্লেইচাবের দ্বিতীয় শ্রেণীতে, যৌগিক ভাষাগুলির অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয়—তৎসত্ত্বেও, মনে হয় এতে রয়েছে অতি সরলভাব প্রকাশকারী কতকগুলি শব্দমূল, যেইগুলি সংস্কৃতে পাওয়া গেলেও সংস্কৃতজাত নয়, যেমন সেমেটিয় ও আর্য ভাষায় কয়েকটি অনুরূপ শব্দমূল পাওয়া যায়, যেইগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরজাত নয়, কিন্তু সম্ভবত কোনো উৎসজাত।[২৪]

তৃতীয়—কোনো সুদূর অতীতে সংস্কৃত ভাষা সাঁওতালি বা তার কোনো প্রাচীন রূপের সংস্পর্শে আসে; সংস্কৃত সাঁওতালি ভাষা থেকে গ্রহণ করে—

সম্ভবত, আদিম স্বল্প বর্ণমালা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি অনার্য ধ্বনি;[২৫]

নিশ্চিতভাবে, বহু শব্দ, যেইগুলি প্রাচীন প্রাকৃতে ও বর্তমান সাঁওতালিতে অপরিবর্তিত অবস্থায় দেখা যায়;

বাংলাভাষার সাথে মোটামুটিভাবে প্রাকৃতের সেই সম্পর্ক যা প্রাকৃতের সাথে সংস্কৃতের ছিল; বাংলাভাষা সাঁওতালি হতে ক্রমান্বয়ে শব্দগ্রহণ করেছে আর সাঁওতালি প্রাচীনতর আর্যভাষা হতে প্রভূত পরিমাণেও গ্রহণ করেছে।

চতুর্থ—সংস্কৃতচর্চা রূপভেদী ভাষাগুলির ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়েছে, সাঁওতালি সহ ভারতের অন্যান্য আদিবাসী ভাষাচর্চা যৌগিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রে সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে; এই ভাষাচর্চা পরিচালনার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমান; বঙ্গদেশে ও তার অধীন অঞ্চলগুলি সকল প্রকার ভাষার কেন্দ্রস্থল, ফলে এইখানে রয়েছে গবেষণার অভূতপূর্ব সুযোগসুবিধা এবং সেই ভিত্তি যা ব্যবহার করে যে কোনো দক্ষ ভাষাবিজ্ঞানী অগ্রসর হতে পারেন

এবং ভাষাগত এক নতুন দুনিয়া আবিষ্কার করতে পারেন।

পঞ্চম—সংস্কৃত ভাষা যেমন ইন্দো-আর্যদের যাত্রারম্ভ স্থল হিসাবে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে নির্দেশ করে তেমনই ভারতীয় আদিবাসীদের আদিনিবাস হিসাবে হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে সাঁওতালি ভাষা চিহ্নিত করে; অন্যদিকে সাঁওতালি কিংবদন্তি, পূর্ব-বাংলার মধ্য দিয়ে তাদের পশ্চিম-অভিমুখে যাত্রার এবং অবশেষে, আর্যদের ধাক্কায় নিম্ন উপত্যকার পার্বত্যাঞ্চলে বসতি গড়ার ইঙ্গিত দেয়।

সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলদায়ী ঈশ্বরের কোনো ধারণা সাঁওতালদের নেই। তার ধর্ম হচ্ছে ত্রাস ও কাকুতি-মিনতির ধর্ম। উন্নততর জাতি দ্বারা দেশ হতে দেশান্তরে অনুসৃত এবং বিতাড়িত সাঁওতালদের পক্ষে বোঝা কঠিন যে তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ কেন তার কোনো অনিষ্ট করবে না। এদের মধ্যে যারা বিচ্ছিন্নতর জীবনযাপন করে, তাদের কাছে দেবতার গুণগানের কোনো মাহাত্ম্য নেই—এই সবে তাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জঙ্গলে পালিয়ে আত্মগোপন করা। সেই কারণেই জনৈক মিশনারি কর্তৃক সর্বময় ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করার পর এক সাঁওতালের একমাত্র উত্তর ছিল, 'ঐ সর্বশক্তিমানটা আমাকে খেয়ে ফেললে কি হবে'?

কৃপা প্রার্থনা করার মতো বদান্য কোনো ঈশ্বর সাঁওতালদের না থাকলেও, তাদের রয়েছে অসংখ্য প্রেত ও পিশাচ। এদের আক্রোশ হতে বাঁচার জন্য তার প্রার্থনার অন্ত নেই। তাই, তারা ধর্মহারা তো নয়ই বরং হিন্দুদের চেয়ে তাদের আচার অনুষ্ঠান বহুগুণ বেশি: প্রকৃতিগত কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় যে সদা সচকিত, পরলোকের উপস্থিতিতে বিশ্বাস তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাস্তব ফলপ্রসূ। শুভকাজকে পুরস্কৃত করার জন্য তার কোনো ঈশ্বর নেই; কিন্তু সর্বদা নিকটেই রয়েছে একদল দানব যাদের কাজ হলো দুষ্টের দমন করা, রোগজ্বালা আর গবাদি পশুর মহামারী ছড়িয়ে দেওয়া, শস্যহানি করা এবং এইগুলি হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় পশুবলি আর প্রায়শই রক্তদানের ঘুষ।

সাঁওতালদের পুজাপার্বণের ভিত্তি তার পরিবার। প্রত্যেক পরিবারের রয়েছে নিজস্ব দেবতা (ওরা বোঙা) তার পূজা হয় অজ্ঞাত আচার-অনুষ্ঠান পালন করে—সেইসব আবার অচেনা লোকদের থেকে সযত্নে গোপন করা হয়। এই গোপনীয়তা এতই কঠোর যে এক ভাই কি পূজা করে, তা অপর ভাইও জানে না, এবং আলোচনায় এই প্রসঙ্গের অবতারণামাত্র দেখা দেয় সন্দেহের ভ্রূকুটি, অথবা পাহাড়িয়া আদিবাসী প্রাণপণে দৌড় মারে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। আমি যতটুকু জেনেছি, এইসব গৃহদেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয় শুভ কামনার জন্য নয়, বরং অশুভ হতে বাঁচার জন্য। যেমন, 'ঝড়ে যেন আমার চালাটুকু রক্ষা পায়'; 'আমার ধানের ক্ষেতে যেন পোকা না লাগে'; 'আমার



স্ত্রীর যেন কন্যাসন্তান না হয়; 'সুদখোরটাকে যেন বুনো জন্তুতে খায়'। পরিবারের কর্তা মৃত্যুশয্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের কানে কানে গৃহদেবতার নাম বলে যায়, এবং এই ভাবেই বংশানুক্রমে একই পারিবারিক দেবতার পূজা অব্যাহতভাবে চলে। সাঁওতালদের গৃহদেবতা অশুভ শক্তির গোপন উৎস, কোনো বন্ধ দুয়ার তাঁকে প্রতিহত করতে পারে না, প্রতিটি ঘরের কোনে তাঁর অদৃশ্য বিদ্বেষ পরায়ণ উপস্থিতি। গৃহদেবতা ছাড়াও প্রত্যেক পরিবার পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মা উপাসনা করে। ব্যক্তিগত অমরত্বে বা পরলোকের কোনো নির্দিষ্ট ধারণা ব্যতিরেকেই, মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সঙ্গে এই পৃথিবীর সকল সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, এই কথা সাঁওতালরা বিশ্বাস করে না—বরং তারা নিজেদের চারপাশে ছায়াময় এক দুনিয়ার নিরন্তর অস্তিত্ব কল্পনা করে। কায়াহীন প্রেতেরা, একদা সেইসব জমি কর্ষণ করেছে সেইখানে ভেসে বেড়ায়, যেইসব ঝর্ণায় তারা মাছ ধরেছে, তার তীরে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং যে ঘরে তাদের জন্ম সংসার ও মৃত্যু, সেইখানে তাদের অবিরত ও নিঃশব্দ যাতায়াত। এই প্রেতকুলকে বহু উপায়ে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন এবং সাঁওতালরা তাদের গৃহদেবতার মতোই পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাদেরও ভয় করে।

সাঁওতাল গ্রামের পাশেই থাকে শালকুঞ্জ—তাদের জাতীয় বৃক্ষ,[২৬] যেই খানে, তাদের বিশ্বাস, এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সকল গৃহদেবতার প্রিয় নিবাস। এর নীরব আলো-আঁধারি হতে বিগত পূর্বপুরুষেরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের জীবনের বিভিন্ন ভূমিকায় ক্রীড়ারত দেখে। তারা খুব একটা বৈরীভাবও পোষণ করে না; তবুও শালবন নিবাসী এইসব ভূতুড়ে অধিবাসীরা কড়া সমালোচক, এবং ঠিক মতো তুষ্ট করা না হলেই তারা অঙ্গবিকৃতি, স্নায়ুবিকার ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত করেন। বৎসরে কয়েকবার সমগ্র গ্রাম রঙিন বস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে গ্রামদেবতার উপাসনার জন্য নৈবেদ্য আর বলি নিয়ে গানবাজনা সহকারে শালকুঞ্জে উপনীত হয়। পুরুষ আর নারীরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায়, বিশাল বৃত্তাকারে নাচ শুরু হয়, সম্প্রদায়ের আদিপিতার স্মরণে গান চলে। ছাগল, লাল মোরগ আর ছোট ছোট মুরগি বলি দেওয়া হয়; কিছু উপাসককে আগুনের ধারে ভোজের জন্য মাংস রান্না করতে পাঠানো হয়, বাকিরা তখন পরিবারগত ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের গৃহদেবতার প্রিয় বিশেষ গাছটিকে ঘিরে নাচে। আরো কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপজাতিদের মধ্যে প্রতিটি গাছকে ঘিরে প্রত্যেক পরিবারের নাচের প্রথা প্রচলিত—যাতে কোনোক্রমে তাদের দেবতাদের আবাস বিশেষ গাছটি বাদ না পড়ে যায়।

শালবনের গ্রাম্য দেবতারা ছাড়াও, সাঁওতালরা যেইখানেই যায় সেইখানেই তুষ্ট করার জন্য দেবতা দৈত্য ও পিশাচদের সন্ধান পায়। যেমন আবগী বা নরভুক পিশাচ; পরগনা বোঙা, গ্রাম্য দেবতা: উভয় শ্রেণীই পরিত্যক্ত প্রাচীন

গ্রামের রক্ষাকারী দেবতা। বাসযোগ্য কোনো গাছ বা গুহা না পাওয়া পর্যন্ত এরা সাঁওতাল অঞ্চলে অতৃপ্তভাবে বিচরণ করে। গ্রীকরা যে কুসংস্কারকে সুন্দর এক রূপ দিয়েছে, তারই অবশেষ আজও বেঁচে আছে দা-বোঙা (নদীর দানো), দান্দী-বোঙা (কুয়োর দানব), পাকরি-বোঙা (পুকুর-দানব), বুরু-বোঙা (পর্বত-দানব), বীর-বোঙা (বনদেবতা) ইত্যাদিতে। চাঁদো, অর্থাৎ সূর্য দেবতা, যদিও বড় একটা বলি গ্রহণ করে না, তবু ইনি তত্ত্বগত ভাবে প্রধান দেবতা হিসাবে স্বীকৃত। কখনো কখনো মুরগি-খেকো সিম-বোঙা হিসেবে সূর্য দেবতার পূজা হয় এবং চার-পাঁচ বৎসর অন্তর তাঁর সম্মানে এক ভোজ দেওয়া হয়। বস্তুত, সাঁওতাল ধর্মে রয়েছে পারিবারিক ভিত্তির উপর গঠিত পৌরাণিক উপাখ্যান, কিন্তু আদিমতর প্রকৃতিপূজায় সাঁওতাল ধর্মের মূল নিহিত।

পরিবারকে ভিত্তি করে সংগঠিত সমাজে, গ্রামের পরই আসে উপজাতির কথা। সাঁওতালদের মধ্যে রয়েছে সাতটি উপজাতি,[২৭] প্রত্যেক উপজাতি এক অভিন্ন আদিপুরুষ জাত বলে দাবি করে এবং নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠান বজায় রাখে। বৎসরে একবার বিরাট সমারোহে উপজাতি-দেবতা আবে-বোঙার উপাসনা হয় ; কিন্তু যেহেতু সন্তানরা পিতার উপজাতি ভুক্ত, তাই শুধু পুং জাতীয় প্রাণী বলি দেওয়া হয়। প্রতিটি উৎসবই একে অপরের এত অনুরূপ যে একটি মাত্র উৎসবের প্রত্যক্ষদর্শী কৃত বিবরণ দানই যথেষ্ট : "বৃদ্ধ ও যুবা, পুরুষ ও নারী হাজারে হাজারে জমায়েত হলো, এবং প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে উৎসবের মেজাজে সামিল হন। ভারি পিতলের গহনায় সালংকারা মেয়েরা সর্বোত্তম পোশাকে ছেলেদের হাত ধরে মুক্ত আঙিনায় অনাবৃত কুন্তলে নৃত্যরত। পুরুষদের পোশাক আরো জমকালো ও অদ্ভুত ; তাদের পোশাকে যদিও বা রামধনুর সকল রঙের ছটা না মেলে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যুবক সাঁওতাল প্রণয়ীটির জন্য পালক সরবরাহে কাঁটাচুয়া, ময়ূর ইত্যাদি জাতীয় বহু জীবের অবদান রয়েছে। সেই কারণেই দীর্ঘ আর সুন্দর পালকের বিচিত্র বাহার—কোনোটির দৈর্ঘ ফুট খানেক, আবার কোনটি পুরো পাঁচফুট দীর্ঘ। ধার করা এই পালকগুচ্ছ সব সমান খাড়াভাবে নেই বরং সর্বদিকে অভিমুখী। তদুপরি, মাথায় আর কোমরে লাল, নীল, হলুদ কাপড়ের টুকরোর পোশাক আরো জমকালো হয়েছে। ঢাক আর বাঁশির সাথে গান, আর ২০-৩০ জনের দল বেঁধে বৃত্তাকারে বা সঠিকতর ভাবে অর্ধ-বৃত্তাকারে নাচে। মাঠজুড়ে এইরকম ২৫-৩০টি দল, প্রত্যেক দলের সাথে তাদের নিজস্ব বাজনাদাররা—সারাদিন এবং একটা পুরো রাত্রি জুড়ে এই উন্মত্ততা চলে। এতগুলি ঢাকের অব্যাহত গুরু-গম্ভীর আওয়াজ, এত মানুষের কলরব, নৃত্যরত মানুষের উন্মত্ত চপলতা, আরো উদ্ভট পোশাক, তাদের অনাবৃতপ্রায় শরীর—সব মিলিয়ে আদিম জীবনের যুগপৎ প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।[২৮]

পরিবারের সাথে গোষ্ঠীর যে সম্পর্ক, গোষ্ঠীর সাথে জাতির সেই সম্পর্ক। মারাঙ্ বুরু, মহাপর্বত সাঁওতালদের জাতীয় দেবতা—তাদের কিংবদন্তি অনুসারে তাদের জাতির পালক ও রক্ষক; এই দেবতাই তাদের জন্মলগ্নে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাদের প্রাথমিকতম অভাবপূরণ করেণ এবং জাতির প্রথম যুগলের বিবাহ সম্পন্ন করান। গোপনে এবং প্রকাশ্যে, দুঃসময়ে এবং সুসময়ে, সুস্থ অবস্থায় এবং অসুস্থ অবস্থায়, বাসর শয্যার এবং মৃত্যুশয্যায় শোণিত নৈবেদ্যে মহাপর্বতকে আবাহন করা হয়। ইনিই সমগ্র জাতিকে একসূত্রে বাঁধা একমাত্র ধর্মীয় যোগ-সূত্র; এবং গৃহদেবতার উপাসনা কয়েকটি মাত্র পশুবলিতে সীমিত থাকলেও, এঁর ক্ষেত্রে পৃথিবীজাত বা অস্থাবর যে কোনো কিছুই নিবেদন করা যায়—ছাগল, ভেড়া, গো-মহিষাদি, পাখি চাউল, ফল, ফুল, মদ, জঙ্গল হতে জামফল, মাঠ হতে ধানের শীষ, এমনকি একমুঠি মাটিও;—সকল কিছুই মহাপর্বতের কাছে গ্রহণীয়। খ্রীস্টিয় চিন্তানুসারে না হলেও উচ্চ মার্গের চিন্তায়, তিনি হলেন জাতির জনক। তিনি স্বর্গীয় প্রেরণায় উপাসনা প্রচলন করেন, আদি নিবাস হতে যাত্রাপথে তিনি ছিলেন জাতির সহযাত্রী, পরাজয়ে এবং পলায়নে তিনি নিত্যসঙ্গী, এবং বর্তমানেও তিনি এদের চিরসাথী—শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরের প্রতীক।

গৃহদেবতার সবচেয়ে নিখুঁত প্রতিমূর্তি হচ্ছেন মহাপর্বত। তাঁর বন্দনা করেছে প্রথমে আদি পরিবার, তারপর প্রথম গ্রাম, তারপর প্রথম গোষ্ঠী, এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে সমগ্র জাতি। পরিবার ভিত্তিক ধর্মের চূড়ান্ত ফলাফলের তিনি হচ্ছেন মূর্ত প্রতীক—দেবতাবৃন্দের মাঝে তিনি সর্বদেবতা এবং সকল মানুষের পিতৃপ্রতিম।

সাঁওতালদের ধর্মীয় ব্যবস্থাতেও সর্বোচ্চ ঈশ্বরকে ত্রিমূর্তিতে বিভাজনের আর্যধর্ম সুলভ প্রবণতা দেখা যায়; এদের একটি বিমূর্ত ধারণা আকারে বর্তমান, আর অন্য দুটি পুরুষ ও নারী আকারে কল্পিত। মহাপর্বত পুরুষও নন, নারীও নন, কিন্তু এই দুয়ের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন নির্বাহী ভগবানের প্রতীক। মহাপর্বতের রয়েছে এক ভাই আর এক বোন; সাধারণত মদ সহযোগে পুরোহিত বা তাদেরও অর্চনা করেন, মদ ছাড়াও দামোদরের তীরে শাদা ছাগল এবং এক বিশেষ বর্ণের মুরগি তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়; কিন্তু আরাধ্য হিসেবে মহাপর্বতের নিচে এদের অবস্থান এবং বনাঞ্চলে এরা প্রায় অজ্ঞাত। এই ভাইটির নাম মানিকো—বিমূর্তভাবে সংস্কৃত ভাষীদের সাথে মনুর যে সম্পর্ক সাঁওতালদের সাথে এর সম্পর্ক একই, অর্থাৎ আদিপুরুষ। যে নারী ত্রিমূর্তির অন্যতম, তার নাম জহের-এরা, আদি নারী। মানিকো এই আদি নারীর যুগপৎ স্বামী এবং ভাই। তাদের আদি পিতামাতার এই অনুমোদিত বিবাহ থেকেই সাঁওতালদের বেআইনি যৌন-মিলনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত শব্দটি উদ্ভূত: যেমন, 'জহের-এতে'

'উপপত্নী গ্রহণ করা' বা 'উপপত্নীর সাথে বাস করা,' অর্থাৎ বিবাহের অনুমোদন ছাড়া, ঠিক যেমন মানিকো, জহের-এরাকে গ্রহণ করে।

মহাপর্বতের আরাধনা মূলত রক্তের আরাধনা। ভক্তবৃন্দ কোনো প্রাণী সংগ্রহে অক্ষম হলে, লালফুল বা লাল ফল নিয়ে দেব-সন্নিধানে আসে। বীরভূম পার্বত্যাঞ্চল ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার পর্যায়েও, নরবলির প্রচলন ছিল এবং বলির মানুষ সরবরাহের জন্য রীতিমতো ব্যবসা চালু ছিল। বর্তমানে নরবলি ঘটলে, তা ঘটে জঙ্গলের অতি গভীরে এবং এক্ষেত্রে সেই গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, যে গোপনীয়তা সহকারে সাঁওতালরা হিন্দু রাজাদের আমলে গোরু বলিদান করত। সাঁওতালদের পরোক্ষ উত্তর উৎসুক লোকদের হতবুদ্ধি করে, এবং সবচেয়ে বিশদ উত্তর হলো—"কিভাবে আমরা নরবলি দেব? এখনকার দিনে মানুষের দাম বেশি; কে তার দাম দিতে পারে?"

রক্তলোলুপ এই অনার্য দেবতাই যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রুদ্র এবং বর্তমান সমতলের অধিবাসী সংকর হিন্দু জনগণের আরাধ্য শিব, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।[২৯] উভয়ের পুজা এত সদৃশ যে আনাড়িরা সাধারণত তাদের অভিন্ন গণ্য করে এবং পাহাড়িয়াদের মাঝে কিছুদিন গবেষণাকারী একজন মিশনারি, বর্তমান অধ্যায়ের অংশবিশেষ যাঁর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত, সাঁওতালদের রক্তলোলুপ এই দেবতাকে অভ্যাসবশে শিব বা মহাদেব নামে উল্লেখ করেছেন। দেবলোকে প্রবেশের জন্য অনার্য এই দেবতার সংগ্রামের ইঙ্গিত বেদে আছে এবং বিভিন্ন পণ্ডিতগণ তার স্পষ্টতা স্বীকার করেছেন; বস্তুত, এই পবিত্রভূমিতে তাঁর প্রথম পদার্পণের দুর্বল এক মৌলিক কাহিনী বর্তমান। প্রাচীন এক পুঁথিতে রয়েছে, 'দেবতারা স্বর্গে গেলেন, তাঁরা রুদ্রকে (শিব) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে'? [৩০] নবাগত নিজেকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বলে ঘোষণা করলেন, বস্তুত আর্যদের মধ্যে তিনি তাই ছিলেন; এবং রোমানরা যেমন এট্রুরিয়ার দেবতাদের ও গ্রীসের দেবতাদের অভিন্ন গণ্য করতো, সেইভাবেই আর্য-দেবসভায় রুদ্র (শিব), নবাগত হিসেবে নয়, বরং ইন্দো-জার্মান দেবতাদের অন্যতম যে অগ্নি, তাঁর রূপ ধারণ করে, তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। অবশ্য, এই অভিন্নতা সহসা সম্পন্ন হয়নি; সেই কারণেই পদানত দেশের এক অঞ্চলের আর্য পুরোহিত যখন মন্ত্রোচ্চারণ করেন, 'রুদ্রকে প্রণাম, যিনি অগ্নিতে আছেন, যিনি জলে আছেন, যিনি লতাগুল্ম মধ্যে প্রবিষ্ট, যিনি এই বিশ্বসৃজন করেছেন;[৩১] তখন দেশের যে অঞ্চলে এই অভিন্নতা পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়নি, সেইখানের পুরোহিত পৃথক দেবতা হিসাবে রুদ্র ও অগ্নির আরাধনা করেন।[৩২] আদি সংস্কৃত ব্রহ্মবাদীরা ইহা স্পষ্ট ভাবে বোঝেন, এবং খুব সঠিক ভাবেই বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ দেবতা নানা নামে পরিচিত; কিন্তু এই দেবতা আসলে আদি সংস্কৃত দেবতা অগ্নি। একটি প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে, 'অগ্নি একজন

দেবতা, এইগুলি তার নাম : সর্ব, পূর্বদেশের জনগণের এইগুলি তার নাম : সর্ব, পূর্বদেশের জনগণের মধ্যে এই নাম প্রচলিত ; ভব, বাহিকারা এই নামে ডাকে ; পশুনাম্পতি (প্রাণীদের দেবতা), রুদ্র এবং অগ্নি। অগ্নি ব্যতীত এই সকলেই অনম্র' সম্ভবত এর অর্থ এই যে আদিবাসীরা রক্তলোলুপ রূপে যে দেবতার পূজা করে এই নামগুলি তারই সূচক। 'তার সবচেয়ে নম্র নাম অগ্নি' ; সম্ভবত এর অর্থ এই যে বিজয়ী আর্যদের কাছে যে মঙ্গলদায়ক রূপে দেবতা পবিচিত ছিলেন, এইটি তারই সূচক।[৩৩]

আদিবাসীদেব রক্তগত উৎস সম্বন্ধে সেনর গোরেসিও-র মতামত গ্রহণ না করলেও তিনি আদিবাসী দেবতার সংস্কৃত দেবসভাব প্রবেশের পদ্ধতির চমৎকার চিত্রায়ণ কবেছেন। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হওয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'আমার মনে হয় যে এই ঘটনার মাধ্যমে ভারতে প্রাচীন ধর্মগুলির সংঘাতের বিবরণ পুরা কাহিনীর আড়ালে বর্ণিত হয়েছে। আর্য বা ইন্দো-সংস্কৃত জাতির পূর্বে ভারতে বাসরত কুশ বা হেসটিক উপজাতির দেবতা শিব, বিজয়ী জাতির পূজার্চনা এবং তাদের যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তাকে বাদ দেওয়া হয় ; তাদের যজ্ঞ পণ্ড করে এবং তাদের যজ্ঞস্থলে আসুরিক শক্তি প্রদর্শন করে, তিনি অংশগ্রহণের অধিকার অর্জনে সফল হন'।[৩৪] অন্যত্র সেনর গোরেসিও শিব সম্বন্ধে বলেন যে, শিব এখন দেবতা 'যিনি এমন এক ধর্মীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে দেবসভায় প্রবেশ করেন যার চিহ্ন প্রায়শই প্রাচীন পূজা পদ্ধতিতে পাওয়া যায়'।

সাঁওতালদের দেবতা গিরীশের মতোই প্রাকৃতিক পবিত্রভূমিতে আজকের দিনের শিবের প্রিয় নিবাসভূমি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বীরভূমের পশ্চিম পার্বত্যভূমিতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার হিন্দু তাঁর মন্দিরে যায় ; এবং আদিবাসী দেবতার সাথে শিবের অভিন্নতার এক অদ্ভুত প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়—জনৈক সাঁওতাল দ্বারা এই মন্দিরের গোড়াপত্তন এবং আজও এইটি জনৈক সাঁওতালের নামেই পরিচিত। যে পাহাড়ে এই মন্দির নির্মিত সেইটি বহুযুগ ধরে আদিবাসীদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু ; এবং ব্রাহ্মণরা মন্দির হতে তাদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে এবং দেবতাকে এক হিন্দু নামে অভিহিত করলেও, এই মনোভাব এত প্রবল যে এক মিশনারি পণ্ডিত, এই পর্বতমালা সাঁওতালদের আদিভূমি কিনা জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হন। মন্দিরের পুরোহিতরা তাদের আরাধ্য শিবের সাথে চারপাশের আদিবাসীদের জাতীয় দেবতার কোনো সম্পর্ক ঘৃণাভরে অস্বীকার করে এবং মন্দিরের নামটির সাথেই যে স্থায়ী প্রমাণ রয়ে গেছে, এক অসম্ভব কাহিনীর সাহায্যে তা পত্তন করতে চেষ্টা করে।

তাদের মতে, যে সুন্দর পার্বত্য হ্রদের ধারে পবিত্র নগরী অবস্থিত, পুরাকালে একদল ব্রাহ্মণ তার তীরে বসবাস শুরু করে। চারপাশে ছিল শুধু বন আর পর্বতমালা—সেখানে ছিল কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের বাস। ব্রাহ্মণরা হ্রদের নিকটে

শিবলিঙ্গ স্থাপন করে এবং যাগযজ্ঞ করে ; কিন্তু কৃষ্ণকায় উপজাতিরা এই দেবস্থানে পূজা না করে আগের মতোই তিন বড় পাথরে[৩৫] যেত—তাদের পূর্বপুরুষেরা এইখানেই পূজা দিত এবং আজও পবিত্র নগরীর পশ্চিম প্রবেশপথে এইগুলি দেখা যায়। ব্রাহ্মণরা, এছাড়া, জমি চাষ করতো এবং হ্রদ থেকে মাঠে জল সেচ করতো ; কিন্তু পাহাড়িয়ারা আগের মতোই শিকার করতো, মাছ ধরতো অথবা পশুপালন করতো, আর তাদের মেয়েরা অল্প জায়গায় স্থানীয় শস্য ফলাতো। কিন্তু কালক্রমে উর্বরা জমির কারণে ব্রাহ্মণরা আলস্য ও লালসার শিকার হলো এবং শিবভজনা প্রায় বন্ধ করলো। পাথর পূজা করতে এসে কৃষ্ণকায় উপজাতিরা এইটা দেখে উত্তরোত্তর বিস্মিত হতো ; অবশেষে বৈজু নামে শক্তিশালী ও বহু গবাদি পশুর মালিক এক আদিবাসী ব্রাহ্মণদের মিথ্যাভাষণে ও উচ্ছৃংখলতায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের দেবতা শিবকে প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণের আগে লাঠি-পেটা করার শপথ গ্রহণ করলো এবং তাই করলো। কিন্তু একদিন সকালে তার গোরুগুলি জঙ্গলে হারিয়ে যাবার পর সারাদিন সে গোরুর খোঁজে ঘুরে ক্ষুধার্ত শ্রান্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরলো এবং হ্রদের জলে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সন্ধ্যায় খেতে বসলো। খাবার নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই, শপথের কথা তার মনে পড়লো ; এবং চরম ক্লান্তি সত্ত্বেও, সে উঠে পড়লো, এবং খুব কষ্ট করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হ্রদের ধারে ব্রাহ্মণদের দেবমূর্তিস্থানে এসে সেইদিকে লাঠির আঘাত করলো। অকস্মাৎ জল হতে রত্নশোভিত এক অপরূপ মূর্তি আবির্ভূত হলো, এবং বললো, 'দেখ, এই লোকটি আমাকে আঘাত করার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলেছে, আর আমার পুরোহিতরা বাড়িতে রক্ষিতার সাথে শুয়ে আছে, তারা আমার খাদ্য বা পানীয় কিছুই দেয় না। এই লোকটি তার ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করুক, আমি তাকে বরদান করবো।' বৈজু জবাব দিলো, আমার বাহুবল আছে, আমি গোধনে ধনী। আমি আমার জাতির সর্দার। আমার আর কি চাই ? তোমাকে সকলেই নাথ (প্রভু) নামে ডাকে ; আমাকেও নাথ বলে ডাকা হোক ; এবং তোমার মন্দির আমার নামে খ্যাত হোক'। দেবতা উত্তর দিলেন, 'তথাস্তু, এখন হতে তুমি আর বৈজু নও, তুমি বৈজনাথ, এবং আমার মন্দির তোমার নামে খ্যাত হবে।'

সাঁওতালদের গিরীশের সাথে সংকর হিন্দু জনগণের শিবের সাদৃশ্য এত বেশি যে, এই প্রশ্নের কোনো পূর্ব বিচার ছাড়াই শুধু গুণকীর্তন ও প্রত্যক্ষ অর্চনা বিচার করে, সাঁওতালদের দেবতার নামের অনুবাদ হিসাবে 'হিন্দুদের মহাদেব' (অর্থাৎ শিব) এর নাম ব্যবহার করে।

পূর্বে এক পরিচ্ছেদে আমি বলেছি যে, বর্তমান সংকর হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে আদিবাসী প্রভাব রয়েছে। বীরভূমের পাহাড়িয়াদের মধ্যে প্রচলিত আদিবাসী ধর্মাচরণের পর্যালোচনা এখানে করা হলো এবং নিশ্চিতরূপে এই

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, পদানত আদিম জাতির থেকে হিন্দুরা তাদের গৃহদেবতা[৩৬] এবং তার গোপন পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করেছে ; গ্রামীণ দেবতাগুলি[৩৭] ও তার সাথে বৃক্ষনিবাসী ভূত-প্রেত-রাক্ষস এইসবও গ্রহণ করা হয়েছে ; এবং শেষ পর্যন্ত, সমগ্র বাংলা ব্যাপী নিম্নশ্রেণী দ্বারা সর্বজনীনভাবে বর্তমানে আরাধ্য রক্তলোলুপ দেবতাটিও (শিব) আদিম জাতিদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন এই কুসংস্কারগুলি রয়েছে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, পরস্পর অসংযুক্ত অবস্থায় ; কিন্তু, সাঁওতালদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক একক পরিবারকে ভিত্তি করে যাদের পূজাপদ্ধতি তথা সমগ্র সমাজব্যবস্থা গঠিত, সেই জাতির পুরাকাহিনীর স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ক্রমবিন্যাস আকারে এইগুলি সাঁওতালদের মধ্যে রয়েছে।

শিবপূজার সাথে বৌদ্ধধর্ম রহস্যজনক ভাবে সংযুক্ত। সংস্কৃত ধর্মবিশ্বাসের একেশ্বরবাদী উপাদান কিভাবে বস্তুভিত্তিক, বহু-ঈশ্বরবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অধ্যাপক ম্যুলারের চমৎকার রচনা সাধারণ পাঠকদের তা জানিয়েছে। কিন্তু এই সংস্কার সাধনের পরবর্তী পরিণতি, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কেন্দ্রগুলি হতে অচিরেই এইটি কিভাবে নির্বাপিত হয় এবং ভারতের বিলুপ্ত জাতিগুলি সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করে, কিভাবে এইটি উত্তরে, পূর্বে এবং দক্ষিণে পলায়ন করে, এবং অবশেষে এশীয় দুনিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছায়, তা আজও গভীর পাণ্ডিত্যের ব্যাপার। অযোধ্যার সংস্কৃত রাজত্ব হতে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধধর্ম নিম্ন প্রদেশগুলির পর্বত ও উপত্যকাগুলিতে নিজের রাজ্য গড়ে তোলে ; সেইখানে আধা-অনার্য জনসাধারণের হৃদয় জয় করে, এবং মূল বাংলার উত্তর সীমান্ত পারে, সারনাথ[৩৮] হতে একেবারে দক্ষিণে সমুদ্র বিধৌত জগন্নাথ পর্যন্ত সকল জেলায় মঠ-মন্দির বা পবিত্র নগরী স্থাপন করে। বৌদ্ধধর্ম, এক ধর্মীয় রাজবংশের অধীনে[৩৯] সমগ্র বিচ্ছিন্ন উপজাতিদের সংহত করে শক্তিশালী এক রাজত্ব গড়ে তোলে। যে রাজ্য হতে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হয়, সেই রাজ্যের সাথে নবগঠিত এই রাজবংশ সাফল্যজনক ভাবে যুদ্ধ করে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষে এই রাজবংশের যে গৌরবচিহ্ন রয়েছে, তা সময় বা গঙ্গার গতিপথ-পরিবর্তন মুছে ফেলতে পারেনি।

নিম্নবঙ্গের পশ্চিমের প্রত্যেক জেলায় প্রচুর বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ রয়েছে ; এবং যেইখানে তাদের সংখ্যাধিক্য সর্বাধিক, বর্তমানে সেইখানেই জনগণের মাঝে শাক্ত প্রভাব প্রবল। তদুপরি লক্ষণীয়, নিম্নবঙ্গের বহু বুদ্ধমূর্তির নাক চ্যাপ্টা এবং ঠোঁট পুরু — সংস্কৃতভাষী জাতিগুলির মধ্যে এইটা দেখা যায় না ; কিন্তু সংস্কৃত রচনায় অনার্যদের বিবরণের সাথে এইগুলি নিখুঁত ভাবে মিলে যায় এবং সমতলের ব্রাহ্মণদের বিপরীতে বীরভূমের সাঁওতালদের চেহারায় এইগুলি আজও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ভূমিমধ্যে অর্ধপ্রোথিত এই মূর্তিগুলির শিল্পীরা ছিল অনার্য ;

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনার্য মুখাকৃতির ভিত্তিতে এইগুলির পরিকল্পনা ; একমাত্র অনার্য প্রধান সমাজেই এইগুলি শ্রদ্ধার বস্তু হতে পারতো ; এবং পরবর্তীকালে আবার যখন আর্যতরঙ্গে নিম্নবঙ্গ প্লাবিত হলো অনার্য জাতিগুলির প্রতিমূর্তি এই চ্যাপ্টা-নাক পুরু-ঠোঁট মূর্তিগুলিকেও, অনার্য জাতিগুলির মতোই ঘৃণাভরে দেখা হতো।

প্রাচীন সারনাথের কিংবদন্তিতে দুই ধর্মের এই সংঘাত স্পষ্টভাবে রক্ষিত। প্রথমে অনার্য বসতি বা শিবপূজা, তারপর নিম্নবঙ্গের রাজা কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা, অবশেষে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদের দ্বারা হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন, এবং এর সম্পূর্ণ ইতিহাস ভস্মীভূত ; দেশীয় পণ্ডিতদের কাছে এমনকি এর নামটিও অনুমানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—তারা উত্তরের এই বৌদ্ধ রাজধানীর[৪০] নামটির মধ্যেই সোজাসুজি শিবপূজার উল্লেখ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন। এই পবিত্র নগরীর নিকটে, বীরভূমের পর্বতমালার মাঝে, এই নির্জন পর্বত ভূমিতে একমাত্র যেখানে শিবপূজা বর্তমান, সেইখানে বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের সন্দেহাতীত প্রমাণ রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সাথে শিবপূজার এই প্রকারের গভীর সম্পর্ক দক্ষিণ-ভারতে দেখা যায়।[৪১] সবত্রই বৌদ্ধধর্ম পরাজিত হয়, এবং রক্তলোলুপ যে অনার্য দেবতা একদা পুরাকালে আর্যদের সভায় আপন মর্যাদা আদায় করে, সেই দেবপূজা তৎক্ষণাৎ শূন্যস্থান দখল করে।

শিবপূজার সাথে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা। গ্রামীণ ইতিকথা রচয়িতার ক্ষুদ্র পরিসরের অতীত ; কিন্তু, যে পদ্ধতিতে প্রকৃত পরিবর্তন সাধিত হয়, তার স্মৃতিচিহ্ন বের না করে মূল বাংলার স্থানীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা সম্ভব নয়। উভয়ের নির্যাতন হতে পলাতকরা, অনার্যদের কিয়দংশের হৃদয় জয় করে, কিয়দংশকে পরাজিত করে নিম্নবঙ্গে রাজারূপে অধিষ্ঠিত। বস্তুত একথা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, বৌদ্ধদের সহজ জয়লাভের অন্যতম ব্যবস্থাগত কারণ হলো : পূর্ববর্তী আর্য বাহিনীর আরোপিত অত্যাচার ও আদিম দাসত্ব হতে অনার্য বংশোদ্ভবদের মুক্তিদাতা হিসেবে তারা নিজেদের নিম্নবঙ্গে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়। পূর্ববর্তী আর্য হানাদারদের ধর্ম ছিল ইতিবাচক, সামাজিক বৈষম্যের পক্ষে এবং জনগণের বাস্তব জীবনে হস্তক্ষেপকারী। বৌদ্ধধর্ম ছিল নেতিবাচক, মানুষে-মানুষে সাম্য ঘোষণা করতো, এবং যতদূর সম্ভব বাস্তবজীবন এড়িয়ে চলতো। সেই কারণে, নিম্নবঙ্গের আধা-অনার্য জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম ছিল বিরাট জয় এবং সত্বর তাদের আনুগত্য লাভ করে। কিন্তু কোনো রাজবংশের আনুকূল্য লাভ করলেও, নেতিবাচক কোনো ধর্ম জনগণের ধর্ম হতে পারে না। নিম্নবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম দ্রুত তার সক্রিয় ভূমিকা হারায়, এবং মঠগুলিতেও বীরভূমের পবিত্র নগরীর মতো নির্জন, পার্বত্যাঞ্চলের ধর্মীয় গ্রামগুলিতে পশ্চাদপসরণ করে ; বৌদ্ধরাজবংশকে সিংহাসনে স্থাপন করে এবং

সমাজের উপর একেশ্বরবাদের এক পাতলা আস্তরণ বিস্তৃত করেই সন্তুষ্ট থাকে। সাধারণ মানুষও সন্তুষ্ট ছিল; তাদের কেউ বিরক্ত করতো না। পূর্ববর্তী আর্যরা রোধ করতে চেষ্টা করলেও, তারা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের পিতৃ-পিতামহের রক্তাক্ত আরাধনা পুনরায় শুরু করে,এবং কোনো জাতির উপর সাধ্যের অতিরিক্ত উচ্চতর মাত্রার অধ্যাত্মবাদ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শীঘ্রই নিম্নবঙ্গে দেখা যায়; অর্থাৎ কুসংস্কারের বর্ণনাতীত গভীরতার উপর এক আপাতসুন্দর উজ্জ্বল পালিশ। এই অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না; বৌদ্ধধর্ম সমাজ হতে মঠের নির্জনতায় অবসর নেওয়ার পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় ফিরে আসে এবং অবশেষে একে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের সর্বদাই রয়েছে দুইটি দিক, আধ্যাত্মিক ও পৌত্তলিক; প্রথমটি অহিংস বিষ্ণুপূজার বা বৈষ্ণবধর্মের এবং শেষোক্তটি রক্তাক্ত অনার্য রুদ্র বা শিবপূজা, শাক্তধর্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরাজয় হতে জ্ঞান আহরণ করেছে; শিখেছে যে কোথাও, এমনকি বাংলাদেশের, জনগণের বিরোধিতা করে কোনো রাজবংশই স্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং আবার পুরাতন গূঢ়ধর্ম তথা মহিমাময় মতান্ধতা এবং ফল, দুধ ও তৈলের রক্তহীন নৈবেদ্য প্রবর্তন করার বদলে, ব্রাহ্মণরা জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের ধর্মমতের জনপ্রিয় দিকগুলির প্রচার শুরু করলো; জনপ্রিয় দেবতা শিব বা রুদ্রের সর্বোচ্চ দেবতা হিসাবে প্রচলিত রক্তাক্ত পদ্ধতিতে পূজার প্রচলন হলো। এইটিই ছিল নিম্নবঙ্গের আধা-অনার্য জনসাধারণের যথাযোগ্য ধর্মমত। সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশে সকল সময়েই ছিল এবং এখনো সর্বত্র রয়েছে যে কুসংস্কারের বোঝা, তার বিস্ফোরণ ঘটলো এবং একেশ্বরবাদের যে পাতলা আবরণে এগুলি ঢাকা ছিল, সেই আস্তরণ সহস্রখণ্ডে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো। সেই সময় হতেই আধুনিক হিন্দু মতবাদের সূচনা—এর সমুন্নত শীর্ষদেশ স্বর্গচুম্বী এবং মানুষের কলুষিত অন্তরের তলদেশে এর পদভার। একমাত্র নিম্নবঙ্গে এর হীন ধরনটি রয়েছে এক সমসত্ত্ব ও কঠোর জাতীয় ধর্মরূপে; কারণ, সংস্কৃতের আধ্যাত্মিক দিকটিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নাকচ করে আধা-অনার্য জনসাধারণের সাথে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের একাত্ম করেছিল। যেখানেই যাক, নিম্ন-উপত্যকার হিন্দু তার স্থূল বস্তুবাদ ও রক্তাক্ত আচারের মাধ্যমে পরিচিত। যে নিম্ন প্রদেশগুলি হাজার বৎসর আগে একেশ্বরবাদের আশ্রয় ছিল, সেই অঞ্চল বর্তমানে পৌত্তলিকতার কেন্দ্র হওয়ায় দেশীয় পণ্ডিতবর্গ, যাঁরা শুধু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, এর অন্তরালবর্তী কারণ অনুসন্ধানের কষ্টটুকু করেন না, তাঁরা বিস্মিত হন। দক্ষিণ উপত্যকার অধিবাসী এক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেন, বৌদ্ধধর্ম দ্বারা দীর্ঘদিন প্রভাবিত বঙ্গদেশ, পুরোদস্তুর ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করেছে। যেইখানেই যায় বাঙালি সাথে পৌত্তলিকতা বহন করে নিয়ে যায়। নিজের বিজয় চিহ্নিত করার জন্য আলেকজাণ্ডার পথে নগরীর পর নগরী রেখে যান; আর তাঁর বিদেশ ভ্রমণের

চিহ্ন হিসাবে বাঙালিরা পথপ্রান্তে ফেলে যায় বিভিন্ন দেবমূর্তি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, হাসপাতাল পত্তনে ইংরেজরা উদ্যোগ নেয়; আর বাঙালি উদ্যোগ নেয় মন্দির নির্মাণে ও মূর্তি প্রতিষ্ঠায়। ইংরেজরা বাঙালিদের নদীতে সেতুবন্ধন ও রেলপথ নির্মাণ শেখায়; বাঙালিরা সাঁওতালদের চড়কপূজায় কাঁটায়-ঝোলা,[৪২] আর উত্তরের হিন্দুদের মূর্তিগড়া শেখায়। কথিত আছে যে, যে বাঙালি বাবুটি কানপুরে দুর্গামূর্তি (অনার্য দেবতা শিবের ঘরনী) প্রতিষ্ঠা করে সে কলিকাতা হতে কারিগর নিয়ে আসে, কারণ উত্তরের লোকেরা সিংহবাহিনী দশভুজার মূর্তি গড়ার কৌশল জানতো না।'[৪৩]

সাঁওতালদের মধ্যে জাতিভেদ অজ্ঞাত। তাদের আদি পিতামাতার সাত সন্তানের প্রত্যেকেই একটি করে উপজাতির প্রবর্তন করে; এবং সাধারণভাবে, যেখানে সাঁওতালরা হিন্দু প্রভাবমুক্ত, সেখানে আজও উপজাতির সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশধররা, 'নিজ্-কস্‌দা-হড়'; দ্বিতীয় পুত্রের বংশধররা; 'নিজ্-মুর্মু-হড়,'; তৃতীয় পুত্রজাতরা, 'নিজ্-সরণ-হড়্'; চতুর্থ পুত্র জাতরা, 'নিজ্-হাসদি-হড়'; পঞ্চমপুত্র জাতরা, 'নিজ্-মারুডি-হড়্,'; আদি পিতামাতা এদের গিরীশ বা মহাপর্বতের পূজারী পদে নিযুক্ত করে গেছেন; ষষ্ঠপুত্র জাতরা, 'নিজ্-কিস্‌কু-হড়্'; সপ্তমপুত্র জাতরা, 'নিজ্-টুডু-হড়্'। আদিতে নিযুক্ত প্রত্যয় 'নিজ্'-র অর্থ 'এর পুত্র,' ইংরেজিতে যেমন, 'ম্যাক' বা 'ফিজ্' এবং সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেক উপজাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব নেতৃবৃন্দ ও মেহনতি শ্রেণীবর্গ; কিন্তু দুইটি উপজাতি বিশেষভাবে নিজেদের ধর্মেকর্মে নিযুক্ত করেছে এবং এই দুইটি হতেই অধিকাংশ পুরোহিতরা আসে। এদের একটি এই পরিবার-ভিত্তিক ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে—আদি পুরোহিত পঞ্চম পুত্রের বংশধররা এই কাজ সম্পন্ন করে।

গ্রামের সকল দেবতার নিবাসস্থল শালবীথিতে সর্বজনীন উৎসবে পূজার্চনা করার জন্য এই পুরোহিতরা বিনামূল্যে সামান্য পরিমাণ নিষ্কর জমির সুবিধা ভোগ করে। কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষভাবে উত্তরে, দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরদের (নিজ-মুর্মু-হড়্) পঞ্চমপুত্র জাতদের তুলনায় ভালো পুরোহিত গণ্য করা হয়; কিন্তু লক্ষণীয় যে বিনামূল্যে জমির কোনো সুবিধা তারা পায় না, এবং নিজেদের ভরণপোষণের জন্য নিজেদের শ্রম বা ভক্তদের উদারতার উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। প্রধানত তারাই ভবিষ্যদ্বক্তা, গণক, জঙ্গলের তথা অন্য দেবস্থানের পূজারী বা ওঝা—রাক্ষসপূজার প্রতিনিধি; এবং খুব বিরল ক্ষেত্রে তারা পরিবার-ভিত্তিক জাতীয় ধর্ম ব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগে পঞ্চম উপজাতির স্থান দখল করে। হিন্দুধর্মের সর্বাধিক অনুপ্রবেশ যে উত্তরে, সেখানে আরো পাঁচটি উপজাতি যুক্ত হয়েছে—আমার বিশ্বাস, এরা আর্য পিতার ঔরসে

সাঁওতাল মাতার গর্ভজাত জারজ সন্তানদের বংশধর। বিশুদ্ধ আর্যরা সংকর জাতিগুলিকে যে চোখে দেখে, বিশুদ্ধ সাঁওতালরা এদেরও সেই চোখেই দেখে; কিন্তু, সমতলের আর্য বিজয়ীদের কাছে, সংকর জাতির তুলনায় এরা, তাদের অনার্য স্বজাতিদের মধ্যে পূর্বপুরুষদের সূত্রে প্রাপ্ত উন্নততর বুদ্ধির কারণে, অনেক ভালো অবস্থান পেতে সমর্থ হয়। অবশ্য, অতিরিক্ত এই পাঁচটি উপজাতির বিষয়টি অস্পষ্টতায় আবৃত, এবং তাদের উৎস সম্বন্ধে এই মতামত বহুলাংশে অনুমান-নির্ভর,—তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি নয়। উত্তরের সাঁওতালরা হিন্দুধর্মের এত কাছাকাছি আসে যে তাদের চারটি উপজাতির জন্য চারটি নির্দিষ্ট পেশা নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন, 'কিস্‌কু হড়'রা রাজা, 'মুর্মু হড'রা পুরোহিত, 'সরণ হড়্'রা সৈনিক এবং 'মারুড়ি হড়'রা চাষী হয়—স্পষ্টত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অর্থাৎ চতুর্বর্ণ বিভাগের এক অমার্জিত অনুকরণ। এই চার উপজাতি ছাড়াও উত্তরের সাঁওতালদের আরো আটটি উপজাতি রয়েছে—এদের কোনো নির্দিষ্ট পেশা নেই।

বর্ণভিত্তিক এই প্রকার স্থানীয় প্রভাব সত্ত্বেও, মানুষে মানুষে যে নিষ্ঠুর অসাম্য সমতলের হিন্দুদের বিভক্ত করে, তা পাহাড়িয়া গ্রামগুলিতে কখনো অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। সমগ্র গ্রাম একত্রে হাসি-কান্না সমানভাবে ভোগ করত। একত্রে কাজ, একত্রে শিকার, একত্রে পূজা এবং উৎসবে একত্রে আহার। হিন্দুদের মধ্যে স্ববর্ণে বিবাহ প্রচলিত হলেও, নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ আদিবাসীদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয়। হিন্দুদের প্রথম তিনটি বর্ণ বস্তুত পেশা বা সামাজিক মর্যাদা ভিত্তিক; এবং অভিজাত বংশীয় কন্যার সাথে ব্যবসায়ীপুত্রের বিবাহ, সামন্ততান্ত্রিক ইয়োরোপীয় আর্যদের মধ্যে যেমন, সেইরকমই কৃষিভিত্তিক ভারতীয় আর্যদের মধ্যেও সকল সময়ে সমান ঘৃণ্য ছিল। পরাজিত কৃষ্ণকায় জাতিগুলি নিয়ে হিন্দুদের চতুর্থ বর্ণ,—এবং কোনো বাগিচা মালিক কন্যার সাথে নিগ্রোদাসের বিবাহ নিউ অরলিন্সের সমাজ কি চোখে দেখে, তা আমরা জানি। সাঁওতালদের জাতিগত বিন্যাস পরিবার-ভিত্তিক, সামাজিক মর্যাদা বা পেশাভিত্তিক নয়। যে কোনো সাঁওতাল সমগ্র জাতিকে আত্মীয় ভাবে; এবং নিজ গোষ্ঠীর সাথে অন্যদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে নিজগোষ্ঠীর স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে এখানে আন্তর্বিবাহ অনুমোদিত নয়। সন্তানরা পিতার গোষ্ঠীভুক্ত হয় এবং কন্যারা বিবাহের পর তাদের পুরাতন গোষ্ঠী ও তার দেবতাদের ত্যাগ করে স্বামীর গোষ্ঠী ও দেবতাদের গ্রহণ করে।

পারিবারিক বোধ এত তীব্র যে গোষ্ঠী হতে বহিষ্কার নির্বাসনের একমাত্র রূপ। এর অর্থ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান হতে বহিষ্কার, কারণ সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে অপর কোনো গোষ্ঠী গ্রহণ করে না; এবং জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার ধারণা সাঁওতালরা সমর্থন করে না। অবশ্য, ঘন ঘন শাস্তি-

দানের কারণে এবং অপরাধীর আবার এই সাধারণ পরিবারে প্রত্যাবর্তনের একটা পথ খোলা রাখার ফলে শাস্তির বিভীষিকা অনেক কমে যায়। প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের সাথে তার পুনর্মিলিত হওয়া আবশ্যক ; এবং পুনর্মিলন কঠিন হবে কিনা, সেটা অপরাধ সম্বন্ধে জনমতের ধারণার উপর নির্ভর করে। সাধারণ অপরাধের জন্য, ২০ গ্যালন হাঁড়িয়া,[৪৪] এবং গোষ্ঠীর লোকদের ভোজ দেওয়ার জন্য দশ শিলিং-ই যথেষ্ট ; আরো জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে, পুনর্মিলনের অসুবিধা এত বেশি যে হতভাগ্য লোকটির আপন দুর্ভাগ্য মেনে নিয়ে তীর ধনুক সহ চিরতরে জঙ্গলে বিদায় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

সাঁওতাল জীবনে বড় ছয়টি অনুষ্ঠান হলো : পরিবারভুক্তি; গোষ্ঠীভুক্তি ; জাতিভুক্তি ; বিবাহের মাধ্যমে নিজ গোষ্ঠীর সাথে অন্যগোষ্ঠীর সংযুক্তি ; দাহকার্যের মাধ্যমে জীবিতদের থেকে বিদায় ; পরিশেষে, বিগত পূর্বপুরুষদের সাথে পুনর্মিলন। গৃহদেবতার পূজার মতোই পরিবারভুক্তির পদ্ধতিও গোপন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন। এর অন্যতম রূপ হলো পিতা নিজ বংশদেবতার নাম মনে মনে বলেন এবং নিজপুত্রের স্বীকৃতি হিসাবে শিশুর মাথায় হাত রাখেন। 'নরথ' নামে গোষ্ঠীভুক্তির অনুষ্ঠান আরো প্রকাশ্য এবং কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে জন্মের তিনদিন পর ও পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে জন্মের পাঁচদিন পর অনুষ্ঠিত হয়। মোটামুটি এই সময় হতে সাঁওতালমাতা আবার কাজকর্ম শুরু করতে পারে। বড় বড় হাঁড়ায় হাঁড়িয়া তৈরি হয়, বাড়ির উভয় পাশের গোষ্ঠীর লোকজন নিমন্ত্রিত হয় ; কিন্তু যেহেতু সাঁওতাল বিশ্বাস মতো সন্তানের জন্মগ্রহণে পরিবার অপবিত্র হয়, তাই পবিত্রকরণ অনুষ্ঠানের আগে কেউ এই পরিবারের সাথে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে না। নবজাতকের মস্তক মুণ্ডিত করা হয়। গোষ্ঠী সদস্যারা চারপাশে বৃত্তাকারে দাঁড়ায় ও সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত আত্মীয়জনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিক্তরস[৪৫] মিশ্রিত জলে চুমুক দেয়। তারপর পিতা খুব গম্ভীরভাবে শিশুর নামকরণ করে—পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে শিশুর পিতামহের নামে ও কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে, শিশুর মাতামহীর নামে নামকরণ হয় ; এই নাম শোনামাত্র শিশুর ধাত্রী জল ও চাল নিয়ে সমবেত আত্মীয়দের বুকে কয়েকদানা চাল ও জল দিয়ে টোকা মারে এবং শিশুর নামটি বলতে থাকে। তখন, নবজাতকসহ সমগ্র পরিবারটি আবার গোষ্ঠীভুক্ত হয় এবং পিতামাতা ও উভয় তরফের আত্মীয়রা হাঁড়িয়ার বিরাট বিরাট জালা শেষ করে উৎসব শেষ করে—ধনী পরিবারের ক্ষেত্রে এর সাথে ভোজও যুক্ত হয়।

পাঁচবছর বয়সে জাতিভুক্তি অনুষ্ঠিত হয় হাঁড়িয়া প্রস্তুত হয় ; গোষ্ঠী নির্বিশেষে পরিবারের আত্মীয়-বন্ধুরা আমন্ত্রিত হয় ; এবং শিশুর দক্ষিণ হস্ত সাঁওতাল টীকাচিহ্নে চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্নের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেগুলি সব সময়েই বেজোড়-সংখ্যক ; এবং এই চিহ্ন ছাড়া কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে সে

সাঁওতাল দেবতাদের রোষের পাত্র হয়। মৃত্যুর পর যে প্রেতজগতে সাঁওতালদের বাস ও বিচরণভূমি, যেখানে তার আত্মা থাকে, সেখান হতে নির্বাসিত হয়ে যুগ যুগ ধরে সে পড়ে থাকে, আর সাপরা তার বুক খুবলে গর্ত করে।

নিজগোষ্ঠীর সাথে বিবাহের মাধ্যমে অন্য গোষ্ঠীর বন্ধন সাঁওতালদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান।[৪৬] হিন্দুদের চেয়ে বেশি বয়সে তাদের বিবাহ হয় ও বিবাহযোগ্য বয়সের আগে বাল্যবিবাহ প্রথাকে সাঁওতালরা ঘৃণ্য বিবেচনা করে। সচরাচর, একজন সাঁওতাল কিশোর ১৬-১৭ বৎসর বয়সে বিয়ে করে ও মেয়েদের সাধারণত ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়; সভ্যতার বিলাস দ্রব্যগুলি যেসব জাতিগুলির প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হয়েছে, তাদের কাছে এই বয়স উপযুক্ত না-ও মনে হতে পারে; কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলী অরণ্যে ষোল বা সতেরো বৎসরের যুবক পরিবার নির্বাহের পক্ষে সর্বতোভাবে সমর্থ; এবং গৃহস্থালীর জন্য এক সাঁওতাল ঘরণীর প্রয়োজন শুধু এক পর্ণকুটির, সাথে খানকয় মাটি ও পিতলের পাত্র। অল্পবয়সে বিবাহিত জীবন শুরু করা বংশানুক্রমিক ভাবে প্রচলিত; যে প্রথার ফলে ব্যভিচার অজ্ঞাতপ্রায় এবং বৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অসংখ্য পৌত্রস্থানীয় বংশধররা রয়েছে, সে ব্যবস্থায় দোষের কিছু নেই। ১৮৬৬ সনের দুর্ভিক্ষ ছাড়া কখনো সাঁওতাল গ্রামে কোনো ভিক্ষুক আমার চোখে পড়েনি।

যেহেতু বিবাহের আগে বিচারবুদ্ধির বয়স হওয়া সাঁওতালদের পক্ষে আবশ্যক, সে কারণেই, যে স্বাধীনতা হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সেই জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা তাদের থাকে। এর আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি হচ্ছে : পাত্রের পিতা কন্যার পিতার কাছে বৈবাহিক দূত বা ঘটক (রাইবরা) পাঠায়, সে এই প্রস্তাব নীরবে শোনে, এবং স্ত্রীর সাথে পরামর্শের পর উত্তর দেয়, 'আগে ছেলে ও মেয়ে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করুক, তারপর এইসব নিয়ে কথা বলা যাবে।' নিকটবর্তী কোনো মেলায় এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়; দিনের শেষে, কিশোর-কিশোরীর পরস্পরকে পছন্দ হলে পাত্রের পিতা কন্যাটির জন্য সামান্য কিছু উপহার কিনে দেয় এবং কন্যা তার পুত্রবধূ হওয়ার প্রকাশ্য সম্মতির স্বীকৃতি হিসাবে তার সামনে দণ্ডবৎ করে। তারপর কন্যার আত্মীয়স্বজন পাত্রের গ্রামে যায়, সেখানে পাত্র তাদের প্রত্যেককে একমিনিট তার হাঁটুতে বসিয়ে চুম্বন করে,[৪৭] এবং আত্মীয়দের কিছু টাকা ও কন্যার পিতাকে পাগড়ি এবং প্রচলিত তুলোর পোশাক উপহার হিসেবে দেয়। পাত্রের আত্মীয়রা এরপর কন্যার পিতৃগৃহে যায়। পাত্রের মতো অনুরূপ ভাবেই ভাবী বধূ তাদের সকলকে সম্ভাষণ করে, হাঁটুতে বসায়,[৪৮] এবং অবিকল একই রকম উপহার দেয়। এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, উভয় গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মৈত্রী ও শুভেচ্ছা ঘোষণা করার পর, পাত্রের বাবা ঘটক মারফৎ বেজোড় সংখ্যক মুদ্রা উপহার হিসাবে পাত্রের পিতা-মাতাকে পাঠায় —এইটি গ্রহণ করার অর্থ কন্যার আইনত নতুন গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া। প্রকৃত বিবাহ-

প্রস্তুতি তারপর শুরু হয়। কন্যার আত্মীয়রা গ্রামে এক সাময়িক আস্তানা খাড়া করে এবং তারপরই সত্বর পাত্র আত্মীয়জন সহ আসে। গ্রামের একমাত্র পথে (কুল-অহি, আক্ষরিক অর্থে পরিবারগুলির বিভাজক পথ) গ্রামের দুই চৌকিদার তাদের অভ্যর্থনা জানায়। তারপর বরযাত্রীরা আস্তানাটিতে যায়, সেখানে তারা মত্তদানকারী বৃক্ষের[৪৯] ছোট শাখা মাটিতে রোপণ করে এবং তার নিচে এক পাত্র জল সমেত চাউল রাখা হয়। পূর্বেই এই চাউল কন্যার পরিবার এক বিশেষ পদ্ধতিতে ভেনে ও এক বিশেষ লাল রং দিয়ে রাঙিয়ে রাখে। এরপর পাত্রের পবিত্র করণ। তাকে স্নান করিয়ে, তার চুল আঁচড়িয়ে, কন্যাপক্ষের মেয়েরা তার পুরানো কাপড় ছাড়িয়ে সিঁদুর চর্চিত নতুন কাপড় পরিয়ে দেয়। পঞ্চমদিনে, নতুন পোশাকে সজ্জিত বর লোকের কাঁধে চড়ে কনের বাড়িতে যায়। পাঁচজন বরযাত্রী এক বড় ঝুড়িতে কনেকে বসায় ও তার ছোট ভাইকে নিয়ে আসে—কন্যার তরফে সে বরকে অভ্যর্থনা জানায়। পারস্পরিক সম্ভাষণ বিনিময়ের পর কন্যাকে ঝুড়িতে করেই নিয়ে যাওয়া হয় : বর-কনের মাঝে এক কাপড় টাঙ্গানো হয় এবং এর দুইদিক হতে বর-কনে পরস্পরের গায়ে জল ছিটকায় ; বর এক দেবতার নাম বলে ও সকলে তাকে ঝুড়ি থেকে কনেকে ওঠাতে বলে—কারণ কনে তার স্ত্রী। তারপর আত্মীয়রা বর-কনের কাপড়ে গেরো বেঁধে দেয়, তারপর কন্যাপক্ষের মেয়েরা জ্বলন্ত কাঠকয়লা নিয়ে আসে এবং পুরানো পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হবার প্রতীক হিসাবে শিল-নোড়া[৫০] দিয়ে ঐ কাঠকয়লা গুড়ো করে পুরাতন গোষ্ঠী হতে বধূর চূড়ান্ত বিচ্ছেদ বোঝাবার জন্য জল দিয়ে কাঠকয়লার আগুন নেভায়।

এরপর গৃহ প্রত্যাবর্তনের মশাল মিছিল,—এই গৃহাভিমুখী মশাল মিছিলের মতো সুন্দর দৃশ্য আর হয় না। সমগ্র দলটি প্রথমে পত্রাচ্ছাদিত পূর্বোক্ত আস্তানায় ধানের হাঁড়ি আর সিঁদুর-রাঙা জল একত্রে দেখে। ঐ ধান প্রচুর মাত্রায় অংকুরিত হবার অর্থ প্রচুর সন্তান হওয়া ; কম মাত্রার অংকুরোদ্গমের অর্থ কম সন্তান ; আর অংকুরিত হবার পরিবর্তে বীজ নষ্ট হয়ে গেলে বিবাহ অশুভ সূচক। তারপর ঢাক, ঢোল, বাঁশীসহ মিছিল অগ্রসর হয়, বনের গাছে গাছে জ্বলন্ত মশালের বিভীষিকাময় আভায় পাখিরা সচকিত, আর্তরবে তাদের অন্ধকার মধ্যে সন্ত্রাসে পলায়ন। বরের গ্রামের নিকট, নববধূর অভ্যর্থনায় গ্রামের কুমারীরা মাইল দুয়েক অগ্রসর—তারপর নতুন ঘরের দুয়ার অবধি বধূকে নৃত্যগীত সহকারে পৌঁছে দেওয়া।

সাঁওতালরা এক স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। দ্বিতীয় বিবাহ অজানা নয়, তবে বংশরক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া বিরলপ্রায় ; সাঁওতালরা যৌবনের স্ত্রীকে গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা দেয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বিরল এবং স্বামীর আত্মীয়দের সম্মতি ছাড়া কার্যকরী হয় না। এক্ষেত্রে, পাঁচজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে ডাকা হয়, হাঁড়িয়া প্রস্তুত

হয়, তারপর যে পক্ষ বিচ্ছেদ চায়, সে কারণ দর্শায়। আত্মীয়রা সব কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত হলে, বিচ্ছেদ যে পক্ষের কাম্য, সে এই বিচার সভার সামনে একটি গাছের পাতা গম্ভীরভাবে ছিঁড়ে দেয়।

একজন সাঁওতালের জীবনে পঞ্চম প্রধান অনুষ্ঠান হলো : জাতি হতে তার আনুষ্ঠানিক চিরবিদায়। যে কোনো সাঁওতাল মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করলে, ওঝা একটি গাছের পাতায় তেল লাগিয়ে দেখে যে কোন 'ডাইন' বা প্রেত অসুস্থ লোকটিকে 'খেয়ে' ফেললো। দেহ হতে প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ামাত্র শবদেহটি লাল ঔষধিযুক্ত তৈল চর্চিত করা হয় এবং নতুন শাদা কাপড়ে শয্যার উপর সুন্দরভাবে রাখা হয়। আত্মীয়রা সকলে একত্রে, চালের জন্য একটি ও জলের জন্য একটি, মোট দুইটি পিতলের পাত্র ক্রয় করে এবং ছায়াময় সেই জগতের দ্বারপ্রান্তের দৈত্যদের তুষ্ট করতে মৃত বন্ধুকে সক্ষম করার জন্য কয়েকটি টাকার সঙ্গে পিতলের পাত্রগুলি শয্যার উপর রেখে দেয়। চিতা প্রস্তুত হলে এই উপহারগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। পাঁচজন আত্মীয় শবদেহ বের করে নিয়ে আসে, শবদেহ সহ তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করা হয় ও তারপর দেহটি ধীরে ধীরে চিতার উপর নামানো হয়। চিতার এককোণে বা নিকটস্থ কোনো গাছে একটি মোরগকে গলায় কাঠের গজাল মেরে আটকে রাখা হয়। নিকটতম এক আত্মীয় ঘাস দিয়ে এক মশাল তৈরি করে নিজের কাপড়ের সুতো দিয়ে সেটি বাঁধে, তারপর নীরবে তিনবার চিতাটি প্রদক্ষিণ করে মৃতের মুখে অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় সে মুখ ফিরিয়ে থাকে—বন্ধু ও আত্মীয়রা এগিয়ে আসে ও সকলে দক্ষিণমুখী হয়ে চিতায় অগ্নি সংযোগ করে। দাহকার্য সমাপ্তপ্রায় হলে আত্মীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলে ও নিকটতম আত্মীয় অর্ধদগ্ধ মাথার খুলি হতে তিনটি টুকরো নেয়, লাল জড়িবুটি-রঞ্জিত নতুন দুধে সেগুলি ধুয়ে নেওয়া হয় এবং ছোট এক মাটির পাত্রে সেগুলি রাখা হয়।

জীবনোত্তর স্বর্গীয় ভবিষ্যতের কোনো ধারণা সাঁওতালদের নেই। তার স্বাভাবিক ন্যায়বোধ তাকে শিক্ষা দেয় যে মর্ত্যে অন্যায়কারীরা আর ধনীরা মৃত্যুর পর সমুচিত সাজা পাবে; কিন্তু তার ভবিষ্যৎ জীবনে দুষ্টের জন্য শাস্তি থাকলেও সংলোকের ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো পুরস্কার নেই। বিমূর্ত নামপদের অভাবে এই বিষয়ে তাদের প্রকৃত মতামত জানা কঠিন; কিন্তু আমার দেখা সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকটি মনে করে যে কৃপণ পুরুষ ও বন্ধ্যা নারীকে চিরকাল পোকা আর সাপে খায়। আর সৎ লোকরা ফলভারাবনত বাগানে প্রবেশের অধিকার পায়। সাধারণ সাঁওতালদের ধারণা আরো অস্পষ্ট। তার বিশ্বাস, তাকে ঘিরে রয়েছে ভূত আর দানোর দল—তাদের সন্তুষ্ট না রাখলে তাকে শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করতে হবে; কিন্তু এই ভূতরা যে কারা, সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই আর সবশেষে, মৃত্যুর পর তার কাছে সব ফাঁকা।

আর একটি মাত্র—অতি সুন্দর এক অনুষ্ঠান বাকি রইলো,—মৃতের সাথে পূর্ব-

পুরুষদের পুনর্মিলন। চালের থলি আর মাটির ভাঁড়ে খুলির তিন টুকরো নিয়ে নিকটতম আত্মীয় পবিত্র নদী অভিমুখে একাকী যাত্রা করে। নদীতীরে, খুলির তিনটি খণ্ড মাথায় নিয়ে সে জলে নেমে পুরো ডুব দেয়। ডুব দেবার সময় সে সামনে ঝুঁকে পড়ে, যাতে অস্থি তিনটি স্রোতোধারায় পড়ে যায় ও স্রোতোবাহিত হয় — আর এইভাবে 'মৃতের সাথে পিতৃপুরুষের মিলন' ঘটে।

একটি জাতি যে দেশে বাস করে, সেই দেশের চরিত্র কিভাবে গ্রহণ করে, সাঁওতালরা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমুদ্রোপকূলবর্তী দক্ষিণের দেশগুলিতে তারা পুরোপুরি কৃষিজীবী জাতি হিসাবে চিহ্নিত। যে মিশনারিরা পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গলে তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে বেড়িয়েছে, তাদের চোখে সাঁওতালরা মৎস্যজীবী ও শিকারী উপজাতি; বীরভূমের পার্বত্যাঞ্চলে তাদের কোনো নির্দিষ্ট পেশা নেই, এই বন্ধ্যাদেশে যতটুকু ভালো থাকা যায়, তার উপায় হিসাবে এরা গবাদি পশুপালন করে, সামান্য পরিমাণে স্থানীয় শস্য ফলায় এবং জঙ্গলের উপকরণ দিয়ে কোনোমতে তাদের আধা-কৃষিজীবী, আধা-পশুপালক অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখে। বস্তুত, জঙ্গলই তাদের স্থায়ী বন্ধু। নিম্নভূমির হিন্দুদের সাধ্যাতিরিক্ত সমস্ত দ্রব্যসম্ভার জঙ্গলই তাদের সরবরাহ করে। মূল্যবান কাঠ, উজ্জ্বল রং,আঠা, মৌমাছির চাক-ভাঙ্গা মধু আর মোম, ভেষজ ঔষধ, জড়িবুটি, কাঠকয়লা এবং বন্য জীবজন্তুর চামড়া, — পশ্চাৎপদ সমাজের ঐশ্বর্যের এক ক্ষুদ্র দুনিয়া, যা, চাওয়া মাত্র পাওয়া যাবে। তাদের গোরুর গাড়ির চাকা শালগুঁড়ির একটিমাত্র খণ্ড দিয়ে আগাগোড়া তৈরি, শীতকালে এই গাড়ির দীর্ঘ সারি দেখা যাবে বীরভূমের সমতলের মেলার দিকে অতিকষ্টে তুলকালাম আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে। এখানে রাত্রে তাদের তাঁবুর কোনো দরকার নেই ; রাস্তার পাশে কোনো পুকুরের ধারে তারা বলদগুলিকে ছেড়ে দেয়, গাড়ির নিচে হামা দিয়ে ঢোকে, এককোণে একটু আগুন জ্বালে, আরেকটি গাড়ি এনে তার নিরেট চাকাটি দিয়ে খোলা দিকটি বন্ধ করে যেন আগল দেয় এবং ভরপেট খাওয়ার পর গান গাইতে গাইতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

শিকারী হিসাবে সে যেমন দক্ষ, তেমনই শঙ্কাহীন। তীরধনুক ছাড়া কখনো নড়ে না। শক্ত পাহাড়ি এক ধরনের বাঁশ দিয়ে ধনুক তৈরি হয় — সমতলের হিন্দুদের সে ধনুক বাঁকাবার ক্ষমতা নেই। তীর থাকে দুই রকমের : বড় শিকারের জন্য ভারী, তীক্ষ্ণ তীর, আর ছোট পাখির জন্য হাল্কা তীর — যার সূচীমুখ তীক্ষ্ণ না রেখে গোলাকার স্থূল এক আঁবের আকার দেওয়া হয়। শেষোক্ত এই তীরের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ যে কত কঠিন, একবারের চেষ্টাতেই তা বোঝা যায় ; কিন্তু শুধু এই অমার্জিত হাতিয়ার সম্বল করে একজন সাঁওতাল জঙ্গল হতে যত ছোট শিকার আনতে পারবে, আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়েও কোনো ইংরেজ শিকারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। অবশ্য একমাত্র আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্যই

সাঁওতালরা পাখি শিকার করে। রাস্তার পাশে এক সাঁওতাল আস্তানায় আমি দেখেছি যে সারাদিন রাস্তায় পরিশ্রম করার পর, যে পুকুরের পাড়ে তাদের আস্তানা, সেখান হতে তারা জলচর পাখি শিকার করে নিয়ে এলো যে সময়ের মধ্যে, তাতে একজন হিন্দুর স্নান বা মুসলমান যাত্রীর নমাজও শেষ হবে না।

বাঘ বা চিতাবাঘ শিকার তার কাছে একাধারে অবসর বিনোদন এবং মুনাফাও। লাভের আশা থাকলে, বাঘের অস্তিত্ব টের পেলেও, সে ভাগ্যবান যে আত্মীয়ের বন্দুক আছে, তাকে ছাড়া আর কোনো লোককে সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলে না, বন্যজন্তুটির জল খেতে আসার জায়গাটি চুপিসাড়ে নজর করে। এটি জানার পর, নিকটবর্তী কোনো গাছে দুই আত্মীয় অবস্থান নেয় ও ধৈর্য সহকারে দিনের পর দিন, কখনো বহুদিন, জন্তুটির প্রতীক্ষায় থাকে। নিকৃষ্ট মানের বারুদ দিয়ে গাদাবন্দুকটি পাথর ও লোহার টুকরোর সাহায্যে ঠাসা হয় এবং সেটিকে তাক করে বসানো হয়; পলিতার কাজ করে যে ধূমায়িত দড়িটি, ফুঁ দিয়ে সেটিকে জ্বলন্ত করা হয়;. এতসব কাজ করার পরে যদি জানোয়ারটির জলপান অব্যাহত থাকে, তবে সেটিই নিশ্চিতভাবে তার অন্তিম জলপান। সাঁওতালরা শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কখনো গুলি ছোড়ে না। তার বন্দুকের ইঙ্গিত নিয়ে ছেলেখেলা চলে না—সম্ভবত ৩০ মাইলের মধ্যে এইটিই একমাত্র বন্দুক; এবং সমতলের যে হিন্দুগ্রামে যেতে সে সদাসন্ত্রস্ত, নিকৃষ্ট মানের হলেও তার বারুদ খোদ সেখান থেকেই আনীত। আমোদ-প্রমোদের জন্য শিকার হলে, সাঁওতালরা বন্দুক ধরার চেয়ে বাঘ খেদানোর কাজ বেশি পছন্দ করে। বাঘ খেদানোর জন্য জঙ্গলঝাড়ু হবে—যে কোনো ইংরেজ এই ঘোষণা করা মাত্র ঢাক-ঢোল বাঁশি সমেত শত শত সাঁওতাল যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়। দুইদিনের আগাম ঘোষণায় পাঁচশত জনকে হাজির হতে আমি নিজে দেখেছি। জঙ্গলটি বিভিন্ন গোলাকার অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হয়, প্রত্যেক এরূপ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে ইংরেজ শিকারীদের জন্য সাঁওতালরা একটি করে কাঠে উঁচু 'মাচান্' বাঁধে—এইগুলি গির্জার বেদীর মতো হলেও বাঘের নজর এড়াবার জন্য গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে। তীর-ধনুক সজ্জিত পাহাড়িয়ারা চারিপাশ হতে নীরবে বৃত্তাকার অঞ্চলটিকে ঘিরে ফেলে এবং পূর্ব নির্ধারিত কোনো বুনোপাখির ডাক দিয়ে এই প্রস্তুতির সমাপ্তি জানিয়ে দেয়; তারপর সবাই মিলে একযোগে তুমুল চিৎকার তোলে, সাথে থাকে অসংখ্য ঢাক, বাঁশি, শানাই ইত্যাদি। যতই তারা বৃত্তের কেন্দ্রের কাছে আসে, ততই খেলা জমে ওঠে, শিকারটি মানুষের এই বৃত্ত ভাঙ্গার জন্য সচেষ্ট হলেই সাঁওতালরা চরম প্রশংসনীয় সাহস ও পারস্পরিক নির্ভরতা দেখায়, এবং যেসব ছোট শিকার সামনে আসে, সেগুলিকে মেরে ফেলে। মাচায় উপবিষ্ট ইংরেজ শিকারীরা ছোট জানোয়ারকে গুলী করা থেকে বিরত থাকে, কারণ বন্দুকের আওয়াজে বড় শিকার আতংকিত হয়ে ক্রম-আগুয়ান মানুষের বৃত্ত ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে। যেহেতু

বর্তমানে বাঘ ও চিতা বিরল, সে কারণে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে মাচার সশস্ত্র ভদ্রলোকেরা একবারও বন্দুক চালাবার সুযোগ পায় না, অথচ ঝাড়ুয়ারা (বীটার) পায় পর্যাপ্ত শিকার — সারাদিনের কাজের পুরস্কার হিসাবে কারো থাকে একটি খরগোশ, কারো বা একটি পাখি, বা অন্তত বড় মাপের এক সাপ। এইসব নিয়ে বিজয় মিছিল করে তারা ফিরে যায়।

সাঁওতালদের ভাষা এবং উৎসবগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কিছুদিন আগেও তারা কৃষিজীবী ছিল। সমতলভূমি হতে বিতাড়িত হয়ে তারা জঙ্গলের নির্ভরযোগ্যতায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে; কিন্তু কৃষির প্রতি রয়েছে তাদের সহজাত আকর্ষণ ও লক্ষণীয় দক্ষতা। কৃষিকাজের জন্য সমতলবাসী হিন্দুরা সংস্কৃতজাত এক রাজকীয় ভাষা ব্যবহার করে — এই ভাষার একটি শব্দও সাঁওতালিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু গরিব কৃষকদের মধ্যে চলিত রয়েছে হৃতমান, মৌখিক এক ভাষা — এর বহু শব্দ অনার্যদের থেকে নেওয়া। কৃষিকাজে দক্ষতার ব্যাপারে আর্যদের কাছে সাঁওতালরা কোনো প্রকারে ঋণী নয়। তাদের রয়েছে নিজেদের স্বতন্ত্র শস্য,[৫৪] স্বতন্ত্র যন্ত্রপাতি, পৃথক কৃষিপদ্ধতি ও গ্রামীণ জীবনের এক পর্যাপ্ত শব্দভাণ্ডার — উপত্যকার উত্তরাধিকার হতে যে জাতি তাদের বঞ্চিত করেছে, তাদের থেকে এইসব একটি শব্দও গৃহীত হয়নি। সমুদ্র সন্নিকটে নিচু জমিতে হিন্দু প্রতিবেশীর মতোই সফলভাবে সে ধান চাষ করে এবং তাদের দ্বারা অত্যাচারিত না হলে, তার অবস্থা সচ্ছল হতে পারে। কিন্তু সমতলবাসীদের অগ্রগমনের সাথে সাথে ঘটে তার পশ্চাদপসরণ — ফলে সাঁওতালদের বড়গ্রাম বিরলপ্রায় এবং কোনো শহর বা নগর গড়ে ওঠেনি। মিশনারিরা সর্বত্র সাঁওতালদের 'নতুন ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের প্রতি সন্দেহাতীত পক্ষপাত' লক্ষ্য করেছেন। মানুষকে প্রকৃতির সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ উপহার যে ধান, সেটাই সাঁওালদের জাতীয় শস্য: তাদের প্রাচীন কিংবদন্তিতে এর উল্লেখ রয়েছে; ধানচাষের বিভিন্ন পর্যায় প্রকাশ করার জন্য শব্দরাজিতে তাদের ভাষা পরিপূর্ণ;[৫৫] এবং ধান তোলায় তাদের বংশানুক্রমিক দক্ষতা, এমনকি জঙ্গলেও কখনো তারা সম্পূর্ণ হারায় নি। চাষ-আবাদের প্রতিটি পর্যায় উৎসব দ্বারা চিহ্নিত। যেসব উৎসব সাঁওতালরা পালন করে ও-দেবতাদের কাছে বলি দেয়, সেগুলি হলো: বীজ বপন উৎসব (এরো-সিম পরব); সবুজ-পত্র নির্গম উৎসব (হরিয়াল-সিম); ধানের শীষ বের হলে; (হোরো) এবং বৎসরের সবচেয়ে বড় উৎসব, ধান তোলার পরব (জোহোরাই)।[৫৬]

সাঁওতালরা স্বভাবে মধুর, অতিথিবৎসল ও নিজেদের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় সামাজিক। যে কোনো উপলক্ষের অজুহাতে ভোজ আয়োজিত হয় এবং যে কোনো বিলাসিতার অভাব সেখানে ভাত-থেকে তৈরি পচুই বা হাড়িয়া ও শিকারের প্রাচুর্য দিয়ে পূরণ করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলে প্রতি গৃহে দরজার বাইরে

রয়েছে 'দাওয়া'—সেখানেই জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল গৃহাগত অতিথিকে সৌজন্য সহকারে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সাঁওতালদের নিজেদের সৌজন্য বিনিময়ের নিজস্ব পদ্ধতি আছে। গ্রামের হিন্দুদের মতো কোনো সাঁওতাল আভূমি নত হয় না; বরং নিজের হাতদুটি কপালে ছোঁয়ায়, তারপর অতিথির দিকে হাত প্রসারিত করে পরস্পরের হাতের তালুগুলি মেলায়।[৫৭] স্বজাতের বৃদ্ধদেরই সে মূলত শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু বহিরাগতদের সাথে ব্যবহারে, ভদ্র ও অতিথিবৎসল হওয়া সত্ত্বেও, সে সমভাবেই দৃঢ় ও অনবনত। অপরিচিত ব্যক্তির সহায়তায় অর্থোপার্জনের চিন্তা সে কখনো করে না, ব্যবসা সংক্রান্ত সকল বিষয় সযত্নে পরিহার করে এবং অতিথি সংকারের জন্য তার স্ত্রী যে ফল বা দুধ দেয় তার দাম দিতে চাইলে আন্তরিক দুঃখিত বোধ করে। যদি অবশেষে ব্যবসাগত ব্যাপারে তাকে রাজী করানো যায়, সেক্ষেত্রে তার ব্যবহার সংক্ষিপ্ত, কাঠখোট্টা ধরনের; সমতলবাসী কোনো লোক যা করে না, সে তাই করে—প্রথমেই প্রকৃত মূল্য বলে দেয় এবং এই বিষয়ে কোনো আলোচনা বা দরাদরি ভদ্রভাবে প্রত্যাখান করে। অপরিচিত লোকজন তার গ্রামে না এলেই সে খুশি থাকে; কিন্তু তারা যখন এসেই যায়, সে তাদের সম্মানিত অতিথি হিসাবে গণ্য করে। তার অতিথিদের সাথে কোনোরূপ কারবারে সে অনেক কঠোরভাবে গররাজী; কিন্তু অতিথিরা বিষয়টি উত্থাপন করলে, স্বজাতিদের মতোই সমান সৎভাবে কারবার করে।

গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি পিতৃতান্ত্রিক। প্রতিটি জনপদের রয়েছে এক মূল প্রবর্তক (মাঝি হানান) বা বড়সর্দার,—ইনি সম্প্রদায়ের পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য। পবিত্র শালকুঞ্জ হতে ইনি স্বর্গীয় সম্মান লাভ করেন এবং আপন বংশধরদের নিজ কর্তৃত্ব অর্পণ করে যান। সাময়িক সর্দারের (মাঝি) রয়েছে বংশানুক্রমিক শাসকসুলভ অবিসংবাদিত প্রতিপত্তি; কিন্তু একমাত্র বড় ব্যাপারগুলিতেই তাঁর হস্তক্ষেপ ঘটে, খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি তাঁর সহকারির (পরামানিক) দায়িত্বে থাকে। সাঁওতালদের মধ্যে বহু বৎসর ব্যয় করেছেন এমন জনৈক মিশনারি আমাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন যে, এই সর্দারদের তরফ হতে ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার তিনি কখনো দেখেন নি এবং সর্দারের কথায় খাদ্য, পথপ্রদর্শক, পরিবহন ব্যবস্থা, এক কথায় সকল ব্যাপারে যে সুবিধা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, যে কোনো আগন্তুকেরও সেটা চোখে পড়ে। বয়স্কদের মতোই শিশুদেরও সর্দার ও তার সহকারি থাকে। কিশোর সম্প্রদায় তাদের নিজেদের (যোগ-মাঝি ও যোগ পরামাণিক) দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়—কিশোর-কিশোরী বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার আগে পর্যন্ত এই তত্ত্বাবধান বহাল থাকে। এছাড়া, চৌকিদারের কথা বলা হলেই, গ্রামীণ কর্তৃপক্ষের তালিকা সম্পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু বিশুদ্ধ সাঁওতালদের মধ্যে অপরাধ এবং অপরাধ দমনের

জন্য কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাতপ্রায়।[৫৮]

সাঁওতাল তার পরিবারের মহিলাদের শ্রদ্ধার সাথে দেখে, তাদরে উৎসবে যোগদানের অনুমতি দেয়, এবং শুধু স্ত্রীর খাওয়ার আগে নিজের খাওয়া সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে নিজ প্রাধান্য চিহ্নিত করে। সাঁওতাল রমণী বিনয়ী কিন্তু অকপট। হিন্দুরমণী সুলভ সংকুচিত খুঁতখুঁতে স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ সাঁওতাল রমণী অপরিচিতদের সার্থে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আলাপ করে, এবং স্বামীর অতিথিদের প্রতি আতিথ্যের দায়িত্ব বহন করে। সাঁওতাল রমণীদের নৃত্য মন্থর ও মনোরম। সকল মহিলারা হাত ধরাধরি করে বৃত্তাংশের মতো সারিতে দাঁড়ায়, বাজনাদাররা থাকে মাঝে, তাদের দিকে রমণীরা ক্রমন্বয়ে এগিয়ে আসে ও আবার পিছিয়ে যায় এবং প্রতিবার একটু একটু করে ডানদিকে সরে যায় – এইভাবে নাচ চলে এবং পুরো বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগে।

সাঁওতালরা হিন্দুদের থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকে। পাহাড়ের কোলে কোনো বিজন স্থানে হঠাৎ এক ধানের ক্ষেত দেখা দেয় এবং কিছু বোঝার আগেই সাঁওতাল পল্লীটি আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মাঝে একমাত্র যে হিন্দুটিকে তারা মেনে নেয় সে একজন কামার, প্রতি গ্রামেই একজন করে কামার যুক্ত থাকে এবং কালক্রমে তার বংশধররা সাঁওতাল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরা গ্রামের সমস্ত লোহার কাজ করে এবং সাঁওতাল গিন্নিদের বালা ও আন্যন্য স্থূল গহনা গড়ে। কোনো কোনো অঞ্চলে, হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে, বা বলা সঙ্গত, স্বীকৃত হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যবর্তী স্তরে, ডোম নামে সম্প্রদায়ের এক ছোট দলকে সাঁওতাল গ্রামের প্রান্তে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়; এরাও শীঘ্রই পরিবেশের শিকার হয় এবং তাদের মধ্যে আদিতে যে হালকা চিহ্নটুকু ছিল, তা অচিরেই হারায়। পাহাড়িয়ারা এত সরল যে তাদের সাথে কারবারে আগ্রহী সমতলবাসীর পক্ষে অতীব লাভজনক, সেই কারণেই যে ব্যক্তির প্রভাব সাঁওতালদের মধ্যে তাদের স্থান করে দিতে পারে, তাকে বিপুল উৎকোচ দিতে এরা রাজী থাকে। কখনো কখনো গ্রামের মোড়লের আনুকূল্যে, কোনো হিন্দু দোকানি বা মহাজন সাঁওতাল পল্লীতে অনুপ্রবেশ করে; এবং সেদিন হতেই গ্রাম থেকে সততা, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিদায় নেয়।

১৭৯০ সন পর্যন্ত সাঁওতালরা সন্নিহিত নিম্নভূমিতে উপদ্রব করত ও প্রধানত তাদের অবাধ অগ্রগতির ফলেই লর্ড কর্নওয়ালিস বীরভূমের প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রতি শীতে, ধান তোলার ও তাদের বিখ্যাত খামার-উৎসব সমাপ্ত হবার সাথে সাথে, পথিমধ্যে জঙ্গলে শিকার ও চতুর্দিকে লুণ্ঠন করতে করতে সমগ্র জাতি সমতলে নেমে আসত। তিনমাস ধরে এই চমৎকার অভিযানের পর ফেব্রুয়ারি উৎসব পালনের জন্য লুঠের মাল বোঝাই করে তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে আসত। যে সকল কার্যকলাপের ফলে অবশেষে

সাঁওতালরা নিজেদের অঞ্চলে আবদ্ধ থেকেছে, তা ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে।[৫৯] শীতকালীন অবসর বিনোদন হিসাবে নিম্নভূমিতে হানাদারি অভিযানের বদলে নিজেদের জঙ্গলে শিকারে সন্তুষ্ট থাকতে তারা ক্রমশ শিখলো, এবং এই শতাব্দীর শেষে এক নতুন ভূমিকায় তাদের আবির্ভাব—যথা, নিম্নভূমির মালিকদের মূল্যবান প্রতিবেশী। ১৭৯০ সনে ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষ সাধারণ ভাবে আরো বিস্তৃত হয় এবং মহাদুর্ভিক্ষের পর হতে ক্ষেতের সীমান্ত অধিকার করে যেসব বন্যজন্তু ঘাঁটি গেড়েছিল, তাদের থেকে সমতলভূমিকে মুক্ত করার জন্য সাঁওতালদের ভাড়া করা হয়। বিগত লুণ্ঠনের জমানার চেয়ে এই ব্যবস্থায় আমোদ ও মুনাফা বহুগুণ বেশি ছিল এবং ক্রমে ক্রমে শীতকালে সমতলে নিয়মিত কাজকর্ম গ্রহনে তাদের রাজী করানো যায়। এই ঘটনা এত লক্ষণীয় ছিল যে, লণ্ডনের সংবাদপত্রে স্থান পায় ও ১৮৯২ সন হতে সাঁওতালদের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।[৬০]

সেই বৎসর হতে বাংলার নিম্নভূমিতে দিনমজুর হিসাবে তার আবিভাব মুসলমান শাসনের অবসানে, দুর্ভিক্ষের ফলে কিভাবে জনসংখ্যা ও কর্ষিত জমির পরিমাণের সমতা বিঘ্নিত হয়, তা আমরা দেখেছি। জেলার পর জেলা পতিত পড়ে থেকেছে; আমাদের প্রথম পদ্ধতি ছিল বাৎসরিক বন্দোবস্তের পদ্ধতি; এর ফলে অমিতব্যয়ী ও অলস জমিদারদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য পরিশ্রমী ও উদ্যমী জমিদারদের ফলভোগ করতে হয়; ফলে বিপুল পরিমাণে পতিত জমি উদ্ধারের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু ১৭৯০ সনে, যখন ব্রিটিশ সরকার পুনরুদ্ধার কৃত জমির উপর নতুন কোনো কর আরোপ না করা স্থির করলেন, পুঁজি দ্রুত কৃষিভিত্তিক দেশের স্বাভাবিক গন্তব্যস্থলে হাজির হলো—অর্থাৎ জমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে। প্রতিটি সক্ষম কৃষককে যতবেশি একর মর্জি চাষ করতে স্বাগত জানানো হলো। তবু চমৎকার বিশাল বিশাল জমি উদ্বৃত্ত পড়ে রইলো; এবং অভূতপূর্ব মজুরি ও সুলভ খাজনায় প্রলোভিত হয়ে সাঁওতালরা সমভূমিতে এসে শত শত পতিত গ্রাম উদ্ধার করলো ও বীরভূমকে এক নতুন ভূমিব্যবস্থা উপহার দিল। উত্তরের জেলা রাজমহলে ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেয়ে তারা আরো নেমে এলো; তাদের জমির অনুদান ও সাথে সাথে সাধারণ আইনের আওতা হতে ও সকল প্রকার কর হতে অব্যাহতি দিয়ে সরকার বিজ্ঞতার সাথে তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের আওতায় আনলো। ১৮০৯ সনে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, 'যেসব ব্যাপার সর্বসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করে না, তারা নিজেরাই সেগুলির মীমংসা নিজেদের প্রথানুসারে করে; কিন্তু ডাকাতি, নরহত্যার মতো হিংস্র অপরাধে অপরাধীদের আইনের হাতে সমর্পণের জন্য তাদের এক বাৎসরিক ভাতা ঘুষ দেওয়া হয়; এবং তাদের লোকদের নিয়ে গঠিত জুরিরা তাদের দোষী মনে করলে, বিচারকরা এইসব

অপরাধীদের সাজা দেন।'[৬১]

এইসব ব্যবস্থাগ্রহণ করেই ব্রিটিশ সরকার বহিরাক্রমণকে এইদেশে বহিরাগতদের বসবাস করায় রূপান্তরিত করে এবং অবিস্মরণীয় কাল হতে যে জাতি বাংলার পশ্চিম সীমান্তের আতংক ছিল তাদের ব্যবহার করতে পারে। মুসলমান আমলে যে জাতি কর্ষিত জমিকে পতিত জমিতে পরিবর্তিত করে, ইংরেজ আমলে সেই পতিত জমিকে আবার আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করা ঐ একই জাতির বিধিলিপি ছিল।

শীতকালীন অভিজান জনিত ক্ষয়ক্ষতি আর না হওয়ার ফলে সাঁওতালদের পক্ষে শীঘ্রই তাদের বন্ধ্যাজমি অপ্রতুল হলো এবং ১৮৩০ সন নাগাদ তারা দলে দলে উত্তর অভিমুখে দেশান্তরে যাত্রা শুরু করলো। উত্তরের পাহাড়ে তারা অন্য এক আদিবাসী জাতির সাক্ষাৎ পেল; এরা তুলনায় বেঁটে, আরো কৃষ্ণকায়, হিংস্রতর, অপরিচিতদের প্রতি তুলনায় আরো শত্রু মনোভাবাপন্ন, শাস্তিপূর্ণ অজ্ঞ, জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এদের ভাষা অবোধ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই জাতি মুসলিম সশস্ত্র শক্তিকে প্রতিহত করেছে ও অবশেষে ১৭৮০ সনে অগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের সত্যানিষ্ঠ ও নমনীয় নীতির বশীভূত হয়েছে। অগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের সমাধির উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত রয়েছে: 'রাজমহলের জঙ্গলটেরির (অরণ্য সীমান্ত) যে উচ্ছৃংখল ও অসভ্য অধিবাসীরা তাদের লুণ্ঠন অভিযান দ্বারা সমগ্র সন্নিহিত অঞ্চলে দীর্ঘদিন উপদ্রব করেছে, রক্তপাত বা কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক ভীতি ছাড়াই একমাত্র সৌহার্দ্য, বিশ্বাস ও মহানুভবতার নীতি গ্রহণ করে তিনি তাদের সামগ্রিক ভাবে বশীভূত করার চেষ্টা করেন ও সাফল্য অর্জন করেন, এবং —আধিপত্যের রূপ হিসাবে যে বিজয় সবচেয়ে স্থায়ী তথা, যুক্তিগ্রাহ্য, সেই হৃদয় জয় করে ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাদের যুক্ত করেন।'[৬২]

এই বন্য উপজাতিদের মধ্যে স্থির হতে না পেরে, অপেক্ষাকৃত সভ্য সাঁওতাল দেশান্তরীরা নানা যাযাবর দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে; ১৮৩২ সনের চমৎকার নীতি ব্যতীত সম্ভবত তারা আবার অসভ্য জীবনে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হতো হিন্দুরা সর্বদা এই যুদ্ধবাজ পাহাড়িয়াদের বিপজ্জনক প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য করেছে, ফলে পাহাড়ের ঢালে উর্বরা জমি সর্বদা জনহীন নিরপেক্ষ জমি থেকেছে। ১৮৩২ সনে সরকার জন্মের মতো পাহাড়িয়াদের অঞ্চল পাকা পিলারের এক বৃত্তাকার বেড়া দিয়ে চিহ্নিত করে দিতে মনস্থ করে। হিন্দুরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাষের সীমানা এই বেড়া অবধি এগিয়ে নিয়ে এলো; কিন্তু পাহাড় ও পিলারের মধ্যবর্তী বন্য পাহাড়িয়ারা চাষ করতে সাহসী না হওয়ায় অনধিকৃত পড়ে রইলো। এই উর্বরা অঞ্চলের জন্য প্রয়োজন ছিল এক জনবসতির, এবং এই প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী হিসাবে সাঁওতালরা আবিষ্কৃত হলো। হিন্দুদের তুলনায় কম ভীরু হবার

ফলে তাদের পাহাড়ি প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখতে তারা সম্পূর্ণ সক্ষম ছিল ; অরণ্যাবৃত অঞ্চলে আধা কৃষিজীবীর জীবন তাদের প্রিয় ছিল, এবং জঙ্গল হতে জমি উদ্ধারের সাথে তাদের ছিল আবাল্য পরিচিতি এই উর্বর পাহাড়ি ঢালু জমি ছিল সেই স্বপ্নের দেশ যার খোঁজে এতদিন তারা বৃথাই অনুসন্ধানরত থেকেছে।[৬৩] নামমাত্র খাজনায় এই জমিতে প্রথম যে কয়েকশত জন বসতি স্থাপন করলো, দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠায় দক্ষিণের পাহাড় হতে তাদের আত্মীয়দের তারা ডেকে পাঠালো ও ১৮৩৮ সনের মধ্যেই তারা ৩ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৪০টি গ্রাম পত্তন করে ফেললো। উর্বরা জমি ও শিকার সমৃদ্ধ বনভূমির থেকেও তাদের বেশি আকর্ষণ করে এই সত্য যে এখানে তারা নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে। বীরভূমের পতিত জমিতে যারা বসতি স্থাপন করলো, শীঘ্রই তারা সমতলবাসী ও পাহাড়িয়া স্বজাতি উভয়ের দ্বারাই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হিসাবে গণ্য হতে থাকলো। পরিবার ভিত্তিক তাদের পুরাতন প্রথাসমূহ, তাদের ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও এইগুলিতে নিহিত মানুষে মানুষে সাম্যের নীতি দ্রুত বিসর্জিত হলো এবং এইভাবে তারা বিশাল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাৎপর্যহীন এক বর্ণে অধঃপতিত হলো। বস্তুত, সমতলের গ্রামগুলিতে সাঁওতালদের মাংসভুক অসভ্য হিসাবে গণ্য করা হয় ও সর্বনিম্ন শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলে পিলারের বেড়ার ভিতরে যেখানে হিন্দুদের অনুপ্রবেশ বিরল, যেখানে সাঁওতালরা আজও তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। সে কারণেই এই অঞ্চল সাঁওতালদের প্রিয় আবাসভূমি, আর তাই ১৮৪৭ সনের, অর্থাৎ মিঃ ওয়ার্ড কর্তৃক এই পিলারগুলি নির্মিত হবার ২৫ বৎসরের মধ্যে, এই অঞ্চলে লক্ষাধিক জনসংখ্যা সংবলিত ১৫ শত সাঁওতাল গ্রাম ও শহর গজিয়ে উঠলো। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে, এই জনসংখ্যা বর্তমানে দুই লক্ষাধিক।

পশ্চিমের নিম্নভূমিতে আবাদি জমি ওজনসংখ্যার মাঝে সমতা ফিরিয়ে আনা ছাড়াও সাঁওতালরা সমগ্র বাংলাব্যাপী ব্রিটিশ উদ্যোগকে সম্ভবপর করার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিগত দুই প্রজন্ম ধরে যেসব হিন্দুর বাস্তুভিটের সাথে এক টুকরো খামার রয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই তারা বিদেশি প্রভুর ভাড়াটে কর্মী হতে রাজী হয় না। এতাবৎ, জনগণের মধ্যে পুঁজিপতি ও দিনমজুর হিসাবে শ্রেণীবিভাজন হয়নি ; এবং বাংলায় ইংরেজ পুঁজি বিনিয়োগ কালে দেখা গেল যে উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান অনুপস্থিত। সুতরাং দেশের অবস্থার সাথে সংগতি রেখে, শ্রমের জন্য কৃষকদের অগ্রিম দাদন দিতে ইংরেজ পুঁজি বাধ্য হয় — এই ব্যবস্থা স্বভাবত লাভজনক নয় ও এতে অপব্যবহারের সম্ভাবনা নিহিত। উপরন্তু, পরবর্তীকালে ইংরেজ কারবারের প্রধান ফসল নীল, কৃষকদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায় ; কোনো কোনো অঞ্চলে নীল চাষ করার জন্য নীলকরদের

প্রথমে ঋণ দিয়ে বা আবাদি জমি ক্রয় করে সন্নিহিত সমগ্র জনসাধারণকে আয়ত্তাধীন করার প্রয়োজন হতো। সিকি শতাব্দী জুড়ে বাংলার নীল উৎপাদনের এক বড় অংশ অত্যাচারের ফলশ্রুতি। কৃষক স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা মেনে নিলেও এই ঘটনা কম পীড়াদায়ক নয়। এই অসন্তোষজনক অবস্থায় পশ্চিমের আদিবাসীরা মুক্তিদূত হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩৫ সন নাগাদ সাঁওতালসহ অন্যান্য আদিবাসী উপজাতিরা পূর্বাভিমুখে ছোট ছোট দলে যাত্রা করে; জীবনধারণের জন্য তারা যে কোনো কাজেই ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু সম্ভব হলে কৃষিভিত্তিক কাজকর্ম তাদের পছন্দসই ছিল। পাহাড় আর লালমাটি দিয়ে পশ্চিমবাংলার আবাদি জমির সীমা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত এবং সেই সীমা পর্যন্ত সবত্রই ইতিমধ্যেই চাষ বিস্তৃত। অথচ পূবের জেলাগুলির উর্বর পলিমাটিতে ছিল সংখ্যাল্প কৃষক, ফলে প্রতিটি জনহীন জলাভূমি ও জঙ্গলের প্রান্তে দ্রুত সাঁওতাল পল্লী গড়ে উঠলো। হিন্দু কৃষকদের থেকে জবরদস্তি শ্রম আদায়ের ব্যবস্থা অধিকাংশ ইংরেজ ভদ্রলোকের মনঃপূত ছিল না। নবাগত সাঁওতালদের থেকে প্রচুর দিনমজুর পাওয়ার ফলে এই ব্যবস্থার আর প্রয়োজন রইলো না। নীলচাষ ছিল পাহাড়িয়াদের পক্ষে উপযুক্ত কাজ। সাঁওতাল অভ্যাসের সাথে সংগতি সম্পন্ন এই কাজ প্রধানত কৃষিকর্ম ভিত্তিক ও এখানে অনিয়মিত কাজের অবকাশ থাকে--অর্থাৎ, কোনো কোনো সময়ে সর্বশক্তি দিয়ে কাজের প্রয়োজন হলেও, অন্যান্য সময়ে প্রায় সম্পূর্ণ আলস্যের সুযোগ থাকে।

নিম্নবঙ্গের পূব ও পশ্চিমের জেলাগুলির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে পশ্চিমের পাহাড় হতে অব্যাহত এক জলস্রোত আজও বহমান। পূবের জমি পশ্চিম হতে শুধু উর্বরতর নয়, সুলভতরও। সার ও কৃত্রিম জলসেচ প্রয়োজন এমন এক-ফসলি জমি একর প্রতি ৯ শিলিং-এর কম খাজনায় বীরভূমে পাওয়া যায় না। অথচ খুব সাম্প্রতিক কালেও, সার ছাড়াই দোফসলি চমৎকার জমি পূবের জেলাগুলিতে সাত বা আট শিলিং-এ পাওয়া সম্ভব। বস্তুত, শেষোক্ত জেলাগুলিতে সার বা কৃত্রিম জলসেচ প্রায় অজানা। কলিকাতার এক সংবাদপত্র অনুযায়ী, 'সাধারণভাবে জ্ঞাত বলে মনে না হলেও এই কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে পশ্চিমের উদ্বৃত্ত জনগণের সাহায্যেই বর্তমানে পূর্ববঙ্গের জনবসতি গড়ে উঠছে।' নদীয়ার সর্বত্র সাঁওতাল, ডাংগর বা অন্যান্য উপজাতিদের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাসরত দেখা যায় এবং তারা নিম্নভূমির জনগণের মধ্যে নিজেদের জাতিগত প্রথাসমূহ বজায় রাখে। পূবের জেলাগুলির[৬৪] বহু নীলের কারখানাতে এইসকল পশ্চিমি উপজাতিদের গ্রাম রয়েছে। যেখানেই শারীরিক শ্রম প্রয়োজন, সেখানেই এদের একটি পরিবার আবির্ভূত হয়, কয়েকদিনে আপন পর্ণকুটীর গড়ে তোলে, এবং মাস পূর্ণ হবার আগেই তারা এত একাত্ম হয়ে যায় যেন এখনো তারা পুরানো

পাহাড়েই বাসরত। শ্রমে ধৈর্যশীল, প্রকৃতির সাথে একাত্ম, নামমাত্র পয়সায় জীবনধারণে সক্ষম, সুখাদ্যের অভাবে শিকড়-বাকড়েই সন্তুষ্ট, কৃষ্ণকায়, মদ্যপ্রেমী কিন্তু মদ্যপ নয়, শূকর শিকার অবসর বিনোদন, হিন্দুদের দ্বারা ঘৃণিত, ঘৃণার প্রত্যুত্তরে প্রাণভরে ঘৃণা করায় পটু, পশ্চিমের এই উপজাতি পূর্ববঙ্গে ইংরেজ কারবারের প্রাণশক্তি স্বরূপ। এদের অধিকাংশই এসেছে মধ্যাঞ্চলের সেই মালভূমি হতে, যেখানে জনসাধারণ স্থায়ী উপবাসের চরম সীমায় কোনোক্রমে রয়েছে, যেখানে পুষ্করিণী খননে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করার আগে আবাদবৃদ্ধি সম্ভব নয়, যেখানে শীতের প্রকোপ চরম, যেখানে চর্মরোগ সুলভ আর অনশনক্লিষ্ট শিকারী সম্প্রাদায় সুলভ প্রতিটি অক্ষমতা বিদ্যমান এবং যেখানে চিরন্তন ক্ষুধাজাত রাজনৈতিক অসন্তোষ অতিপরিচিত। নতুন বাসভূমিতে প্রকৃতির কৃপায় শারীরিক শ্রম প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, ভালো মজুরি নগদ টাকায় সর্বদা পাওয়া যায় এবং তাদের পূর্বতন বাসভূমির ক্ষুদ্র জমিতে জীবনধারণের জন্য যতটুকু পেত, এখানের জঙ্গলে ততটুকু যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রত্যেক শীতকালে, নীলের কাজ শেষ হবার পর, বহু মজুর তাদের আদিগ্রামে যেত এবং প্রায়শ একদল গরিব আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়ে আসত, আর সৈন্যরা যেভাবে লুঠের মালের প্রত্যাশায় আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, সে ভাবেই তারা আগামী বসন্তের বীজ বপন পর্যায়ের মজুরির প্রতীক্ষায় থাকত।

মার্সি ও ক্লাইড নদীর তীরের মতো গঙ্গার উপত্যকাতেও সরবরাহ ও চাহিদার নিয়ম সমভাবে সক্রিয়। বাংলার পশ্চিমের জেলাগুলিতে জমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি আর পূবের জেলাগুলিতে জনসংখ্যা এখনো জমির সমপরিমাণও হয়নি।[৬৫] সুতরাং, জমি ও পুঁজির সাথে শ্রমিকের দর কষাকষি পশ্চিমের তুলনায় পূবে অনুকূল; এবং বিধাতা তাদের যে একমাত্র পণ্যের অধিকারী করেছেন— শারীরিক শ্রম—তা যে জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা যাবে, সেইটি খুঁজে বের করার ও সেখানে যাতায়াত করার বিচারবুদ্ধি পাহাড়িয়া জাতিগুলির যথেষ্ট রয়েছে।

ব্রিটিশ সরকারের নমনীয় নীতির অধীনে, উত্তরের পাকা পিলারের বেষ্টনীর মধ্যস্থিত সাঁওতাল উপনিবেশটি নিম্নবঙ্গের যে কোনো জেলার মতোই নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ফসল কাটার পর প্রত্যেক শীতে উৎপন্ন শস্য ক্রয় করার জন্য হিন্দু বণিকরা সেখানে হাজির হতো এবং ধীরে ধীরে এই বসতির প্রতিটি গঞ্জে একজন করে হিন্দু ব্যবসায়ী স্থানীয় বাসিন্দা হলো। সাঁওতালরা ছিল অজ্ঞ ও সৎ; আর হিন্দু ব্যবসায়ীরা ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিবেকহীন। প্রতি বৎসর পাহাড় হতে সমতলে আপন আদি শহরে ফিরে এসে সফল কয়েকজন ব্যবসায়ী তাদের দ্রুত আহরিত সম্পদে প্রতিবেশীদের অবাক করে দিয়ে সমতল-ভূমিতে জমি ক্রয় করত। হিন্দুদের বিবেক-বর্জিত এক অংশের কাছে সাঁওতাল

অঞ্চল যেন-তেন-প্রকারেন দ্রুত সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হয়ে উঠলো। দুঃসাহসী কতিপয় ইংরেজ ফাটকাবাজের নীতিহীন কর্মকাণ্ডে যেমন সমগ্র ইংরেজ জাতির মর্যাদা এইদেশে বিঘ্নিত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই এই ব্যবসায়ীদের জন্যই সাধারণভাবেই সমগ্র হিন্দু জনসাধারণ সাঁওতালদের কাছে প্রতারক, অত্যাচারী ও সুদখোর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উত্তরের এই সাঁওতাল উপনিবেশ হতে বীরভূমের পাহাড়ি উপত্যকা পর্যন্ত সর্বত্র সাঁওতাল অঞ্চলের প্রান্তে হিন্দু দোকানিরা বিভিন্ন অজুহাতে বসবাস শুরু করে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই ধনবান হয়। প্রতিটি লেন-দেনে তারা গরিব সাঁওতালদের প্রতারিত করে। জঙ্গলবাসী বিক্রয়ের জন্য মাখন নিয়ে আসে; হিন্দু দোকানির পরিমাপের পাত্রে থাকে গোপন বাড়তি জায়গা; সাঁওতাল কৃষক লবণ, তেল, কাপড় ও বারুদের সাথে বিনিময়ের জন্য ধান নিয়ে আসে; হিন্দু শস্যের জন্য ভারি বাটখারা আর বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার সময় হাল্কা বাটখারা ব্যবহার করে। প্রতিবাদ করলে সাঁওতালদের বলা হয় যে করযোগ্য দ্রব্য হওয়ার কারণে লবণের জন্য অন্য বাটখারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অসম বিনিময়ের ফলে লব্ধ সম্পদ মহাজনিতে নিয়োগ করে বর্ধিত হয়। জঙ্গল সাফ করার সময়, মৃগয়ালব্ধ পশুর অভাব পূরণের জন্য, নবাগত পরিবারের সামান্য শস্য অগ্রিম প্রয়োজন হয়। হিন্দু ব্যবসায়ী তাদের সামান্য পরিমাণ ধান দেয় এবং পরিবর্তে জঙ্গল সাফ হবার পর বীজ বোনা সমাপ্ত হওয়ামাত্র জমিটি দখল করে। আরেকটি পরিবার, আতিথ্যের আতিশয্যে, তাদের সারা বৎসরের সঞ্চিত ফসল দিয়ে ভোজ দিয়ে দেয় ও তারপর বাকি বৎসর চালাবার জন্য জনৈক শস্য ব্যবসায়ীর নিকট ঋণগ্রহণ করে—তাদের কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রাখার মতো যৎসামান্য অগ্রিম সে দেয়। যে মুহূর্তে সাঁওতাল কৃষক এই ঋণ গ্রহণ করে, তখন থেকে সে ও তার সন্তানরা শস্য ব্যবসায়ীটির ভূমিদাসে পরিণত হয়। পরিবারটি যতই ব্যয় সংকোচ করুক, এই ঋণজাল হতে নিজেদের মুক্ত করার জন্য যত চেষ্টাই তারা করুক, যত কার্পণ্য আর যতো পরিশ্রমই তারা করুক না কেন, উৎপন্ন সমস্ত শস্য হিন্দুটি দাবি করবে এবং পরবর্তী মরশুমে দেয় হিসাবে ঋণের এক অংশ বাকি থাকবে। বছরের পর বছর সাঁওতালটিকে এই অত্যাচারীর সেবা করে যেতে হবে। যদি নির্যাতিত জঙ্গলে পলায়নের ভয় দেখায়, তখন সুদখোরটি আদালতে তার নামে মামলা করবে—ডিক্রি পাওয়ার ও তা কার্যকরী করার আগে যাতে সাঁওতালটি ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে না পারে, তার ব্যবস্থা করবে। কোনো প্রকার বিপদসংকেত ছাড়াই দরিদ্র কৃষকটির গোরু-বলদ, গৃহস্থালীর সামান্য উপকরণ, এমনকি পারিবারিক উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত পিতলের তৈজসপত্রগুলিও বাজেয়াপ্ত হবে। এমনকি সাঁওতাল রমণীদের মধ্যে নারীমর্যাদার প্রতীক শস্তা লোহার গহনাগুলিও তার স্ত্রীর হাত হতে ছিনিয়ে নেওয়া

হবে। প্রতিকরের কোনো উপায় নেই : প্রায় শত মাইল দূরে সভ্যজগতের কেন্দ্রে আদালত বসে। রাজস্ব আদায়ের চিন্তায় মগ্ন ইংরেজ বিচারকরা জনগণের এইসব তুচ্ছ অভিযোগের জন্য কোনো সময় দিতে পারে না। দেশীয় কর্মচারিরা প্রত্যেকেই অত্যাচারীর অর্থপুষ্ট : পুলিশেরও তাতে বখরা থাকে। সাঁওতালদের কথায়, 'ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি থাকেন বহুদূরে' ; তাই. গরিবের অশ্রু ঝরত— সহায়তা করার কেউ ছিল না।

এই সকল বিষয়ে সরকার কিছুই জানত না। সাঁওতালদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন মাত্র ইংরেজ অফিসার নিযুক্ত ছিল ; একজন লোকের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, মনে হয় তিনি তা করতেন। চাষের বিস্তৃতির সাথে সাথে তিনি ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করেন, এবং কোনো প্রকার অত্যাচার বা প্রতিবাদ ছাড়াই তার ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব ১৮৩৮ সনে ৬৮ পাউণ্ড হতে ১৮৫৪ সনে ৫৮০৩ পাউণ্ড হয়। ন্যায় বিচারের দায়িত্ব আদালতের নিম্নতম কর্মচারিদের অর্পণ করতে হয়, তারা হিন্দু ও স্বাভাবিক কারণেই তারা ঘৃণ্য সাঁওতালদের বিরুদ্ধে স্বজাতির পক্ষ নিত। ইংরেজ অফিসার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় রাজস্ব সংক্রান্ত প্রাত্যহিক কাজ সমাপনে সক্ষম হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত। জনগণের ইতিহাস, অভ্যাস বা প্রয়োজন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য তার এক মুহূর্তও সময় ছিল না। সশস্ত্র, অর্ধসভ্য, শক্তসমর্থ এক আদিবাসী জনতা কোনোপ্রকার যত্ন ছাড়াই বেড়ে ওঠে ; এবং এই সম্বন্ধে কোনোপ্রকার উদ্বেগ দূরে থাক, বরং একলক্ষ অসভ্য যাযাবরকে স্থায়ী কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত করার জন্য সরকার নিজেকে অভিনন্দিত করেন। কত দ্রুত জঙ্গল সবুজ ক্ষেতে পরিণত হয়েছে দেখিয়ে সরকার সানন্দে বাৎসরিক আদায় নিয়ে মগ্ন থাকল, এবং যুগোপযোগী সুলভ ও বাস্তব প্রশাসনের প্রমাণ হিসাবে সাঁওতাল বসতিটিকে উপস্থাপিত করলো। কিন্তু পরিণামে এই প্রকার প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বসতিটিই মারাত্মক যুক্তি জোগাতে বাধ্য ছিল। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো সংস্থার কাজই ছিল রাজস্ব হতে লাভ আদায়, এই সংস্থার কর্মচারিদের সর্বদাই বাণিজ্যিক সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার ও অর্জিত মুনাফার ভিত্তিতে এর সাফল্য বিচার করার প্রবণতা থাকবে। পরিচালক সভা যে ধারাবাহিকতার সাথে এই প্রবণতাকে প্রতিহত করেন তা আমাদের জাতির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক, কিন্তু ভারতে উচ্চাকাংক্ষী অধস্তনরা কখনো কখনো সংকীর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন কারণ ভারতের গভর্নররা শুধু কয়েকশত ইংরেজ বিনিয়োগকারী অছি নয়, সমগ্র ভারতীয় জনগণের অছি স্বরূপ—এই মহৎ প্রবচনটি একমাত্র যখন ভারত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীন হয় তখনই সম্পূর্ণ ও নির্দিষ্ট স্বীকৃতি পায়। সাঁওতাল বসতির প্রশাসনে নির্দিষ্ট প্রতি-দান হীন, ব্যয়সাপেক্ষ সকল কিছু সযত্নে পরিহার করা হয়। জনগণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে কোনো অর্থ ব্যয়িত হয় না। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় ছিলেন বিশিষ্ট এক

বাস্তববোধ সম্পন্ন মানুষ ; পরবর্তী ঘটনায় সেইটাই বোঝা গেল, কারণ ১৮৫৫ সনের প্রারম্ভে সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শান্তিপূর্ণ প্রদেশ দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের ক্ষেত্রে হয়ে উঠলো – কেউই কোনো বিপদসংকেত বা কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারলো না। ১৮৫৪ সন অবধি সাঁওতালদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা ছিল – হয় হিন্দু মহাজনের অধীনে ভূমিদাস থাকা, অথবা যে অঞ্চল হতে তারা এসেছে সেই বন্ধ্যা, জনাকীর্ণ দেশে প্রত্যাবর্তন করা। ১৮৪৮ সনের তিনটি গঞ্জের সমগ্র জনগণ শেষোক্ত পথটি গ্রহণ করে এবং জঙ্গল লব্ধ জমি ত্যাগ করে মরীয়া হয়ে জঙ্গলে পলায়ন করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে স্থায়ীভাবে অর্ধাশনে রাখার চেয়ে উবরা নিম্নভূমিতে ভূমিদাসের জীবনও অধিকতর কাম্য মনে করে ও অবিস্মরণীয় কাল হতে বাংলায় প্রচলিত দাসত্বকে গ্রহণ করে। ১৮৬০ সন অবধি এর বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যাবস্থা ছিল না, এবং এই সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার ও আইনের সমর্থন দিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে বস্তুত এর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।[৬৬] বহু সাঁওতালদের নিজেদের সামান্য ঋণের জন্য বন্ধক দেওয়ার মতো কোনো জমি বা ফসল ছিল না। আপন পিতাকে সমাহিত করার জন্য এই শ্রেণীর যে কোনো লোককে হিন্দু মহাজনের কাছে যেতে হতো ; এবং নিজের ও সন্তানদের শারীরিক শ্রম ব্যতীত বন্ধক দেওয়ার আর কিছু না থাকায় সে ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত পরিবারসহ নিজেকে দাসরূপে বাঁধা রাখত। সামান্য কয়েকটি রূপার গহনা পিতার চিতায় দ্রুত নিঃশেষিত হতো, শ্রাদ্ধের ভোজ সমাপ্ত হতো, এবং পরের দিন সকালে পুরো পরিবারটি মহাজনের গৃহে হাজির হতো, এবং নিজেদের দাসত্বে উৎসর্গ করত। ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে মহাজনের আশা বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না, বরং দিনের প্রতিটি ঘণ্টা তাকে কাজে ব্যাপৃত রাখতে সচেষ্ট হতো যাতে অবসর সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম মারফৎ নিজ স্বাধীনতা ক্রয় দাসটির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বংশধরদের জন্য উত্তরাধিকার হিসাবে শুধু এই ঋণই থাকত – প্রথমে কয়েক আনা, পরে শতকরা ৩৩ হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে বহু টাকা হয়ে দাঁড়াত। তার পুরো সময় দিতে দাসটি অস্বীকার করলে, মনিব তার খাবার বন্ধ করে দিত, অন্যের জন্য কাজ করলে, মালিক তার নামে মামলা করত, এবং জেলের বিভীষিকা সবিস্তারে বর্ণনা করে শীঘ্রই অজ্ঞ লোকটিকে নতজানু হতে বাধ্য করত।

মালিকরা অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতায় লিপ্ত হতো বলে মনে হয় না। আমেরিকায় দাস মালিকরা যে ধরনের অত্যাচার করত সেইরকম একটি কাহিনীও আমি কখনো শুনিনি। আশ্রিতকে আঘাত করতে হিন্দুদের আত্মমর্যাদায় লাগত, এবং নিষ্ঠুর মালিকের অত্যাচার অসহনীয় হলে জঙ্গলের পথ সর্বদাই খোলা ছিল। যে দেশে জনসংখ্যা বাড়ে অথচ জীবনধারণের উপায়সমূহ বিস্তৃত হয় না, সেই-রকম প্রতি দেশে দেশীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নমনীয় ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব ঘটে। এই

ঘটনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রম সম্পূর্ণরূপে পুঁজিনির্ভর হওয়ার প্রতিফলন। এই অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করেও বেঁচে থাকার উপকরণটুকু মাত্র উপার্জন করতে পারে; নিম্নতম এইটুকুই মালিক দাসকে দিতে পারে। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫১ সন পর্যন্ত সাঁওতাল অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রান্তীয় ১০ হাজার ছাড়াও মূল অঞ্চলে ৩ হাজার থেকে ৮৭,১৯৫ হয়; এবং ভূমিদাসদের জীবন প্রায়শই স্বাধীন মজুরের জীবন অপেক্ষা কোনো অংশে খারাপ না হওয়ায় ভূমিহীন সাঁওতাল নিজের এই ভাগ্য মেনে নেয়। কিন্তু ১৮৬৪ সনের ঘটনাবলীতে বাংলায় পুঁজির সাথে শ্রমের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। সরকার ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন, এবং ২০০ মাইল ব্যাপী রেল লাইন সাঁওতাল অঞ্চলের প্রান্ত ঘেঁষে যায়। উঁচু বাঁধ, বিপুল মৃত্তিকা খনন, রেলসেতু নির্মাণের ফলে ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব মজুরের চাহিদা সৃষ্টি হয়। কয়েক বৎসর পরে শুধু বীরভূমেই ২০ হাজার মজুর লাগে, এবং সাঁওতাল অঞ্চলের মধ্যে বা প্রান্তে সর্ব মোট এই সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ,[৬৭] অর্থাৎ বিগত ২৫ বৎসর ব্যাপী সাঁওতাল বাস্তুত্যাগীদের মোট সংখ্যারও অধিক। উত্তরের বসতিতে পুঁজির সন্ধানে মজুরের ব্যর্থ পরিক্রমার পরিবর্তে, অভূতপূর্ব পরিমাণ পুঁজি মজুরের সন্ধানে সাঁওতাল অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেক মেলায় ঠিকাদাররা মজুরের সন্ধানে লোক পাঠায়, এবং যেসব সাঁওতাল চাকুরি গ্রহণ করে কয়েক মাসের মধ্যেই তারা প্রচুর টাকা নিয়ে এবং সাঁওতাল রমণীরা রূপার গহনায় বোঝাই হয়ে ফিরে আসে—'একেবারে হিন্দুদের মতোই' বিস্মিত জাতভাইরা মন্তব্য করে। প্রতিটি পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু কাজ পেতে পারে, এবং নিজগ্রামে যে উপার্জন একজন বয়স্ক লোক কখনো করেনি তা একটা দশ বৎসরের শিশুও রেললাইনে কাজ করে উপার্জন করতে পারে। এই সময় হতেই দাসের সাথে স্বাধীন মজুরের পার্থক্য অনুভূত হতে থাকে। ভূমিহীন সমগ্র জনগণ নিজের থেকেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ তীর ধনুক হাতে ও মাদল বাজাতে বাজাতে কয়েকমাসের জন্য রেলের কাজে যোগ দেয়। এবং তারপর তারা ফিরে এসে জমি কেনে ও স্বজাতিদের ভোজ দেয়। গ্রামে যে ভূমিদাসরা মালিকদের কাজে ছিল তারা নিজেদের ভাগ্যের সাথে এই সমৃদ্ধ দুঃসাহসীদের ভাগ্যের তুলনা করলো। পলায়ন হলো সাধারণ ঘটনা; এবং আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু মালিকদের পূর্বের তুলনায় কঠোরতর ও আরো সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর রইল না। যে কারণগুলির জন্য দাসরা স্বাধীনতার প্রতি আকৃষ্ট হয় ঠিক সেইগুলির জন্য তারা মালিকদের কাছে আরো মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়, এবং বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে, ব্রিটিশ আইনের অধীনে স্বাধীনতাকামী মানুষকে ক্রীতদাস রাখা যায় কিনা সেই প্রশ্নের ফয়সালা অতি জরুরি হয়ে পড়ে।

১৮৫৪ ও ১৮৫৫ সনের শীতকালে সাঁওতালদের মধ্যে অদ্ভুত অস্থিরতা দেখা

যায়। ঐ মরশুমে তারা চমৎকার ফসল তোলে, এবং বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের স্থানীয় মূল্য বৃদ্ধি পায়। এতদ্‌সত্ত্বেও পাহাড়িয়াদের উত্তেজনা ও অসন্তোষ অব্যাহত থাকে। বীরভূমের জেলাশাসক ঐ বৎসর জেলার অগ্রগতির পর্যালোচনা কালে সর্বত্র যে সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন তা অহেতুক গর্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি লেখেন, 'সমগ্র জেলাব্যাপী রেল কর্তৃপক্ষ বিস্তৃত কাজ করার ফলে এবং বিশাল সংখ্যককে কর্মে নিযুক্ত করার ফলে অধিবাসীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে; এবং সর্বত্র ফসলের প্রাচুর্য মঙ্গলকর হয়'।[৬৮] কিন্তু শস্যের উচ্চমূল্য এবং শ্রমের চড়া মজুরি সত্ত্বেও সাঁওতালরা সমান অস্থিরতা ভোগ করে। আসল কথা এই যে, ধনী সাঁওতালরা আর উচ্চমূল্যের সুবিধাভোগী হিন্দুদের ধামাধরা হতে গররাজী হয়; দরিদ্রতর কৃষকেরা আর তাদের ভূমিদাস হতে রাজী থাকে না এবং দিনমজুররা তাদের দাসত্ব অস্বীকার করতে মনস্থ করে।

জনগণের এই মানসিকতায় নেতার অভাব হয় না। হিন্দু সুদখোরদের অসহনীয় অত্যাচারে পীড়িত একটি গ্রামের অধিবাসী দুই ভাই[৬৯] স্বজাতের মুক্তিদাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে তারা নিজেদের স্বর্গীয় ইচ্ছার প্রতিভূ হিসাবে দাবি করে, এবং প্রমাণ হিসাবে স্বর্গীয় স্মারক চিহ্ন দাখিল কলে করে। তারা বলে যে, সাঁওতালদের দেবতা পরপর সাতদিন তাদের দেখা দেন: প্রথমে দেশীয় পোশাকে শ্বেতকায়রূপে; তারপর আগুনের শিখারূপে, যার মাঝে রয়েছে এর জ্বলন্ত ছোরা; তারপর সাঁওতালদের গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি হয় যে শাল-গুঁড়ি দিয়ে তার এক খণ্ড রূপে। দেবতা দুই ভাইকে এক পবিত্র গ্রন্থ অর্পণ করেন এবং আকাশ হতে ঝরে পড়ে টুকরো কাগজ—এইগুলি গুপ্তভাবে সমগ্র সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি গ্রাম এক টুকরো কাগজ পায়, তাতে কোনো ব্যাখ্যা নেই রয়েছে এক অভিশাপ—দেবতার অভিশাপ এড়াতে হলে এই মুহূর্তে কাগজটি নিকটতম গ্রামে পৌছে দেবার আদেশ। এইভাবে স্বজাতির মধ্যে বিরাট কোনো ঘটনার সাধারণ প্রত্যাশা জাগ্রত করে নেতারা আশা করেছিল যে ইংরেজ শাসকেরা ব্যাপারটি অনুসন্ধান করবে এবং তাদের প্রতি অবিচারের প্রতিবিধান করবে; কিন্তু এই প্রকার অনুসন্ধানের জন্য ইংরেজ শাসকদের কোনো সময় ছিল না। এরপর তারা ন্যায় প্রার্থনা করে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলো। অস্পষ্টভাবে যোগ করলো যে তাদের দেবতা আর অপেক্ষা না করতে আদেশ দিয়েছেন। জনগণ সম্বন্ধে বা তাদের প্রতি অবিচার সম্বন্ধে এই অফিসারের কিছু জানা ছিল না। সুলভ ও বাস্তব প্রশাসনের শুধু রাজস্ব দেখাশোনার জন্য সময় থাকে; সাঁওতালদের জন্য প্রশাসন এইটুকুই কার্যকরী ভাবে করে; এবং জনগণ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণে যে ভয়ানক শাস্তি আমাদের উপর নেমে আসে তার জন্য কোনো অফিসারকে ব্যক্তিগতভাবে

ইংরেজ অফিসার, প্রদেশের একটি পুরো বিভাগের অধিকর্তা—নেতারা সোজাসুজি তাকে বলে যে তাদের প্রতি অবিচারের যদি তিনি প্রতিবিধান না করেন, তবে তারা নিজেরাই এইগুলির প্রতিবিধান করবে।[৭০] তারা কি চায় কমিশনার সাহেব বুঝতে পারেন নি : রাজস্ব যথারীতি আসতে থাকে,প্রশাসন পূর্বের মতোই সুলভ ও বাস্তব থাকে। 'ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি থাকেন বহুদূরে', সাঁওতাল নেতারা বললেন। শেষ একটিমাত্র পথ খোলা রইল। জাতির প্রতীক শালগাছের একটি শাখা নিয়ে দূত পাঠানো হলো প্রতিটি পার্বত্য উপত্যকায় ; এই সংকেতের প্রতি বিশ্বস্ত জনগণ উদ্দেশ্য না জেনেই, কিন্তু কাগজের টুকরোর উদ্দীপ্ত প্রত্যাশা নিয়ে, অপরিহার্য তীর-ধনুক হাতে বিশাল সংখ্যায় জমায়েত হলো।

ভ্রাতৃদ্বয় এমন এক ঝড় তোলে যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের ছিল না। সমতলভূমি দিয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রার সাধারণ নির্দেশ শিবিরে প্রচারিত হয় এবং ১৮৫৫ সনে ৩০ জুন এই বিশাল অভিযান শুরু হয়।[৭১] নেতাদের শুধু দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল ৩০ হাজার জন। গ্রাম হতে আনীত খাদ্য যতদিন থাকে, ততদিন এই বাহিনীতে শৃংখলা বজায় ছিল ; কিন্তু ভ্রাম্যমাণ সর্দারবিহীন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল বিহীন সশস্ত্র দলবল শীঘ্রই বিপজ্জনক হয়ে উঠলো, এবং নিজেদের রসদ শেষ হতেই লুণ্ঠন ও কর ধার্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। নেতারা শেষোক্ত পদ্ধতি ও শৃংখলাহীন বাহিনী প্রথম পদ্ধতির পক্ষ নিল। ৭ই জুলাই দেশীয় এক পুলিশ অফিসার ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে বিশাল এক পাহাড়িয়া বাহিনীর তার এলাকায় প্রবেশের খবর পায়, আতংকিত হিন্দু মহাজনরা, এই বাহিনীকে চুরির মিথ্যা অভিযোগে লিপ্ত করে এদের নেতাদের গ্রেফতার করার জন্য এই অফিসারটিকে ঘুষ দেয়। রক্ষীদের সাথে নিয়ে যাওয়ার সময় মাঝপথে সাঁওতালদের দূতের সাথে তার দেখা হয়—তাকে শিবিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ নিয়ে সে এসেছিল। ভ্রাতৃদ্বয় বাহিনীর রসদের জন্য অফিসারটিকে তার এলাকার প্রতিটি হিন্দু পরিবার প্রতি ১০ শিলিং করধার্য করার আদেশ দেয় ; কোনো প্রকার গণ্ডগোল ছাড়াই তারা তাকে ছেড়ে দিতে উদ্যত ছিল, এমন সময়, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতারের উদ্দেশ্য নিয়ে তার আসার কথা আবিষ্কৃত হলো। প্রথমে যে এই অভিযোগ অস্বীকার করে বললো যে, সর্পাঘাতে মৃত্যুজনিত দুর্ঘটনা তদন্তের উদ্দেশ্যে সে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে স্বীকার করে যে মহাজনরা, চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নেতাদের গ্রেফতারের জন্য, তাকে ঘুষ দিয়েছে। ভ্রাতৃদ্বয় বললো, আমাদেব বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকলে তুমি আমাদের বেঁধে নিয়ে যেতে পারো। সাঁওতালদের নিরীহ অভ্যস্ত গোঁয়ারগোবিন্দ অফিসারটি নেতাদের বাঁধার জন্য রক্ষীদের আদেশ দিল ; কিন্তু এই কথা তার মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র সমগ্র জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষী সমেত

তাকে বেঁধে ফেললো। দ্রুত এক বিচারের পর, প্রধান নেতা সিধু এই দুর্নীতি-পরায়ণ অফিসারটিকে নিজ হস্তে হত্যা করলো, এবং সাঁওতাল শিবিরে পুলিশ দলের নয়জনকে মৃত রেখে বাকিরা পলায়ন করলো।

এই দিন হতেই—৭ই জুলাই—বিদ্রোহের সূচনা। যাত্রা শুরুতে সরকারের সশস্ত্র বিরোধিতার কথা তারা চিন্তা করেছিল বলে মনে হয় না। যে নেতারা অন্তত অন্য সকল ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বা মিথ্যাচরণকে ঘৃণা করত, তারাই সবকিছু সমাপ্ত হওয়ার পর ঘোষণা করে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিলকৃত আবেদন-পত্রটি গভর্নর-জেনারেলের পদপ্রান্তে নিবেদন করার উদ্দেশ্যেই তারা কলিকাতা যাত্রা করে—এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নেওয়া থেকে এই বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতপক্ষে প্রচলিত ঢাক, ঢোল, বাঁশি সমেত তাদের বিরাট জাতীয় মিছিলের সাথে প্রথমে তাদের অভিযানের কোনো প্রকার প্রভেদ করা সম্ভব ছিল না। অভাব তাদের লুণ্ঠনের পথে নিয়ে যায়, এবং ঘটনাক্রমে পুলিশের ওপর হামলার ফলে এই অভিযানের চরিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়। নিরীহ কিন্তু অর্ধসভ্য পাহাড়িয়ারা রক্তের আস্বাদ পাওয়া মাত্র মুহূর্তেই তাদের বন্য প্রকৃতি ফিরে পেল। এতদসত্ত্বেও তাদের কর্মধারায় ছিল একপ্রকারের স্থূল ন্যায়বোধ। দিব্যজ্ঞানের ভিত্তিতে নেতারা হিন্দু মহাজনদের হত্যা করার, কিন্তু অপর সকল শ্রেণীকে রক্ষা করার আদেশ দিল; তারা এই জনসমুদায়কে আশ্বাস দিল যে, দক্ষিণের মহান ইংরেজ প্রভু তাদের কার্যাবলী অনুমোদন করবেন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশ গ্রহণ করবেন।

বিপুল সংখ্যক অপরিচিত জাতি বেষ্টিত অল্প সংখ্যক অধিবাসীদের পক্ষে যা স্বাভাবিক, ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়, সেই প্রকার আশংকা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিকার হলো। এই প্রকার আশংকা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যুক্ত হয়ে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, সাম্প্রতিক জ্যামাইকার ঘটনা হতে তার দুঃখজনক প্রমাণ মেলে। ইংল্যাণ্ডে মাত্র কয়েক ডজন পুলিশ যে অসন্তোষের সম্যক মোকাবিলায় সমর্থ, লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও হাজার হাজার মানুষের জীবন চূড়ান্ত শৃংখলার ওপর নির্ভরশীল যেখানে, সেইখানেই এই অসন্তোষই যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ হয়। এই অসন্তোষের চূড়ান্ত সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা সেইটা প্রশ্ন নয়। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সচেতন যে ইংল্যাণ্ড বদলা নিতে সক্ষম, কিন্তু তারা এইটাও জানে যে ইংল্যাণ্ডের বিলম্বের ফলে তারা রক্ষা নাও পেতে পারে। এই অবস্থায় বিপদ অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা বাড়ে এবং বাড়া-বাড়ি ঘটে। জ্যামাইকার শ্বেতকায়রা এইভাবেই ঘটনা অতিরঞ্জিত করে এবং তার ফলে জ্যামাইকার পুলিশ মাত্রা ছাড়ায়। জনসাধারণের তরফে আতংকের এই স্বাভাবিক প্রবণতা প্রতিরোধের গুরুদায়িত্ব সরকারে বর্তায়; এবং ভারত সরকার ও ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার স্থায়ী

কারণগুলির এইটি অন্যতম৭। বহুদিন যাবৎ ভারতে ইংরেজ সরকার নিজেদের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন; বস্তুত, কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা বিপরীত মেরুতে উপস্থিত হন—কর্তৃপক্ষ বহির্জগতের অতিরঞ্জিত বিপদের অনেক বেশি পরিমাণে ও মারাত্মক মাত্রায় অবমূল্যায়ন করেন।

সাঁওতাল অভ্যুত্থান সরকারকে এই চেতনায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে। সমকালীন এক লেখক বলেন যে অবশেষে যখন আঘাত হানা হয়, তখন বিদ্রোহীদের ৮০ মাইলের মধ্যে ২০০ সৈন্যও পাওয়া যায়নি।[১২] পুরো একপক্ষ কাল পশ্চিমের জেলাগুলিতে সাঁওতালরা আগুন ও হামলা ছড়ায়। প্রারম্ভিক নেতাদের এই সশস্ত্র জনতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং জুলাই মাস শেষ হওয়ার আগেই বহু গ্রাম ভস্মীভূত হয়, হাজার হাজার গবাদি পশু লুণ্ঠিত হয়, আমাদের সৈন্যরা প্রতিহত হয়, এবং দুইজন ইংরেজ মহিলা সহ কয়েকজন ইংরেজ নিহত হয়। বেশ কয়েকটি ছোট ইংরেজ ঘাঁটি ও কারখানা হামলাকারীদের মর্জির ওপর নির্ভর করে থাকে; ১৮৫৫ সনে যে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের অত্যাচারের পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি, সুযোগের অভাব, তার কারণ নয়। বরং সাঁওতালদের নিরীহ প্রকৃতিই তার জন্য দায়ী—আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া তাদের মাত্র একজন নেতাই ইংরেজ বসতি আক্রমণ করে। সরকার তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠায়, কিন্তু বর্ষা শুরু হওয়ায় বহুদিন ধরে নদীগুলি অতিক্রম-যোগ্য ছিল না। বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী জনৈক অফিসার বলেন, 'আমার বাহিনী ব্যারাকপুরে থাকা কালে এক সন্ধ্যায় কর্নেল আমায় ডেকে পাহাড়িয়া উপজাতি দমনের জন্য এক বাহিনী নিয়ে পরদিন সকালে বীরভূমের অন্তর্গত রানীগঞ্জে যাত্রার আদেশ দিলেন। এই বিষয়ে আমি পূর্বে কিছু শুনি নাই, যতদূর স্মরণ হয় সামরিক বাহিনীতেও এই বিষয়ে কিছু আলোচনা হয় নাই। পরের দিন ভোর চারটায় আমি যাত্রা করি এবং প্রাতঃরাশের সময় ট্রেনযোগে বর্ধমান পৌঁছাই। কমিশনার সাহেব (প্রদেশের ঐ বিভাগের বেসামরিক প্রধান) আমার সাথে দেখা করেন এবং বীরভূমের রাজধানী সিউড়িতে আক্রমণের তাৎক্ষণিক বিপদ থাকায় সরাসরি সেখানে যেতে আদেশ দেন। আমরা দুইদিন ও একরাত সমানে হাঁটি, সারাটা পথ বৃষ্টি পড়ে এবং আমার সৈন্যরা নিয়মিত কোনো খাবার পায় না। সিউড়ির নিকটের গ্রামগুলিকে আমরা খুব সন্ত্রস্ত দেখি, প্রধানত হিন্দুরা রাস্তার দুইপাশে দাঁড়িয়ে সাশ্রু নয়নে আমাদের অভ্যর্থনা করে এবং আমার ক্লান্ত সিপাহিদের চিঁড়ে-গুড় খাওয়ার জন্য মিনতি করে। সিউড়িতে অবস্থা আরো খারাপ। জনৈক অফিসার দিনরাত তার ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, দ্রুত জেলের সুরক্ষা দৃঢ় করা হয়, এবং সত্য কিনা আমি জানি না তবে, বলা হয় যে তোষাখানার অর্থ কুয়োর মধ্যে লুকিয়ে ফেলা হয়।[১৩]

কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত অবস্থা অস্বীকার করে। উপস্থাপিত প্রমাণাদির ভিত্তিতেই সরকার সক্রিয় হতে পারে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যা অনুভব করত তার তুলনায় অনেক বেশি ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনাবলীর বিবরণ দাখিল করত। তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক নথিপত্র পর্যাপ্ত ধারণা দিতে পারেনি। পাছে কেউ তাদের অকারণে আতঙ্ক ছড়াবার অপবাদ দেয় সেই বিষয়ে ভারতীয় অফিসাররা খুব সচেতন ছিল এবং যেহেতু ঘটনাস্থলের কর্মচারিরা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস পেতে ব্যর্থ হয়, তাই অবশেষে যখন এই অভ্যুত্থান ঘটলো এইটিকে অবমূল্যায়নের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। কোনো কিছু গোপন করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও এমনকি তাদের রিপোর্টের ফলে ভুল পথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন না হয়েও এইটি ঘটে। প্রতিটি তথ্যের ব্যাপারে তাদের সঠিকতা অবিসংবাদিত ; কিন্তু তথ্য হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তাদের এই প্রবণতা দেখা যায়। কয়েক মাস আগে তাদেরই কয়েকজন যে তাদের এলাকায় অপরাধ বেশ কমেছে, এক নতুন ও আরো কার্যকরী পুলিশি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এবং পূর্বে কখনো জনগণ এত সন্তুষ্ট বা সামগ্রিকভাবে জেলা এত সমৃদ্ধ ছিল না। ফেব্রুয়ারিতে সেইসব ব্যক্তি এই সুরে রিপোর্ট লেখে তাদের জেলা যে জুলাই মাসে বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সেইকথা বিশ্বাস করা কঠিন। পাঁচ থেকে পঞ্চাশ জনের দল নিয়ে নৈশ আক্রমণ সর্বদাই বাংলাদেশে সাধারণ ঘটনা ছিল, এবং ঠিক কখন থেকে এই প্রকারের বেসামরিক অপরাধ প্রকাশ্য বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায় সেইকথা বলা খুব কঠিন ছিল। একটি উদাহরণই যথেষ্ট, বীরভূমের জেলাশাসক, একটি বাঙালি জনপদ লুণ্ঠন সম্বন্ধে লেখেন, সামগ্রিক তদন্তে একথাই প্রমাণিত হয় যে এইটি ছিল বাংলাদেশের সাধারণ ঘটনাগুলির অন্যতম, এইখানে ডাকাতরা ছিল সাহসী, বেপরোয়া ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর বাঙালিরা কাপুরুষ ও অসহায়, এবং চৌকিদাররা সকলেই অনুপস্থিত ছিল।[৭৪] এইটা সম্ভব এই বিশেষ ক্ষেত্রে জেলাশাসকের অনুমান হয়তো সঠিক ছিল কিন্তু অনুরূপ বহু ক্ষেত্রে তিনি যে বিদ্রোহকে ভুল করে ডাকাতি ভেবেছিলেন, সেই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রতিটি জেলাশাসক তার জেলা যে সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে এই স্বীকৃতি যতদিন সম্ভব ঠেকিয়ে রাখে, এবং সেইসব ব্যক্তির বিদ্রোহী হিসাবে ফাঁসিতে ঝোলা উচিত ছিল তাদের সিঁধেল চুরির অভিযোগে, অথবা, লুণ্ঠন ও গুরুতর শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে মারাত্মক অস্ত্রসহ বেআইনি ভাবে জমায়েত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। আদালতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই প্রহসন অব্যাহত থাকে, আর আদালতের বাইরে বিয়োগান্তক এক নাটক অভিনীত হতে থাকে। তার এলাকার জনগণ বিদ্রোহী ও তার কর্তৃত্ব হস্তচ্যুত হয়েছে, এই স্বীকৃতি বেসামরিক যে কোনো অফিসারের পক্ষেই মর্মন্তুদ।

সুতরাং সরকার এইসব রিপোর্ট বিচার করে সন্ত্রস্ত হতে অস্বীকার করে এবং সৈন্য পাঠায় ; কিন্তু, বিগত শতাব্দীতে উপদ্রুত সীমান্ত জেলাগুলির অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা নিয়ে সামরিক আইনের কঠোরতা পরিহারের উদ্দেশ্যে সৈন্য দলকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে রাখে কিন্তু এইটা করার সময় ১৭৮৮ সনে মিঃ কিটিং-এর মতো জেলাশাসকের সাথে ১৮৫৫ সনের জেলাশাসকের পার্থক্য উপেক্ষা করে। আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে মিঃ কিটিং-এর কোনো জ্ঞান ছিল না কিন্তু তিনি অতীব দক্ষতার সঙ্গে, কোন গিরিপথগুলি অবরুদ্ধ হবে নির্ণয় করেন, সৈন্যবিন্যাস করেন এবং সৈন্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৮৫৫ সনের জেলাশাসক ছিলেন দক্ষতর আইনজ্ঞ এবং সুষ্ঠুভাবে জেলা প্রশাসন চালালেও সামরিক কৌশলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন ; এবং বর্তমানে অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণে তাঁর ক্ষমতাও ছিল না, ভানও করতেন না। তাঁর সামরিক ধ্যানধারণার ফলে অধীন সৈন্যদের চোখে তিনি হাস্যাস্পদ হতেন, ইংরেজ শিবির ছিল মতভেদে আকীর্ণ আর বাইরে বিদ্রোহীরা খুশিমতো লুণ্ঠন ও হত্যালীলায় ব্যাপৃত ছিল।

কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে সরকার ২৫ জুলাই নাগাদ একজন অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষের[৭৫] হাতে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব অর্পণ করে ; প্রদত্ত নির্দেশের ফলে উপদ্রুত জেলাটিকে সামরিক বাহিনীর হাতে অর্পণ করার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তারপর আবার পিছু হঠে, আদেশের নতুন ব্যাখ্যা হয় বা প্রত্যাহৃত হয় এবং জেনারেলের স্বাধীন কর্তৃত্ব হরণ করা হয়। এই সংক্রান্ত নির্দেশ অনুসারে, 'আমাদের নিজেদের প্রজাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী সামরিক কর্তৃপক্ষ ছাড়াই স্বাধীনভাবে সক্রিয় হবে এইটা উদ্দেশ্য ছিল না ; কিন্তু বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করা ও গ্রেফতার করার জন্য ও বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থাদির প্রকৃতি নির্ণয় সম্পূর্ণরূপে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে।[৭৬]

অসম্পূর্ণ এই ব্যবস্থা ও সামরিক সক্রিয়তাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করলো এবং কিছুদিন পর্যন্ত মনে হলো যে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সম্ভবত সফল হতে চলেছে। বাহিনীর পর বাহিনী দ্রুত পশ্চিমে ধাবিত হলো, দেশপ্রেমিক দেশীয় জমিদাররা তাদের পোষ্যদের সশস্ত্র করে মহড়া দিতে শুরু করলো ;[৭৭] ইংরেজ নীলকররা অভিযানের জন্য সেনাবাহিনীকে অর্থ সরবরাহ করলো ;[৭৮] মুর্শিদাবাদের নবাব এক চমৎকার হস্তীবাহিনী পাঠালো এবং তাদের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলো ;[৭৯] এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য অতিরিক্ত বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন এক বিশেষ অধিকর্তা নিয়োগ করা হলো।[৮০]

নিয়মিত সেনাবাহিনী যে যুদ্ধে আধা সশস্ত্র কৃষকদের নির্বিচারে হত্যা করে সেই সীমান্ত যুদ্ধের বিশদ বিবরণ খুবই অপ্রীতিকর, এবং বিজয়ীদের পক্ষে গৌরবজনকও নয়, সামরিক কৌশলের ক্ষেত্রেও শিক্ষাপ্রদ নয়। যেসব অফিসার

সাঁওতালদের দমন করেন ১৩ বৎসর বাদেও এই অভিযান সম্পর্কে বিশদ কোনো আলোচনায় সহজে তাদের রাজী করানো যায় না। এদের একজন আমাকে বলেন, 'এইটা যুদ্ধ নয় এইটি হত্যাকাণ্ড; জঙ্গলের ওপর যেইখানেই ধোঁয়া দেখা যাবে সেই গ্রামেই আমাদের যাবার নির্দেশ ছিল। সচরাচর ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের সাথে যেতেন সিপাইদের দিয়ে আমি গ্রামটি ঘিরে ফেলতাম এবং ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রাহীদের আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানাত। একবার ৪৫ জন সাঁওতাল একটি মাটির ঘরে আশ্রয় নেয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলে। কিন্তু জবাব হিসাবে আসে এক ঝাঁক তীর। আমি বললাম, 'মিঃ ম্যাজিস্ট্রেট এইটা আপনার কাজ নয়,' সিপাইদের নিয়ে এগিয়ে গেলাম, সিপাইরা দেওয়ালে এক বড গর্ত কাটলো। আমি বিদ্রোহীদের আবার আত্মসমর্পণ করতে বললাম, নচেৎ গুলী চালাবার ভয় দেখলাম। দরজা আবার ঈষৎ উন্মুক্ত হলো এবং জবাব হিসাবে আবার একঝাঁক তীর। সিপাইদের একদল এগিয়ে ঐ গর্ত দিয়ে গুলী চালালো। আমার লোকরা পুনরায় গুলী ভরার সময়, আমি তাদের আর একবার আত্মসমর্পণ করতে বললাম। আবার দরজা খুললো আবার এক ঝাঁক তীরের জবাব। কয়েকজন সিপাহি আহত হলো, আমাদের চারপাশে সমগ্র গ্রামে আগুন জ্বলছে, আমাকে আমার সৈন্যদের তাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে আদেশ দিতে হলো। প্রতি ঝাঁক গুলীর পর আমরা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব রেখেছিলাম; এবং অবশেষে দরজা দিয়ে তীর আসা কমে গেলে, আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকতে মনস্থ করলাম—এইভাবে যদি জীবিত কয়েকজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়। ঘরের ভেতরে আমরা শুধু এক বৃদ্ধকে দেখলাম, সর্বদেহ রক্তাক্ত, শবদেহগুলির মাঝে খাড়া দণ্ডায়মান। আমাদের একজন গিয়ে তাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে বললো। বৃদ্ধটি সিপাইটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, এবং তার টাঙ্গি দিয়ে সিপাইটিকে কুপিয়ে হত্যা করলো।[৮১]

অফিসারটি আরো বলেন, 'এইটা যুদ্ধ ছিল না, সাঁওতালরা নতি স্বীকার করতে জানতো না। যতক্ষণ মাদল বাজবে পুরো দল দাঁড়িয়ে থাকবে, গুলী চললেও দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের তীরে প্রায়ই আমাদের লোক মারা যেত, এবং সে কারণেই তারা দাঁড়িয়ে থাকলেই আমাদের গুলী চালাতে হতো। মাদল বন্ধ হলে তারা সিকি মাইল প্রায় সরে যেত; তারপর আবার তাদের মাদলের বাজনা শুরু হতো, তারা গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে থাকত, আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের ওপর কয়েক ঝাঁক গুলী চালাতাম। এই যুদ্ধে এমন একজনও সিপাই ছিল না যে এর জন্য লজ্জিত ছিল না। বন্দীরা অধিকাংশই ছিল আহত লোকজন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা আমাদের নিন্দা করত। তারা সর্বদা বলতো যে তাদের যুদ্ধ বাঙালিদের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়। তাদের প্রতি অবিচার বুঝতে এবং তার প্রতিকার করতে সক্ষম একজন মাত্র

ইংরেজ তাদের কাছে প্রেরিত হলে কোনো যুদ্ধই হতো না বলে তারা ঘোষণা করত। তারা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করত একথা সত্য নয়। তারাই আমার দেখা সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী লোকজন; উন্মাদের মতো সাহসী। তাদের মাদল বন্ধ হওয়ার এবং তাদের পশ্চাদপসরণের আগে, আমার এক সহকারিকে একবার ৭৫ জনকে গুলী করে মারতে হয়।

এইসব সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নাগাদ বিদ্রোহীরা সমতলভূমি হতে বিতাড়িত হয়। সেই কারণে, নেতাদের ছাড়া অন্য সকলকে ক্ষমা করার প্রস্তাব ঘোষিত হয়; এবং সামরিক বাহিনীর আংশিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত বেসামরিক কর্তৃপক্ষ জানালেন যে সামরিক বাহিনীকে ঐ কর্তৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। বীরভূমের জেলাশাসক লিখলেন, 'বিগত সাত সপ্তাহ সবকিছু শান্ত রয়েছে। গ্রামবাসীরা নিজগ্রামে ফিরে গেছে, এবং কৃষকরা যথারীতি ক্ষেতে চাষাবাদে লিপ্ত আছে। সাঁওতালরা ২০ মাইল পিছিয়ে অন্য এক জেলায় যাবার পর··· তাদের কোথাও দেখা যায় না।[৮২] কিন্তু এই শান্তি ছিল ক্ষণিক; এবং ঠিক একমাস পরে একই অফিসারকে রিপোর্ট করতে দেখা যায় যে বিগত পক্ষকালের মধ্যে বিদ্রোহীদের দ্বারা ৮০ টিরও বেশি গ্রাম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছে,[৮৩] ডাক চলাচল বন্ধ হয়, এবং জেলার সমগ্র উত্তর পশ্চিমভাগ তাদের দখলে যায়। একদিকে ৩ হাজার সাঁওতালের এক বাহিনী জেলাময় ঘুরতে থাকে, আর একদিকে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ হাজার; দূরবর্তী ঘাঁটিগুলি হতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ বিতাড়িত হয়, কৃষকরা ক্ষেত ছেড়ে পালায়, এবং মার্জনা দানের ঘোষণা সরব ঔদ্ধত্য ও ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সাঁওতাল ও হিন্দুদের মধ্যবর্তী আধা-অনার্য জাতিগুলি, এবং বস্তুত পক্ষে হিন্দুদের নিজেদের অতি নিম্ন কয়েকটি শ্রেণী এই সময়েই বিদ্রোহে যোগদান করে বলে মনে হয়—এরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দুর্গাপূজা সম্পন্ন করানোর জন্য অপহরণ করে।[৮৪] অবশ্য সাফল্যের সময়ও সাঁওতালদের বন্য মর্যাদা বোধের অভাব ছিল না, এবং যে কোনো শহর লুণ্ঠনের আগে সচরাচর ভালোভাবে সতর্ক করত। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে (আনুমানিক, ২২ বা ২৩) এই প্রকার এক সতর্ক বার্তায় বীরভূমের রাজধানী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একদিন এক ডাক-হরকরা ফিরে এসে বলে যে যাত্রাপথে বিদ্রোহীরা তাকে ধরে, তার ডাকের থলি ছিনিয়ে নেয় এবং জেলাশাসকের কাছে তাদের জাতীয় প্রতীক শালগাছের এক ছোটশাখা নিয়ে যাওয়ার শর্তে, শুধু তার প্রাণ বাঁচে। জেলা-শাসক সরকারকে জানান যে এই শাখায় রয়েছে 'তিনটি পাতা, যতগুলি পাতা ততদিন পরে তারা আসবে'।

এই সাধারণ বিপদ সত্ত্বেও বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতভেদ তখনো অব্যাহত থাকে। সেনাবাহিনীর প্রকৃত কাজকর্ম জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রণ

মুক্ত হয়েছে ; কিন্তু সামরিক আইন ঘোষিত না হওয়ায় সামরিক বাহিনীকে ব্যক্তিগত ভাবে তাদের কাজের জন্য বেসামরিক অফিসারদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। শেষোক্তদের কর্তৃত্বের সামাপ্তিরেখা সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ণীত হয়নি ; এর ফলশ্রুতি হিসাবে ক্রমাগত ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে থাকে এবং সর্বক্ষেত্রে এই বিষয়ে ক্রুদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়।

নভেম্বরের প্রথমভাগে, পশ্চিমের জেলাগুলির চারমাসের দুর্ভোগের পর, সরকার অনিচ্ছাভরে সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক শাসনের কঠোরতা পরিহারের ব্যর্থ চেষ্টা সরকার এতদিন পর্যন্ত করেন ; কিন্তু এই নমনীয়তার ফলে আমাদের সৈন্যদের দখলে থাকার বদলে বিদ্রোহীদের দখল কায়েম হয়েছে। হাঙ্গামার স্বরূপ বোঝার পর, স্থানীয় অফিসাররা প্রথমে এইটি বিস্তৃত হতে দেন, এবং তারপর নিজেদের কর্তৃত্ব সামরিক বাহিনীর হাতে অর্পণের ততদিন বিরোধিতা করেন যতদিন পর্যন্ত না বিদ্রোহীরা এই কর্তৃত্ব বেআইনিভাবে দখল করে। সামরিক আইন জারি হওয়ার সাথে সাথে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। সরকারি বাদ-বিসংবাদ বন্ধ হয়, এবং সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলিই ব্রিগেডিয়ার ও জেলাশাসকের যোগাযোগের একমাত্র বিষয় হয়। এক একটি ঘাঁটিতে কখনো কখনো ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার লোক,[৮৫] এইরকম ঘাঁটির এক সুবিস্তৃত জাল সাঁওতালদের দ্রুত সমতলভূমি হতে হঠিয়ে দেয়, এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যে জঙ্গল থেকে দলছুটদের বিতাড়ন করা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। শীতকাল সমাপ্ত হওয়ার আগেই (১৮৫৫-৫৬) বিদ্রোহীরা আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করে, এবং তাদের হাজার হাজার লোক শান্তিপূর্ণ ভাবে এক নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ করতে থাকে।

কিন্তু স্থানীয় অফিসারদের রিপোর্টে বিভ্রান্ত হয়ে এবং জনগণের প্রতি চিরাচরিত নমনীয়তার নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে, বিদ্রোহীদের দ্রুত মোকাবিলায় ব্যর্থ হলেও, এই অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানে এবং সেইগুলি দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হতে সরকার এক মুহূর্তও নষ্ট করেনি। পূর্বে যে সুলভ ও বাস্তব প্রশাসন এত উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল, সেইটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সাঁওতালরা আদালতের দূরত্ব নিয়ে অভিযোগ করেছিল : সরকারের নিজের কর্মচারিরা যখন জানালো যে সমগ্র সাঁওতাল সীমান্ত জুড়ে ইংরেজ অফিসারদের সংখ্যা এত কম এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশাল অঞ্চলের উপর কার্যকরী কোনো তত্ত্বাবধান সম্ভব নয়।[৮৬] এইটা দ্রুত প্রতীয়মান হলো যে পূর্বতন প্রশাসনের মিতব্যয়িতার অর্থ ছিল, শুধু রাজস্ব আদায় করা, পরিবর্তে তাদের কিছু দেওয়া নয়— এই মিতব্যয়িতার ফলশ্রুতিতেই এমন এক অভ্যুত্থান ঘটে যার ফলে ছয় মাসের মধ্যেই সরকারের বিগত দশ বৎসরের সুশাসন চালাবার খরচের চেয়েও বেশি খরচ হয়। শৃংখলা পুনঃস্থাপিত

হওয়মাত্র তৎকালীন গভর্নর পূর্বতনদের ত্রুটিগুলি সংশোধিত করেন। তিনি সাঁওতাল অঞ্চল নিয়ে আলাদা জেলা গঠন করেন। অধস্তন দফতর হতে একটি মাত্র অফিসারের পরিবর্তে, আদিবাসী অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস হতে সর্বোচ্চমানের অফিসারদের গ্রহণ করা হয়। সরল কৃষকদের উপর অত্যাচার করতো যেপুলিশরা, তাদের নির্মূল করা হয়; এবং ইংরেজ অফিসাররা সাঁওতালদের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে—এই ছাড়াও তারা গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত পরিভ্রমণ বজায় রাখে। ন্যায়বিচার সুলভ করা হয়, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়; এবং তৎকালীন লেখকরা অভিযোগ করেন, যে সকল বিষয় নিয়ে বিদ্রোহীরা সংগ্রাম করে, তার সবগুলি স্বীকার করে সরকার প্রায় বিদ্রোহকেই অনুমোদন করেছেন।

বাইরের মতামত সম্বন্ধে বাংলা সরকারেব চিরাচরিত বিরাগের ফলে, অভ্যুত্থানের সূচনায় অবিজ্ঞ নমনীয়তা ঘটলেও, এর সমাপ্তিতে এর ফলেই সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধগুলি পরিহার কবা সম্ভব হয়। যেসব লোকজন ছয়মাস যাবৎ প্রকাশ্য বিদ্রোহী ছিল, শহরগুলি ভস্মীভূত করে এবং কলিকাতার শত মাইলের মধ্যে জেলাগুলি বলপ্রয়োগ করে দখল করে, জনসাধারণের কাছে তাদের জন্য নিষ্ঠুরতম শাস্তিও যথেষ্ট ছিল না। তৎকালীন সংবাদপত্রে উত্তেজনার মুহূর্তে লিখিত প্রবন্ধাদি হতে উদ্ধৃতি সম্ভবত সঠিক নয়; কিন্তু ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের ঘৃণা যে কত তীব্র ও গভীর, সেই কথা তৎকালীন প্রথমশ্রেণীর ভারতীয় সংবাদপত্র 'রিভিউ' পত্রিকায় সবকিছু সমাপ্ত হওয়ার পর লিখিত এক প্রবন্ধে পাওয়া যায়: 'এক বন্য আদিম মানুষকে মনুষ্য সমাজে উচ্চশ্রেণীতে হঠাৎ প্রবেশাধিকার দিলে, যে জঙ্গলের গুহা বা আস্তানা হতে নবাগত প্রায় বৃহৎ ব্যাঘ্র সদৃশ হয়।' এক কথায়, সাঁওতালদের শান্তিপূর্ণ প্রয়াস বা তাদের প্রতি অবিচার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না। তারা ছিল শুধু 'বিরাট বাঘ' বা 'রক্তলোলুপ বর্বর'; এবং প্রবন্ধ লেখক, শুধু প্রকৃত বিদ্রোহীদের সাজা দেওয়াব মামুলি পরিকল্পনাকে অপর্যাপ্ত হিসাবে বাতিল করে, শুধু দুই একজন নেতাদের নয়, উপদ্রুত জেলাগুলির সমগ্র জনসাধারণকে কালাপানিতে চালান দেওয়াব প্রস্তাব করেন।'[৮৭]

ভারতে আমাদের মুষ্টিমেয় স্বদেশবাসীর অবস্থায় পতিত যে কোনো সম্প্রদায়ের এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। সরকারি সক্রিয়তার পথে তারা কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। সাঁওতালদের স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের সুযোগ দেওয়া হয় এবং বিদ্রোহে যারা প্রকৃতই অংশগ্রহণ করে, একমাত্র তাদেরই শাস্তি দেওয়া হয়। অধিকাংশই প্রভূত সাহস প্রদর্শন করে; তারা বিদ্রোহে নিজেদের ভূমিকা গর্বের সাথে স্বীকার করে এবং যুদ্ধের কারণ হিসাবে সরকারের অজ্ঞতাকে দায়ী করে। বীরভূম জেলে তাদের এক নেতা বলে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা আমাদের বাধ্য করেছ। যা ন্যায়সংগত, আমরা একমাত্র তাই চেয়েছিলাম,

এবং তোমরা তার কোনো জবাব দাওনি। আমরা যখন অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিকারের চেষ্টা করি, তখন তোমরা জঙ্গলের চিতার মতো আমাদের গুলী করে হত্যা করেছো।'[৮৮]

প্রশাসনিক অযোগ্যতাই সাঁওতালদেব বিচ্যুতির প্রধান উৎস এবং বিদ্রোহের সঠিকতর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সেইগুলি দ্রুত অন্তর্হিত হয়। ক্ষতিকর ও অকেজো সুদ সংক্রান্ত আইন গ্রহণ না করেই মহাজনদের অত্যাচার যে পথ ধরে চড়া সুদ হতে জবরদস্তি আদায় দাঁড়ায়, সেই পথ রুদ্ধ করা হয়। হিন্দু সুদখোররা খুশি মতো চড়া সুদের হার ধার্য করতে পারে, কিন্তু পূর্বের মতো একই ঋণ দু'বার তিনবার পরিশোধ বন্ধ করার জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এবং প্রতারক ঋণ দাতাদের ঋণশোধের রসিদ দিতে বাধ্য করার জন্য ঘন ঘন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়; এবং প্রতারণার কোনো সম্ভাবনা ছাড়া এই প্রথম সাঁওতালর প্রকাশ্য বাজারে তাদের ফসল বিক্রয়ে সমর্থ হয়। দাসপ্রথাও বন্ধ করা হয়। এই বিষয়ে ১৮৪৩ সনের আইনটি আদালত অতি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করে; এবং ১৮৫৮ সনের পূর্বেই এইটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোনো দাস পলায়ন করলে বা কাজ করতে অস্বীকার করলে, তার বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ দাস প্রভুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রেলপথের কাজে শ্রমিকদের চাহিদা, পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে। কয়েক বৎসর পূর্বে, যে কোনো সাঁওতালের পক্ষে শক্তিশালী কোনো প্রভুর ভূমিদাস হওয়া ছিল ভালো ব্যাপার; কিন্তু এখন সে স্বাধীন শ্রমিক হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। দাসপ্রথার স্বাভাবিক কারণ অর্থাৎ স্বাধীন শ্রমিকের জন্য মজুরি-পুঁজির অনুপস্থিতি আর অনুভূত হতো না, দাসপ্রথাই বিলুপ্ত হয়। ইংরেজরা দুনিয়ার সুদূরতম অঞ্চলে যে বিরাট ও নতুন উদ্যোগ নিতে পারে তার প্রমাণ হিসাবে প্রায়শই ভারতীয় রেলপথকে দেখানো হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে রেলপথ এই প্রমাণ বহন করে; কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে হয় যে, ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের জাতির সম্পদ বৃদ্ধি তত ছিল না, বরং বহুলাংশে তা ছিল দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে শ্রম ও পুঁজির পারস্পরিক সমতা ফিরিয়ে আনা ও এই দেশ থেকে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করা।

বাংলার উত্তর-পূর্ব সুদূর সীমান্তে ইতিমধ্যে এক আবিষ্কারের ফলে সাঁওতাল ও পশ্চিমের অনুরূপ জাতিগুলির অবস্থার আরো উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আসাম ও সন্নিহিত প্রদেশে জংলি চায়ের গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এইটি চাষ করার প্রাথমিক প্রয়াস প্রভূত লাভ আনে, কিন্তু মজুরের অভাবে বিশালাকারে এর সম্ভাবনার আশা ছিল না। দুনিয়ার উর্বরতম অঞ্চল অধিবাসীর প্রত্যাশায় পতিত পড়ে ছিল; পশ্চিমের জনবহুল পার্বত্য অঞ্চলের কথা পুঁজিপতিদের মনে পড়ে ও তাদের মধ্য হতে মজুর বাহিনী সরবরাহ শুরু হয়। সর্বত্রই বহু সংখ্যক

লোকের পরিবহনের জন্য তত্ত্বাবধান আবশ্যক ; কিন্তু বিশেষভাবে ভারতে সযত্ন তত্ত্বাবধান ছাড়া আতংককর জীবনহানি ঘটে। পূর্বের নদীগুলি ও উপত্যকার মধ্য দিয়ে এই দুর্গম যাত্রাপথের বিপদ সম্বন্ধে পাহাড়িয়ারা কিছুই জানতো না এবং পরিবহনের ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদারের জ্ঞানও ছিল সামান্য। কুলি চালানের ব্যবসা বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহনের স্থান সংকুলানের সমস্যা মারাত্মক হয়ে উঠলো। তাদের খোলা নৌকা বোঝাই করে অথবা আরো মারাত্মকভাবে স্টিমার বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হতো। পরিচ্ছন্নতা বা উপযুক্ত খাদ্যের দিকে কোনো নজর দেওয়া হতো না, এমনকি সময়ে সময়ে চিকিৎসার কোনো প্রকার ব্যবস্থা থাকতো না। কয়েকটি যাত্রার মৃত্যুহার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমগ্র ব্যবস্থাটি সরকারি অফিসারদের তত্ত্বাবধানে রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বা জবরদস্তি করে যাতে কোনো গ্রাম হতে মজুর নিয়ে যাওয়া না হয়, সেইদিকে নজর দেওয়া হয়। নিজের জেলা ত্যাগ করার পর, মজুরকে এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হতো, সে স্বেচ্ছায় এই কাজে যোগদান করেছে কিনা জিজ্ঞেস করে তিনি কাজের প্রকৃতি তার কাছে ব্যাখ্যা করে বলতেন। ঠিকাদার কোনো প্রকার প্রতারণা করে থাকলে, মজুরটি ছাড়া পেত এবং গ্রামে ফিরে যাওয়ার ভাড়া তখন তাকে দিয়ে দেওয়া হতো। কাজের মেয়াদ কার্যত তিন বছর ধার্য হতো ; এই সময়ের জন্য লাগাতার কাজ ও দেশের তুলনায় দ্বিগুণ মজুরির নিশ্চয়তা ছিল। এই ছাড়াও বাগিচা মালিককে দিতে হতো মজুরের যাওয়ার ভাড়া, আবাসগৃহ, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সুস্থ শরীরে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। মজুরের সমগ্র পরিবার কাজ পেত আর প্রতিটি অতিরিক্ত শিশু অভাব বৃদ্ধির উপায় হওয়ার পরিবর্তে সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হতো। কৃষিক্ষেত্রে অন্য কাজের তুলনায় এই কাজ সবচেয়ে লঘু এবং শিশু বয়স থেকেই রুজি উপার্জন করা হয়।

সুতরাং পশ্চিমের পাহাড়িয়াদের মধ্যে দেশান্তর যাত্রা সঠিকভাবেই জনপ্রিয় হয়েছে এবং প্রতিমাসে তাদের হাজার হাজার লোক পূবের সুদূর প্রদেশগুলিতে চালান হয়েছে।[৮৯] বাগিচা মালিকরা প্রথমে অভিযোগ করে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সরকারি তত্ত্বাবধান এক অত্যাচার বিশেষ ; কিন্তু বারংবার পরিবর্তনের মাধ্যমে মানবিকতা ও নৈপুণ্যের বিচারে অতুলনীয়। অভূতপূর্ব এক কুলিচালান ব্যবস্থা বিকশিত হয়। উচ্চতর মালভূমির পাহাড়িয়াদের তুলনায় সাঁওতালরা কম শক্ত-সমর্থ এবং আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনে কম সহনশীল হওয়ার জন্য সাঁওতালরা এই ব্যবস্থায় অন্যান্য কয়েকটি স্বজাতির তুলনায় তেমন উপকৃত হয়নি। অবশ্য, নিম্নমানের ঠিকাদাররা সাঁওতালদের বিশাল বাহিনীকেই শক্ত-সমর্থ অপরাপর পাহাড়িয়া উপজাতি হিসাবে বাগিচা মালিকদের কাছে চালিয়ে দেয়।

কয়েক বৎসর পরেই দেশান্তরীরা ধনী হয়ে ফিরে আসে, এবং ইতিমধ্যে তাদের

দূরদেশ যাত্রার ফলে গ্রামে তাদের স্বজাতিদের পক্ষে জীবনধারণ সহজতর হয়। একদল যেমন ক্রমাগত উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যায় ও অপরদল কলিকাতায় জমা হয় এবং সমুদ্রপার হয়ে মরিশাস বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যায়; সেইখান হতে চুক্তির মেয়াদ শেষে গড়ে ২০ পাউণ্ডের মতো সঞ্চয় নিয়ে তারা ফিরে আসে; নিজগ্রামে মোটামুটি ধনী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য একজন সাঁওতালের পক্ষে এই টাকা যথেষ্ট। আরো উদ্যমীরা বেশ ভালোরকম সম্পদ সংগ্রহ করে, কখনো কখনো একটি মাত্র পরিবার ২০০ পাউণ্ড নিয়ে আসে—পশ্চিম বাংলার পাহাড়িয়াদের পক্ষে এই সম্পদ ইংরেজ কৃষকের ৫ হাজার পাউণ্ডের সমতুল্য।

সাঁওতালদের সভ্যতা কোনো ক্রমেই তার বস্তুগত সমৃদ্ধির সাথে তাল রাখতে পারেনি। উত্তরে, পিলাবের বেড়ার মধ্যস্থিত অর্ধ-হিন্দু বসতিতেই সাঁওতালদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রের তরফ হতে শক্তিশালী প্রচেষ্টা নেওয়া হয়; শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা—যে ভাষা বিশুদ্ধ সাঁওতালরা ঘৃণা করে। উৎসাহ ও ধৈর্য দ্বারা যেটুকু করা সম্ভব সরকারি অনুদান পুষ্ট মিশনারিরা ঐ অঞ্চলের সংকর সাঁওতালদের মধ্যে তা করেছেন। কিন্তু একমাত্র মাতৃভাষা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই এই জাতিকে সভ্যতায় ফিরিয়ে আনা যায়। দক্ষিণের এক মিশনারি পণ্ডিত তাদের ভাষাকে লিখিত রূপ দিয়েছেন, শব্দভাণ্ডার সহ এর ব্যাকরণ প্রকাশ করেছেন এবং তার ব্যক্তিগত ছাপাখানা হতে প্রতি মাসে ছোট ছোট সাঁওতালি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তার চারপাশে বহু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে ও সেইখানে মাতৃভাষা শেখার জন্য সাঁওতালরা ভিড় করে, কিন্তু অর্থের অভাবে তার কাজ ব্যাহত হয়েছে, এবং সরকার অনুদান দিয়ে তার কার্যাবলীকে সহায়তা না করলে এইগুলির যথাযথ বিস্তার আশা করা যায় না।

বীরভূমের পাহাড়িয়াদের সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচনা করার আংশিক কারণ, বাংলার গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যস্থিত অনার্যদের সম্বন্ধে এদের ভাষা ও প্রথা মূল্যবান আলোকপাত করে, এবং অপর আংশিক কারণ, আদিবাসী জাতিগুলির সাথে মোকাবিলার সুষ্ঠু পদ্ধতি সম্বন্ধে এদের সাম্প্রতিক ইতিহাস খুবই শিক্ষাবহ যেইসব আদিম অরণ্যবাসী উপজাতি সর্বত্র আমাদের সীমান্ত ঘিরে রেখেছে এবং যাদের সমগোত্রীয়দের নিয়ে সমতলভূমির জনসাধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠিত, তাদের চরিত্র অবস্থা এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সরকার অতঃপর অজ্ঞ থাকতে পারেন না। পুরাকালে যুদ্ধ ও মহামারী যখন ক্রমাগত তাদের জনহানি ঘটাত তখন এই অনুসন্ধিৎসার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই ফল দিত; কিন্তু বর্তমানে কঠোর ভাবে শান্তি প্রযুক্ত হওয়ার, রোগের টিকা প্রবর্তিত হওয়ার ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে মহামারীর প্রকোপ সর্বনিম্ন হওয়ার পর বর্ধিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্রিটিশ শাসনাধীন আমলে জীবন সংগ্রাম মুসলমান অত্যাচারের সময়ের চেয়ে কঠোরতর হয়। একই সাথে, পরিবার নির্বাহে অক্ষম কৃষকদের

শেষ সম্বল দাসপ্রথাও আমরা অবলুপ্ত করেছি। সংক্ষেপে আমরা খ্রীস্টীয় মানবতাবাদ ও আধুনিক সভ্যতার নীতি অনুসারে শাসন করার চেষ্টা করছি; আমরা ভুলে গিয়েছি যে এই প্রকার ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অথচ ভারতে জীবন ধারণের উপায় সমূহ অনড় রয়েছে। প্রগতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে নিশ্চল সমাজে অজ্ঞাত বিপদসমূহ, এবং বিদেশি সভ্যতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা একমাত্র সেইখানেই নিরাপদ যেখানে এই সভ্যতাজাত পরিবর্তনগুলি পূর্বনির্ণীত ও ব্যবস্থাকৃত। জনসংখ্যার চাপ নির্ণয়ের উপায়ের অনুপস্থিতিতে যে কোনো মুহূর্তে এই রূঢ় সত্য সম্বন্ধে আমাদের জাগ্রত হওয়া সম্ভব যে, ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ ইতিমধ্যেই অভিশাপে পরিবর্তিত রয়েছে; এবং অভ্যুত্থানের আগে সাঁওতালদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল অর্থাৎ তরবারি ও মহামারী হতে রক্ষা করার ফলে শুধু জীবনধারণের অসুবিধা তীব্রতর হতে পারে। পরিসংখ্যান সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ; কিন্তু বর্তমানে গ্রামবাংলার একটি মাত্র গ্রামের জনসংখ্যা, এর উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ, অথবা সেইসব দ্রব্যের ফলে সামগ্রিকভাবে জনগণ সমৃদ্ধশালী বা অনুগত বা ক্ষুধার্ত ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; সেইগুলি নির্ণয়ের কোনো নির্ভর-যোগ্য উপায় আমাদের নেই। আগামী ৫০ বৎসর ধরে ভারতীয় রাজপুরুষদের এই সমস্যাগুলি সমাধানের দায়িত্ব থাকবে। তাদের পূর্ববর্তীরা ভারতে সভ্যতা এনেছেন; এই সভ্যতাকে একই সাথে দেশীয়দের জন্য মঙ্গলকর ও আমাদের জন্য নিরাপদ করা তাদের কর্তব্য।

নির্দেশিকা

১. *The Cocch, Bodo, and Dhimal Tribes*, by B.H. Hodgson, Calcutta, 1847, preface, p. 2

২. অন্ত তেলেগু অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনার্য শব্দাবলী দিয়ে সমগ্র শব্দভাণ্ডারের অর্ধাংশ গঠিত; তত্‌স্থান্ বা তদ্ভবম্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্কৃতজাত শব্দ দিয়ে আরো এক-চতুর্থাংশ; অন্য দেশ্যম্ অর্থাৎ তেলেগু বহির্ভূত অন্যান্য আর্য ভাষা হতে গৃহীত শব্দাবলী দিয়ে আরো এক-চতুর্থাংশ। দক্ষিণ-ভারতে মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসের মিঃ এলিস্, রেভা: ড. কল্ডওয়েল ও মিঃ এ. ডি. ক্যাম্পবেল মহোদয়গণের পরিশ্রমের সাথে যখন উত্তরের অনার্য উপজাতি সংক্রান্ত গবেষণা যুক্ত হবে, তখনই কেবল আদিম তামিলিয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বলার মতো প্রমাণ পণ্ডিতরা হাজির করতে পারবেন।

৩. কুমায়ুন ও আসামের মধ্যবর্তী জেলা। আসাম সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক জেলার অধিবাসী নাগা উপজাতির মধ্যে প্রায় ৩০টি বিভিন্ন ভাষা বর্তমান, —এ'হতে মৌলিক ভাষাগুলির অসংখ্য বিভিন্ন কথ্য রূপে বিভাজনের প্রবণতার লক্ষণীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি জেলার ভাষার পার্থক্যের জন্য বাধাস্বরূপ একটি পাহাড়, একটি নদী বা একটি জলাভূমির অস্তিত্বই যথেষ্ট।

৪. শালীনতা রক্ষার জন্য এই কিংবদন্তি সংক্ষিপ্ত করা হলো।

৫. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৬. এই অনুচ্ছেদে বীরভূম সন্নিহিত সাঁওতালদের উল্লেখ করা হয়েছে, চরম দক্ষিণে উড়িষ্যার বা উত্তরতম প্রান্তে রাজমহলের সাঁওতালদের কথা বলা হয়নি।

৭. আসামের পাহাড়িয়াদের পূজ্য দেবতাদের তালিকার জন্য মিঃ হজসন-রচিত *Essay on the Kocch, Bodo, and Dhimal Tribes*, p. 166 দ্রষ্টব্য।

৮. A. W. Von Schlegel's Observations sur la langue et litterature Provencales, p. 14

৯. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১০. আমার নাগালের মধ্যের পাণ্ডুলিপিগুলি ছাড়াও, আমি ক্রমাগত রেভাঃ জে. ফিলিপ্‌সের *Introduction to the Santal Language*, Calcutta, 1852, পুস্তকটি ও অন্যান্য মিশনারিদের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছি।

১১. ক্যাম্পবেলের 'তেলেগু ব্যাকরণ' ভূমিকার উপর মিঃ এফ. ডাবলিউ. এলিসের টীকা।

১২. August Schleicher, *Compendium*, sec. 122. Weimar, 1866.

১৩. ঐ

১৪. ঐ, পৃ. ৩

১৫. রেভারেণ্ড জে. ফিলিপ্‌স; কিন্তু তুলনীয়, সংস্কৃত 'অস্মদ্' শব্দের দ্বিবচন ও বহুবচন।

১৬. August Schleicher, *Compendium etc.*, 2nd edn., p. 3

১৭. ব্রহ্মপুত্রের উচ্চ উপত্যকার পূর্বের পর্বতমালা এক ভাষাগত বিভাজকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। নিম্ন বঙ্গের জেলা আসাম রাজনৈতিক সীমান্তের সাথে সমভাবেই জাতিগত এক সীমান্ত।

১৮. *Grundzuge der Griechischen Etymologie, voi Georog*

Curtius, 2nd edn, pp. 120, 121, Leipzig 1866, অথবা শ্লেইচারের সুবিন্যস্ততর ব্যঞ্জনবর্ণ-পরিবর্তন তালিকা, *Compendium*, 2nd ed. p. 340, Weimar, 1866.

১৯. যথাযথ উচ্চারণের জন্য 'ন' এর পর একটি মহাপ্রাণ বর্ণ ব্যবহার করা হয় ; যেমন, না-হাই । না-হারি = না আহারি ।

২০. Von Georg Curtis, *Grundzug etc*, 2nd ed, p. 279

২১. মৃচ্ছকটিক, ৪০, মূরের *Sanskrit Texts*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬

২২. ঐ, ৭২ ও ১১২, *Sanskrit Texts*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬

২৩. (১) চতুর্থ ; (২) চতুর্থাংশ ; (৩) পদ কেবল গণিত ও ছন্দ শাস্ত্রে ব্যবহৃত ; (৪) এক-চ, এক পদ-র সংক্ষিপ্তরূপ (হটন) ।

২৪. Muller *Survey of the three Fauilies of Languages*, 2nd edn, p. 27 ; Maskil le-Sopher, p. 12-411 Cresenius ; Ewald.

২৫. শ্লেইচারের মতানুসারে, আদিপর্যায়ে সংস্কৃতে মাত্র ১৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল, এবং পরে অনার্য ভাষা হতে আরো ১৯টি গৃহীত হয় ।

২৬. শালগাছ (Shorea Robusta, Hovt. Beng. p. 42)

২৭. দেশের অঞ্চল অনুযায়ী এই সংখ্যা বিভিন্ন হয় — উত্তরে এইটি বারো, দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলে সাত ।

২৮. মিঃ ফিলিপ্স ।

২৯. *Original Sanskrit Texts*, ii. p. 437

৩০. ঐ, iv, p. 291.

৩১. অথর্ববেদ, ৭ম । ৮৭, ১ ।

৩২. ঐ, ৮ম । ৫-১০ ; Texts, iv

৩৩. শতপথ ব্রাহ্মণম্, ১ম, ৭, ৩, ৮, Text iv

৩৪. *Remarks on Ramayana*, vol. ix, p. 291, note 35, Texts, vol. iv, p. 378

৩৫. তিনটি বিশাল স্তম্ভকায় প্রস্তর । দুইটি ভূমির উপর খাড়া দণ্ডায়মান ও তৃতীয়টি ভূমির সমান্তরাল ভাবে উপরিউক্ত প্রস্তর দুটির শীর্ষদেশে স্থাপিত । এই বিশালাকার প্রস্তর খণ্ডগুলি দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট, প্রতিটির ওজন সাত টনের অধিক । এইগুলি চতুর্ভুজাকার, প্রতি পৃষ্ঠদেশ আড়াই ফুট চওড়া, অর্থাৎ প্রতি পৃষ্ঠের পরিসীমা ১০ ফুট । ভূমিসমান্তরাল প্রস্তরটির প্রান্তদেশ খিলানে বসাবার উপযোগী সুচালো করে কাটা এবং এই উপায়ে প্রস্তরটি অপর দুটির শীর্ষে স্থাপিত । কখন, কে এই প্রস্তর খণ্ডগুলি স্থাপন করে, কারো জানা নেই ।' — ক্যাপ্টেন ডাবলিউ. এস. শেরউইলের রাজস্ব

সংক্রান্ত রিপোর্ট, কলিকাতা, পৃ. ৬।

৩৬. শালগ্রাম।

৩৭. গ্রামদেবতাগুলি।

৩৮. আধুনিক বেনারসের নিকটে।

৩৯. পাল রাজবংশ।

৪০. জনৈক পুরাবস্তু সংগ্রাহক কর্তৃক সারনাথের এক সাম্প্রতিক বিবরণ, *Englishman's Weekly Journal*, vol. iv, no. 29। কলিকাতায় প্রকাশিত হয়েছে।

৪১. দাক্ষিণাত্যের ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে মেজর সাইকের রিপোর্ট।

৪২. চরক পূজা, বর্তমানে দণ্ডার্হ অপরাধ।

৪৩. *Englishman's Weekly Journal*, vol. ix, no. 32, Calcutta.

৪৪. হাড়িয়া, তীব্রতা অনুযায়ী মূল্য গ্যালন প্রতি ১ পেনি হতে ৩ পেনি।

৪৫. নিমগাছ।

৪৬. ছুতিয়ার।

৪৭. রাজমহল অঞ্চলের ই. এল. পুস্‌ক্লে উৎসবের এই কৌতূহলজনক অংশের বিবরণ আমায় দিয়েছেন।

৪৮. ঐ

৪৯. মহুয়া।

৫০. 'টোক', ওকলিং গাছের ডাল দিয়ে তৈরি লাঠি।

৫১. তিত্‌রি-কুরি।

৫২. প্রাণঘাতী অসুখের ক্ষেত্রে সিংহলের আদিবাসীরা সাধারণত মোরগ বলি দেয়—স্যার ই. টেনেণ্টের 'সিংহল', ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ৫৪১, ইত্যাদি।

৫৩. সাঁওতালি 'মাইচান্‌স্', গ্রীকশব্দ MAKHINE বা আমাদের 'মেশিন' শব্দও অভিন্ন শব্দমূলজাত।

৫৪. বীরভূমের পাহাড়িয়াদের প্রধান শস্য ভুট্টা (সাঁওতালি, জনার), এবং গুণ্ডোলি ও ইরি নামে তিনটি নিম্ন মানের শস্য—নিম্নভূমিব হিন্দুদের এগুলি চাষ করতে আমি দেখিনি। নিম্নভূমিবাসীদের সর্বজনীন খাদ্য চাউল, বীরভূমের সাঁওতালদের নিকট এক বিরলপ্রায় বিলাসিতা বিশেষ; কিন্তু সমগ্র বাংলায় প্রচলিত 'বাজরা' সাঁওতালরা উৎপন্ন করে। দক্ষিণ অঞ্চলে, 'জনহে' বলতে একপ্রকার বুনো ঘাস বোঝায়।

৫৫. ধান চাষের প্রতি পর্যায়ের জন্য সাঁওতালদের নিজস্ব নাম বিদ্যমান। (১) বাংলা, 'ধান', সাঁওতালি 'হোড়ো'; (২) বাংলা 'বীজ' বা বিচ্, সাঁওতালি 'ইটা'; (৩) বাংলা 'কাটা ধান', সাঁওতালি 'ইর'; তাই, 'ইরাতে', ধান কাটা; (৪) বাংলা 'বিচালি', সাঁওতাল : 'বস্থপ'।

৫) বাংলা : 'ধান মাড়াই' ; সাঁওতালি : 'এন্-মেন্' বা 'মা এন্মেন্' ; ৬) বাংলা চা'ল ; সাঁওতালি : চাউলী, উভয় ভাষাতেই শব্দমূল অভিন্ন—'চালাতে', অর্থাৎ 'সরানো' হতে ; ৭) বাংলা 'ভাত' ; সাঁওতালি : দাকা ; ৮) বাংলা 'মদ' বা পচাই ; সাঁওতালি : হাঁড়িয়া। বীরভূম পুলিশ বাহিনীর দু'জন সাঁওতাল সিপাহি—ধুলা মাঝি ও চন্দ্র মাঝির, উচ্চারণ হতে আমি লিখে নিয়েছি।

৫৬, সাঁওতাল উৎসবের তালিকার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫৭ জোহর-এতে।

৫৮. কয়েক বৎসর যাবৎ বীরভূম-সন্নিহিত সাঁওতাল অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল 'বিনা-পুলিশী ব্যবস্থা'। ১৮৫৮ সনের জন্য 'সরকারেয় নিকট দেওয়ানি ও ফৌজদারি রিপোর্ট'-এ (পৃ. ৪, ৫, ৬) কমিশনার মিঃ জি. ডাবলিউ. ইয়ুল এই ব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা করেন, এবং এই ব্যবস্থা কার্যে রূপায়িত করতেন অধঃস্তন যে অফিসাররা, তাঁরাও এই ব্যবস্থার সাফল্য সম্বন্ধে একমত ছিলেন।

৫৯. পূর্বে বর্ণিত, ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬০. 'প্রত্যেক জমিদার নিম্নভূমিতে তার জমির উন্নতির জন্য পাহাড় হতে কৃষক সংগ্রহ করছে।' – *Morning Chronicle*, London, 23 Oct. 1792. উ. স.

৬১. *History of Antiquity etc. of Eastern India*—বুকানন পাণ্ডুলিপি, ২য়, ৮২। গরীবদাসের পত্রাবলী, প্রত্যুত্তর সহ, ১৭৯৪। উ. স.

৬২. 'গভর্নর-জেনারেল ও বঙ্গীয় পরিষদের আদেশানুসারে, তাঁর চরিত্রের সম্মানার্থে এবং অন্যান্যদের সম্মুখে উদাহরণ রূপে,' ১৭৮৪।

৬৩. প্রশাসন বিভাগের মি. জন পেটি ওয়ার্ডকে এই বসতির প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। বৃত্তাকার এই বেড়ার পরিধি ২৯৫ মাইল দীর্ঘ, ৮৬৬ বর্গমাইল পার্বত্য অঞ্চল ও ৫০০ বর্গমাইল সমতলভূমি এর অন্তর্গত। ১৮৫১ সনে সমতলভূমির ২৫৪ বর্গমাইল আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

৬৪. বুনা-পাড়া

৬৫. নদীয়ায় ধানী জমির জন্য রাজস্ব ছিল একর প্রতি ১ শিলিং ৬ পেনি। কুষ্টিয়া মহকুমার দায়িত্বে থাকাকালীন, ১৮৬৫ সনে আমার নিকট যে বিপুল সংখ্যক রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা আসে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো জমির করের পরিমাণ ছিল একর প্রতি ৬ শিলিং-এর নিচে ; এবং আমার যতদূর স্মরণ আছে, সর্বোচ্চ যে কর দাবি করা হয়, তা ছিল স্বাভাবিকভাবে সেচযুক্ত, দো-ফসলি জমির জন্য একর প্রতি ১২ শিলিং। এই প্রকার জমি বীরভূমে পাওয়া দুষ্কর। যে সামান্য পরিমাণ আছে, তা'

তুঁত চাষে ব্যবহৃত হয়, এবং একর প্রতি ২৪ হতে ৪২ শিলিং পাওয়া যায়। পুবের জেলাগুলিতে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমির অস্তিত্ব উঠবন্দী ব্যবস্থার প্রাধান্য থেকে প্রমাণিত। এই ব্যবস্থায়, জমির মালিকের সাথে কোনো প্রকার আগাম বন্দোবস্ত ছাড়াই কৃষক অকর্ষিত জমি চাষ করতে শুরু করে, মর্জিমাফিক ফলন করে ও বৎসরান্তে এই জমি পরিত্যাগ করে আবার নতুন জমিতে চলে যায়। ফসল পাকার পর জমির মালিক এইভাবে কর্ষিত জমি পরিমাপ করে এবং একর প্রতি সামান্য কর—৭ শিলিং ৬ পেনি—ধার্য করে। ফলন অত্যধিক হোক আর সামান্যই হোক, এই কর নির্দিষ্ট থাকে। আমি শুনেছি, ১৮৬৫ সন হতে নদীয়ার কর বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬৬. ১৮৪৩ সনের পঞ্চম ধারা (ভারতীয় পরিষদ)।

৬৭. প্রধান এঞ্জিনিয়ার, মিঃ জর্জ টার্নবুল প্রদত্ত পূর্ব-ভারতীয় রেলপথে নিযুক্ত দিনমজুরদের গড় হিসাব।

৬৮. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট বীরভূমের পরিবর্ত জেলা-সমাহর্তার পত্র, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ৮৫৫। বী. আ. ন.

৬৯. সিধু ও কানু, ভাগনাদিহির বাসিন্দা, পরবর্তীকালে আরো দুই ভাই, চাঁদ ও ভৈরব যোগ দেন।

৭০. যোগ করা উচিত যে, এই বক্তব্যের সত্যতা সরকারি দলিল পত্রের সাহায্যে যাচাই করতে আমি সমর্থ হইনি।

৭১. জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে এই সাঁওতাল নেতারা সরকার, ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার, বীরভূম ও ভাগলপুরের জেলা শাসকদ্বয় ও যাত্রা পথবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন দারোগাকে এক চরমপত্র পাঠায়। কৌতূহলজনক এই ঘোষণাপত্রের একটিরও সন্ধান লাভে আমি সফল হইনি ; এইগুলির খুব কম সংখ্যকই, আদৌ কোনোটি কিনা আমি জানি না, গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও তথ্যনিষ্ঠ সমকালীন এক লেখক এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। কথিত আছে যে, চরমপত্রে প্রধানত, সুদখোরী নিয়ন্ত্রণ, রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা এবং সাঁওতাল অঞ্চলের সকল হিন্দু সুদখোরের বহিষ্কার, বা কারো কারো মতে হত্যা, দাবি করা হয়।

৭২. বিবরণীর এই অংশ প্রধানত সমকালীন সংবাদপত্রগুলি হতে গৃহীত—*The Friend of India*, *The Englishman*, *The Harkaru* এবং *The Calcutta Review.* ইত্যাদি পত্রিকা।

৭৩. মেজর ভিনসেণ্ট জারভিসের ব্যক্তিগত বর্ণনা ; এই পরিচ্ছেদের ভিত্তি-স্থানীয় পাণ্ডুলিপিগুলির অন্যতম। কূপমধ্যে ধনসম্পদের কিংবদন্তিটির সত্যতা সরকারি ভাবে আমি যাচাই করতে পারিনি।

৭৪. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট বীরভূমের পরিবর্ত জেলাশাসকের পত্র, ৮ নভেম্বর ১৮৫৫। বী. আ. ন.

৭৫. জেনারেল লয়েড।

৭৬. বর্ধমানের কমিশনারের নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারির পত্র, ফোর্ট উইলিয়াম, ৩০ জুলাই ১৮৬৫। ব. আ. ন.

৭৭. বীরভূমের জমিদার বিপচরণ চক্রবর্তীর নিকট সরকারি ধন্যবাদজ্ঞাপন পত্র, ২ অকটোবর, ১৮৫৫ দ্রষ্টব্য। বী. রা. ন.

৭৮. বীরভূমের পরিবর্ত অস্থায়ী জেলাশাসকের নিকট বর্ধমানের কমিশনারের পত্র, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫, অনু. ২। বী. রা. ন.

৭৯. সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত, বিশেষ কমিশনারের নিকট হতে বহরমপুর, ২২ আগস্ট ১৮৫৫।

৮০. ক্যাপ্টেন আর. ডি. ম্যাকডোনাল্ডের নিকট ঐ বিশেষ কমিশনারের পত্র, ২১ আগস্ট, ইত্যাদি।

৮১. মেজর জারভিসের ব্যক্তিগত বর্ণনা।

৮২. কমিশনারের নিকট পত্র, ২৪ আগস্ট, ১৮৫৫, অনু. ২। অন্যান্য উপদ্রুত জেলাগুলির অফিসাররা এই প্রকারের রিপোর্ট আগেই পাঠিয়েছিলেন; কারণ প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি হতে সরকার ৬ আগস্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, বিদ্রোহীরা 'বহুলাংশে বিরোধিতা ত্যাগ করেছে' এবং তাদের আত্মসমর্পণ স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া বিশেষ কিছু করার নেই। বিশেষ কমিশনারের নিকট পত্র, ক্রমিক সংখ্যা ১৮০৮। বী. র. ন., ক. অ. ন.

৮৩. বর্ধমানের কমিশনারের নিকট বীরভূম জেলা শাসকের পত্র, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫।

৮৪. দুর্গাপূজা।

৮৫. বীরভূম জেলাশাসকের নিকট বীরভূম ও বাঁকুড়া সীমান্ত বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার এল. এস. বার্ড-এর পত্র, ১০ ডিসেম্বর ১৮৫৫। বী. রা. ন.

৮৬. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট বীরভূমের জেলাশাসক ও সমাহর্তাদের সংযুক্ত রিপোর্ট, নং ১৪৫, ২৮ আগস্ট, ১৮৫৫। বী. রা. ন.

৮৭. ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৫৬ মার্চ।

৮৮. সাঁওতাল বিদ্রোহ সংক্রান্ত সরকারি কিছু নথিপত্র পরিশেষে পাওয়া যাবে।

৮৯. আমার নিকট কোনো সম্পূর্ণ হিসেব নেই, কিন্তু ১৮৬৫ সনে, পদাধিকার বলে কুষ্টিয়ায় মজুর চালানের তত্ত্বাবধায়ক থাকাকালীন, আমার হিসাবমতো সংখ্যা ছিল মাসিক ৩ হাজার। জুলাই মাসে ৩৮২৭ জন, মে মাসে ৩২৩৬ জন পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক, অর্থাৎ, শিশুদের নিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪ হাজার জন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৭৬৫-৯০

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন অঞ্চলগুলির ক্রমাগত পরিবর্তনে অসন্তুষ্ট হয়ে এবং 'বিভিন্ন রাজা, জমিদার ও অন্যান্য দেশীয় জমির মালিকদের' নালিশে বিচলিত হয়ে ১৭৮৪ সনে[১], পার্লামেণ্ট 'দেশের প্রাচীন নিয়মকানুন ও প্রথার ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের জন্য স্থায়ী নিয়মাবলী' প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। বাংলার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় ইংরেজ অথবা দেশীয় অফিসার নিয়োগের প্রশ্নে পরিচালক সভা ৩০ বৎসর দোদুল্যমান ছিলেন। ১৭৬৭ সনে ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিকে লেখেন, 'কালেক্টর হিসাবে কোম্পানির কর্মচারিদের নিযুক্তি অথবা যে সকল কাজ নবাব দ্বারা করা সম্ভব সেই প্রকারের কোনো কাজে ইংরাজ ক্ষমতা প্রয়োগের অর্থ হবে মুখোশ খুলে সরাসরি কোম্পানিকে প্রদেশের শাসক (গভর্নর) ঘোষণা করা। তদনুসারে, দিল্লির বাদশা বাংলার শাসনভার কোম্পানিকে অর্পণ করার প্রথম চার বছর দ্বৈত-শাসনের এই ব্যবস্থা বজায় ছিল এবং প্রশাসনের প্রকৃত কাজকর্ম দেশীয়দের হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এই প্রকার দায়িত্ব পরিহার যে পুরুষোচিত ও সুবিবেচনা প্রসূত নয়, সেই বোধ ক্রমশ কোম্পানির অভিজ্ঞতম কর্মচারিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অন্ধকূপ হত্যায় জীবিতদের অন্যতম ও এই ঘটনার বিবরণীকার মিঃ হলওয়েল এই বিষয়ে নিজস্ব কঠোর মতামত প্রকাশ করেছেন: "আট বছর ধরে এইসব প্রদেশগুলিতে আমরা শুধু ঠোকর মেরেছি, এবং বিশাল অঞ্চল দখল ও রাজস্ব আহরণ সত্ত্বেও, আমাদের সাফল্যে কোম্পানির কি লাভ হয়েছে? ফাঁদে পড়ার আগে পর্যন্ত আমরা কি শুধু টোপ করেই যাবো এবং শেষে এইভাবে বিনষ্ট হব।...আমাদের নিজেদেরই সাহসভরে শাসনভার গ্রহণ করা উচিত।"[২]

অবশ্য, ১৭৬৯ সনের আগে প্রদেশের প্রতিটি বিভাগে ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তি সম্ভব হয়নি। যদিও সংখ্যাল্প এই ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষে একটি মাত্র দফতরেরও সঠিক তত্ত্বাবধান সম্ভব ছিল না, তবুও পরিচালক সভা এদের নিকট হতে সমগ্র অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশা করতেন। তাদের প্রধান কাজ ছিল 'রাজস্ব আরোপকারীদের চরম অব্যবস্থা ও রাজস্বদাতা-দের প্রতারণা পূর্ণ কর ফাঁকির ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিবন্ধক' হিসাবে কাজ করা।[৩] কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ তাদের সামগ্রিক দায়িত্বের অংশবিশেষ মাত্র ছিল। রাজস্ব অফিসার হওয়া অপেক্ষা তাদের পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও গ্রামীণ পরিসংখ্যানবিদ হওয়ার কথা ছিল। তাদের কর্তব্য হিসাবে অবিলম্বে কাজ শুরু করার জন্য সরকার কয়েকটি বিষয় তথা প্রবন্ধের শিরোনামা ঠিক করে দেন। "প্রদেশের বর্তমান সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন সংবিধানের রূপ, এর রক্ষকবৃন্দ বা শাসকদের বিবরণ, তাদের রাজ্যশাসন পরম্পরা, তাদেব পারিবারিক অভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক; তাদের দ্বারা বা তাদের নিজস্ব লোক দ্বারা প্রচলিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত বিশেষ প্রথা তথা সুযোগগুলি; এবং সংক্ষেপে তাদের উদ্ভব ও প্রগতি সম্বন্ধে আলোকপাতকারী বা প্রদেশের বাস্তব পরিবর্তন-কারী সকল রচনা সমগ্র।"[৪] এই সহজ ঐতিহাসিক গবেষণাগুলিতে সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর তাদের অন্য কাজগুলি করার কথা ছিল, যথা ভূমি-ব্যবস্থা ও রাজস্বসংক্রান্ত অনুসন্ধান, প্রচলিত কর ও বেআইনি আদায়ের মধ্যে দ্রুত ও চূড়ান্ত প্রভেদ নির্ণয়, ন্যায়বিচারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রদেশে উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি; এইগুলি ছাড়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিকাশের উপায় সম্বন্ধে বিশদ আলোচন এবং মুসলমান অপশাসনে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে যেসব অসংখ্য বাধা শিল্পচেতনাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে, সেগুলি অপসারণের প্রস্তাবসহ, প্রদেশেব উপজাত দ্রব্যের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থাপিত করার দায়িত্বও তাদের ছিল। পরিচালক সভা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে তত্ত্বাবধায়কদের অবসর সময় কাটানো মুশকিল হবে; যে কারণেই তাদের মন ভোলানোর জন্য তাদের উপর জনগণের পিতৃপ্রতিম ভূমিকা আরোপ করে ভাবা হয়েছিল যে তারা সকলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে, জমি উন্নয়নে কৃষককে সহায়তা করতে, ব্যবসায়ীদের ব্যবসাবৃদ্ধি করতে, শিল্প-মালিকদের উৎপাদনবৃদ্ধি করতে ও সমস্ত শ্রেণীকে পূর্বের তুলনায় আরো বিজ্ঞ ও ভালো হতে সহায়তা করবে। তাছাড়া, তাদের 'দৃঢ় ও প্রত্যয়পূর্ণভাবে' কৃষকদের বোঝানোর দায়িত্ব ছিল যে কোম্পানির ব্যবস্থাগুলি তাদের মঙ্গলের জন্য গৃহীত হয়েছে, এবং এইগুলির বিরোধিতা করার একমাত্র অর্থ হবে 'নিজেদের শৃংখল দৃঢ় করা ও তাদের অত্যাচারীদের দাসত্ব ও তাদের উপর নির্ভরতা স্বীকার করে নেওয়া।'[৫]

সংক্ষেপে, তত্ত্বাবধায়কদের নিকট হতে সাধ্যাতিরিক্ত আশা করা হয়েছিল এবং তার ফলে সম্ভাব্যটুকুও তারা করেনি। তাদের চাকুরির প্রথম বৎসরে, পূর্বে বর্ণিত দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশে দেখা দেয় ; সেই কারণ বর্ণনা পাঠে যে-কেউ উপলব্ধি করবেন যে ব্রিটিশ মানবিকতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা তখনো গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেনি। দুনিয়া থেকে যখন এক কোটি লোক চিরতরে বিদায় নিচ্ছে, তত্ত্বাবধায়করা তখন প্রাণপণে পুরাতত্ত্ব বা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনায় রত ; 'এবং কয়েকটি মাত্র মহৎ ব্যতিক্রম ছাড়া, অন্যেরা কি অবস্থায় তাদের এই সাহিত্যসাধনা করা হয়েছে বোঝাবার জন্য দুর্ভিক্ষের যে উল্লেখ প্রয়াশ করেছেন, সেগুলি করা হয়েছে তৎকালীন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে দুর্ভিক্ষকে হাজির করার জন্য নয়, বরং রাজস্ব বা চাষের অবস্থা বা রিপোর্টের মূল বিষয়বস্তু সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে। দেশীয়দের হাতে অভ্যন্তরিণ প্রশাসনের এই পূর্ণ দায়িত্ব, ক্লাইভের 'দ্বৈত-ব্যবস্থা'র মতোই, 'আরো দুই বৎসর থাকে। 'দেশীয় আদায়কারী বা কৃষকদের নিঙরে নেয আর ইজারাদাররা একদিকে সরকারকে প্রতারিত করে ও অন্যদিকে কারিগর ও কৃষকদের নিকট হতে বেআইনি কর আদায় করতে থাকে। কিন্তু, ১৭৭২ সনের ১৩ এপ্রিল, জন কার্টিয়ের প্রদেশের দায়িত্ব ওয়ারেন হেস্টিংসের[৬] হাতে অর্পণ কবার এক মাসের মধ্যেই বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। নতুন শাসক সাহসের সাথে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এক গুরুত্বপূর্ণ আইনের মাধ্যমে ৪ মে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কার্যত বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। পরিষদের সক্ষমতম ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত পরিদর্শক কমিটি, মারাত্মক গ্রীষ্ম বা আরো মারাত্মক বর্ষাকালীন ম্যালেরিয়ার পরোয়া না করে জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করেন, প্রতিটি বিভাগের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরেজমিন তদন্ত করেন, রাজস্ব বিন্যাস করেন ও দৃঢ়হস্তে পুরনো ভুলগুলিকে সংশোধিত করেন। কমিশনাররা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রাপ্ত ফলাফলগুলির তুলনামূলক বিচার করে দেখেন যে তত্ত্বাবধায়করা তাদের কাজে ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় এই সময়েই পরিচালক-সভা উত্তপ্ত এক পত্রে অভিযোগ করেন যে তত্ত্বাবধায়কদের দায়িত্ব গ্রহণ কালীন অবস্থার থেকে বর্তমান অবস্থা শোচনীয়তর। চিঠি ভারতে পৌঁছানোর আগেই অবশ্য তত্ত্বাবধায়কদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

১৭৭২ সনে করদাতা ও তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যবর্তী 'দেশীয় আদায়কারী' ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় এবং শেষোক্তদের উপর ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব বর্তায় ; এইজন্য তাদের নিজ জেলায় দেওয়ানি বিচারকের ক্ষমতা ও দেশীয় কর্মচারিদের উপর সীমিত নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হয়—তখনো দেশীয় কর্মচারিদের প্রশাসনিক ও পুলিশি ভূমিকা বজায় ছিল।[৭] কিন্তু দুই বৎসর অতিক্রান্ত হবার আগেই পুরাতন ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়, ; ইংরেজ কর্মচারিদের প্রত্যাহার করা হয়,

তাদের দায়িত্ব দেশীয় কর্মচারিদের হস্তান্তরিত করা হয় ও বংশানুক্রমিক ফৌজদারদের হাতে পুলিশি দায়িত্ব অর্পিত হয়।[৮] ১৭৭৫ সনে এইভাবে পুনর্বহাল কৃত ফৌজদারদের, ১৭৮১ সনের পুনরায় পদচ্যুতি ঘটে এবং সেক্রেটারির পদে আসীন ব্যক্তিটির মর্জিমাফিক, তাদের দায়িত্ব হয় দেওয়ানি বিচারক বা আঞ্চলিক প্রধান জমিদার গ্রহণ করেন। হেস্টিংস ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের সমস্যা ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করেছেন; কোথাও কোনো সুশৃংখল ব্যবস্থা ছিল না এবং পরের বৎসর আবার যথারীতি নতুন পরিবর্তন ঘটানো হয়।[৯] অবশেষে জনগণের অসন্তুষ্ট গুঞ্জন পার্লামেন্টের কানে যায় এবং ১৭৮৪ সনে আইন রচিত হয়।[১০]

বাংলার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রণয়ন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ও বিরোধিতা এত প্রবল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে, প্রকৃত এক অভিজাত বংশীয়কে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৭৮৬ সনের ১৪ সেপ্টেম্বর 'কলিকাতা গেজেট, পত্রিকায় বলা হয়, "গত সোমবার মহামহিম আর্ল অফ কর্নওয়ালিশ নদীবক্ষে পৌছান, ও মঙ্গলবার তিনি স্থলভূমিতে উপনীত হন।' দেশীয় প্রথাসমূহের ব্যবস্থা প্রণয়নের নির্দেশ নিয়ে নতুন গভর্নর-জেনারেল আসেন। কিন্তু তিনি দ্রুত আবিষ্কার করেন যে এইজন্য প্রথমেই এই ব্যবস্থাগুলি কি কি, তা নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং তিনি আরো বোঝেন যে, অপ্রতুল তথ্যের ভিত্তিতে একের পর এক অতিদ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণই বিগত ২০ বৎসরের বিধ্বংসী পরিবর্তনগুলির মূল কারণ। কিন্তু দেশ শাসনের মাধ্যম হিসাবে কাদের ব্যবহার করবেন, সে সম্বন্ধে লর্ড কর্নওয়ালিশ বিন্দুমাত্রও দ্বিধান্বিত ছিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, রাজধানী তথা প্রদেশগুলিতে সর্বত্র একমাত্র ইংরেজ অফিসাররাই দফতর প্রধান হবেন ও শুধু কঠোর পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষেই দেশীয়রা বিশ্বাসযোগ্য।[১১] শাসনকালের প্রথম তিন বৎসর তিনি ভবিষ্যৎ স্থায়ী ব্যবস্থার ভিত্তি রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের মনোনিবেশ করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বাংলার বিভাগগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটান, প্রত্যেক জেলাকে একজন করে অভিজ্ঞ ইংরেজ অফিসারের সকল দায়িত্ব—অর্থ, দেওয়ানি, ফৌজদারি ও পুলিশ—ন্যস্ত করেন।[১২]

এই ব্যবস্থার ফলেই স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে বীরভূমের আবির্ভাব ঘটে। রাজস্ব সমাহর্তা, শাসক ও দেওয়ানি বিচারক হিসাবে মিঃ ক্রিস্টোফার কিটিং ও ৭৫০ বর্গমাইলের উপর চরম কর্তৃত্ব নিয়ে শাসন করতেন,[১৩] এবং তাঁর এখতিয়ার মধ্যবর্তী বহুদূরের পাহাড়িয়া উপজাতিরা পর্যন্ত তাঁর শাসন বুঝতে বাধ্য হতো। স্বাভাবিক কারণেই জেলাটি দুইভাগে স্বতঃবিভক্ত ছিল: অজয় নদীর উত্তরে বীরভূমের রাজার রাজত্ব ও দক্ষিণে বিষ্ণুপুর রাজের রাজ্য।[১৪] মিঃ কিটিং সৈন্য চলাচল সংক্রান্ত নির্দেশ দিতেন, কৃষকদের দেয় কর গ্রহণ করতেন, দেওয়ানি

মামলার বিচার করতেন, জেলার মধ্যে যাতায়াত কালীন সৈন্যদলের রসদ সরবরাহ করতেন, ছোটখাটো অপরাধের বিচার করে সাজা দিতেন, ঘৃণ্য অপরাধীদের শৃংখলিত করে মুসলিম কাজীর নিকট প্রেরণ করতেন এবং এক বিশাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষের কাজ করতেন। এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে ওলনদড়ি নিয়ে যে কারিগরকে কাজ করতে হয়, তার কাজে চরম উৎকর্ষ সন্ধান অযৌক্তিক ; এবং মিঃ কিটিং-এর মতো লোকদের প্রশাসন সামগ্রিক ভাবে কার্যকরী হয়ে থাকলেই যথেষ্ট—আজকের দিনে প্রচুর অবসর ও উন্নত উপকরণের সহায়তায় কর্মরতদের সেই পর্যন্তই প্রত্যাশা রাখা উচিত।

রাজস্ব আদায় ছিল জেলাশাসকদের প্রধানতম কর্তব্য, জনগণের সমৃদ্ধির থেকে রাজস্বের ক্ষেত্রে সাফল্যের উপরই অফিসার হিসাবে তাঁর সুনাম নির্ভর করত। তখনো পর্যন্ত পরিচালক-সভার কর্মপন্থা কিছু মাত্রায় এমন ছিল যেন বাংলা প্রচুর রাজস্ব দেবার মতো এক জায়গির মাত্র, কিন্তু শাসনের কোনো দায়-দায়িত্ব যেন নেই ; গ্রামীণ প্রশাসকদের গণ্য করা হতো ব্যক্তিগত সম্পত্তির নায়েব হিসাবে, সরকারি রাজস্ব গ্রহণ ও পুনর্বিতরণের মাধ্যম হিসাবে তাদের গণ্য করা হতো না। সুতরাং, জেলা হতে কত বেশি পাওয়া সম্ভব এবং এখানে কত কম খরচ করা সম্ভব, এই বিচার ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৮৮ সনে বীরভূম ও বিষ্ণুপুর শাসনের জন্য সর্বমোট ব্যয় ছিল ৫৪৪০ পাউণ্ড স্টার্লিং,[১৫] অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে ১৪ শিলিং ৬ পেনি। বর্তমানে জেলার আয়তন এক-তৃতীয়াংশেরও কম হয়েছে,[১৬] এবং প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪,৮৬৯ পাউণ্ড স্টার্লিং,[১৭] অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে ১০ পা. ১৩ শি. ৬ পে.। ব্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রশাসকদের কর্তব্য সম্বন্ধে পুরাতন ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়। ১৭৮৮ সনে ভূমি-রাজস্ব আদায়জনিত খরচ ছিল ৪,৫০০ পা.,[১৮] ১৮৬৭ সনে ছিল মাত্র ৩,৫৫০ পাউণ্ড। ১৭৮৮ সনে দেওয়ানি বিচারের ক্ষেত্রে খরচ ছিল ৭০৮ পাউণ্ড ;[১৯] বর্তমানে এই খরচ ৭১৬০ পাউণ্ড। ১৭৮৮ সনে অপরাধ দমন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যয় ছিল ৩১৮ পা.[২০] মাত্র ; ১৮৬৭ সনে এই খরচ ছিল ৯৯২০ পা.।[২১] কর আদায় জনিত সকল প্রকার খরচ কমেছে ; কারণ সরকারি দায়-ভারের বোঝা জনগণের উপর কম থাকার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজে সংগৃহীত হয়েছে। প্রজাদের সুরক্ষার জন্য সকল প্রকার ব্যয়ের ১০ থেকে ৩০ গুণ বৃদ্ধি ঘটেছে। ইংরেজরা আর কর সংগ্রাহক মাত্র থাকেনি, তারা বাংলার শাসকে পরিণত হয়েছে।

অজয়ের উত্তরে বীরভূমের রাজার বার্ষিক দেয় রাজস্ব ছিল ৬৫ হাজার পাউণ্ড,[২২] অর্থাৎ বনাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকাসহ, প্রতি বর্গমাইলে ১২ পাউণ্ড। যেহেতু রাজ্যের সমগ্র অর্ধাংশ জুড়েই ছিল অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চল, চাষযোগ্য প্রতি একরের সরকারি খাজনা ছিল ৯ পেনি। অজয়ের দক্ষিণে বিষ্ণুপুরের রাজার

দেয় বার্ষিক কর ছিল ৪০ হাজার পাউণ্ড,[২৩] অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ১৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং, অথবা অনাবাদী জমি অনুরূপভাবে বাদ দিলে, চাষযোগ্য একর প্রতি এক শিলিং। যতদিন রাজারা সময়মতো সরকারি পাওনা মিটিয়ে দিতেন, ততদিন সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ ব্যতীত তারা কৃষকদের অসংখ্য ছোট ছোট জমির খাজনা বিষয়ে ইচ্ছামতো দরাদরি করতে পারতেন। কিন্তু, প্রায় বৎসরই সময়মতো খাজনা দেওয়া দূরে থাক, খাজনার একটা বড় অংশ তাঁরা আদৌ দিতে পারতেন না, এবং প্রজাদের নিকট হতে পাওনা আদায়ের জন্য ও কৃষকদের সশস্ত্র বিরোধিতা দমনের জন্য জেলাশাসক ক্রমাগত সৈন্য দিয়ে রাজাদের সহায়তা করতে বাধ্য হতেন।[২৪] প্রত্যেক বৎসর খাজনা পরিবর্তিত হতো,[২৫] এবং প্রতিটি সামান্য করবৃদ্ধির অজুহাতে জমিদারবা খাজনা বৃদ্ধি করত। কৃষকদের অভিযোগ ছিল, যেহেতু চাষের কাজ বহুদূর এগিয়ে না যাওয়া অবধি কর বৃদ্ধির কথা গোপন রাখা হতো, তাই বীজ বপনের সময় কখনো তারা ফসল কাটার সময় করের পরিমাণ কি দাড়াবে জানতে পারত না। ১৭৮৮-৮৯ সনের একটি জলন্ত উদাহরণ দেখা যায়। ভূমি-রাজস্বের সামান্য বৃদ্ধির কারণে সর্বব্যাপী খাজনা বৃদ্ধি ঘটে। বীজ বপনের আগে তাদের জানানো হয়নি, এই যুক্তিতে কৃষকরা প্রতিরোধ করে ও সমগ্র জেলা নতুন করবিন্যাসের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে সামিল হয়—ফলে জেলাশাসক এই ঘটনা জানাতে বাধ্য হন।[২৬] মিঃ কিটিং-এর সিপাহিরা জেলাবাসীদের দ্রুত শান্ত করে,[২৭] এবং তৎকালীন প্রথানুসারে ফসল বাজেয়াপ্ত করণ রোধের জন্য যে অসংখ্য কৃষক জেলা সীমান্তের ঠিক বাইরে বসবাস শুরু করেছিল, সন্নিহিত অঞ্চলের জেলা শাসকদের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৭৬৯ সনের দুর্ভিক্ষের ফলে এইসব সন্নিহিত জেলাগুলিতে লোকাভাবের কারণে সেখানের জেলা শাসকরা কিন্তু কৃষকদের ঐসব অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য প্রলুব্ধ করছিল। ফলে, আইনি ব্যবস্থা হতে অব্যাহতি লাভ হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে লোভনীয় টোপ। সুতরাং মিঃ কিটিং-এর সমান কার্যকরী হতো না বা বিলম্বিত হতো। ফলে উত্তপ্ত পত্রবিনিময় ঘটে, সরকারের নিকট বিষয়টি প্রেরিত হয়; প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য কালেক্টরদের প্রধান সহকারিদের নিজ নিজ জেলার সীমান্তে প্রেরণ করা হয়।[২৮] কয়েক সপ্তাহব্যাপী একত্রে শিকারাদি করার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যেহেতু কৃষকরা ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি সম্বন্ধে অবহিত ছিল না ও সে কারণে চাষ শুরু করার সময় খাজনা বৃদ্ধির কোনো পূর্বাভাষ পায়নি, তাই চলতি বৎসরে পরবর্তী কোনো বৃদ্ধির জন্য তাদের দায়ী করা যায় না। এই সিদ্ধান্তের পর জেলা শাসকের সাথে সাক্ষাৎকার প্রীতিকর হবে না বুঝে, বীরভূমের সহকারি মিঃ আরবুথনট শিবিরেই রয়ে গেলেন এবং অন্য জেলায় নিযুক্তির পূর্ব পর্যন্ত এইখানেই বাঘ শিকার করে কাটিয়ে দিলেন। তারপর মিঃ কিটিংকে কোনো প্রকার বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে, সদর দফতরে না গিয়ে নতুন কাজে শপথ নেবার জন্য দ্রুত কলিকাতায় আসেন।[২৯]

ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদির সাহায্যে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও বিন্যাসের আলোচনা আরো যথাযথ করা যায়। যতদিন সরকারি প্রাপ্য সন্তোষজনক ভাবে মিটিয়ে দেওয়া হতো, ততদিন কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু করার ছিল না। চরম ঘাটতি ঘটলে, জেলাশাসক জমিদারকে কারারুদ্ধ করে তাঁর ভূমি রাজস্ব অধিগ্রহণ করতেন। বাংলা দেশে দীর্ঘদিন এই প্রকার চরম ঘাটতি স্বাভাবিক ছিল, এবং একেবারে নির্বোধ ও নাবালক না হলে কোনো জমিদারের পক্ষে জেলের বাইরে থাকা মুশকিল ছিল। বীরভূমের আদি আমলের সরকারি রেকর্ডে বিষ্ণুপুরের রাজার কারাবাসের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি;[৩০] সাবালক হবার কয়েক মাসের মধ্যেই বীরভূমের তরুণ রাজাও এই দুর্ভাগ্যের শিকার হন।[৩১]

ভূমি রাজস্ব ছাড়াও জেলা শাসকের হাতে ছিল রাজস্বের আরো দুইটি উৎস, —যথা, অন্তঃশুল্ক ও মন্দির-কর।[৩২] ১৭৯০ সনে জেলা-সমাহর্তাদের মাদকদ্রব্যের উপর শুল্কের দায়িত্ব নিতে এবং নিজ নিজ জেলায় মদ্যপানের পরিমাণ সম্বন্ধে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩৩] এই বৎসর পযন্ত এই কর কখনো জমিদার কর্তৃক তাঁর নিজস্ব হিসাবপত্রে, কখনো সমাহর্তা কর্তৃক ও কখনো বা উভয় কর্তৃক ধায হয়েছিল।[৩৪] এই কর আরোপ করাই সুকঠিন ছিল। একটি মাটির হাঁড়ি আর একটি বাঁশের নল—এই দিয়েই দেশি চুল্লি তৈরি হতো, এর সর্বমোট মূল্য এক ফার্দিং, সন্ধ্যার পর জঙ্গলে এই চুল্লি বসানো হতো, সারা রাত কাজ চলার পর সূর্যোদয়ের আগেই সব ভেঙ্গে ফেলা হতো। ১৭৮৭ সনে মিঃ শেরবার্ণ সরকারের পক্ষ হতে প্রতিটি মদের দোকানের জন্য জেলা সদরে এক পাউণ্ড ও গ্রামে গঞ্জে ৮ শিলিং কর ধায করেন—বিক্রেতাদের যত খুশি মদ প্রস্তুত ও বিক্রয় করবার স্বাধীনতা ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁর রাজ্যে দোকান প্রতি দুই থেকে ৪ শিলিং কর ধার্য করেন এবং রমজানের মাসে দোকানে মদ বিক্রির অনুমতি দেওয়ার মূল্য হিসাবে বীরভূমের রাজা প্রভূত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করেন।[৩৫] কোনো মদ্য বিক্রেতা এই আদায়কে প্রতিরোধ করলে এবং অনুমতি ব্যতিরেকে মদ বিক্রয় করলে, তাকে কাজীর সামনে হাজির করানো হতো, আর বেত্রাঘাত করা হতো, অথবা মোটা জরিমানা দিতে বাধ্য করা হতো।

বহু দ্রব্যের উপর কর ধার্য করা সত্ত্বেও অন্তঃশুল্ক হতে প্রাপ্ত রাজস্বের স্বল্প পরিমাণ প্রশাসনিক শৈথিল্য ও অযোগ্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। ১৭৮৯ সনে জেলার আয়তন বর্তমান আয়তনের তিনগুণ হওয়া সত্ত্বেও, মাদক দ্রব্য হতে প্রাপ্ত কর ছিল মাত্র ৩৩০ পাউণ্ড[৩৬]; ১৮৬১-সনে এই পরিমাণ ছিল ৫২৯৪ পাউণ্ড, অর্থাৎ পূর্বের পরিমাণের প্রায় বিশ গুণ।[৩৭] মদ্যপানের বৃদ্ধির চেয়েও সতর্ক প্রহরায় আরো কঠোরতার কারণে এই বৃদ্ধি ঘটে। জেলার প্রত্যক্ষ শাসনভার আমরা গ্রহণ করার সময় নিম্ন শ্রেণীর মাঝে মাতলামি সর্বব্যাপী ছিল। মদ অত্যন্ত সুলভ হবার

ফলে এই উত্তেজকটির প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক ছিল – বীরভূমের মতো আধা-অনার্য জনসাধারণের মধ্যে এই আসক্তি সর্বদা যথেষ্ট প্রবল ছিল। বস্তুত, মাতলামি বাঙালি চরিত্রের এত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, প্রাচীন রচনায়ও তৎকালীন ভ্রাম্যমাণ পথিকদের পত্রাদি ও দিন-বিবরণীতে এর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।[৩৮] বীরভূমের আদি পর্যায়ের এক জেলা শাসক উল্লেখ করেছেন যে, এই রোগই জেলার প্রায় প্রায় সমস্ত গুরুতর অপরাধের উদ্ভবের কারণ। নিম্নতম মানের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর মাদক দ্রব্যটি সাধারণত ব্যবহৃত হতো-অর্ধভুক্ত পাহাড়িয়া বা অরণ্য বাসীদের উন্মত্ত করার জন্য ও দুঃসাহসিকতম কাজে তাদের প্ররোচিত করার জন্য আধ পেনি মূল্যের ৬ পাঁইট মদই যথেষ্ট ছিল। শুল্ক আরোপে কঠোরতার ফলে বীরভূমের মদের দাম ছয়গুণ বাড়ে ও ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে জেলায় অপরিচিত হালকা ধরনের মদের সাধারণ ব্যবহার শুরু হয়। মদ্য বর্জন জনগণের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে ও আধা-অনার্য জাতিগুলির মধ্যে ছাড়া অন্যত্র মাতলামি সচরাচর দেখা যায় না। নিম্নলিখিত সারনিতে বীরভূমে ১৭৯০ ও ১৮৬৬ সনের বিভিন্ন উত্তেজক পানীয়ের খুচরা মূল্য দেখানো হয়েছে –

স্থানীয় নাম	বিবরণ	১৭৯০ সনের মূল্য	১৮৬৬ সনের মূল্য
মহুয়া মদ	শুকনো ফল থেকে প্রস্তুত মদ	ব্যবহার ছিল না	৬ পেনি পাঁইট
তাড়ি	খেজুর গাছ নিঃসৃত রসজাত মৃদু গাঁজান মদ	,,	½ পেনি পাঁইট
পাকি, ১নং	ভাত থেকে চোলাই মদ	১½ পে. পাঁইট	৫ পেনি পাঁইট
পাকি, ২নং	ঐ	¾ পে. পাঁইট	৪ পেনি পাঁইট
পচুই	ভাত গাঁজান মদ	½ পে. গ্যালন	৩ পেনি পাঁইট

মিঃ কিটিং-এর মতে,[৩৯] শেষোক্ত দ্রব্যটি সবচেয়ে ক্ষতিকারক। তিনি লিখেছেন, "নিত্যকার অসংখ্য ডাকাতি ও অন্যান্য দুষ্কর্মের কারণ হিসাবে আমি এর সুলভ মূল্যকে দায়ী করি ; ফৌজদারি রেকর্ড হতে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে দুষ্কৃতকারীরা এই মদ পান করে ও ভাঙ নামে এক প্রকার লতাপাতা দিয়ে ধূমপান করে সকল প্রকার দুষ্কর্মের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে।" ভারতে এবং অন্যত্রও আরো কাপুরুষ ধরনের সিঁধেল চোররা এখনো কৃত্রিম সাহসের জন্য ঔষধ ব্যবহার করে ; কিন্তু অপরাধের উর্বর উৎস হিসাবে মাতলামি বর্তমান বাংলা দেশে অজ্ঞাত। বীরভূমে তিন বৎসর (১৮৬৩-৬৬) বাসকালে বিচার বিভাগীয় কাজকর্মে আমার সামনে একটিমাত্র ঘটনা আসে, যেটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাতলামির

সাথে যুক্ত করা যায় ; এবং আমার বিশ্বাস, জনগণের সংযমের পক্ষে গ্রাম বাংলায় সকল শাসন বিভাগীয় অফিসাররা সাক্ষ্য দেবেন। অন্য সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মতোই এখানের কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকরাও সারাদিনের পরিশ্রমের পর মদ্য পানে আনন্দ পায় ; কিন্তু, তাদের উত্তেজনা প্রকাশের হিংস্রতম রূপ শুধু বাড়ি ফেরার পথে প্রত্যেককে সাড়ম্বরে প্রণাম নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। হিন্দুয়ানি বন্ধন ছিন্নকারী অল্প সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির গোপনে বিলাতি মদ-পানের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু এই ব্যাপারগুলি আদালতের সামনে আসে না ; এবং ইয়োরোপীয় কোনো দেশ সম্বন্ধে বলা না গেলেও এই কথা আমি হলফ করে বলছি যে, অপরাধ প্রবণতার এক নিয়মিত কারণ হিসাবে বাংলা দেশে মাত-লামির অস্তিত্ব নাই। মাছের ভেড়ি, সীমানা, জলসেচ ও ধর্মীয় মিছিলের অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের ফলে অসংখ্য অবশ্যম্ভাবী হাঙ্গামা ঘটে ; কিন্তু, জেলায় নয়-দশমাংশ অপরাধের ক্ষেত্রে মারামারি ও অনুরূপ ছোটখাট হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও, মদে আসক্তির কারণে শান্তিভঙ্গ হয়েছে বলে কখনো মনে হয় না। সুসংগঠিত শুল্ক ব্যবস্থার কারণেই বহুলাংশে এটা সম্ভব হয়েছে। দোকান প্রতি ৮ শিলিং শুল্ক আরোপের ভীরু, ঢিলেঢালা ব্যবস্থা এবং বিক্রেতার মর্জিমতো মদ তৈরির স্বাধীনতার পরিবর্তে, সরকার বর্তমানে প্রতিটি চোলাই-এর দোকান হতে প্রভূত কর আদায় করেন—উত্তেজক পানীয়ের প্রস্তুতিকরণ ও বিক্রয়ের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য আলাদা অনুমতি আবশ্যিক ও প্রতিটির জন্য একটি কর দিতে হয়। কখনো কখনো নিম্নতন অত্যুৎসাহী অফিসাররা জনগণের প্রকৃতিস্থ থাকার মূল্যে রাজস্ব বৃদ্ধির অভিযোগে অভিযুক্ত হন ; কিন্তু সামগ্রিক ভাবে, মদের চোরাচালান রোধের সাথে সংগতিপূর্ণ ভাবে মদের মূল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে বজায় রাখার প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করেছে। অন্তত বীরভূমে শুল্ক ব্যবস্থার আইনি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, যথা—রাজস্ব বিভাগীয় অফিসারদের প্রতি বাংলা সরকারের নির্দেশের সূচনা হয়েছে যে কথাগুলি দিয়ে—"উত্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিরুৎসাহ করার সাথে সাথে এইগুলির উপর সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব ধার্য করা।"[৪০]

অন্য যে একমাত্র রাজস্বের উৎস আদি ইংরেজ প্রশাসকরা আবিষ্কার করেন ও বীরভূমে প্রয়োগ করেন, সেটি ভূমি-রাজস্বের তুলনায় সামান্য হলেও রেকর্ড-পত্রে বহু পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে। এবং এটি তৎকালীন যুগবৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। পশ্চিমের পাহাড়-গুলির নির্জনতার মধ্যে, জেলার একেবারে সীমান্তে রয়েছে এক পবিত্র নগরী,[৪১] এখানে মহাদেবের এক প্রাচীন মন্দিরে প্রতি বৎসর বহু তীর্থযাত্রী সমাগম হয়। মুসলমান রাজবংশ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কাফেরদের মূল্যে রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে ; উড়িষ্যার মহান দেবমূর্তিকে ব্যবহার করে পুণ্যাত্মা মুরশেদের বার্ষিক ১ লক্ষ পাউণ্ড প্রাদেশিক রাজস্ব বৃদ্ধির মুসলিম ঐতিহাসিকরা প্রশংসা

করেছেন।[৪২] বীরভূমের রাজা প্রধান পুরোহিতকে এই নগরীটি ইজারা দেন, তিনি নির্দিষ্ট এক খাজনা দিতেন ও বিনিময়ে ভক্তদের নিকট হতে যা পারতেন আদায় করতেন। আদি ইংরেজ সমাহর্তারা ভেবেছিলেন তাঁদের ব্যবস্থাপনায় মন্দিরের আয়বৃদ্ধি ঘটবে। ১৭৮৮ সনে প্রধান সহকারি মিঃ হেসিলরিগ পবিত্র নগরীর দায়িত্ব গ্রহণের পর, এই পরিবর্ত সাধনের জন্য সরকারি খরচে পুরোহিত, বাঁদর ধরার দল, রক্ষীদের নিয়ে বহু দফতর খোলা হয়।[৪৩] কিন্তু সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের সাথে সাথে, হয় ভক্তদের উদারহস্তে দান অদ্ভূত ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, অথবা পুরোহিতরা প্রণামী তছরূপ করতে থাকে। আদায় কমে যায়; নিযুক্ত অফিসারদের ওপর নজর রাখার জন্য অতিরিক্ত অফিসার নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু "মন্দিরের প্রতিটি রাস্তায় পাণ্ডাদের নিযুক্ত করে তীর্থযাত্রীদের মন্দিরে দর্শনের আগেই প্রণামী দিতে প্ররোচিত করে", প্রধান পুরোহিত তার সতর্ক প্রহরা বানচাল করেছেন বলে সমাহর্তা তখনো অভিযোগ করতে থাকেন। অবশেষে বিষয়টি মিঃ কিটিং-এর অর্থ-সচেতন মানসিকতার পক্ষে এত বেশি অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে যে, তিনি ভক্তদের উদারহস্তে প্রণামী দিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে ও পুরোহিতদের তছরূপ রোধ করার উদ্দেশ্যে, নিজে মন্দির পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সেইমতো, ১৭৯১ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে রক্ষী হিসাবে ৩৫ জন সৈন্য সহ জেলাশাসক মহোদয় যাত্রা করেন, এবং রাজকীয় গতিতে যাত্রার অভ্যস্ত থাকার ফলে প্রায় এক সপ্তাহ পরে পবিত্র নগরীতে উপনীত হত।[৪৫] তিনি লেখেন, "মন্দিরের যত সন্নিকটে সম্ভব তীর্থযাত্রীদের মধ্যে তাঁবু খাটালাম, প্রতিদিন আমি দর্শনে যেতাম এবং ঐ হট্টগোলের মধ্যে যতখানি সম্ভব প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম।"[৪৬] "নির্ধারিত সময়ে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হলে তুমুল কলরবে নৃত্যগীত সহকারে, উৎসাহের আতিশয্যের উন্মাদনায় আভূমি দণ্ডবৎরত ভক্তবৃন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ে। চতুর্দিকে হট্টগোল ও বিশৃংখলা। মূল্যবান ধাতু ও রত্নাদির প্রণামী, সবচেয়ে মূল্যবান উপহারের অংশ, তারপর বৈদ্যনাথদেবের সম্মুখে [দেবমূর্তির সামনে] নিক্ষেপ করা হয়, এবং ধরা পড়ার কোনোরূপ ভয় ছাড়াই সংগ্রাহক ব্রাহ্মণদের পক্ষে খুশীমতো যা কিছু সরিয়ে ফেলার সুযোগ থাকে।" দেবতার মাথায় পবিত্র গঙ্গাজল ঢালা এখানে অনুষ্ঠানের অঙ্গ। তীর্থযাত্রীদের উদ্দীপনা ছিল অপর্যাপ্ত, "কিন্তু তাদের সম্পদের কোনো চিহ্ন ছিল না। পাঁচটির বেশি পরিবারের যাতায়াতের বা বসবাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বাঁশের মাথায় একটিমাত্র কম্বল খাটিয়ে আবহাওয়া থেকে বাঁচার উপায় করে শতখানেক পরিবার; এবং বাদবাকিরা', মরশুম অনুযায়ী ১৫ থেকে ৫০ হাজারের মতো, 'সন্নিহিত বৃক্ষতলেই কোনোরূপ সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই আশ্রয় নেয়। সর্বব্যাপী দারিদ্র্য হতে মনে হয় যে, ভক্তদের প্রণামী হতে মন্দিরের লাভ বিশেষ হতে পারে না এবং জীবন ধারণের

জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপকরণ হতে বঞ্চিত হতভাগ্যদের থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করা যায় না।'[৪৮] অবশ্য ছিন্নমূল এই জনতার নিকট হতেই বর্ধিত কর আদায় করা হতো। সে কারণে মিঃ কিটিং ১৫ জন অফিসার সহ ১২০ জন সশস্ত্র পুলিশকে নিযুক্ত করেন।[৪৯] এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, পরিবর্তে তীর্থযাত্রীদের কোনো প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো। বিভিন্ন পাহাড়গুলি ঘিরে সর্পিল পথ, মাইলের পর মাইল অরণ্যের মাঝে পাহাড় পথের মাঝে মাঝে গভীর গিরিখাত, অসংখ্য গুহা—সেখানে ডাকাত আর বন্য জন্তুর রাজত্ব। যতক্ষণ পযন্ত ডাকাতরা সম্পূর্ণ রূপে পথ অবরুদ্ধ করত, ততক্ষণ সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা লুণ্ঠন অব্যাহত রাখতে পারত। কিন্তু অবশেষে তীর্থযাত্রীদের দুর্দশা এত তীব্র হলো যে, মন্দিরের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল এবং পবিত্র নগরীতে দেবতার প্রণামী দেবার কিছুই থাকত না। তখন এইটি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় হয়ে উঠলো, এবং মিঃ কিটিং তৎপর হলেন। তিনি দস্যু-দলের বিরুদ্ধে একদল দেশীয় সৈন্য পাঠাবার নির্দেশ দিলেন; দস্যুদল, 'তিনশত লোক নিয়ে গঠিত বলে কথিত', একদল তীর্থযাত্রীর উপর হামলা করে পাঁচজনকে হত্যা করে 'এবং রাস্তা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেয়।'[৫০] ভৌগোলিক কারণে এখানে পুলিশি তৎপরতা নেওয়া কঠিন ছিল এবং সেনাধ্যক্ষ 'দেশীয় সৈন্যদল হতে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব সৈন্য জঙ্গলকে দস্যুমুক্ত করার জন্য' প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। হতভাগ্য ভক্তটি পথে দস্যুদল ও বন্যজন্তুর কবল হতে রক্ষা পেলেও মন্দিরে জেলা-শাসকের অতিলোভী অনুচরদের শিকার হতো এবং শেষ কপর্দকটি হতো বঞ্চিত করার পর ও বহু শীতের উদ্বিগ্ন রাত্রি যাপন করার পর প্রায়ই তীর্থযাত্রায় ফল-লাভে ব্যর্থ হতো। মন্দিরে ছিল একটি মাত্র প্রবেশপথ,—দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট, প্রস্থে ৪ ফুট একটিমাত্র অপ্রশস্ত দ্বার এবং তীর্থযাত্রীদের মহা উদ্দেশ্য ছিল পবিত্ররাত্রে দেবদর্শন,[৫১] যা থেকে বঞ্চিত হলে তাদের সকল শ্রম ব্যর্থ। হাজার হাজার ভক্ত নিরাশ হয়ে ফিরে যেত';—জেলাশাসক এই কথা যোগ করেছেন; কিন্তু যাবার আগে তাদের প্রণামী দিয়ে যেতে বাধ্য করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হতো। [পবিত্র রাত্রির] দুইদিন পর একটিমাত্র তীর্থযাত্রীকেও দেখা যেত না।'[৫২]

কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি বীরভূমের মুসলমান রাজারা গ্রহণ করার পযায়ে প্রতিবছর পবিত্র নগরীতে ৪০ হাজার হতে এক লক্ষ তীর্থযাত্রী যেত। তখন পরিমিত মাত্রার এক মন্দির-কর নির্দিষ্ট ছিল এবং মন্দিরের রহস্য নিয়ে মিঃ কিটিং-এর পক্ষ হতে কোনো প্রকার অশোভন হস্তক্ষেপ ছিল না। ১৭৮৯ সনে, মিঃ কিটিং-এর চাকুরির প্রথম বৎসরে, ৫০ হাজার তীর্থযাত্রী থেকে মাত্র ৪০০ পাউণ্ড পাওয়া যায়।[৫৩] ১৭৯০ সনে, মিঃ কিটিং-এর উন্নততর ব্যবস্থা ৯০০ পাউণ্ড আনে;[৫৪] এছাড়া পাওয়া যায় ৩টি টাট্টু ঘোড়ার দাম, যেগুলি ভক্তদের গছিয়ে দিতে মিঃ কিটিং সমর্থ হন। শেষোক্ত এই লেনদেনটি আমাদের প্রশাসন

ব্যবস্থার, প্রশংসনীয় না হোক, হাস্যকর রূপটিকে প্রকাশ করে। একটি পত্রে মিঃ কিটিং এই ঘোড়াগুলিকে খর্বদেহী, জীর্ণ, অতিবৃদ্ধ, জেলাসদরে নিয়ে যাবার অযোগ্য, এবং এদের সর্বোত্তমটির মূল্য ১ পাউণ্ড থেকে ৩০ শিলিং হতে পারে বলে বর্ণনা করেছিলেন। আরেকটি পত্রে তিনি কলিকাতাস্থ সরকারকে বিজয়গর্বে জানিয়েছেন যে, কিভাবে এইগুলিকে তিনি ১৪ পাউণ্ডে বিক্রয় করেছেন।[৫৫] অবশ্য, এই আর্থিক উদ্দীপনা শীঘ্রই হতাশায় পরিণত হয়। ১৭৯১ সনে জেলা-শাসক মন্দির-করের আরো বৃদ্ধি ও প্রণামীর ব্যক্তিগত তদারকি করতে মনস্থ করেন। সেই বৎসর মাত্র ১৫ হাজার তীর্থযাত্রী আসে। কিন্তু, যে বৎসর তিনি স্বয়ং মন্দিরে যান, সেই বৎসর মন্দির-কর হ্রাস পেয়েছে, সে কথা জানাবার মতো লোক মিঃ কিটিং ছিলেন না। সেই কারণে, সোনা-রূপা মিলিয়ে ৪৬০ পাউণ্ড[৫৬] আদায় করা হয়, এছাড়া প্রণামীর কাপড়, পাগড়ি ও চাউল নেওয়া হয়।[৫৭] সব মিলিয়ে সম্ভবত সর্বমোট ১২০০ পাউণ্ড হবে, এবং জেলা-শাসকের মতে, তীর্থযাত্রীদের কাজ থেকে গৃহীত সামগ্রীর অর্ধাংশও তাঁর হাতে আসেনি। সর্বমোট প্রকৃত আদায় ১৫০০ পাউণ্ড হয়েছিল ধরে নেওয়া হলে, মাথা-পিছু করেব পরিমাণ ছিল এক টাকা, অর্থাৎ একজন লোকের একমাসের জীবন ধাবণের খরচেরও অধিক, এটা আদায় করা হয় দারিদ্র্য নিপীড়িত ১৫ হাজার হতভাগ্যদের নিকট হতে, যাদের মাত্র ১০৭ জনের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল।[৫৮]

১৮০৪ সনে জন শোর ব্রিটিশ ও বিদেশি বাইবেল সমিতির সভাপতি হিসাবে যে মতামত ব্যক্ত করতেন, ১৭৮৯ সনে রাজস্ব পর্ষদের প্রধান হিসাবে অবিকল সেই মতামত প্রকাশ না করলেও, জেলাশাসক ও পুরোহিতদের মধ্যে অবিরাম এই এই অশোভন বিবাদকে তিনি ঘৃণা করতেন। প্রথা অনুমোদানের জন্য এই সকল ব্যাপারে সরকারের পক্ষে যত কম সম্ভব ভূমিকা গ্রহণ করার এক ব্যবস্থা তাঁর কাম্য ছিল। মিঃ কিটিং বোঝেন যে, উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাঁর এই উৎসাহে অংশীদার নন; কিন্তু যে কোনো স্থান হতে রাজস্ব আদায়ের কোনো নৈতিকতা বিচারে সামগ্রিক-ভাবে অক্ষমতার কারণে তিনি প্রধান পুরোহিতের সাথে মন্দির-শুল্ক বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব দেন এবং হাস্যকর সরলতায় যোগ করেন, 'সরকারি হস্তক্ষেপ না ঘটলে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কি বৃদ্ধি পেতে পারে না?'[৫৯] তিনি আরো যে কারণে এই পরিকল্পনা সুপারিশ করেন, সেটির ভিত্তি ছিল এই যে 'ধর্মীয় কৌশলাদি প্রযুক্ত হবে ও মন্দিরের খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে।'[৬০] কর্ণওয়ালিশ সাহেব শোরের চিন্তা-ভাবনার অংশীদার ছিলেন এবং তাঁদের পারস্পরিক বিচ্ছেদের পূর্ববর্তী মত-পার্থক্যের কারণে আরো কঠোরভাবে তাঁর মতামত কার্যকরী করতে প্রয়াসী হন। সুতরাং, প্রধান পুরোহিতকে মন্দির ইজারা দেবার জন্য গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন[৬১] মিঃ কিটিং দ্রুত লাভ করেন এবং ১৭৭২ সনের সূচনার পূর্বেই জন-গণের কুসংস্কারকে ভিত্তি করে আমাদের এই বাণিজ্যের অতঃপর দেবোদ্দেশ্যে

নিবেদিত প্রণামীর প্রত্যক্ষ লুণ্ঠনের রূপ থাকলো' না। বিশাল চারণ ভূমি সহ ৩২টি গ্রামীণ জনপদ পুরোহিতদের দখলে রইল এবং মন্দির-শুল্ককে মন্দির সংলগ্ন জমির জন্য নামমাত্র খাজনায় রূপান্তরিত করা হলো—প্রকৃতপক্ষে, এইটি খোদ মন্দিরটুকুর জন্যই খাজনামাত্র।[৬২]

কীটদষ্ট এই সকল পাণ্ডুলিপি বিস্মৃত এক জগতকে পুনর্জীবিত করে। পথিমধ্যস্থ দস্যুতার ত্রাসজন্মী ধর্মীয় আকুলতা, পাহাড়ি-অঞ্চলের নিদারণ শীতকালীন দীর্ঘ রজনীতে সামান্য আচ্ছাদনহীন অবস্থান, সরকারি অত্যাচার ও অপবিত্র হস্তক্ষেপ—বর্তমান বীরভূমবাসীদের এই সকলই অজানা। তীর্থস্থান আজও বিদ্যমান, কিন্তু মানুষ আজ সেই সকল স্থানে যায় গঞ্জ বা মেলা ভ্রমণের মেজাজ নিয়ে, দেবতার প্রিয় আবাসভূমি দর্শনের জন্য নয়। শিক্ষা প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করেছে, এবং উদীয়মান প্রজন্মের কট্টরতমরাও প্রকাশ্যে অবিশ্বাস ঘোষণা হতে বিরত থাকে মাত্র। এটা সম্ভব যে খ্রীস্টধর্ম ও প্রতিটি প্রাচীন ধর্মের মাঝে রয়েছে যে বিস্তীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবিশ্বাসের উপত্যকা, হিন্দুরা সেখানে সদ্য প্রবেশমান। যে আলোকবর্তিকার সহায়তায় তাদের পূর্বপুরুষেরা বহু যুগ ধরে অগ্রসর হয়েছে, আজ সে দীপ নির্বাপিত এবং আগামী দিনের আরো পূর্ণতাদীপ্ত আলোকঝর্ণা এখনো উদিত হয়নি।

সরকারি রাজস্বের এইসকল উৎস ছাড়াও, প্রচলিত প্রথা অনুমোদিত আরো ২৬টি শুল্ক জমিদারেরা নিজেরা ধায করে।[৬৩] সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলাগুলিতে লবণ শুল্কের জন্য স্বতন্ত্র দফতর ছিল এবং ব্যবহারের জন্য বাজারে যাবার আগেই কর আদায় করা হতো। বস্তুতপক্ষে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে স্থানীয় নথিপত্রে এর একমাত্র উল্লেখে বলা হয়েছে যে, ঐ দফতরের এক দেশীয় অফিসার, এই জেলার মধ্যে যাত্রাকালে, পথপার্শ্বের সকল লবণ বিক্রেতার নিকট হতে বদান্যতা আদায় করেন।

জেলা-শাসকের কর্তব্যগুলির মধ্যে গুরুত্ব বিচারে, যথাসময়ে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের পরেই আসে জেলায় কোম্পানির ব্যবসায়িক অর্থ দফতরের প্রধানরূপে দায়িত্বটি। মিঃ কিটিং ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, এবং কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতেন, তা ছিল মিঃ কিটিং-এর খাজাঞ্চিখানা। জেলার নিট রাজস্ব ১ লক্ষ পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর অধিক ছিল,[৬৪] এবং সরকারি ব্যয় ৫ হাজার পাউণ্ড হওয়া দুষ্কর ছিল। বাকি ৯৫ হাজার পাউণ্ডের অংশবিশেষ কলিকাতা বা অন্যান্য খাজাঞ্চিখানায় পাঠানো হতো এবং অংশবিশেষ জেলায় কোম্পানির কারবার চালাবার জন্য রাখা হতো। বর্তমানের মতো সেই সময়েও প্রাদেশিক খাজাঞ্চিখানায় যথাসম্ভব কম টাকা রাখা সরকারের লক্ষ্য ছিল—বর্তমানের পূর্ণাঙ্গতর ব্যবস্থায় এই লক্ষ্য দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতির অঙ্গ মাত্র। কিন্তু আলোচ্য পর্যায়ে ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা যে কোনো সময়ে জেলা-

শাসকের দায়বদ্ধতায় কর্তৃপক্ষ সম্ভব হলে হুণ্ডি কাটবার আগে যথাসময়ে পূর্বাহ্নে জানাতেন; তবুও, যতবেশি সম্ভব টাকা জেলা হতে প্রেরণের তাগিদ সত্ত্বেও খেয়াল রাখতে হতো যেন জেলায় কোম্পানির হুণ্ডির মর্যাদা রক্ষার মতো যথেষ্ট টাকা জেলাতে থাকে—এই বিষয়ে জেলাশাসকদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন হতো। খাজাঞ্চিখানায় গড়ে ৭ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং জমা রাখতে হতো। এই পরিমাণ ১০ হাজার হলে কলিকাতায় প্রেরণের রীতি ছিল। মনে হয়, মিঃ কিটিং বাণিজ্যিক কোষাধ্যক্ষ হিসাবে রাজস্ব-প্রশাসকের মতো সফল হতে পারেন নি। প্রতি মাসের শেষে মহাগাণনিক মহোদয়ের নিকট হতে নিয়মিত ভর্ৎসনা অহেতুক ছিল না, কারণ যখন মারাঠাযুদ্ধের জন্য কলিকাতার তোষাখানা শূন্য ও ফলে কোম্পানিকে অতি উচ্চহার সুদে ঋণ করতে হচ্ছে. মিঃ কিটিং তখন গম্ভীরভাবে ১৯ হাজার পাউণ্ড নিজের খাজাঞ্চিখানায় অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছেন।[৬৫] জেলার সরকারি ব্যাঙ্কের পরিচালন পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ: আগামী ছয় মাসে জেলা ব্যাঙ্ক হতে যে টাকা নেওয়া হবে, বাণিজ্য পর্ষদ তা জানিয়ে দিত এবং উদ্বৃত্ত খাজাঞ্চিখানায় পাঠাতে হবে, তা রাজস্ব-পর্ষদ জানিয়ে দিত। প্রতি মাসের শেষ তারিখে জেলা সমাহর্তা এক হিসাব দাখিল করতেন, এতে আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি কিভাবে কোথায় পাঠাবেন, তা বলা থাকত। সুতরাং প্রেরিতব্য টাকার পরিমাণ ও প্রেরণের দিন বর্তমানের মতো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো না, বিষয়টি জেলা সমাহর্তার ইচ্ছাধীন ছিল।

এই ইচ্ছা প্রয়োগের ব্যাপারে মিঃ কিটিং সর্বদা বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি। একটি ক্ষেত্রে তিনি ৮ হাজার পাউণ্ডের এক বাণিজ্যিক হুণ্ডি ফেরত দিতে বাধ্য হন—এর একমাত্র কারণ হলো প্রয়োজনীয় যথেষ্ট টাকা তিনি রাখেন নি।[৬৬] আরেকটি ক্ষেত্রে, খাজাঞ্চিখানা কর্তৃক পাওনা মেটানো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার ফলে সমগ্র জেলায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯০ সনের শেষে, টিপুর সাথে যুদ্ধের ফলে কোম্পানির তোষাখানা শূণ্য হয়ে পড়ে ও দক্ষিণ ভারতে শস্যহানির ফলে সমগ্র ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব বাংলার জেলাগুলিকে বহন করতে হয়।[৬৭] প্রতিটি টাকা কলিকাতায় পাঠাবার জন্য সমাহর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়; প্রায় টিউডর বদান্যতার অনুকরণে, নবাবের থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়;[৬৮] এবং নভেম্বরের ১৫ তারিখে মহাগাণনিক সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। দশ দিন পর টাকা পাঠাবার জন্য আরো জরুরি তাগিদ আসে, সমগ্র শীতকাল ব্যাপী প্রায়শই এর পুনরাবৃত্তি ঘটে ও সমগ্র বাংলায় প্রাদেশিক সরকারি ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকে।[৬৯] এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট দুর্দশা বোঝার জন্য গ্রামীণ বাংলার অর্থনীতির সাথে পরিচিতি আবশ্যক। যেহেতু কোম্পানি ছিল এক বড় উৎপাদনকারী, তাই এই সমস্ত পদক্ষেপের আশু ফল হয় মধ্যশীতে হাজার হাজার পরি-

বারের কর্মচ্যুতি। উপরন্তু, প্রদেশের আকস্মিক মুদ্রাহ্রাসের ফলে কৃষকদের খাজনা দেবার বা কারিগরদের পাওনা নেবার জন্য কোনো মুদ্রা রইল না। ক্ষুধার্ত জনতা খাজাঞ্চিখানা অবরোধ করে, এবং সরকারের এই একটিমাত্র আদেশের ফলে পরপর কয়েক বৎসরের অজন্মার চেয়েও বেশি দুর্ভোগ ঘটে—জনগণের অলিখিত দুর্দশার যে বিশাল পাহাড়ের উপর আমাদের ভারতবিজয় গর্ব দণ্ডায়মান, তাতে এই প্রদেশটির অবদান কিছুমাত্র কম নয়। শীতকালীন এই মাসগুলিতে তাঁতিদের অনশন ও কোম্পানির অন্তিম দিন ঘনিয়ে আসার সাধারণ বিশ্বাস দীর্ঘদিন বীরভূমের স্মৃতিতে থেকেছে।[৭০]

খাজাঞ্চিখানার অর্থাদি স্থানান্তরকরণের সময় প্রহরার বিষয়টি গভীর মনোযোগ দাবি করে। দেশে নিরাপত্তার অভাব এত প্রকট ছিল যে, বিরাট দল বা সশস্ত্র সুরক্ষা ব্যতীত কেউ যাতায়াত করত না। মান্যগণ্যদের সাথে থাকত তাঁদের অনুচরবৃন্দ এবং পর্যাপ্ত শক্তি না নিয়ে যেসব দেশীয় ধনবানরা জেলার মধ্য দিয়ে যাবার চেষ্টা করত তাদের নিরাপত্তার জন্য বহুবার জেলাশাসককে সেনাদলের জন্য সেনাধ্যক্ষকে অনুরোধ করতে হয়।[৭১] বস্তুত, যাত্রাকালীন আড়ম্বরের জন্য সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন করা সামাজিক মর্যাদাকামীদের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আজকের মতো তখনো বেসামরিক প্রতিটি জীবনই মূল্যবান বিবেচিত হতো। দস্যু অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারি সমাহর্তা ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরা যে তাঁবু ফেলে বাস করতেন, সেটা কোনো ব্যক্তিগত ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারই ছিল না; কিন্তু, জেলা প্রধান হিসাবে কিছু আড়ম্বর প্রয়োজন বিবেচনা করায় জেলাশাসক একদল সিপাহি ছাড়া কখনো সিউড়ি ত্যাগ করতেন না। মিঃ কিটিং বীরভূমে আসার কয়েক সপ্তাহ আগে এক সরকারি কোষরক্ষী 'বাহিনী'র নিকট হতে ৩ হাজার পাউণ্ড লুণ্ঠিত হয়; এবং নতুন জেলাশাসক স্থির করেন তাঁর আমলে অনুরূপ দুর্ভাগ্য ঘটতে দেওয়া যাবে না। এই সংক্রান্ত তাঁর বহু পদক্ষেপ আমাদের সমসাময়িক অফিসারদের অযৌক্তিক মনে হবে। একবার, মাত্র ২০০ পাউণ্ড মুর্শিদাবাদে পাঠাবার জন্য বর্ষাকালে তিনি সৈন্যদল চেয়েছিলেন।[৭২] রক্ষীদলে অন্তত একজন অফিসার ও ৫ জন সৈন্য থাকত—এর চেয়ে ছোট দল জঙ্গলে পাঠানো সমীচীন ছিল না; বৎসরের সেই ঋতুতে যাতায়াতে ১৫ দিন সময় লাগে। সিপাহিদের জনপ্রতি মাসিক বেতন ছিল ১০ শিলিং ও অফিসারের ক্ষেত্রে এক পাউণ্ড; সুতরাং রক্ষীদলের যাতায়াতে, আজ যা কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, সেইসময়ে প্রেরিত অর্থের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ ব্যয়িত হতো। অপর এক ক্ষেত্রে, রক্ষী দিতে সেনাধ্যক্ষের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, একই স্থানে কয়েকদিন অন্তর টাকা পাঠাবার জন্য জেলাশাসক দুইবার আলাদাভাবে বিশাল সংখ্যক সৈন্য চেয়ে বসেন, আর এই সকল বিরক্তিকর দাবি মেটানোর জন্য প্রায়শই খাজাঞ্চিখানায় প্রহরী সংখ্যা কমাতে হতো। প্রতি যাত্রায় গড়ে

রক্ষীসংখ্যা ছিল ৬০ জন সেনা ও ৯ জন অফিসার, এতে মাসিক খরচ দাঁড়ায় ৫২ পাউণ্ড,[৭৩] অর্থাৎ বার্ষিক ৬২৪ পাউণ্ড—এটি বৎসরে ৪০ হাজার পাউণ্ডেরও কম অর্থ পাঠাবার খরচ। ১৮৬৪ সনে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড পাঠানোর জন্য রক্ষীদের খরচ মাত্র ২০ পাউণ্ড।[৭৪] প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৪ সনে ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার পাউণ্ড প্রেরণের মোট খরচ ১৭৭৯ সনে মাত্র ৪০ হাজার পাউণ্ড প্রেরণের মোট খরচের এক-দশমাংশের প্রায় সমান।[৭৫]

প্রাদেশিক সরকারি ব্যাঙ্কের প্রধান হিসাবে, জেলা সমাহর্তাকে জেলার মুদ্রা-সঞ্চালন সম্বন্ধে কিছু মনোযোগ দিতে হতো। কোম্পানি ঋণের জন্য চড়া সুদ দিত, তাই প্রতিটি মুদ্রার যত বেশি সম্ভব সঞ্চালন জরুরি বিবেচিত হতো। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জটিল ও বিরক্তিকর নিয়মাবলী প্রণীত হয়েছিল। বার্ষিক ১২,০০ পাউণ্ডের উপর সমস্ত বেতন বা দেয় অর্ধেক নোটে, অর্ধেক মুদ্রায় দেওয়া হতো[৭৬]; এইভাবে সুদূর অঞ্চলবাসীদের হাতেও কোম্পানির কাগজ জমা হতো, যা ভাঙ্গানোর জন্য তাদের ক্ষতি স্বীকার করতে হতো[৭৭] বস্তুত, কর্মচারিদের বেতন দেবার জন্য প্রায়শ কোষাগারে কাগজ ছাড়া আর কিছু থাকত না। পুরাতন এক সংবাদ-পত্র খুব আড়ম্বরের সাথে ঘোষণা করে যে এইবার কলিকাতার কর্মচারিরা মাসিক বেতন রৌপ্যমুদ্রায় পাবে। সরকারের তরফ হতে কাগজি মুদ্রা জনসাধারণের নিকট আইনি মুদ্রা বিবেচিত হলেও মনে হয়, জনসাধারণ এইগুলি দিয়ে অধিকার হিসাবে সরকারি ঋণ পরিশোধ করতে পারত না। রাজস্ব পর্ষদের কাছে মিঃ কিটিং-এর লেখা এক পত্রে বলা হয়েছে যে, কাগজীমুদ্রায় রাজস্ব জমা দিতে চাওয়া হচ্ছে ও তিনি সেইগুলি গ্রহণ করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে[৭৮]

নথিপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠা ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রাব্যবস্থা জনিত দুর্দশার সাক্ষ্য বহন করছে। কুড়িটি বিভিন্ন রাজবংশের ও করদ রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ এই মুদ্রাব্যবস্থা ৪০০ বৎসর ধরে হিন্দু-প্রতিভাজাত অবমূল্যায়নের সকল পদ্ধতির শিকার হয়েছে এবং সকল প্রকার কাটছাঁট, ঘষা-মাজা, জাল করার মধ্য দিয়ে এর আদিমূল্য পরিবর্তিত হয়েছে। মুদ্রার আপাতমূল্য হতে কি পরিমাণ বাদ দেওয়া হবে, তার বিস্তৃত হিসাব ছাড়া ক্ষুদ্রতম মুদ্রাও হস্তান্তরিত করা যেত না। বলা বাহুল্য, এই হিসাব সর্বদা সবল পক্ষের অনুকূলে যেত। খাজাঞ্চিখানার অফিসাররা প্রচুর ছাড় আদায় করত; বাংলাদেশ ব্রিটিশ শাসনাধীন হবার সময়, প্রকৃত কোনো ক্ষয় না হওয়া সত্ত্বেও, এক বছর সঞ্চালনের পর শতকরা ৩ ভাগ এবং দ্বিতীয় বৎসরের পর শতকরা ৫ ভাগ ছাড় নেওয়া হতো।[৭৯] দালালদের নিকট হতে জমিদাররা দ্বিগুণ ছাড় এবং দালালরা হতভাগ্য কৃষকদের কাছ হতে চতুর্গুণ ছাড় আদায় করত। দীর্ঘ এক উত্তপ্ত পত্রে, বেআইনি যেসব শুল্কের চাপে কৃষক আর্তনাদরত, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, মিঃ কিটিং পুরানো টাকার উপর 'বাট্টা' বা বিনিময়কে নিষ্ঠুরতম হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন, কারণ এটি সর্বাপেক্ষা

অনির্দিষ্ট।[৮০] খাজাঞ্চিখানার অফিসারদের লালসা সীমিত করার জন্য স্বীকৃত কোনো মানের অস্তিত্ব ছিল না। প্রকৃত রাজস্ব পুরোপুরি পাঠাবার দায়িত্ব সরকার তাদের উপর অর্পণ করেন এবং ওজন কম হওয়ার সব ঝুঁকি পূরণের জন্য প্রতিটি মুদ্রা যে অনুপাতে বাদ দেওয়া উচিত, তা নির্ণয় করার দায়িত্ব তাদের ছাড়া হয়েছিল। উপরন্তু এত প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হতো যে কোনগুলি তারা ব্যবহার করবে, সেটিও তারাই স্থির করত। কড়ি, সকল মূল্যমানের তাম্রমুদ্রা, নির্ধারিত মূল্যমানহীন তাম্রখণ্ড, পিতল-আঁটা লৌহখণ্ড, ৫২টি বিভিন্ন প্রকারের টাকা, প্রায় অর্ধমূল্যের উজিরি মুদ্রা[৮১], বিভিন্ন প্রকার ওজন[৮২], বিভিন্ন বিশুদ্ধতার ডলার[৮৩], ২৫ থেকে ৩২ মূল্যমানের স্বর্ণমোহর[৮৪], এবং বিচিত্র ধরনের সব এশীয় ও ইয়োরোপীয় মুদ্রা—বর্তমানে যেগুলির নাম পর্যন্ত বিস্মৃত।[৮৫] কয়েকটি খাজাঞ্চিখানায় কড়ি নেওয়া হতো, কয়েকটিতে নেওয়া হতো না।[৮৬] কয়েকজন সমাহর্তা সোনার মাধ্যমে লেনদেন করতেন, অন্যরা তাতে রাজী ছিলেন না; কেউ বা আবার কোনোটিতেই মনস্থির করতে পারতেন না[৮৭]; এবং ফসল বিক্রয়লব্ধ মুদ্রা খাজনা দেবার জন্য কাজে লাগবে কিনা, হতভাগ্য কৃষক কখনো জানতে পারত না। মুদ্রা গ্রহণকালীন এত পীড়নমূলক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও, যে পরিমাণ 'অচল টাকা খাজাঞ্চিখানায় জমা হতো, তা আজকের দিনে অবিশ্বাস্য মনে হয়। ৪০,৭৩৮টি টাকার (৪১ হাজার পাউণ্ড) মধ্যে অন্তত ৭৩৮টি টাকা 'অচল বের হয়।'[৮৮] বর্তমানে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে গড়ে পাচটিও অচল টাকা থাকে না। উপরন্তু, দেশে ব্যবসার জন্য উপযুক্ত মুদ্রা সঞ্চালিত হয় না। ও বিবেচনাহীন সরকারি হস্তক্ষেপ অবস্থাকে জটিলতর করে। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী, বাট্টা (বিনিময়) বৃদ্ধির কৌশল', 'সুদখোরদের আদায়ের জন্য', 'ধনী দালালদের জোটবদ্ধতার কারণে'[৮৯]—এইগুলিকে মুদ্রা ঘাটতির কারণ মনে করা হতো। সংক্ষেপে, সমস্ত কারণ দর্শানো হতো—শুধু প্রকৃত কারণটি ছাড়া, অর্থাৎ প্রদেশের ব্যবসা চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রার অভাব। সোনা, রূপা, তামা ও কাগজী মুদ্রা—এই চার প্রকার মুদ্রা ক্রমশ চালু করা হয়; কিন্তু এর ফলে যে অসুবিধাগুলি দেখা দিতে পারে, তার প্রতিরোধের জন্য কোনো একটি মাত্রও নেওয়া হয় না। খামখেয়ালী নিয়ম প্রবর্তনের অবশ্য কোনো ঘাটতি ছিল না। সরকার অন্ধভাবে হঠাৎ হঠাৎ সোনারূপার মূল্যমান নির্দিষ্ট করত এবং সদ্যজাত ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র মহলও অন্ধভাবে এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। এক তদন্ত কমিটি বসে এবং বলা বাহুল্য কোনো সংস্কার সাধিত হয় না। ১৭৮৮ সনে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর সম্পাদক মহাশয় লেখেন, "দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বনাশা দুর্দশায় ফেলে ও মিতব্যয়ী পরিবারগুলির চরম অসুবিধা ঘটিয়ে স্বর্ণমোহরের উচ্চ বাট্টা এখনো অব্যাহত। বর্ধমান সহ অন্যান্য জেলাগুলি হতে কলিকাতায় বহুল পরিমাণ রূপা আসার আরও ক্ষতিকর এই রীতি বজায় থাকা, এমনকি তীব্র হওয়া, স্পষ্ট প্রমাণ

করে যে ধনবান দালালদের জোটবদ্ধতাই এর কারণ। পরবর্তী বৎসরের সূচনা পর্যন্ত যদি ইহা অব্যাহত থাকে, তবে উদ্বিগ্নভাবে আশা করা হবে যে তাদের সহ-নাগরিকদের গঠিত এর জুরির সম্মুখে বেআইনি এই প্রথার জন্য জবাবদিহি করতে বলা হবে এবং মূল্যবৃদ্ধির জন্য কোনো দ্রব্য মজুত করা নিরোধ করে শাস্তি-দানকারী আইন মোতাবেক এদেরও চরমতম শাস্তি দেওয়া হবে। রৌপ্যমুদ্রা এমন একটি দ্রব্য যার প্রকৃত মূল্য নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এর মজুতদারী ও মূল্যবৃদ্ধি নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যাবে।" এক পক্ষকাল পরে তিনি আরো লেখেন, "ব্যাপক সমাজ যে ক্ষতি এত তীব্রভাবে অনুভব করছে, তা বন্ধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ঐকান্তিকভাবে আশা করা যায়; অন্যথায় মহাজনি ব্যবস্থার চাপে বাণিজ্য তলিয়ে যাবে।" কিন্তু যে সময়ে সরবে আদালতের সাহায্য চাওয়া হচ্ছিল, তখন মুদ্রার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা রাখার বিষয়টি আইনসভা সম্পূর্ণ বাদ দেয়। একদিকে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় যে মাত্রায় আইনি হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ সরবে দাবি করছিল, তা আইনি আওতার বাইরে ছিল, অন্যদিকে যে দায়িত্ব আদালত সহজেই গ্রহণ করতে পারতো, ইঙ্গ-ভারতীয় সরকার তার কোনো সুযোগ রাখেনি। কলিকাতার জুরিদের সম্পূর্ণ সভাকে দায়িত্ব অর্পণকালে,[৯০] স্যার উইলিয়াম ডানকিন্‌স দুঃখ-প্রকাশ করে বলেছেন, মুদ্রা কেটে নেওয়া, জাল করা এবং মুদ্রা সংক্রান্ত এই ধরনের অপরাধগুলির ক্ষেত্রে শুধু জুয়াচুরি ব্যতীত আর কোনো অভিযোগ দায়ের করার কোনো উপায় নেই।

গ্রামীণ মুদ্রাব্যবস্থার অপকর্ষ সাধন ও অভাবের কারণ দুই প্রকারের; বাংলা-দেশের সাথে ইংরেজদের কোনো সম্পর্ক সাধনের আগে থেকেই এর একটি কারণ সক্রিয় ছিল, আর অন্যটি হলো মুদ্রাসংস্কারের জন্য তাদের সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কিন্তু অবিবেচনা প্রসূত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। মুসলমানরা একটিমাত্র মুদ্রামাধ্যমকে স্বীকৃতি দিয়েছিল—যথা, রৌপ্য। স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যেত, কিন্তু সেগুলির মূল্য স্বতঃ-স্ফূর্তভাবেই নির্ণীত হতো।[৯১] সংক্ষেপে, স্বর্ণ মূল্যবান ধাতুবিশেষ হিসাবে বিবে-চিত হতো এবং প্রচলিত মূল্য অনুযায়ী মোহর নামে পরিচিত মুদ্রিত খণ্ডগুলির বিভিন্ন মূল্য চালু ছিল। দিল্লি মোহরগুলির প্রতিটির ওজন ও উৎকর্ষ সমান ছিল, রৌপ্যমুদ্রার মতোই সমান ওজন ও অভিন্ন উৎকর্ষ বজায় থাকত, কিন্তু একটি দিল্লিমোহর কখনো ১২, কখনো ১৩, ১৪ বা ১৫ রৌপ্যমুদ্রায় বিক্রয় করা হতো।[৯২] পরিমাণে বিপুল হলে তাম্রমুদ্রাও একইভাবে বাগেও বিক্রি হতো, এখনো হয়; অর্থাৎ, মুদ্রিত মূল্যমান অনুযায়ী সেগুলি বিক্রয় করা যায় না, বরং অপেক্ষাকৃত কমদর পাওয়া যায়; কি অনুপাতে মূল্যহ্রাস ঘটবে, তা এলাকা এবং রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার আপেক্ষিক চাহিদার উপর নির্ভর করত। বস্তুত জেলা খাজাঞ্চিখানায় তাম্রমুদ্রা সঞ্চিত হবার প্রবণতা আজও বহু সরকারি পত্র-বিনিময়ের

বিষয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে—যেমন পৌর পুলিশ—তাম্রমুদ্রাকে টাকায় পরিবর্তনের জন্য কর সংগ্রাহকদের শতকরা হারে দালালি দেওয়া হতো।

সুতরাং দেশীয় সরকার যে মুদ্রামাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করতে সদাসচেষ্ট ছিল, রৌপ্যই সেই প্রকারের একমাত্র মুদ্রা মাধ্যম, আর তাদের এই প্রচেষ্টাও সফল হয়নি।[৯৩] প্রথমত অনেকগুলি টাঁকশাল ছিল, কোনোটিই সৎভাবে একই মান বজায় রাখেনি এবং অনেকগুলি বজায় রাখার ভান পর্যন্ত করেনি। মুদ্রাঙ্কন ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার সযত্ন লালিত প্রতীক; এবং যেসব ছোট রাজা অন্যসব দিক দিয়ে দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করত, তারাও নিজেদের স্বাধীন মুদ্রাঙ্কনের অধিকার বজায় রাখত। যেহেতু এইটিই ছিল অধঃপতিত রাজবংশগুলির বিশেষ অধিকারের অন্তিম আশ্রয়, তাই সদ্য ক্ষমতাসীন দুঃসাহসীদের নিকট এইটি ছিল চরম আকাংক্ষিত ক্ষমতা। মারাঠারা পাহাড়ি দস্যু থাকাকালীন টাঁকশাল বসায়; আর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ১৬৮০ সনে বাংলা দেশে তাদের কয়েকটি মাত্র বাড়িও বাগানের মালিকানা থাকার সময় হতেই নিজস্ব মুদ্রার মর্যাদাকাংক্ষী ছিল। এইভাবে প্রস্তুত রৌপ্যমুদ্রাগুলি, ভ্রাম্যমাণ বণিকদের হাতে হাতে অথবা বেতনাদির মাধ্যমে প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে যায় ও তাদের মূল্য নিরূপণের জন্য নির্দিষ্ট এক আদর্শ মূল্যমান প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[৯৪] কোনো দুই টাঁকশাল অভিন্ন ওজন ও গুণ সম্পন্ন একই প্রকারের মুদ্রাঙ্কন করে না; প্রকৃতপক্ষে, নিজেদের নামমাত্র মানও অধিকাংশ টাঁকশালই বজায় রাখে না এবং সেই মুদ্রা প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের নিকট যাবার পর সর্বপ্রকারে সেইটিকে হীনমান করা হয়ে থাকে। সুতরাং, কোনো একটি টাঁকশালের প্রকৃত মুদ্রাকেও আদর্শ হিসাবে নির্বাচন করা যায় না, কারণ কোনো টাঁকশালই বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং ব্যবহৃত সকল কিছুরই নকল বের করা হয়ে থাকে। সেই কারণেই, আদর্শ মুদ্রা আবিষ্কার করতে হয়, যার সাহায্যে সকল টাকার মূল্যায়ন করা যাবে এবং কোম্পানির প্রবীণতম ও অভিজ্ঞতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের অন্যতম একজন এই পদ্ধতিটি নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। "স্রফ (মহাজন বা পোদ্দার)-এর কাছে টাকা নিয়ে এলে, সে প্রতিটি আলাদা আলাদা করে দেখে প্রথমে গুণ অনুযায়ী ও তারপর ওজন অনুযায়ী বিন্যস্ত করে। তারপর সে সিক্কা ও সুনতের উপর নানা আইনি বাট্টা (বিয়োগ) হিসাব করে; তারপর, সমগ্র পরিমাণের মূল্যের জন্য সে 'প্রচলিত মুদ্রা'র ভিত্তিতে মোটমূল্য নির্ণয় করে। সুতরাং, 'প্রচলিত মুদ্রা'ই একমাত্র মুদ্রা যার দ্বারা বর্তমানে মূল্যমান নির্ণীত হয়; এর কারণ হলো, যেহেতু "এইটি নিজে কোনো মুদ্রা নয়; তাই এইটিকে কখনো জাল বা ক্ষয় করা যায় না।"[৯৫]

এই পদ্ধতি সরল এবং মহাজন ও খাজাঞ্চি খানার অফিসারদের পক্ষে নিঃসন্দেহ লাভজনক হলেও গরিব কৃষকদের পক্ষে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা অসম্ভব

ছিল। সমগ্র গ্রামীণ জনসাধারণকে তাদের ফসলের মূল্য হিসাবে যে মুদ্রা গ্রহণ করতে হতো, তার মূল্য সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা ছিল না, এবং তারপর এই সকল মুদ্রা খাজনা ও কর হিসাবে এমন এক হিসাবের ভিত্তিতে দিয়ে দিতে হতো, যে হিসাব তাদের বোধগম্য ছিল না। এখন আমরা বুঝতে পারি যে ভারতীয় কৃষকরা কেন টোডরমলকে দীর্ঘদিন প্রায় ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সহকারে মনে রেখেছে। টোডরমল ছিলেন এমন এক মহাজন, যিনি কর্তৃত্ব সহকারে ফসলাদি দিয়ে রাজস্ব পরিশোধের বিকল্প পুনঃ প্রবর্তিত করেন।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিম্নবঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ কালে এই ছিল অবস্থা। ধনভাণ্ডারে মুদ্রাসংখ্যা অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো সূচক হিসাবে কাজ করত না; এবং প্রচলিত মুদ্রায় হিসাব রেখে এই অসুবিধা অতিক্রম করা হলেও, প্রকৃত মুদ্রাকে আদর্শ মানে পরিবর্তিত করার কাজটি সঠিকভাবে করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। ওজনগত অসংখ্য পার্থক্য বাদ দিলেও, একই মানসম্পন্ন মুদ্রা বৎসরে দুইবারও ব্যবহৃত হতো না। ১৭৬৪ সন থেকে ১৭৬৯ সনের মধ্যে, প্রান্তিক বৎসরসহ, যে ২৮টি বৃহৎ লেনদেন হয়, সেগুলির সঠিক বিবরণ আমাদের রয়েছে,[১৬] মাত্র তিনটিতে মান অনুযায়ী বিশুদ্ধ মুদ্রা ছিল; আর বাকি ২৫টির মূল্যমান নির্ধারণ করার পূর্বেই, সেইগুলি গালানো, ওজন করা ও তাদের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে। সমগ্র পুরাতন মুদ্রা জমা করে নেওয়া ও তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট ওজন ও বিশুদ্ধতার নতুন মুদ্রা চালু করাই ছিল এর একমাত্র প্রতিকার; এবং বাংলার প্রথম ইংরেজ গভর্নররা সাগ্রহে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কিন্তু অচিরেই তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে তাঁরা যেমন ভেবেছিলেন প্রতিকার কোনোক্রমেই তত স্পষ্ট বা সহজ নয়। নতুন মুদ্রা চালু করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, এবং মুদ্রামূল্যে মাত্র তিন-পঞ্চমাংশ ফেরত পাওয়া গেলে লোকে খুঁতযুক্ত টাকা টাঁকশালে জমা দেয় না। অংশত এই কারণে এবং অংশত নতুন মুদ্রা প্রচলনে বিলম্বের কারণে প্রদেশে মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়; সমৃদ্ধতম বণিকরাও পণ্যক্রয়ের জন্য কোনো বিনিময় মাধ্যম সংগ্রহ করতে অসমর্থ হয় এবং দাম দেবার সময় কোনো মুদ্রা পাওয়া যাবে না জানা থাকায় কেউ ঋণ দিতে রাজী ছিল না। এই জরুরি প্রয়োজন মেটাবার জন্য কলিকাতার পর্ষদ স্বর্ণমুদ্রা চালু করার সিদ্ধান্ত নেন; রৌপ্যের বাজারদর অনুযায়ী, শুধু যে এর মূল্য নিরূপিত হলো তাই নয়, প্রতিটি মুদ্রার নির্দিষ্ট মূল্য সূচনার নির্ধারণ করে, এইটিকে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রামাধ্যমের রূপ দেওয়ার কথা ভাবা হলো। কিন্তু প্রয়োজনীয় স্বর্ণ বা রৌপ্য পর্ষদের হাতে না থাকায়, জনগণকে তাদের সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রা তৈরির জন্য জমা দিতে উদ্বুদ্ধ করা হলো; এইজন্য নতুন স্বর্ণমোহরের ইচ্ছামতো মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। আইনানুসারে প্রতিটি

মুদ্রার মূল্য রূপার বাজার দর অনুযায়ী মূল্যের থেকে শতকরা ১৭½ ভাগ বেশি নির্দিষ্ট করা হলো। এই লাভজনক মুদ্রা তৈরির জন্য জনসাধারণ সোনা নিয়ে টাঁকশালে ভিড় জমালো, কিন্তু পর্ষদ যত সোনার মোহর চালু করলো, কোনো অজানিত কারণে, তত বেশি মুদ্রার অভাব দেখা দিল। ছয় বৎসর এই রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত ছিল। স্বর্ণকে 'উৎসাহ' দেবার সরল অর্থ ছিল রৌপ্যকে নিরুৎসাহিত করা। নতুন মুদ্রার মূল্য মর্জিমাফিক নির্দিষ্ট করে পর্ষদ সোনার মাধ্যমে দাম মেটানোর পদ্ধতিকে শতকরা ১৭½ ভাগ বেশি লাভজনক করেন; কিন্তু এর ফলে রূপার মাধ্যমে দাম মেটানো শতকরা ১৭½ ভাগ কম লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। স্বর্ণ সঞ্চয়ী ভাগ্যবান কয়েকজনের লাভের পরিবর্তে রৌপ্য সঞ্চয়ী বহু হতভাগ্যকে বঞ্চিত হতে হয়। যে মাধ্যমের শতকরা ১৭½ অবমূল্যায়ন ঘটেছে, সেই মাধ্যমে দাম দিতে শেষোক্তরা অস্বীকার করে এবং স্বর্ণের বিনিময়ে ও ব্যবসার প্রয়োজনে বিদেশে রৌপ্য প্রেরণ করে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেই বার্ষিক সিকি মিলিয়ন স্টার্লিং বাংলা থেকে চীনে পাঠায়;[৯৭] ক্রমাগত বিনিয়োগের জন্য বাংলা থেকে মুদ্রা আনয়ন মাদ্রাজের প্রয়োজন হতো; এবং প্রশাসনিক ব্যয় বহন না করলেও বোম্বাইকেও একই উৎস হতে মুদ্রা সরবরাহ করতে হতো।[৯৮] স্মরণীয় এই পরীক্ষার পরের বৎসর-গুলিতে পর্ষদ ক্রমাগত অভিযোগ করেন যে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রা না থাকা সত্ত্বেও অভূতপূর্ব মাত্রায় রৌপ্য রফতানি অব্যাহত থাকে।

অপর এক কারণে শীঘ্রই এই সংকট তীব্রতর হতে থাকে। মূল্যবান ধাতু-সমূহের সরবরাহের জন্য ভারত সর্বদা বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। অলংকার ও আটপৌরে গহনার জন্য এদেশে প্রচুর পরিমাণ রূপার প্রয়োজন হয়, এবং রোম, ভেনিস, পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা সকলেই একের পর এক প্রাচ্য বিলাসিতার জন্য নিজেদের জাতীয় মুদ্রা রফতানির প্রতিবাদে বিলাপ করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের মাত্র একটি বন্দর সুরাটেই, শুধু পারস্য উপসাগর দিয়ে, বার্ষিক ৫ লক্ষ স্টার্লিং মুদ্রা এসেছে। এই ব্যবসার মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান ধাতু ইংল্যাণ্ডের বাইরে যায়, তা দীর্ঘদিন ধরে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরোধীদের হাতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল। পার্লামেণ্ট এই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করত এবং দেশপ্রেমিক ইস্তাহারে সরবে এর নিন্দা করা হতো। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, ইংল্যাণ্ড হতে রৌপ্য রফতানি করে তার পরিবর্তে ভারতীয় পণ্য আনয়নই কোম্পানির বাণিজ্য ছিল; কিন্তু ১৭৬৫ সনে নিম্ন বাংলার রাজস্ব হস্তগত হওয়ার ফলে, কোম্পানির বার্ষিক উদ্বৃত্ত এত বেশি হলো যে এখানে পণ্যাদি ক্রয়ের জন্য মুদ্রা আমদানির কোনো প্রয়োজন থাকলো না।[৯৯] বীরভূমের মতো

কোনো জেলার রাজস্ব ৯০ হাজার পাউণ্ড হলে, পর্ষদ প্রশাসনিক ব্যয় ৫ হাজার পাউণ্ড হতে ৬ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে রাখত। বাকি টাকার মধ্যে, ১০ হাজার পাউণ্ডের মতো সাধারণ নাগরিক বিষয়ে ব্যয়ের জন্য, আরো ১০ হাজার পাউণ্ড সেনাদলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং বাকি ৬০ হাজার পাউণ্ডের মতো উদ্বৃত্ত লিডন হল স্ট্রীটে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য রেশম, মসলিন, কার্পাস বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হতো। সংক্ষেপে, বাংলার রাজস্ব দিয়েই বাংলার বিনিয়োগের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় বার্ষিক মুদ্রা আনয়ন বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এই খাতে মূল্যবান ধাতুসমূহের ব্যবহার পূর্বের মতোই অব্যাহত থাকে। প্রতি বৎসর প্রদেশ হতে প্রভূত মুদ্রা বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, বার্ষিক এই মুদ্রা আমদানিই মুদ্রা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখত; এবং আমরা নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে চীন, মাদ্রাজ, বোম্বাই দূরে থাক, খোদ দিল্লিতেই কর পাঠানো সম্ভব হতো না। ১৭৭০ সনের রচনায়, ম্যাণ্ডেভিল বলেছেন যে, বাদশাহকে কর দিতে গিয়ে "বাংলার সমস্ত রৌপ্য, মুদ্রারূপে ব্যয়িত হয়। সবই দিল্লি যায় ও সেখান হতে (নিম্ন) বাংলায় কখনো ফিরে আসে না; ফলে মুকসাদাবাদ (মুর্শিদাবাবাদ) হতে এত সম্পদ চলে যাবার কারণে, ব্যবসা চালাবার মতো বা এমনকি বাজার হতে জীবনধারণের সামগ্রী ক্রয়ের মতো মুদ্রাও, পরবর্তী জাহাজে নতুন রৌপ্য সরবরাহ না হওয়া পর্যন্ত, থাকে না।"[১০০]

১৭৬৫ সনে এইভাবে নতুন সরবরাহ আসা বন্ধ হয়। সরবরাহে এই ঘাটতি মটাবার জন্য ১৭৬৩ সনে প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রা ব্যবস্থা সংকটকে শুধু তীব্রতর করে। পরবর্তী দুই বৎসরে আন্তর্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়, এবং ইংরেজ ও দেশীয় সমগ্র জনসাধারণ এই বিষয়ে ফয়সলার জন্য সরকারের নিকট মিনতি জানায়। ১৭৮৯ সনে দেশের ইংরেজ অধিবাসীগণ লেখেন, 'বর্তমানে সংকট এত তীব্র যে কলিকাতার প্রতিটি ব্যবসায়ী দেউলিয়া হবার বা সকল পণ্যাদি বাজেয়াপ্ত হবার বিপদের সম্মুখীন।' 'বাণিজ্য চালাবার জন্য বা হঠাৎ প্রয়োজন মেটাবার জন্য যথেষ্ট (মুদ্রা) নাই।...অধমর্ণদের নিকট হতে প্রাপ্য অর্থসংগ্রহ অসম্ভব হওয়ায় প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ, সৎ ব্যবসায়ী প্রতিদিন প্রতিকারহীন ভাবে আদালতে অভিযুক্ত হচ্ছে।...এইভাবে ব্যয়সাধ্য মামলায় নিজেকে জড়াতে প্রয়োজন তাকে বাধ্য করছে; ন্যায়সংগত দাবি সম্বন্ধে অবহিত থেকেও এবং তা মেটাবার জন্য ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও, পাবার জন্য সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে মামলা চালাতে বাধ্য হচ্ছে; তার অধমর্ণরা সক্ষম হওয়ামাত্র ঋণ পরিশোধে ইচ্ছুক এই পূর্ণ বিশ্বাস সত্ত্বেও নিজে সাজা পাবার আগেই প্রাপ্য আদায়ের জন্য তাড়াতাড়ি মামলা রুজু করতে বাধ্য হচ্ছে। এইভাবে তার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, আর ফলশ্রুতিতে তার দুর্দশা বর্ণনাতীত রূপে স্পষ্ট ও হৃদয়বিদারক।"[১০১] 'কলিকাতার

'অধিবাসী আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীদের বিনীত আবেদন পত্র' বিষয়টি আরো সজোরে হাজির করে: ভাণ্ডার পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন সামগ্রীর অভাবে পীড়িত সুন্দরতম গৃহও যে দুর্দশার সম্মুখীন হয়, রাজধানীতে সাম্প্রতিক মুদ্রাভাব, এতদজনিত বহু অসহনীয় দুর্ভোগসহ, প্রতিটি ব্যক্তিকে একই প্রকারে পীড়িত করে; আর শুধু যে সর্বব্যপী দেউলিয়াপনার আশংকা রয়েছে তাই নয়, সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি।"

প্রতিকার হিসাবে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা প্রস্তাব করেন, যারাই রূপা মজুত করে রাখবে ও আইনানুযায়ী নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রূপা দিতে অস্বীকার করবে, তাদের অভিযুক্ত করা হোক। আর্মেনিয়ানরা বিষয়টি আরো তলিয়ে দেখেছিল। তারা বুঝেছিল যে এমন এক বাস্তব অসম্পূর্ণতা রয়েছে, যেখানে আইনের কিছু করার নেই; তাই তাদের সুপারিশ ছিল—দেশের সমস্ত মূল্যবান ধাতুসমূহ মুদ্রায় বাধিত হোক। রূপা পাওয়া যাবে না, কিন্তু বহু পুঁজিপতি সোনা জমা করে; তারা সোনা দিয়ে ৮ শিলিং থেকে ১ পাউণ্ড ১২ শিলিং পর্যন্ত মূল্যমানের সাধারণ মুদ্রাকরণের প্রস্তাব করে,—এই প্রকার মুদ্রাব্যবস্থা খুব সুবিধাজনক হওয়ার কথা নয়, কিন্তু 'আদৌ কোনো মুদ্রা না থাকার চেয়ে যে কোনো মুদ্রা থাকা ভালো।'[১০২]

মাননীয় হ্যারি ভেরেলেস্ট মহাশয় আর্মেনিয়ান এইসব বিচক্ষণ ভদ্রলোকদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি লেখেন, 'কঠোর ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আমরা দেখি যে, ব্যবসায়ীদের দ্বারা তীব্রভাবে অনুভূত এই মুদ্রাভাব কোনো আকস্মিক বা কাল্পনিক ঘটনা নয়, বা এই ঘটনা কলিকাতাতে মাত্র আবদ্ধ নয়, বরং এই অভাব দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত।' তিনি আরো আশংকা প্রকাশ করেন, 'যথেষ্ট মুদ্রার অভাবে হয় রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেবে অথবা রাজস্ব শস্যাদিতে আদায় করতে হবে'; পরিশেষে তিনি দ্বিতীয় স্বর্ণমুদ্রা ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। কিন্তু এক সফল মুদ্রা সংস্কারের ভিত্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বাংলার তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের হাতে ছিল না; এবং নতুন মুদ্রার আইনি মূল্যমান বাজার দরের উপর ১৮৬৬ সনের মতো তত শোচনীয়ভাবে নির্দিষ্ট না করলেও মিঃ ভেরেলেস্ট শতকরা ৫১/২ ভাগ অধিক হারে মূল্য নির্দিষ্ট করেন। তাই, কিঞ্চিৎ নমনীয় রূপে ১৭৬৬ সনের ঘটনাবলীরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রথমে লাভজনক মুদ্রাব্যবস্থার সুযোগ নেওয়ার জন্য জনসাধারণ সানন্দে সঞ্চিত মূল্যবান ধাতুসমূহ নিয়ে আসে এবং পর্ষদ এই পরীক্ষার সাফল্যে নিজেদের অভিনন্দিত করে। কিন্তু অচিরেই জনসাধারণ উপলব্ধি করতে থাকে যে, স্বর্ণ মোহরের মূল্য কৃত্রিমভাবে ৫১/২% বৃদ্ধি করলেও মুদ্রামূল্য একই মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং, অবশিষ্ট রূপাটুকু তারা সরিয়ে রাখে; টাঁকশাল নিঃসৃত স্বল্প পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে সম্পূর্ণ অপ্রতুল প্রমাণিত হয়। বস্তুত ১৭৬৬ সনের ক্ষতি হতে শিক্ষা

নিয়ে দেশীয় মহাজনরা সরকারের মোকাবিলায় পূর্ব-প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত নেয় এবং যেখানে কয়েক মাস পরে অপ্রকৃত মূল্যসম্পন্ন স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা পরিশোধ সম্ভব, সেখানে রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহারে রাজী হয় না। বৎসর শেষ হবার আগেই পর্ষদ দেখেন যে তাঁদের কোষাগার শূন্য ; তাঁরা অভিযোগ করেন যে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে 'সম্পদ সিন্দুকে বন্ধ করে রেখেছে।'[১০৩]

এমনকি স্বর্ণসঞ্চয়ীরাও শীঘ্রই স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের জন্য কোম্পানির প্রচেষ্টাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করলো। ১৭৬৬ সনের বিধি অনুযায়ী, ১৪৯·৭২ গ্রেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ সম্পন্ন একটি মোহরের দাম ছিল ১৪ টাকা, অর্থাৎ টাকা প্রতি ১০·৬৯৪ গ্রেন হারে ; ১৭৬৯ সনের বিধি অনুযায়ী, মোহর প্রতি বিশুদ্ধ সোনা ছিল ১৯০·৮৬ গ্রেন এবং দাম ছিল ১৬ টাকা, অর্থাৎ টাকা প্রতি ১১·৮৮ গ্রেন হারে ; দেশীয় পোদ্দাররা দ্রুত এটি আবিষ্কার করলো এবং কোম্পানির টাঁকশালের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতে ভীত হয়ে পড়লো। তাদের জানা ছিল যে, ধাতু হিসাবে সোনার বাজারদর তারা সর্বদা পেতে পারে, কিন্তু মুদ্রার ক্ষেত্রে ইংরেজ ভদ্রমহোদয়গণের পরবর্তী মর্জি কি দাঁড়াবে, তা বোঝা অসম্ভব।

পরবর্তী ২০ বৎসরের দুর্দশা বোঝার জন্য প্রবল কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। পরিচালকবর্গের করুণ বর্ণনানুযায়ী, ১৭৬৯ সনের মহাদুর্ভিক্ষে জনগণের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। গ্রামবাংলার ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় জনশূন্যপ্রায় প্রদেশের অভুক্ত জনগণ হতে ক্রমবর্ধমান রাজস্ব আদায় করার জন্য কঠোর অত্যাচারের বর্ণনা। মুসলমান লুণ্ঠনকারীরা হিন্দুস্থানে অবতীর্ণ হবার পর যে নিরাপত্তা জনগণ কখনো বোধ করেনি, ব্যক্তি ও সম্পত্তির সেই নিরাপত্তা বোধ ওয়ারেন হেস্টিংস ফিরিয়ে আনেন। তিনি আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার প্রবর্তন করেন এবং তা জনগণের অনায়াস সাধ্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বাঙালি চরিত্র তাঁর নখদর্পণে ছিল এবং তাদের প্রয়োজন অনুসন্ধানের জন্য বা চরিত্র ব্যাখ্যার জন্য সর্বপ্রকার সহায়তা করতেন, তাদের প্রশংসা অর্জনের জন্য সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে অতিশয় দানশীল ছিলেন এবং দীর্ঘ অত্যাচারে যে জাতির আত্মসম্মানবোধ লোপ পেয়েছে, সেই জাতিকে অভিভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় ত্বরিত, নির্ভুল ঔদ্ধত্য প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতেন। উপরন্তু, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রকৃতই এই দেশবাসীদের ভালোবাসতেন ; পরিবর্তে এই দেশবাসীরাও তাঁকে সেই সম্মান ও ভালোবাসা দিয়েছিলে, যা তারা পূর্বে বা পরে কোনো ইংরেজকে দেয়নি। তিনি ছিলেন প্রকৃতই সর্বোত্তম এক এশীয় নবাব ; শতবর্ষ আগে জন্মালে এই মানুষই হয়তো এমন এক স্বাধীন সাম্রাজ্যের পত্তন করতে পারতেন, যা পরবর্তী বিশ পুরুষের দুর্বল শাসনেও অব্যাহত থাকতো। কিন্তু রাজস্বের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পাষাণ হৃদয়। চারিপাশে হিন্দুস্থানে নৃপতিবৃন্দের বিপদ, মারাঠা কর্তৃক নিমজ্জিত প্রায়, ক্ষমতাবান হিন্দু প্রজাবৃন্দের চক্রান্তজাল, বিদ্রোহী

সেনাদল দ্বারা বিপর্যস্ত, পদে পদে আপন সহকর্মীবৃন্দ কর্তৃক বিব্রত—এই অবস্থায় তাঁর শক্তির একমাত্র উৎস ছিল অর্থক্ষমতা। স্বদেশে পরিচালক-সভায় তাঁর স্বার্থ বজায় রাখতে পারে একমাত্র অর্থ; একমাত্র অর্থই বাংলায় তাঁদের সার্বভৌমত্ব অব্যাহত রাখতে পারে; এবং সারা ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তার মূল্য হিসাবে যে কোনো মাত্রার আর্থিক কঠোরতা তাঁর কাছে অত্যন্ত ন্যায্য মনে হতো। কোনো মুদ্রাব্যবস্থা যতই পরিণামে মঙ্গলজনক হোক না কেন, প্রাথমিকভাবে আতংক ও বিভ্রান্তির কারণ হলে, সে অবস্থায় কোনো গভর্নরের পক্ষেই সেগুলি গ্রহণ করে অবস্থাকে জটিলতর করা সম্ভব ছিল না। সময় সময় ত্রুটিযুক্ত ও অপ্রতুল মুদ্রাব্যবস্থা জনিত দুর্দশা দৈবক্রমে গোচরীভূত হলে সাময়িক উপশমকারী কোনো ব্যবস্থা নিতে তিনি পরামর্শ দিতেন; কিন্তু মূলগত যেটুকু সংস্কার করার ছিল, তা তিনি প্রথম বৎসরেই করেন।

দেশীয় সরকারের আমলে, টাঁকশাল ছিল রাজস্বের এক উৎস,[১০৪] সাধারণত এর উপর বিরাট কর ধার্য করা হতো, এবং, পরিস্থিতি অনুযায়ী মুদ্রাকরণের জন্য আনীত মূল্যবান ধাতুসমূহে খাদ মেশানো হতো। টাঁকশালকে কাজ দেবার জন্য, প্রতি বছর সমগ্র মুদ্রাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে জনগণকে বাধ্য করার এক অন্যায় ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল। মুদ্রার উপর মুদ্রিত বৎসরের পর অতিবাহিত বৎসরগুলির জন্য প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরপেক্ষভাবে শতকরা এক বিরাট অংশ বাদ দেওয়া হতো। উদাহরণ স্বরূপ: এক বৎসর ব্যবহৃত টাকার শতকরা ৩ ভাগ অবমূল্যায়ন করা হতো; দুই বৎসর পর শতকরা ৫ ভাগ বাদ যেত এবং ওজন বা বিশুদ্ধতার কোনো পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও এই বাদ দেওয়া হতো। এই অবমূল্যায়ন পরিহারের জন্য প্রতি এক বৎসর বা দুই বৎসর অন্তর পুঁজিপতিরা তাদের রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ জমা দিত এবং এইভাবে জনসাধারণের মূল্যে টাঁকশালগুলি সাড়ম্বরে ব্যবসা চালাত। সেই ১৭৭১ সনে বঙ্গীয় পরিষদ এর প্রতিকারের উপায় নির্দেশিত করেন,[১০৫] কিন্তু মিঃ কার্টিয়াবের দুর্বল শাসনে কোনো কিছুই বাস্তবায়িত হয় না। অর্থ সম্পন্ন ব্যবস্থার প্রতি ওয়ারেন হেস্টিংসের ছিল তীব্র ঘৃণা—১৭৭৩ সনে তিনি এই কুব্যবস্থার মূলে আঘাত হানেন। তিনি বিধান দিলেন যে, যত দীর্ঘদিনই চালু থাকুক না কেন, সত্য সত্যই নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রকার মুদ্রার কোনো অবমূল্যায়ন চলবে না এবং এই নির্দেশ পালন নিশ্চিত করার জন্য তিনি আদেশ দিলেন যে, ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রায় একটি মাত্র সনের উল্লেখ থাকবে—সেটি হলো ১৭৭৩ সন, অথবা টাকার উপর উৎকীর্ণ বাণী অনুযায়ী শাহ আলমের 'পবিত্র রাজত্বের ১৯-তম বৎসর'। সঠিকপথে কোম্পানির এইটিই প্রথম পদক্ষেপ; এর ফলে এত বিবাদ সৃষ্টি হয় যে, ওয়ারেন হেস্টিংস আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে সাহসী হন না। সেদিনের প্রতিটি বিবরণীতে গভীর ভাবে মুদ্রিত রয়েছে জনগণের দুর্দশা; তৎকালীন প্রকাশিত যে কোনো গ্রন্থের

কয়েক পৃষ্ঠা উল্টালেই পাওয়া যাবে ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রাব্যবস্থা জনিত ক্ষয়ক্ষতি ও মানুষে মানুষে অবিশ্বাসের অদম্য প্রমাণ। কলিকাতার প্রথম সংবাদপত্র থেকে দুইটিমাত্র উদাহরণই যথেষ্ট। ১৭৮০ সনের মে মাসে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রধান নগরগুলির সমস্ত দোকান রৌপ্যমুদ্রার মূল্যজনিত বিবাদের কারণে বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল।[১০৬] কর্তৃপক্ষ জনমত মেনে নেবার পরই এইগুলি আবার খোলা হয়। অল্পদিন পরেই 'অনেস্টাস' অভিযোগ করে যে মধ্য-বাংলার বাণিজ্যিক রাজধানী পাটনায় ব্যবসা, স্থানীয় ও বিধিবদ্ধ মুদ্রা বিনিময়ের বিধ্বংসী ও অবিরত পরিবর্তনশীল চরিত্রের জন্য, সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়েছে।[১০৭]

লর্ড কর্নওয়ালিস যখন প্রদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, মুদ্রাজনিত ত্রুটির কারণে তখন বাণিজ্যের এই ছিল অবস্থা। প্রথম তিন বৎসরে বিচার বিভাগীয় ও আর্থিক সংস্কার তাঁর সমগ্র মনোযোগ দাবি করে; এবং কলিকাতার সংবাদপত্র মহলের কলরব ও গ্রামীণ জনসাধারণের হৃদয়স্পর্শী আবেদন সত্ত্বেও মুদ্রাব্যবস্থায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপে তিনি সাহসী হননি। তাঁর পরামর্শদাতা জন্ শোর এই সমস্যার গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝেছিলেন ও ১৭৮৯ সনের পূর্বেই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই দুই বন্ধু চিরতরে এটি দূরীকরণের এক পরিকল্পনা রচনা করেন। কম ওজনের ভিত্তিতে মুদ্রা গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার কোষাধিকারিকদের নিকট হতে কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক আদেশ জারি করা হয়। স্বীকৃত যে কোনো টাঁকশালে প্রস্তুত যে কোনো মুদ্রা, যতই কাটছাট করা হোক না কেন, জেলাশাসকের দফতরে ঘোষিত নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সেগুলি গ্রহণ করতে কোষাধিকারিকরা বাধ্য হয়। এই একটিমাত্র পদক্ষেপের ফলে চলতি বৎসরের রৌপ্য মুদ্রা ব্যতীত অন্যসব মুদ্রায় প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষরা অবিস্মরণীয় কাল হতে যে অনির্দিষ্ট ও মর্জিমাফিক ছাড় আদায় করত, তা বন্ধ হয়ে যায়। এই সংক্রান্ত বিক্ষোভ প্রশমিত হবার আগেই আরেকটি আদেশ হাজির হয়, এর ফলে তারা শুধু মোট গৃহীত অর্থের জন্য নয়, এমনকি যে মুদ্রায় এইগুলি দেওয়া হয়েছে সেইগুলির জন্যও দায়ী হলো। এইতেই তারা শেষ হয়ে গেল। তাদের অনেকেই উৎকোচ হিসাবে বহু অর্থ বিনিয়োগে কোষাধ্যক্ষের পদলাভ করেছে—সেই আমলে এই পদের বার্ষিক বেতন ছিল ৪০ পাউণ্ড, কিন্তু অতিরিক্ত ৪০ হাজার পাউণ্ড উপার্জনের সুযোগ ছিল। পাঁচ হাজার পাউণ্ড থেকে ৩০ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ 'জমা টাকা' নিয়ে খেলা ছাড়াও, কোষাধ্যক্ষরা গৃহীত প্রতিটি মুদ্রা হতে ইচ্ছামতো ছাড় বাদ দেবার সুবিধা, এবং পুনরায় এই মুদ্রাগুলি ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসাবে নিজেদের দ্বারা নির্ধারিত হারে সঞ্চালন করার সুবিধা সর্বদা ভোগ করেছে। লর্ড কর্নওয়ালিস মুদ্রাব্যবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন. প্রথমটি বিধিবদ্ধ মুদ্রাব্যবস্থা, যেগুলির পূর্ণ আইনি মূল্যমান বজায় থাকে; দ্বিতীয়টি অর্থাৎ নিম্নমানের মুদ্রা যেগুলি প্রকাশিত হার অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে এবং প্রতি মাসের শেষে

কলিকাতায় প্রেরিত হবে। মুদ্রার তথাকথিত মূল্য হতে কিছু বাদ দেবার প্রয়োজনকে তিনি এর পুনঃ সঞ্চালনের অযোগ্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে আদেশ দেন যে, কোষাধিকারিকরা এই মুদ্রা প্রেসিডেন্সির টাঁকশালে প্রেরণ কালে এর সাথে এক চালানে কি হারে এইগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করবে।[১০৮]

কোষাধিকারিকরা বিক্ষোভ জানালো, চিৎকার করলো, আদেশ অমান্য করলো। সংস্কারের প্রথম উদ্দীপনায় ওয়ারেন হেস্টিংসও অনুরূপ এক আদেশ জারি করেছিলেন এবং তারা সেইটি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এইবার তারা প্রতিভাসম্পন্ন কিন্তু খেয়ালী স্বেচ্ছাতন্ত্রের সাথে সুসংগঠিত এক কেন্দ্রীয় সরকারের সদাসতর্কতার পার্থক্য বুঝতে পারলো। স্থানীয় কর্মচারিদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রতি-নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা আজও ভারতীয় প্রশাসনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, লর্ড কর্নওয়ালিস চার বৎসরের কষ্টকর প্রয়াসে তা গড়েছিলেন। ১৭৮৯ সন শেষ হওয়ার পূর্বেই সরকারি চাকুরিরত সকল দেশীয় ব্যক্তিদের নামের তালিকা তাঁর কাছে ছিল,[১০৯] এবং বিদ্রোহী কোষাধ্যক্ষরা হঠাৎ নিজেদের সুকৌশলে রচিত বক্তব্য, রসিদ ও মাসিক কিস্তির জালে জড়িত আবিষ্কার করলো। মহামান্য লর্ডের অঙ্গুলির সামান্য স্পর্শেই তারা নিষ্পেষিত হলো, কারণ জন শোরের নিকট হতে তিনি অপরাধীদের ধরার নিশ্চিত উপায় শিখেছিলেন। তিনি কদাচিৎ সরাসরি কোষাধ্যক্ষদের উল্লেখ করতেন; কিন্তু, এতদিন যেসব অপরাধকে সমাহর্তা সাহেব হয় নজরে আনতেন না বা গুরুত্ব দিতেন না, অধীনস্থদের সেইসব অপরাধের জন্য জেলার ইংরাজ সমাহর্তাকে পরিদর্শনকালে তিনি নির্দয় জরিমানা দিতে বাধ্য করতেন। এমনকি এত আর্থিক উদ্দীপন সত্ত্বেও মিঃ কিটিং-ও এই শাস্তি হতে রেহাই পাননি, এবং লর্ড কর্নওয়ালিস যখন দেখলেন যে তাঁর মুদ্রা সংস্কারকে কোষাধ্যক্ষরা আমল দিচ্ছে না, তিনি জরিমানা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করলেন.—পূর্বে যেখানে অর্থ প্রেরণের সময়ানুবর্তিতার অভাবের জন্যই শুধু জরিমানা ধার্য হতো, এখন সেইখানে হিসাব বা কিস্তি দাখিলে প্রতিটি বিচ্যুতির জন্য ও পদ্ধতিগত প্রতিটি ত্রুটির জন্য ও জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়।[১১০] এইসব খেসারত ও মর্যাদাহানির জন্য সমাহর্তারা অপরাধী দেশীয় অধীনস্থদের ওপর যথেষ্ট প্রতিহিংসা চরিতার্থ করত, এবং হীনমান মুদ্রাগুলির মাসিক প্রেরণ শীঘ্রই অবিসংবাদিত নিয়ামত বিষয়ে রূপান্তরিত হলো।

কোষাধ্যক্ষদের সকল প্রতিরোধ চূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, অপর একটি আরো গুরুতর সংগ্রাম শুরু হলো। এই হীনমান মুদ্রাগুলি প্রাদেশিক মুদ্রা সমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশ ছিল, এবং এইগুলি কোষাগার জাত করার ব্যাবস্থার বিশেষ সাফল্যের কারণেই গ্রামীণ জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনধারণের সামগ্রী ক্রয়ের উপায় হতে বঞ্চিত হয়ে

পড়ে—শস্য সুলভ হওয়ার কারণে নয়, অর্থ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার কারণে ; এবং ফসল কাটার মরশুমে যথারীতি হিসাবপত্র মিটিয়ে ফেলার তাগিদে গ্রামের মহাজনরা বসন্তকালীন অগ্রিম দাদন হিসাবে প্রদত্ত এক পাউণ্ড কিংবা ৩০ শিলিং-এর পরিবর্তে কৃষকদের সমগ্র শস্য নিয়ে নেয়। বড় বড় শহরে বিধিবদ্ধ মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন থাকায় হীনমান মুদ্রা কোষাগার জাত করায় বিশেষ যায় আসে না ও দ্রব্যমূল্য প্রভাবিত হয় না। সুতরাং শস্য ব্যবসায়ীরা গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নামমাত্র মূল্যে দেশের সমস্ত শস্য ক্রয় করে এবং নগরাঞ্চলে প্রচলিত মূল্যে শস্য বিক্রয় করে বা রফতানি করে ; এবং ভালো ফসল তোলার পরও হতভাগ্য কৃষকরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়।

টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ফলে এই দুর্দশা তীব্রতর হয়। একদিকে সমস্ত অচল মুদ্রা গলানোর জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হয়। কোষাধিকারিকদের বিজয় সমাগত মনে হয় ; কারণ তাদের মতে, সমগ্র দেশকে সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাহীন করতে কোনো সরকার সাহস করবে না এবং ১৭৭২ সনের মুদ্রাসংস্কারের মতো একইভাবে অর্থাৎ প্রথমে চরম দুর্দশা ও পরে পরিত্যক্ত হওয়া হয়—১৭৯০ সনের মুদ্রাসংস্কার ও পরিত্যক্ত হবে বাস্তবিকই এই ব্যবস্থার ভাগ্য কিছুদিনের জন্য দোদুল্যমান ছিল। এই সংকটের সময় লর্ড কর্নওয়ালিস এমন সব পরিবর্তনে লিপ্ত ছিলেন যার ফলে সমগ্র বিচারব্যবস্থা তথা আর্থিক প্রশাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, মাদ্রাজে এমন এক যুদ্ধ চলছিল যার ফলে ইংরাজদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল : দুর্ভিক্ষের প্রকোপে দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত জনহানি অব্যাহত ছিল, এবং যে একটিমাত্র প্রদেশ এইসব হতে অক্ষত ছিল, সেইখানে কৃত্রিম এক দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে তিনি কি স্থির প্রতিজ্ঞ থাকতে পারবেন ? কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস বিবেচনা করে দেখলেন যে প্রকৃতপক্ষে এইটি হলো দুইটি বিরাট দুর্দশার মধ্যে একটিকে গ্রহণ করা। গৃহীত ব্যবস্থার ফলে, তাঁর চরমতম আশংকারও বহুগুণ বেশি দুর্দশা ঘটে, কিন্তু সেই দুর্দশারও অর্ধেক অতিক্রান্ত এবং এখন নতিস্বীকার করার অর্থ মুদ্রা অপব্যবস্থার দুর্দশায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রত্যাবর্তন করা। উপরন্তু যখনই আবার মুদ্রা সংস্কার করা হবে, তখন নতুনভাবে পুনরায় সংস্কার জনিত সামগ্রিক দুর্দশা সহ্য করতে হবে। এইসব বিবেচনা করে লর্ড কর্নওয়ালিস জনগণের আর্তনাদকে উপেক্ষা করেন।

১৭৯০-৯১ সনের শীতকাল অতিক্রান্ত হলেও বাংলায় কোনো প্রকার উপশম দেখা গেল না। খারাপ মুদ্রা জমা করার আগে সরকার নতুন মুদ্রা চালু করার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু যে ভাবেই হোক নতুন টাকা জনগণের হাতে আসে না। কলিকাতার পুরানো টাঁকশাল পুরোদমে সক্রিয় হয়, প্রাদেশিক তিন কেন্দ্রে নতুন টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়,[১১১] এবং প্রতিটি জেলা প্রধানের নিকট বিধিবদ্ধ মুদ্রার পরিবর্তে স্থানীয় বাজার দরে সমস্ত মুদ্রা গ্রহণ করার

নির্দেশ যায়।[১১২] প্রথমে জনসাধারণ তাদের খারাপ মুদ্রা নতুন মুদ্রায় পরিবর্তনের জন্য তৎক্ষণাৎ নিয়ে আসে; কিন্তু সমাহর্তারা শীঘ্রই দেখেন যে তাদের আইনি মুদ্রার সরবরাহ নিঃশেষিত হওয়ায়, হয় তাদের স্থানীয় মুদ্রা গ্রহণ অস্বীকার করতে হবে, অথবা সেইগুলি ধারে নিতে হবে। তারপর যুদ্ধ জনিত ব্যয়ের জরুরি প্রয়োজন দেখা দিল এবং বন্দীদের খাদ্যভাতা ও বাঘ শিকারের পুংস্কার ছাড়া জেলা কোষাগার হতে সমস্ত প্রকার দেয়, আবশ্যিক এক আদেশ পুনর্বহাল করে, বন্ধ করা হলো[১১৩] গরিব জনসাধারণ তাদের পুরানো মুদ্রার সামান্য সঞ্চয় জমা দিয়েছিল; কিন্তু তারা যখন পরিবর্তে নতুন মুদ্রা দাবি করলো, সমাহর্তাদের অখোবদনে বলতে হলো যে সর্বপ্রকার লেনদেন বন্ধ করা হয়েছে।

১৭৯১ সনের ১লা জানুয়ারি রাজনৈতিক দিগন্তে এক আশাব্যঞ্জক কিন্তু ক্ষণিক দ্যুতি চমকিত হলো। ধাতু গলানো, তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা ও পুনর্মুদ্রায়ণের ধীর-গতি, জবরজঙ্গ পদ্ধতি অবশেষে কিছু পরিমাণে ফলপ্রসূ হলো এবং বৎসরের প্রথম দিবসে চারটি টাঁকশাল হতে একযোগে 'পুনর্মুদ্রায়িত টাকা' চালু করা হলো। কিন্তু এই সুখবর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আর একটি আদেশ জারি করা হলো—এই আদেশ বলে জেলা কোষাগার হতে লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ আরো কঠোরভাবে প্রযুক্ত হলো, এবং জনসাধারণকে এই জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো যে, তাদের পুরাতন মুদ্রাগুলি নতুনভাবে মুদ্রায়িত হয়ে যুদ্ধ প্রয়োজনে মাদ্রাজে প্রেরিত হয়েছে।

কিন্তু বসন্তের শুরুতে অজানিতভাবে এই দুর্ভোগ কমে যায়। আসলে গ্রামীণ মহাজন ও শস্য ব্যবসায়ীরা যে শস্য ডিসেম্বরে শহরে পাঠায় বা মাদ্রাজে রফতানী করে তার মূল্য এখন দেওয়া হয় এবং এই মূল্যই নতুন মুদ্রায়িত টাকা' রূপে জেলাগুলিতে ফিরে আসতে থাকে। শীতকালীন শস্য ব্যবসায়ে অস্বাভাবিক লাভ হয়, ফলে গ্রামীণ পুঁজিপতিদের হাতে ধার দেওয়ার জন্য অস্বাভাবিক পরিমাণ টাকা জমে। একই কারণে খাতক শ্রেণীগুলিরও লাভ হয় এবং বসন্ত-কালীন ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রিম দাদন প্রত্যেকেই পায়। বস্তুত সংকটের শেষ হয়; মহান ইংরাজ প্রধানের স্থির সিদ্ধান্ত পরিষদে ও কর্মক্ষেত্রে উভয়তই জয়লাভ করে: শতকরা ১২ হারে সাময়িক ঋণ দ্রুত পূরণ করে, স্থানীয় খাজাঞ্চিখানা লেনদেন শুরু করে, এবং গম্ভীরভাবে হুঁকা পানরত গ্রামীণ বৃদ্ধরা কোম্পানির দিন সত্যসত্যই শেষ হয়েছে কিনা, সেই বিতর্ক শুরু করে।

এর মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান হন; কিন্তু ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে তাঁর শিবির হতে তাঁর ক্রমাগত সতর্কতা প্রতিনিয়ত বাংলার সমস্ত প্রান্তে অনুভূত হতে থাকে। তিনি প্রকৃতই সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিজয় অর্জন করেছিলেন। প্রথমে তিনি নিজস্ব শাসনযন্ত্র গঠন করেন এবং তারপর এতে এইরূপ প্রাণ সঞ্চারিত করেন যে এই যন্ত্র তাকে ছাড়াই কর্মক্ষম হয়। যেসব দক্ষ

ও বিবেচক ব্যক্তির ওপর তিনি মুদ্রা সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করেন তারা, দেশের অবস্থা সামান্য স্বাভাবিক হওয়া মাত্র এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রণী হন যা ভারতে কোম্পানির সরকারের সমগ্র ঐতিহ্যের বিরোধী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের প্রথম পরীক্ষা ছিল সোনার এক আইনি মূল্য নির্ধারণ—এর ফলাফল ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি, এবং বাণিজ্যিক দুর্দশা মূলগত কারণে অর্ধাংশই যে অনিয়ন্ত্রিত দ্বি-মুদ্রা ব্যবস্থা জাত, সেকথা পরিষ্কার বুঝে লর্ড কর্নওয়ালিস মুদ্রা সংস্কারে অপরিহার্য প্রাথমিক কাজ হিসাবে ১৭৮৮ সনে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবস্থা রদ করেন।[১১৪] ১৭৯০ সনে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে, অবশ্য রৌপ্যমুদ্রা অপচয় রোধ করার জন্য তিনি সাময়িকভাবে স্বর্ণমোহর চালু করেন;[১১৫] কিন্তু ১৭৯১ সন শেষ হওয়ার আগেই এই চাপ কমে যায়, এবং লর্ড কর্নওয়ালিস এক আঘাতেই দুই প্রকার মুদ্রা-মাধ্যমের বিপদ চিরতরে দূরীভূত করার সংকল্প করেন। একের পর এক শাসক দ্বিমুদ্রা ব্যবস্থা সুসমভাবে কার্যকরী করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। এই বিষয়ে আরো নিয়মবিধি ও শান্তিব্যবস্থার জন্য জনসাধারণ পুনরায় দাবি জানাচ্ছিল; এই সময়ে মূল্যবান ধাতুগুলির লেনদেনের ব্যাপারে প্রতিটি বাধা অপসারিত করে এক আদেশ জারি করা হয় এবং এইগুলি ব্যবসায়ের সাধারণ সামগ্রী হিসাবে ঘোষিত হয়। দলিলে বলা হয়, 'যেহেতু, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ রৌপমুদ্রা সংগ্রহে অসুবিধা জনিত অভিজ্ঞতার কারণে, স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য দিতে পোদ্দারদের বাধ্য করার জন্য ও বিগত বাজারদর অপেক্ষা নিম্নমূল্যে স্বর্ণমোহর বিনিময়ের যে কোনো প্রচেষ্টাকে শাস্তি-দানের জন্য, পুলিশ অধ্যক্ষের নিকট সম্প্রতি বহু আবেদন করেছেন, সেই কারণে পরিষদের গভর্নর-জেনারেল নির্ণয় করেছেন যে, ভবিষ্যতে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয় স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতু বিক্রয়ের মতোই সর্বদিক দিয়ে অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন হবে, এবং বাজারে অন্যান্য পণ্যের দাম যেভাবে নির্ণীত হয়, সেইভাবেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এইগুলির প্রত্যেকটির বিনিময়মূল্য বা দাম নির্ণীত হবে।[১১৬]

এই নতুন ব্যবস্থা এক বৎসর পরীক্ষামূলক ভাবে চালু রাখার পর লর্ড কর্নওয়া-লিস বাধ্যতামূলক ভাবে পুরাতন মুদ্রা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন।[১১৭] কোনো প্রকারের কোনো ব্যয় ধার্য না করেই পুরাতন মুদ্রাগুলিকে নতুন মুদ্রায় পরিবর্তিত করে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে; এবং তিনি নির্দেশ দিলেন যে বাংলা ১২০০ সালের প্রথম দিন (১০ এপ্রিল, ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ) হতে পূর্ণ মুদ্রা ব্যবস্থাই একমাত্র আইনিমুদ্রা হিসাবে পরিগণিত হবে এবং কোর্টের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকেই হুণ্ডি বা অন্য কোনো লিখিত নোট, ১৯-তম সূর্যমুদ্রিত রৌপ্য-মুদ্রা ব্যতীত,[১১৮] অন্য কোনো প্রকার মুদ্রার অঙ্কিত মূল্যমান অনুসারে পরি-বর্তিত করা যাবে না। ১৭৯৪ সনে আরো ১২ মাস সময়সীমা বাড়ানো হয়,[১১৯] কিন্তু ১৭৯৫ সনে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির দীর্ঘ বিলম্বিত বিজয় অর্জিত হয়। দীর্ঘ দিন ধরে জনগণর দুর্দশার কারণ বিভিন্ন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও কলুষিত মুদ্রা ব্যবস্থাকে

অবশেষে এইভাবে নতুন ও সুসংগত মুদ্রা ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে।

হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণের মাধ্যমে লর্ড কর্নওয়ালিস অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বোপার্জিত যে জ্ঞানের পরিচয় রাখেন, ২৫ বৎসর পরেও ইংল্যাণ্ড তা অর্জন করতে পারেনি এবং আজও তা বহু ইয়োরোপীয় দেশের অনর্জিত। ১৮১৯ সন অবধি পার্লামেণ্ট মূল্যবান ধাতু নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়নি;[১২০] এবং বিচ্ছিন্ন এই ভারতীয় রাষ্ট্রনায়ক তাঁর সংস্কার কার্যক্রম রূপায়িত করার কয়েক বৎসর পর্যন্ত, ব্যবসা বন্ধ হওয়া এবং পরিশেষে মুদ্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও, ফরাসি টাঁকশালে ফরাসি মুদ্রার আপাত মূল্যমান অব্যাহত থাকে।[১২১]

এই ব্যবস্থাগুলি হতেই গ্রামীণ বাংলার ব্যবসায়িক বিকাশের সূচনা—আমি যতদূর জানি কোনো ঐতিহাসিক এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নি। লর্ড কর্নওয়ালিস যে অবস্থায় রেখে যান, ভারতীয় মুদ্রা মূলত সেই কারণেই রয়েছে; রৌপ্য মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলিত মাধ্যম এবং মোহর বা সাম্প্রতিক গিনি, যে রূপেই হোক, সোনা মান পরিবর্তনক্ষম মূল্যবান ধাতু হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু মুদ্রা অপরিবর্তিত থাকলেও মুদ্রাব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কোম্পানির অধীনে ভারতের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড কর্নওয়ালিস যা করেন, সেই কাজই সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষের জন্য মিঃ জেমস উইলসন করেন: তিনি মুদ্রা-মাধ্যমের মূল্য চাহিদার সমান করেন। বিগত ১০ বৎসরে গ্রামবাংলার উৎপাদিকা শক্তি যে কোনো প্রকার আতঙ্ক বা অসুবিধা ছাড়াই বিকশিত হতে পেরেছে তা মিঃ উইলসনের পত্র-মুদ্রা ব্যবস্থার দান।

রাজস্ব সমাহর্তা ও সরকারি কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বের পরেই ছিল জেলার বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে মিঃ কিটিং-এর ভূমিকা। শেষোক্ত এই দায়িত্বগুলি অবশ্য তাঁকে বিশেষ বিব্রত করেনি। যতক্ষণ না দস্যুবৃত্তি দেশ জনশূন্য করেছে এবং তদ্বারা ভূমিরাজস্ব আদায় বিঘ্নিত হয়েছে, ততক্ষণ তাঁর হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন ছিল না; লুণ্ঠন এই পর্যায়ে পৌঁছালে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই কাজে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি; কিন্তু কোম্পানির কর্মচারিরা, অন্তত মিঃ কিটিং-এর মতো বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ কর্মচারিবৃন্দ যে শুধু আর্থিক দৃষ্টিকোণ হতে তাদের দায়িত্ব বিচার করতেন, সেকথা বুঝতে না পারা অসম্ভব। পুলিশ সম্বন্ধে মিঃ কিটিং-এর সর্বোত্তম রিপোর্টগুলি প্রশাসক হিসাবে নয়, এবং সমাহর্তা হিসাবে রচিত। প্রজাবৃন্দের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁর আশংকা ছিল না, ছিল ভূমিরাজস্ব আদায় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা তাঁর দায়িত্বের অংশ ছিল না এবং তিনি সে চেষ্টাও করেন নি। লঘু অপরাধের শাস্তি বিধানেই তাঁর অপরাধ সংক্রান্ত আইনি এখতিয়ার সীমিত ছিল,[১২২] —অতি সরল পদ্ধতি অনুসৃত হতো, কোনো প্রকার লিখিত

আদেশ পর্যন্ত দেওয়া হতো না; একটি মাত্র ঘটনাকে তিনি লিখিত আকারে রাখার যোগ্য মনে করেন—এইটি ছিল জেল ভাঙার ঘটনা—কাগজপত্র হতে বোঝা যায় যে এইক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন না, ছিলেন এক প্রতি-হিংসাপরায়ণ অফিসার।

তখন পর্যন্ত পুলিশবাহিনী দেশীয় কর্মচারিদের অধীনেই ছিল; এবং এর অপ-ব্যবহারের সাথে তুলনায় আর্থিক বিচার বিভাগীয় অসামান্য বিচ্যুতিগুলি আর চোখে পড়ে না। পুলিশ বাহিনী দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল; এক দলের দায়িত্ব ছিল সীমান্ত রক্ষা, আর জেলার অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা ছিল অন্যটির দায়িত্ব। উভয়েরই ধ্বংসাবশেষ-চিহ্ন আজও বর্তমান, কিন্তু সরকারি কাজকর্ম হতে প্রথম দলকে অব্যাহতি দেওয়ার ফলে তাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা লুপ্ত হলেও দ্বিতীয় দল আজও গ্রামীণ প্রশাসনে দুষ্টক্ষত আকারে বর্তমান। সীমান্ত পুলিশদের অর্থাৎ 'ঘাটোয়াল'দের সামাজিক অবস্থান বহু পরিমাণ পৃথক হলেও, 'গিরিপথ বা ঘাটগুলি রক্ষা করার শর্তে পাহাড়ি অঞ্চলের প্রান্তে অবস্থিত জমির অনুদান' সাপেক্ষে তারা এই পার্থক্য মেনে নেয়।[১২৩] মূলত উত্তর-ভারতের দুঃসাহসী ব্যক্তিরা, আফগান ও রাজপুতরাই এই বৃত্তিতে ছিল—নিম্নবঙ্গের অভিজাত সম্প্রদায় এদের উত্তরের শৌর্য ও তীক্ষ্ণ তরবারি ভাড়া করতেন। কখনো কখনো এরা এক পূত চরিত্রের ভান করত এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় ধর্মীয় 'নাইট'দের সাথে অদ্ভুত যদিও অসম্পূর্ণ এক প্রকারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রকৃতই অন্য কোনো কিছুই, একাধারে সন্ন্যাসী ও যোদ্ধার সংমিশ্রণের মতো এক কার্যকরীভাবে সীমান্তের বন্য উপজাতিদের আতংকিত করতে পারত না এবং বীরভূমের ফরাসি নথিপত্রে প্রকাশ পায় যে রাজারা সন্ন্যাসী-ঘাটোয়ালদের কত মূল্য দিতেন। এক-বার উত্তর হতে আগত এক সাধুকে, গিরিসংকট রক্ষার শর্তে, নবাব কিছু অর্থের সাথে পশ্চিম বীরভূমের বনাঞ্চলের জমি দিতে চান। সন্ন্যাসী জবাব দেন যে তিনি সীমান্তে বসবাসে ইচ্ছুক, কিন্তু আগুনে কাঠ জোগাবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন ততটুকু জঙ্গল এবং স্নানার্থে পুষ্করিণীর জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু জমিই তাঁর কাম্য।[১২৪]

পুরাতন নথিপত্রে সীমান্তরক্ষীরা জমির মালিক অপেক্ষা, ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে বেশি পরিচিত। ভোগদখল করলেও সীমান্তের জমিতে তাদের কোনো মালি-কানা স্বত্ব ছিল না, ঐ সকল জমির খাজনা হতে একটা ভাতা পাওয়ার অধি-কার তাদের ছিল এবং তারা নিজেরাই তা আদায় করতো; এবং দেশীয় দলিলপত্রে তাদের, বর্গাদার হিসাবে নয় রাজার অধীনস্থ সহকারি'[১২৫] হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য, তাদের নিযুক্তি বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবল প্রব-ণতা সম্পন্ন ছিল; এবং ১৭৯০ সনে তাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ কিটিং বলেন যে, 'বর্তমান সমস্ত 'ঘাটওয়াল'রা বংশানুক্রমে উদ্ভূত'[১২৬] তাদের অধিকার দাবি

করতে আহ্বান করায় অবশ্য দুইজন মাত্র হাজির হয় এবং এরা মালিকানা স্বত্ব দাবি করে ;[১২৭] মুসলমান আইন অনুসারে, আদালত এই স্বত্ব যে বংশানুক্রমিক নয় এবং দীর্ঘদিন দখল বজায় রাখলেও আদি স্বত্বনামার মূলগত ত্রুটির কারণে যে এই স্বত্ব কায়েম হওয়ার নয়, সেই কথা সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণা করে।' কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সর্বদা ভোগদখলি স্বত্বের অনুকূলে থাকায়, সীমান্তরক্ষীদের কর্মভার হতে অব্যাহতি দিলেও, প্রকৃত অর্থে তাদের সকল সুবিধা ভোগ করতে দেয় ; যদিও ১৮১৪ সনের আগে আইনসভা তাদের অধিকার সুনির্দিষ্ট করেনি।[১২৮]

দেশীয় শাসনাধীনে এই সীমান্ত সৈন্যদল কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতো, তা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজরা এই জেলার শাসনভার গ্রহণের সময় পাহাড়িয়ারা ইচ্ছামাফিক যত্রতত্র বিচরণ করতো এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রাথমিক প্রচেষ্টার পর্যায়ে দুইবার মাত্র সীমান্তরক্ষীদের উল্লেখ রয়েছে, একবার দস্যুদল বিতাড়িত পলাতক হিসাবে, অন্যবার তাদের নেতা হিসাবে।

অভ্যন্তরীণ পুলিশ প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুরূপ ছিল, এবং ফলাফলও অভিন্ন ছিল। রাজা নিজের রাজ্য অত্যন্ত অসম আকারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করতেন, প্রত্যেক অঞ্চলের দায়িত্বে থাকত একজন করে দেশীয় অফিসার, নথিপত্রে অনুসারে, রাজস্ব আদায়ের নায়েবদের সহায়তা করাই ছিল তার প্রধান কাজ। এইজন্য তার অধীনে কিছু সংখ্যক সৈন্য ও পাইক-পেয়াদা থাকত, তার গৃহের চারিপাশে মূলত তাদের আবাসস্থল থাকত ; এবং এইভাবে ক্ষুদ্রাকায় যে সেনা-নিবাস গড়ে উঠতো, তা 'থানা' নামে পরিচিত হতো – কখনো কখনো এর সাথে একটা দুর্গ থাকলে এর মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটতো। প্রধান অধিকারিক বা 'থানাদার'এর আয়ের উৎস ছিল হয় রাজস্বের এক অংশ, অথবা ভোগদখলের জন্য জমি ; প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সে অধীনস্থদের বেতন দিত আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে দিত সামান্য নিষ্কর জমি। ঘাটোয়ালদের মতোই থানাদারের পদটিও বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবণতা ছিল, কিন্তু তুলনায় রাজার সন্নিকটে থাকার ফলে এই প্রবণতা একই মাত্রার হতে পারেনি, এবং এই পদ কোনো পরিবারের দখলে যত দীর্ঘদিনই থাকুক না কেন, সবসময়েই এক নতুন ও আনুষ্ঠানিক নিযুক্তির মাধ্যমে উত্তরাধি-কারী কর্মভার গ্রহণ করেছে। আঞ্চলিক এই সদর দফতর অর্থাৎ থানায় এই সব ছাড়াও, খাজনা আদায়ে সহায়তার জন্য, বকেয়া খাজনা আদায়ে সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য এবং রায়তদের বাস্তত্যাগ রোধ করার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামে তার অধীনস্থদের এক বা একাধিকজনকে রাখা হতো। অন্যান্য সাধারণ গ্রামগুলিতে এই কর্মচারিরা নিজেরাই খাজনা আদায় করত এবং আবগারি শুল্ক সহ অন্যান্য যেসব শুল্ক রাজা আরোপ করতেন, সর্বত্রই সেইগুলির বিশেষ দায়িত্ব এদের থাকত। কয়েকটি জেলায় থানা হতে সরাসরি তাদের বেতন দেওয়া

হতো ; অন্যত্র, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মতো যেখানে রাজাদের এক প্রকারের আধা-স্বাধীনতা ছিল ও যেখানে হিন্দু প্রথাগুলি মুসলমান কেন্দ্রিকতা সাফল্যের সাথে প্রতিহত করেছিল, সেইখানে এই গ্রাম্য কর্মচারিরা ভাতা হিসাবে সামান্য নিষ্কর জমি ভোগ করতো। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রাচীন হিন্দু আমলের বংশানুক্রমিক চৌকিদারদের স্থান দখল করে ও বিষ্ণুপুরের মতো সম্পূর্ণ হিন্দু রাজ্যে কখনো কখনো বংশানুক্রমিক ভাবে আদি পরিবারগুলির প্রতিনিধিত্ব করত। কিন্তু, এমনকি বিষ্ণুপুরেও তাদের পদ বংশগত হিসাবে স্বীকৃত ছিল না, এবং থানাদারের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিটি উত্তরাধিকারীর জন্য রাজা নতুন নিয়োগ ঘোষণা করতেন, সেই রকম এইখানেও প্রত্যেকটি উত্তরাধিকারীর জন্য থানাদার নতুন নিয়োগ জারি করত।

পুলিশ কর্মচারিরপরিবর্তে আমি রাজস্ব বিভাগের অফিসারদের কথা বলছি বলে আপত্তি উঠতে পারে। এই আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ; তবুও, আমার বর্ণনা তখনকার দিনে একমাত্র যে পুলিশ ছিল, তাদের বিশ্বস্ত চিত্রণ। সক্রিয় একজন ভূস্বামীর অধীন থানাদের কর্মকাণ্ড ছিল মূলত আর্থিক ; কিন্তু একজন নিষ্ক্রিয় বা দুর্নীতি পরায়ণ ভূস্বামীর অধীনে তারা একেবারে লুঠেরা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সরকারি সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য ভূস্বামীরা দায়ী থাকে এবং যেহেতু ভূস্বামীদের কাছে থানাদারদের জবাবদিহি করতে হয়, সুতরাং তাদের কয়েক ক্ষেত্রে পুলিশের কর্তব্য পালন করতে হতো। এই কারণেই, বাস্তবে তারাই যে তাদের এখতিয়ারভুক্ত সকল সম্পত্তি রক্ষার জন্য দায়ী, এই প্রচলিত ধারণা সৃষ্ট হয়েছে ; কিন্তু, আদি পর্যায়ের তথ্য যাই হোক না কেন, সাম্প্রতিক মুসলমান আমলে এই দায়িত্ব সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুত লর্ড কর্নওয়ালিস ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই দায়ভার প্রসারিত করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।[১২৯] জনমত এই কর্মধারার বিরোধিতা করে ; 'কলিকাতা গেজেট' সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্ব নামে মাত্র ছিল, এর বাস্তব কোনো কার্যকারিতা ছিল না ; এবং মিঃ কিটিং প্রতিদিন ডাকাতির কথা সরকারকে জানালেও, মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে তিনি এই দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হন। এইগুলির মধ্যে দুইটি ক্ষেত্রে লুণ্ঠিত সরকারি অর্থের ক্ষতিপূরণে ভূস্বামীদের বাধ্য করা হয় এবং তৃতীয় ঘটনায় কোম্পানির লুণ্ঠিত কিছু দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার করা হয় ; কিন্তু একটিমাত্র ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য এই দায়িত্বভার কখনো গৃহীত হয়নি।

তৎসত্ত্বেও, পুলিশখাতে প্রাদেশিক বার্ষিক বিপুল পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হয়েছে। ১৭৬৫ সনের চুক্তি অনুসারে কোম্পানি যে শুধু আর্থিক প্রশাসন গ্রহণ করে এবং ফৌজদারি ও পুলিশ ব্যবস্থা নবাবের দায়িত্বে থাকায় তিনি আমাদের কোষাগার হতে ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ ৮০ হাজার

পাউণ্ড এবং আদালত পরিচালনা ও উপযুক্ত পুলিশি ব্যবস্থার জন্য বার্ষিক ৩ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড গ্রহণ করতেন।[১৩০] ১৭৯০ সন পর্যন্ত নবাব প্রধান প্রশাসনের দায়িত্ব ও ধরন-ধারণ বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো কর্তব্য পালন করেন নি। ১৭৬৫ হতে ১৭৬৯ সন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার ভানও তিনি করতেন না : ফলে নিয়মিত ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখা দেয়; 'কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অন্যদের বাধ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তি এর সুযোগ গ্রহণ করতো।'[১৩১] ওয়ারেন হেস্টিংস দাবি করলেন যে, দেয় অর্থের পরিবর্তে নবাবকে অন্তত দায়িত্ব পালনের ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে। ১৭৭২ সনে, এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় সর্বোচ্চ ফৌজদারি ন্যায়ালয় ও প্রত্যেক জেলায় এর অধীনস্থ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ১৭৭৫ সনে সর্বোচ্চ ফৌজদারি ন্যায়ালয় নবাবের আবাসস্থল মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয় ও ১৭৯০ সন পর্যন্ত সেইখানেই থাকে। নবাবি বৈঠকখানার কলুষিত পরিবেশে যে কোনো প্রকার বিচারের কণ্ঠরোধ করে ; গরিব জনসাধারণ ও তাদের সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থভাণ্ডার নর্তকী আর রক্ষিতারা গ্রাস করে ; এবং ১৭৭৫ হতে ১৭৯০ সন পর্যন্ত, অশিক্ষিত ও দুশ্চরিত্র মুসলমানদের নিকট বিচারকদের পদ বিক্রয় করেই সমগ্র ফৌজদারি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে —এই সকল লোকের আদালত ছিল নিষ্পেষণের নিশ্চিত উপায় বিশেষ।

হস্তক্ষেপের কোনো বৈধ অধিকার কোম্পানির ছিল না। চুক্তি অনুসারে, রাজস্ব আদায় ছিল কোম্পানির কাজ ; এবং যে কর্তৃপক্ষ তাদের আর্থিক দায়িত্ব অর্পণ করে, তারাই নবাবকে ফৌজদারি প্রশাসনে নিযুক্ত করে। সচরাচর ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ওয়ারেন হেস্টিংস নবাবের দরবার তত্ত্বাবধানের অধিকার সাময়িক ভাবে আত্মসাৎ করেন, কিন্তু দ্রুত তিনি পশ্চাদপসরণ করেন ; এবং তাঁর শাসনের প্রথম চার বৎসর পর্যন্ত লর্ড কর্নওয়ালিসও সবচেয়ে জরুরি এই আপদকে স্পর্শ করতে সাহসী হননি। নিয়মিত পুলিশ বাহিনী (ফৌজদারি ব্যবস্থা) রাখতে নবাবকে বাধ্য করার ক্ষমতা না থাকায়, কোম্পানি আর্থিক প্রয়োজনের জন্য পুলিশ বাহিনীর (থানাদারি ব্যবস্থা) মাধ্যমে যেটুকু সম্ভব, ততটুকু করে, এবং শীঘ্রই নিয়মিত ফৌজদারি পুলিশের অস্তিত্বটুকুও সকলে বিস্মৃত হয়।

কিন্তু ১৭৯০ সনে লর্ড কর্নওয়ালিস মুসলমান অপশাসনের এই শেষ ঘাঁটিতে আঘাত হানেন।[১৩২] চরম অপব্যবহৃত নবাবের বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্ব তিনি কেড়ে নেন, কিন্তু ঘৃণাভরে নবাবের ভাতা যা ছিল তাই রেখে দেন, এবং গভর্নর-জেনারেলও পরিষদের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠিত করেন ; এছাড়া থাকে চারটি পরিভ্রমণকালীন আদালত—প্রতেকটির শীর্ষে থাকে দুইজন করে অভিজ্ঞ ইংরাজ অফিসার। যে নগণ্য অপরাধগুলি এই সকল আদালতে আসার যোগ্য ছিল না, ইংরেজ জেলাশাসক সেইগুলির বিচারের

ভার নিতেন। কলিকাতার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সমগ্র ব্যবস্থাটির তত্ত্বাবধান করতেন। প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনী সহ মুসলিম ফৌজদারি বিধিই দেশের আইন হিসাবে গণ্য হতে থাকে এবং বিচারাসীন জেলাশাসক বা বিচারপতির নিকট এই বিধিগুলির ব্যাখ্যার জন্য মুসলিম পণ্ডিত রাখা হতো।

নূতন আদালতগুলি প্রথমে থানাদারি পুলিশের মাধ্যমে ফৌজদারি প্রশাসন পরিচালনার চেষ্টা করে। এইটাই ছিল তৎকালীন একমাত্র পুলিশ বাহিনী এবং এই বাহিনী নূতন এই দায়িত্বের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হয়। আসলে, এইসব নূতন দায়ভার অর্পণ করে থানাদারি পুলিশকে বিড়ম্বিত করার কোনো অধিকার সরকারের ছিল কিনা সেইটাই সন্দেহের ব্যপার ছিল, এবং শীঘ্রই স্পষ্ট হলো যে এই দায়িত্ব পালনে সুনিশ্চিত করার কোনো ক্ষমতা জেলাশাসকের নেই। থানাদাররা সমভাবে কখনো দস্যুদলের, কখনো কর্তৃপক্ষের পক্ষাবলম্বন করতো। এমনকি দৃঢ়মনা মিঃ কিটিং-ও তাদের সাথে কাজ করতে সক্ষম হলেন না। বস্তুত তারা তাঁর কর্মচারি ছিল না। তিনি তাদের নিয়োগ করেন নি, তিনি তাদের পদচ্যুত করতে পারতেন না; এমনকি বিচারকের সম্মুখে আইনি পদ্ধতি ব্যতীত, তাদের শাস্তিবিধানও সম্ভব ছিল না, এবং তিনি তিক্তভাবে অভিযোগ করেন যে 'তাদের সাধারণ আচরণ সম্বন্ধে বা তাদের কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ করে লিখিত কোনো নির্দেশাদি অনুপস্থিত।'[১৩৩] বিড়ম্বিত দুইটি বৎসরের পর লর্ড কর্নওয়ালিস বুঝলেন যে নির্দেশাদি কার্যকরী করার প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যতীত আদালতগুলি মূল্যহীন হয়, এবং থানাদারি পুলিশ হতে নিয়মিত এক বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। থানাদারি ব্যবস্থাকে তিনি দুইটি ভাগে বিভক্ত করলেন, —থানার সাথে সংযুক্ত একদল যারা নিয়মিত বেতন পেত এবং আর এক দল যারা গ্রামাঞ্চলে থাকত ও নিষ্কর জমি ভোগ করত। প্রথমোক্ত শ্রেণীকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভূস্বামীদের কবলমুক্ত করলেন, সরকারি কোষাগার হতে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং এদের ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে দুইটি কারণে তিনি কোনো হস্তক্ষেপ করলেন না। প্রথমত—বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মতো জেলাগুলিতে গ্রামীণ থানাদারি পুলিশ হিন্দুদের জাতীয় সংস্থাগুলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং লর্ড কর্নওয়ালিস প্রতিটি জাতীয় সংস্থাগুলিকে আধুনিক প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। তারা কিয়ৎ পরিমাণে বিবর্তিত প্রাচীন গ্রাম্য চৌকিদারি ব্যবস্থার প্রকৃত ভগ্নাবশেষ হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি এইভাবেই তাদের রেখে দিতে আগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয়ত—সমসংখ্যক লোকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় তাদের জন্য সরকারের খরচ কম ছিল। খাজনা হতেই তাদের বেতন হতো অর্থাৎ কোনো প্রকার খাজনা না দিয়ে তারা সামান্য জমি ভোগ করতো, রাজনীতিগত ভাবে এই খাজনার দুইটি অংশ ছিল, একটি সরকারের প্রাপ্য ভূমিরাজস্ব, অপরটি ভূস্বামীর প্রাপ্য, প্রকৃত

খাজনা ও ভূমিরাজস্বের পার্থক্য জনিত উদ্বৃত্ত। যেসব জেলাগুলি প্রত্যক্ষ মুসলিম নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, সেইখানে তথাকথিত ভূস্বামীরা[১৩৪] রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র ছিল, সেইখানে বৈধ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল শতকরা মাত্র ১০ ভাগ; কিন্তু যে জেলাগুলি আধা-স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল বা অর্জন করেছিল, সেইখানে ভূস্বামীরা প্রকৃত রাজা ছিল ও বরীভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের মতো নজরানা দিত, সেইখানে উদ্বৃত্ত নামমাত্র ভূমিরাজস্ব অপেক্ষা বহুগুণে বেশি হতো। শেষোক্ত ক্ষেত্রেই গ্রামীণ চৌকিদারি ব্যবস্থা মূলত সমৃদ্ধ হতো, এবং লর্ড কর্নওয়ালিস বিজ্ঞতার সাথে অত্যন্ত কম সরকারি খরচে এই দলের সমর্থন বজায় রাখেন।[১৩৫] তাদের নিযুক্তির অধিকার ভূস্বামীরা বজায় রাখেন, কিন্তু নিয়মিত পুলিশবাহিনীর মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ তদারকি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষভাবে ইংরাজ জেলাপ্রধানের তদারকি তাদের মেনে নিতে হয়।

১৭৯২ সন হতে এই দুই শ্রেণীর পুলিশ বাংলা দেশে পাশাপাশি থাকে: পুরাতন থানা ব্যবস্থার ভিত্তিতে নিয়মিত এক বাহিনী, যাদের বেতন টাকায় দেওয়া হতো এবং পুরাতন গ্রামীণ চৌকিদারি ব্যবস্থার প্রতিনিধি স্বরূপ অনিয়মিত এক বাহিনী, যাদের সামান্য পরিমাণ নিষ্কর জমি ভোগ করতে দেওয়া হতো। উভয় শ্রেণীরই ছিল নিজস্ব ত্রুটি, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ছিল আকস্মিক ও তার প্রতিকার ছিল সহজসাধ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্রুটিগুলি ছিল ব্যবস্থায় নিহিত ও ব্যবস্থা পরিবর্তন ব্যতীত এই ত্রুটিমুক্ত হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। প্রথমত—চৌকিদারি খুব অসমভাবে বিস্তৃত ছিল। রেলপথ ও রাস্তা-ঘাটের বৃদ্ধির ফলে শিল্প ও জনসংখ্যা প্রাচীন কেন্দ্র ছেড়ে নূতন নূতন পথে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু পুলিশব্যবস্থা অনড় থেকেছে; ফলে প্রাচীন পরিত্যক্ত গ্রামে কখনো কখনো তিন বা চারজন চৌকিদার দ্বারা বিডম্বিত হয়েছে, অথচ নূতন জনবহুল গঞ্জে একজনও চৌকিদার ছিল না। দ্বিতীয়ত—চৌকিদারদের দুই প্রভুকে তুষ্ট করতে হতো, বস্তুত সারাদিন সে জমিদারের কাজ করত, ফলে রাত্রে কয়েকটি নিদ্রাজনিত রোঁদ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট তার কাছ হতে আর কোনো কাজ পেতেন না। তৃতীয়ত—যেহেতু ভূস্বামী তাকে নিযুক্ত করতো এবং সে তারই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তাই তার প্রধান প্রভুকে তুষ্ট করার মতো খবরাদি সে ম্যাজিস্ট্রেটকে দিত। চতুর্থত—দফতরগত ভাবে তাকে দণ্ড দেওয়ার কোনো ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের ছিল না। চাকুরির সময় নিদ্রিত থাকলে শাস্তিদানের জন্য তাকে আদালতে হাজির করতে হতো, বহুদূর হতে সাক্ষীদের আসতে হতো, সরকারি উকিল নিযুক্ত করতে হতো এবং ১ শিলিং জরিমানা দিয়ে বিচারের প্রহসন শেষ হতো। পঞ্চমত—উচ্চতর কোনো পদ না থাকায় তার উন্নতি বিধানের বা পুরস্কারের কোনো ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের ছিল না এবং ফলত সমগ্র বাহিনী অনড় এক অযোগ্যতায় নিমজ্জিত ছিল। গ্রামীণ পুলিশের গঠনগত এই ত্রুটি-

গুলির কয়েকটি প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগে বিকাশের ও তজ্জনিত জাতীয় সমৃদ্ধির ফলশ্রুতি। অন্যান্যগুলি এই ব্যবস্থার মতোই প্রাচীন। ১৭৯১ সনে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটদের এই অভিযোগরত দেখি যে তাঁরা দপ্তরগত ভাবে পুলিশকে শাস্তিদানে অক্ষম এবং সরকারি বিচারের কোনো বিপদ ছাড়াই প্রতিটি গ্রামীণ চৌকিদার এর সুবিধা ভোগ করছে।[১৩৬]

গ্রামীণ নথিপত্রে পর্যালোচিত হয়ে থাকলে বাংলা দেশে এই ত্রুটিপূর্ণ গ্রামীণ পুলিশি ব্যবস্থাজনিত দুর্দশার অবসান হতো। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা দেখেছেন যে, প্রাচীন হিন্দু আমলে সম্পত্তি ও শান্তিরক্ষার জন্য প্রতিটি গ্রামে বংশানুক্রমিক ভাবে একজন চৌকিদার থাকত। ভারতীয় কর্মচারি গ্রামের সাথে সংযুক্ত পুলিশ কর্মচারি দেখেই তাকে সেই প্রাচীন হিন্দু চৌকিদার গণ্য করলো এবং সেই কারণেই তার কাজকর্মে হস্তক্ষেপ দ্বিধান্বিত হলো। কিন্তু নথিপত্রে প্রমাণ করে যে মুসলিম আমলে গ্রামের চৌকিদারের সাথে আদিম চৌকিদারে খুব বেশি হলে এক ক্ষীণ সংযোগ থাকতে পারে এবং কয়েকটি জেলায় আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। হাল আমলের চৌকিদারি বংশানুক্রমিক নয়; সমগ্র গ্রামীণ জনপদের পরিবর্তে শুধু ভূস্বামীর নিকটই সে উত্তরদায়ী এবং ভূস্বামীর মাধ্যমেই তার নিযুক্তি ঘটে। তার কাজকর্ম মূলত অর্থনীতি ঘটিত এবং ফৌজদারি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এক প্রতিষ্ঠিত সংস্থার—একজন মুসলিম কাজীর নেতৃত্বে—প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে সে কাজ করে। ১৭৬৫ সন ও ১৭৯০ সনের মধ্যে, যে পযন্ত প্রাদেশিক ফৌজ-দারি প্রশাসন নবাবের হস্তাধীন থাকে, তিনি নিয়মিত এই ব্যবস্থাকে বিনষ্ট হতে দেন, এবং গ্রামীণ চৌকিদারদের উপর কোম্পানির অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকায়, কোম্পানি তাদের ঘাড়ে ফৌজদারি পুলিশের কর্মভার চাপাতে চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়; কিন্তু পৌনে এক শতাব্দী ব্যাপী উৎকোচ, উৎপীড়ন ও দুষ্কর্মে সহায়তা সত্ত্বেও গ্রামীণ চৌকিদারি ব্যবস্থা টিঁকে থাকে। এইভাবে, দেশের প্রাচীন হিন্দু প্রথা দ্বারা সঠিকভাবেই রক্ষিত হয়ে মুসলিম অপশাসনজাত এই ব্যবস্থা আমাদের হাতে আসে।

এইভাবে প্রাপ্ত গ্রামীণ পুলিশের বিপুল হতচ্ছিন্ন বাহিনী প্রদেশের সকল উদ্যোগ গ্রাস করে। একমাত্র বীরভূমে তাদের সংখ্যা ৮৯১৬ ছিল[১৩৭]; এই ছাড়াও, নিয়মিত আরক্ষা বাহিনীতে রয়েছে ৩৭০ জন, অর্থাৎ সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশ মিলিয়ন জনসমুদায় সুরক্ষার জন্য সর্বমোট ৯৩৪৬ জন নিয়োজিত রয়েছে।[১৩৮] সংবাদপত্র অনুসারে, তিন থেকে চার মিলিয়ন জন অধ্যুষিত লণ্ডনে পুলিশের সংখ্যা মাত্র ৬১০০ জন। সুতরাং বীরভূমে, প্রতি ৩৭ জন অধিবাসীর জন্য একজন পুলিশ রয়েছে, আর লণ্ডনে একজন পুলিশ রয়েছে প্রতি ৫ হতে ৬ শত অধিবাসীর জন্য। অবশ্য লণ্ডনে, পুলিশ প্রকৃতপক্ষেই 'বাহিনী' আকারে সজ্জিত, বাংলা দেশে চৌকিদাররা হলো বিচ্ছিন্ন জনতা মাত্র, কোনো প্রকার আনুগত্য

বর্জিত পেশাগত মর্যাদা বোধহীন এবং এই মর্যাদা জনিত সম্মান বোধহীন, জরুরি প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য নয়, স্বকীয় পুলিশি তৎপরতা গ্রহণে অনিচ্ছুক, জনসাধারণের রক্ষক নয় বরং ভক্ষক এবং প্রায়শই অপরাধ দমনের বদলে সহায়তাকারী।

কিন্তু এমনকি সেই আমলে এই শোচনীয় পুলিশি ব্যবস্থাও অসুবিধাজনক ভাবে দক্ষ প্রমাণিত হয়। ফৌজদারি প্রশাসনকে নবাব ভেঙ্গে পড়তে দেন এবং আদালত যে সংখ্যক বন্দীর বিচার সম্পন্ন করতে পারেন, চৌকিদার তার থেকে বহু বেশি প্রেরণ করে। জেলে বন্দীদের অর্ধাংশেরও বেশি, 'মুসলিম কাজীর নিকট শৃংখলিত অবস্থায় প্রেরণের জন্য,' সন্দেহ ক্রমে ধৃত ছিল। কয়েকটি জেলায় তাদের বিচারের জন্য কোনো বিচারালয় ছিল না। সামরিক দায়িত্বে প্রেরণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বন্দী জড়ো না হওয়া পর্যন্ত তাদের শ্বাসরোধকারী অন্ধকূপে থাকতে হতো। বিলম্বিত গ্রেফতারের ফলে অনিশ্চয়তার এই পর্যায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য দীর্ঘায়িত হতো; এবং অবশেষে যখন এই হতভাগ্যের দল যাত্রা শুরু করত, তখন বর্ষার বারিধারা বা শীতকালীন নৈশ হিমেল কাঁপুনি হতে আত্মরক্ষার জন্য ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডটুকুও তাদের থাকত না। শৃংখলভারে টলমল, খাদ্যাভাবে পথে পরিত্যক্ত, দেহ জংলি কাঁটাঝোপে ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্ষীদের তলোয়ারের আঘাতে জর্জরিত হয়ে অবশেষে তারা যখন বিচারস্থলে উপনীত হয়, তখন মুসলিম কাজীর অবসর ও মর্জি মাফিক তাদের বিচার হওয়া পর্যন্ত তাদের জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। এমনকি বিচারের দিনও কোনো ফয়সালা হয় না: নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কর্মচারিদের ঘুষ দিতে হতো, অন্যথায় নূতন প্রমাণের সম্ভাবনার অজুহাতে আবার জেলে পাঠানো হতো, কিন্তু প্রায়শই কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হতো না। অবিশ্বাস্য শোনালেও এইটা ঘটনা যে বীরভূম জেলের এক বৃহৎ সংখ্যক অপরাধীকে এইভাবে 'যতদিন ইচ্ছা জেলে রাখার' সাজা দেওয়া হয়—এই সাজা একটি আইনি সূত্র, শাদা বাংলায় যার সরল অর্থ হলো আদালতের জীবরা হতভাগ্য বন্দীর বন্ধু-পরিজন হতে শেষ কপর্দকটি আদায় না করা পর্যন্ত মুক্তি মিলবে না।

বন্দীদের খাদ্য ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ইংরাজ জেলা প্রধানের ছিল, কিন্তু সেইখানেই তাঁর দায়িত্বের ইতি। তাদের দুর্দশা প্রশমনের জন্য তাঁর যেটুকু করার ছিল মনে হয় তিনি তা করেন, এবং নথিপত্রে প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকারও এই বিষয়ে খুব দরদী তত্ত্বাবধান করেন।[১৩১] কিন্তু, জেলের ভগ্নদশার কারণে পলায়নের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সতর্কতা গৃহীত হয়, এবং জেল সংস্কারের বিষয়টি গ্রহণ করার সময় লর্ড কর্নওয়ালিস লক্ষ্য করেন যে প্রচলিত রীতি হলো 'বন্দীদের বেড়ী পরিহিত বা শৃংখলাবদ্ধ রাখা, অথবা তাদের বাঁশের সাথে ফেলে রাখা, অথবা রাত্রে তাদের বদ্ধ কক্ষে অবরুদ্ধ রাখা'—গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পরিবেশে এই

পদ্ধতির অর্থ অতি অল্প সময়ে মৃত্যুদণ্ড দান করা। 'যেসব অভিযোগ বা মামলায় তাদের বন্দী করা হয়েছে' সেইগুলির জন্য নয় বরং শুধু জেলের নিরাপত্তার অভাবে এছাড়া পলায়ন রোধের অন্য কোনো উপায় কারাপ্রধানের থাকে না।[১৪০]

১৭৯২ সনের আগে বাংলার কারা শৃংখলার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি হাতে নেয়নি, এবং এর ফলে পরপর যে বিরাট সংস্কার ঘটে সেইগুলি বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য নয়। পরবর্তী বৎসরে ভারতবর্ষে নাগরিক ন্যায়-বিচারের কার্যকরী যে ব্যবস্থা বিরক্তিকর ও অনিশ্চিত পদক্ষেপের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, সেইগুলি বর্ণনা করা আমার বর্তমান আলোচনার মধ্যে পড়ে না। বীরভূম ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার পরের কয়েক বৎসরে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনে প্রকৃত অবস্থা পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করাই যথেষ্ট। হিন্দু ও মুসলিম আইন গঠনের উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর আলোকপ্রাপ্ত প্রয়াস হতে আমাদের প্রাথমিক প্রশাসন সম্বন্ধে যাদের ধারণা গঠিত হয়েছে, এইগুলির এই বাস্তব রূপায়ণের সম্মুখীন হয়ে তারা নিশ্চিতরূপে কিঞ্চিৎ হতচকিত হবেন।

কারণ নথিপত্র নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, ১৭৯০ সন পর্যন্ত বাংলা দেশে নাগরিক ন্যায়বিচার অজ্ঞাত ছিল। বিচারকের দায়িত্ব জেলা সমাহর্তার কর্তব্যের অংশমাত্র, তুচ্ছতম অংশমাত্র ছিল। রাজস্ব আদায় ও দস্যুতা দমনের ফলে তাদের বিবাদ বিসংবাদ শোনার না ছিল অবসর, না ছিল মেজাজ; এবং হেস্টিংস কর্তৃক সুচারুভাবে প্রকাশিত, নিজের অভিমত বলপূর্বক প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তি বিচারক হয়ে দাঁড়ায়। একটিমাত্র জেলার—বীরভূমের—কিছু পরিসংখ্যানই ছিল যথেষ্ট। সেই সময়ে সংযুক্ত জেলার আয়তন ছিল বর্তমান আয়তনের তিনগুণ এবং অধিবাসীর সংখ্যা অন্যূন ১০ লক্ষ।[১৪১] বিচারক ছিলেন মাত্র একজন, ছয়টি অফিস দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল তাঁর, এবং এর প্রতিটিকেই তিনি বিচার বিভাগীয় কাজকর্মের অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।[১৪২] পরবর্তীকালে সংযুক্ত জেলাটি তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে, প্রতিটিতে খাজনা সংক্রান্ত ও জমি সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য চারটি আদালত ছাড়াও, দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির জন্য ৯টি আদালত ক্রমাগত খোলা থাকে।[১৪৩] ১৭৯৩ সন পর্যন্ত জেলায় নাগরিক ন্যায় বিচারের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ব্যয় সরকার অনুমোদন করতেন না; বর্তমানে বার্ষিক ৭ হাজার পাউণ্ড এই খাতে অনুমোদিত।[১৪৪] বীরভূম যখন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন সেই ১৭৮৭ সন হতে ১৭৯৩ সন, অর্থাৎ কর্নওয়ালিস আইন মোতাবেক নূতন ব্যবস্থা কায়েম হওয়া পর্যন্ত সর্বমোট মামলার সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১১২টি, অর্থাৎ গড়ে বার্ষিক ১৮টি।[১৪৫] বিগত বছরে (১৮৬৪) বিভিন্ন আদেশ ও আবেদন ছাড়াও চার সহস্রাধিক দেওয়ানি মামলা রুজু করা হয়। সম্পত্তির সূক্ষ্ম বিভাগ

ও অজস্র মালিকানা স্বত্বসহ সংকীর্ণ সংস্কৃতিজাত অসংখ্য বিবাদের উৎস বিবেচনা করলে, শেষোক্ত সংখ্যা মোটেও বেশি নয়, এবং পূর্বোক্ত সংখ্যা ব্যক্ত করে অশ্রুত অভিযোগ ও প্রতিকারহীন অন্যায়ের এক বিষাদময় কাহিনী। এর থেকে বোঝা যায় যে, ভারতের জনসাধারণের প্রতি ন্যায় বিচারের প্রথম প্রয়াসে, বৎসরে প্রতি ৬০ হাজার জনের মধ্যে মাত্র একজন আদালতের আশ্রয় গ্রহণে সাহসী হয়। এই অবিশ্বাস ভিত্তিহীন ছিল না, কারণ ১৭৮৭ ও ১৭৯২ সনের মধ্যেই যে ১১২ জন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৬৯ জন শেষোক্ত বৎসরের মধ্যে ডিক্রিলাভে সমর্থ হয়। অপরদিকে, ১৮৬৪ সনে ৪৪৮৯টি মামলার মধ্যে ৪৪৮২টির নিষ্পত্তি হয়ে যায়;[১৪৬] এবং বস্তুতপক্ষে বর্তমানে বাংলা দেশে বিচার বিভাগীয় বকেয়া কাজ অজ্ঞাতপ্রায়।

গ্রামবাংলার সাথে ব্যক্তিগত কোনো প্রকার পরিচিতি ছাড়াই যে দুইজন পণ্ডিত ঐতিহাসিক বাঙালি জাতি সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখেছেন, দেশীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে তাঁদের আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে কিছুক্ষণের জন্য মনোনিবেশে আমি প্রলুব্ধ হচ্ছি। মিঃ মিল ও লর্ড মেকলে ভারতীয় কৃষকদের অত্যন্ত মামলাবাজ ও ধুরন্ধর হিসাবে চিত্রিত করেছেন; প্রথমোক্ত ভদ্রলোক কখনো ভারতে পদার্পণ করেন নি এবং শেষোক্ত জন কলিকাতাস্থিত কর্মচারি হিসাবে যেসব তথ্যাদি পেয়েছেন সেইগুলিই মাত্র ব্যবহার করেছেন।[১৪৭] ইংল্যাণ্ডে গ্রামীণ মামলার পরিসংখ্যান, তুলনার কোনো ভিত্তি হতে পারে না; কারণ ইংল্যাণ্ডে জনসারারণের এক ক্ষুদ্র অংশেরই শুধু জমি সংক্রান্ত অধিকার রয়েছে, তাই এই অধিকারজাত মামলা আনুপাতিক ভাবে কম। বিপরীতে, বাংলা দেশে জনসাধারণের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগেরই জমির সাথে কিছু সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই কারণেই তারা স্বাভাবিক ভাবে এই ধরনের বিবাদে লিপ্ত থাকে এই শতাব্দীর শুরুতে বুকানন দেখেন যে, পাটনা নগরসহ পাটনা জেলায় এক-তৃতীয়াংশের অধিক অধিবাসীই 'অভিজাত', অর্থাৎ ভূস্বামী এবং মোট জনসংখ্যা ১২৩,০৭৪ জনের মধ্যে ৭৫,৫১০ জনই জমির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সমগ্র বিহার প্রদেশে এই অনুপাত ছিল ৮২৯,১০৩ জনের মধ্যে ৭৩০,১৫৭ জন—এতে বড় শহরগুলি ধরা হয়েছে, কিন্তু যারা ব্যবসা বা হস্তশিল্পের মাধ্যমে কৃষক সমাজে যুক্ত হয়েছে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। জমির সাথে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীগুলির জমিতে স্বার্থের মাত্রা বিভিন্ন; কিন্তু, সাধারণভাবে জনসাধারণের তিন-চতুর্থাংশের স্বার্থের সংঘাতের কারণে বিচার বিভাগীয় সমঝোতা প্রয়োজন হওয়ার মতো যথেষ্ট স্বার্থ জমিতে জড়িত রয়েছে। এই প্রকারের মামলাগুলি অসুস্থ মানসিকতা জাত নয়—এই উর্বর উৎস ছাড়াও, মনে রাখা দরকার যে বহু শতাব্দীর অবদমিত মামলাগুলি বিগত ৭৫ বৎসরে প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের ইঙ্গ-ভারতীয় আইনি ব্যবস্থায়, তাদের জন্য কি অধিকার রক্ষিত আছে, প্রতিটি শ্রেণীর লোক প্রকৃত

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা আবিষ্কার করতে চেয়েছে।

মামলাতে উদ্দীপনা জোগায় যেসব বিষয়গুলি, সেইগুলি এখন পরীক্ষা করা যাক। আমরা দেখেছি যে, ১৮৬৪ সনে বীরভূমে বৈধ মামলার সংখ্যা ছিল ৪৪৮৭টি। সভ্যতার আওতার মধ্যে জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষাধিক,[১৪৮] অর্থাৎ অখণ্ড সংখ্যায়, ঐ বৎসরে প্রতি ১২০ জন অধিবাসী পিছু একটি মামলা ছিল। ইংল্যাণ্ডের তুলনায় বাংলায় গড় আয়ু বহু কম; গড় আয়ু সম্ভবত ৪০ বৎসর হবে না, বরং ৩০ বৎসরের নিকটতর হবে। সুতরাং খুব সাধারণভাবে বলা হলে এবং ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে গৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে কৃত গণনাতে অযথা গুরুত্ব আরোপ না করলে দেখা যাবে যে, গ্রামীণ জনসাধারণের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ৩ জনই জীবনে কোনো মামলায় জড়িত হয়নি।

গ্রামীণ জনসাধারণ হতে যদি আমরা প্রদেশের সমগ্র জনসাধারণের হিসাব করি, সেই ক্ষেত্রে মামলায় জড়িত লোকের অনুপাত আরো কম। জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ; ১৮৬৪ সনে সর্বমোট মামলার সংখ্যা ১৩৪,৩৯৩ টি,[১৪৯] অর্থাৎ ২৬০ জন পিছু একটি মামলা; অর্থাৎ, গড় আয়ু ৩৫ বৎসর ধরা হলে, বাঙালিদের প্রতি ৭ জনের মধ্যে ৬ জনই আদালতের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্কহীন ভাবে জীবন কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই মামলাগুলি পৌনে এক শতাব্দীর বিবেকবান সরকারের সুস্থ ও উৎসাহজনক ফলশ্রুতি বিশেষ। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকজন তাদের মামলাবাজ ঘোষণা করলেও, এদের মধ্যে জীবনভোর রয়েছেন যেসব শাসকবৃন্দ, তারা ক্রমাগত অভিযোগ করেছেন যে কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিতে এদের রাজী করানো যায় না। তাদের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতের জনগণ তাদের অধিকার প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষারত এবং সেটা তারা করছে আদালতে বৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে,—বহু গ্রামীণ অফিসারের স্মৃতিতে রয়েছে যে উপায়, অর্থাৎ লাঠিয়াল দলের মাধ্যমে নয়। ১০৮,৫৫৯টি মামলার মধ্যে ৭৭,৯৭৯টির রায় বাদী-পক্ষের অনুকূলে যায়;[১৫০] এই ঘটনা হতে মামলা যে ফলপ্রসূ তা প্রমাণিত হয়—এ ছাড়াও খরচ এড়াবার জন্য প্রতিবাদী পক্ষ ব্যক্তিগত ভাবে নতি স্বীকার করায় এক বিপুল সংখ্যক মামলা বিচারার্থে আনীত হয়নি। নাগরিক অধিকারের স্বাভাবিক প্রয়োগ হচ্ছে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সংযমী ব্যবহারের সর্বোত্তম অনুশীলন; এবং আমাদের বিচার ব্যবস্থায় ভারতীয়দের যে বিশ্বাস জন্মেছে, তা আগের জমানার সম্পূর্ণ বিপরীত—মাত্র ৭৫ বৎসর আগে, সেই আমলে, বৎসরে প্রতি ৬০ হাজার লোকের মধ্যে একজন আদালতের সাহায্য ভিক্ষা করতে সাহসী হতো এবং বৎসরে ১ লক্ষ জনের মধ্যে মাত্র একজন সাহায্যপ্রাপ্ত হতো।

পরিমাণের প্রশ্ন ছেড়ে তৎকালীন বিচারের গুণগত মানের বিষয়টি গ্রহণ করলে,

আরো বেদনাময় এক চিত্র প্রকাশিত হয়। বিচারকরা আপন মর্জিমতো সাক্ষ্য-প্রমাণ আহ্বান করতেন বা গ্রহণ করতেন। নিজেদের সুবিধার্থে বিচার স্থগিতরাখা হতো এবং প্রায়শই সেইগুলি পুনরায় গ্রহণ করতে বিস্মৃত হতো। প্রদর্শনযোগ্য বহু প্রমাণে সরকারি মোহর বা সই থাকতো না, ফলে আদালতের ঘুষুরা সেইগুলি ইচ্ছামতো সরিয়ে ফেলতো বা দাখিল করতো। কোনো মামলা স্থগিত রাখা হলে, খুব কম ক্ষেত্রেই সেইগুলি আবার শুরু করার নির্দিষ্ট কোনো দিন ধার্য করা হতো। সুতরাং পেশকার মামলাটি বিচারককে স্মরণ করাবে এবং শুনানীর জন্য আবার আনবে কিনা, তার জন্য মামলায় জড়িত উভয় পক্ষের মধ্যে ঘুষ দেওয়ার প্রতিযোগিতা চলত। এই প্রতিযোগিতায় সচরাচর প্রতিবাদী পক্ষ জয়লাভ করত—স্যার হেনরি স্ট্র্যাচি দেখিয়েছেন যে, ১০০টি মামলার মধ্যে ৯৫টির ক্ষেত্রে প্রতিবাদী পক্ষই অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে থাকে, কারণ কলঙ্কজনক হলেও দেখা গেছে যে, এক বিপুল সংখ্যক মামলায় অনিশ্চিত কালের স্থগিত রাখাই মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিয়মবিধি সমূহ বিশৃংখলভাবে প্রণীত হতো ও বিশৃংখলভাবেই আদালতে প্রেরিত হতো ; এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতন বহু পত্রে উল্লেখিত আইনের জবাবে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ অমায়িক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, নথিপত্রে আইন পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়মবিধি সমূহের মুদ্রণ ও কার্যকরী প্রকাশনার জন্য নির্দেশই যদি লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হতো, তাহলেও একমাত্র এই কারণেই ভারতীয় সংস্কারক হিসাবে তিনি উচ্চাসন লাভ করতেন ; এবং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর আমলের পূর্বে, সমগ্র বাংলা ব্যাপী জেলা আদালতগুলির একটিতেও বাস্তব আইনসমূহ স্বতন্ত্রভাবে ছিল না। অবশ্য, এর ফলে বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটেনি ; কারণ আইনের অনুপস্থিতি-নিরপেক্ষ ভাবেই অবস্থা যতদূর সম্ভব খারাপ ছিল। মামলার রায় প্রকৃতপক্ষে বিচারকের উপর নির্ভর করতো না, নির্ভর করতো অর্থগৃধ্নু এক অধীনস্থের উপর—কারণ রায় লেখা হতো ফারসি ভাষায়, জেলা বিচারকদের একজনও যে ভাষা পাঠে সক্ষম ছিলেন না। বস্তুত, ১৭৮৯ সন পর্যন্ত বীরভূম আদালতের একটিমাত্র সিদ্ধান্তেও ইংরাজ বিচারপতি বা তার নিয়ামকের কোনো মোহর, দস্তখৎ, এমনকি সংক্ষিপ্ত সই পর্যন্ত দেখিনি।

কিন্তু মামলায় ডিক্রিলাভ ছিল দুঃখের সূচনা মাত্র। ২৫ বৎসর ধরে প্রতি ৫ বৎসর অন্তর নূতন নূতন বিচারমণ্ডলী গঠিত হয়েছে এবং ডিক্রিলাভকারীকে একের পর এক আপিল-আদালত টানা-পোড়েন করতে হয়েছে এবং এইভাবে তার বা তার প্রতিপক্ষের সর্বনাশ হয়েছে। বস্তুত উভয়ের মধ্যে কে বেশিদিন মামলা চালাতে পারে, সেইটাই একমাত্র প্রশ্ন হতো—একটিমাত্র মামলার ইতিহাসেই সেই কথা প্রমাণ করা যেতে পারে। কোম্পানি বাংলার আর্থিক প্রশাসন গ্রহণের পূর্ববর্তী বিশৃংখলতার পর্যায়ে, দুই পুত্রসন্তান রেখে বিষ্ণুপুরের

রাজা মারা যান। জ্যেষ্ঠপুত্র অন্যায় ভাবে উত্তরাধিকারের বৃহদংশ দখল করে; এবং, ভালোমন্দ যাই হোক, তৎকালীন বিচার অনুযায়ী, কনিষ্ঠ পুত্র তা মেনে নেয়। কিন্তু কোম্পানির আদালত স্থাপিত হওয়ার পর কনিষ্ঠপুত্র প্রতিকারের জন্য আবেদন করে; এবং বৎসরের পর বৎসর ক্লান্তিকর মামলা ও অবিমিশ্র উৎকোচের পর ডিক্রিলাভ করে জ্যেষ্ঠপুত্র তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদে পরিষদের নিকট আপিল করে। মামলাটি হিন্দু উত্তরাধিকারের নিয়মের দিকে গড়ায়—এই নিয়ম এখনই এত জটিল, সেই সময় পুরোহিতরা এইটিকে গোপন রাখত; আর বিচারক ছিল ১৯ বৎসরের এক অকপট কিশোর মাত্র,[১৫১] যে 'সমতা ও পরিচ্ছন্ন বিবেক'কে আইনি শিক্ষার অভাব ও আইন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার বিকল্প ভাবত। হেস্টিংস লেখেন, 'আপনারা কি বিশ্বাস করবেন যে কর্মরত আমাদের ছেলেরাই, তত্ত্বাবধায়ক, রাজস্ব সমাহর্তা, বিচারপতি ইত্যাদি অর্থহীন পদবি গ্রহণ করে আমাদের দেশের সার্বভৌম রাজা এবং জনগণের শাসক, কঠোর শাসক হয়েছে?' মুর্শিদাবাদের পরিষদ হতে মামলাটি কলিকাতায় রাজস্ব পর্ষদের কাছে স্থানান্তরিত হয়, এইখানে আবার নূতন একদল কর্মচারিকে ঘুষ দিতে হয়, কিন্তু চূড়ান্ত কোনো রায় পাওয়া যায় না। এইভাবে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এক তুচ্ছ বিবাদ দীর্ঘ-মামলার ফলে এক মারাত্মক সংঘাতে পরিণত হয়, এবং সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিক এক আবেদনপত্রে বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁর একমাত্র ভাইকে 'আমার জীবনের শত্রু'[১৫২] আখ্যা দেন। রাজস্ব-পর্ষদ হতে মামলাটি গভর্নর জেনারেলের নিকট যায়; পূর্ববর্তী সকল আদালতের রায় নাকচ করে উভয় ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারে সমান অংশীদার বলে রায় দেন। কিন্তু এই রায় হওয়ার আগেই, একভাই পলিত কেশ, জড়বুদ্ধি হয়ে দেউলিয়াদের কারাগারে বন্দী হয়; আর অন্যজন আনন্দ ও দুঃখের উর্ধ্বে মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকে।[১৫৩]

এমনকি সরকার মামলা রুজু করলেও বিচার অশেষ বিলম্বিত হতো। ১৭৯১ সনের ১লা ডিসেম্বর সহ-সমাহর্তা কোম্পানির তরফে ১২টি মামলা দায়ের করেন; ১৭৯২ সনের ২৪ জুলাই তারিখেও তিনি যথাবিহিত সম্মানের সাথে নিবেদন করেছেন যে, এখনো পর্যন্ত একটিমাত্র মামলারও প্রাথমিক শুনানির জন্য একটি দিনও নির্দিষ্ট হয়নি।[১৫৪]

বাংলার গ্রামীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম প্রয়াস ছিল এই প্রকার। এই চিত্র মনোরম নয়; কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের আদৌ কোনো মূল্য থাকতে হলে, প্রকৃত সত্য প্রকাশ করা আবশ্যিক। প্রাথমিক পর্যায়ের সেই সব ইংরাজ প্রশাসকদের নিন্দা করার পূর্বে, অবশ্য কোম্পানি কি করতে চেয়েছিল, তা সঠিকভাবে বোঝা উচিত। ১৭৬৫ সনের চুক্তি কোম্পানিকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেয় এবং এই কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও বিবেচনার সাথে সম্পাদিত। দেশীয় ধারণা

অনুসারে, নাগরিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত প্রশাসন রাজস্ব সংগ্রহের সাথে জড়িত। ১৭৭১ সন পর্যন্ত এই সত্য কোম্পানির বোধগম্য হয়নি ; এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের আইন প্রণয়নের প্রয়াস সত্ত্বেও, ১৭৯৩ সন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা জনগণ পায়নি। সুতরাং, স্বীকার করতেই হয় যে, এই ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব পালনে আমরা বার্থ হয়েছিলাম, কিন্তু ১৭৬৫ সনে পূর্ববর্তী বিশৃংখলাকালে দেশের প্রাচীন বিচারযন্ত্র লুপ্ত হওয়ায় আমরা কোনো প্রকার নাগরিক বিচারমণ্ডলী পাইনি, সেই কথা ভোলা উচিত নয় ; এবং একথাও সত্য, যে আমাদের প্রাথমিক আদালতগুলি খারাপ হলেও কোনো আদালত না থাকা অপেক্ষা সেগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের তৃতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে—অর্থাৎ ফৌজদারি বিচার প্রশাসন ও পুলিশ সম্বন্ধে—আইনত কোম্পানির কিছুই করণীয় ছিল না। ১৭৯০ সন সর্যন্ত এই দফতর নবাবের হাতে ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে সহিংস অপবাধের মাত্রা রাজস্বকে বিপদগ্রস্ত করলে, একমাত্র তখনই ইংরাজ সমাহর্তারা হস্তক্ষেপ করতেন।

তবে আমি যে পর্যায়ের আলোচনা করছি তার বৃহদংশকালেই, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট দেশের প্রশাসন গৌণ ও সহায়ক ব্যাপার মাত্র ছিল ; এই দায়িত্বও তারা নিতে বাধ্য হয় অথবা বলা চলে যে আত্মরক্ষার খাতিরে তারা নিতে বাধ্য হয়, এবং দীর্ঘদিন কোম্পানির দক্ষতম পরামর্শদাতারাও বিষয়টিকে শক্তির উৎস বলে গণ্য করেন নি, এবং দুর্বলতার কেন্দ্র হিসাবে দেখেছেন। লর্ড কর্নওয়ালিস করণীয় সম্বন্ধে মহত্তর ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে পর্যন্ত, ব্যবসা ও অর্থ উপার্জন প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকৃত ছিল, রাজ্য জয়ও শাসনভার ছিলদু ইটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় মাত্র। সুতরাং, দেশের একমাত্র বৃহৎ ব্যবসায়িক শক্তি হিসাবে এর কাজকর্ম ও প্রভাব সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করলে বিগত শতাব্দীর উত্তরার্ধে গ্রামবাংলার এই পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নি র্দে শি কা

১. 28, Geo. III. c 25. s. 39.

২, *Administration of the East India Company*, by Mr. Kaye, 1853, p. 79

৩. *Life of Lord Teignmouth*,—তাঁর পুত্র লিখিত, ১ম খণ্ড, ১৮৪৩ পৃ. ২২

৪. সভাপতিসহ সিলেক্‌ট কমিটির কার্য বিবরণী, ১৬ আগস্ট ১৭৬৯
৫. ঐ, Mr. Kaye's *Administration'*…হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৪
৬. পরিচালকসভার নিকট সভাপতি ও পরিষদের পত্র, ১৩ এপ্রিল ১৭৭২, অনু. ৯। ই. অ. ন.
৭. ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৭২ সনের পরিকল্পনা (আনুষ্ঠানিক ভাবে ২১ আগস্ট গৃহীত); অনু. ১ ও ২
৮. কমন্‌স সভার সিলেক্‌ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্ট, ১৮১২, পৃ. ৬
৯. *The Administration of Justice in British India*, by W. H. Morley, 1858, p. 52
১০. কষ্টকর পরিবর্তনের এই পর্যায় পর্যালোচনা কালে, অবার (Auber) যথারীতি আত্মসন্তুষ্ট, মিল কলহপ্রিয়, এবং মর্লি যথাযথ।
১১. মনে রাখা উচিত, মুসলমান আমলে বাঙালি কর্মচারিরা দুর্নীতিপরায়ণ থাকলেও, তারা প্রধানত ছিল অবৈতনিক, এবং জুলুমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।
১২. রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্রের পাণ্ডুলিপি, কলিকাতা 'কলিকাতা গেজেট'-এর নির্বাচিত অংশ, ১ম খণ্ড, ১৭৮৬, পৃ.১৮৫, ১৮৬; মর্লি পৃ. ৫০, ৫৭। শুধু শাসন বিভাগীয় ও পুলিশি ক্ষেত্রে সমাহর্তার ক্ষমতা সীমিত ছিল। পরে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।
১৩. জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রের ভিত্তিতে নির্ণীত।
১৪. বর্তমানে সাঁওতাল পরগনার অন্তর্ভুক্ত পাহাড়িয়া অঞ্চলসহ তৎকালীন বীরভূমের ক্ষেত্রফল ছিল ১৩০ মাইল × ৪০, অর্থাৎ ৫২০০ বর্গমাইল। বর্তমানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের অংশ (হাণ্টার বর্ণিত) বিষ্ণুপুরের আয়তন ২৩০০ বর্গমাইল। সংযুক্ত জেলার মোট আয়তন, ৭৫০০ বর্গমাইল।
১৫. নির্ণীত মাসিক ব্যয় ছিল ৪৩৯৪ রৌপ্যমুদ্রা। বিশদ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
১৬. বীরভূম হতে বিষ্ণুপুর ও পাহাড়ি অঞ্চলসমূহ বিচ্ছিন্ন হবার পর, বর্তমান (হাণ্টার সাহেবের আমলে) আয়তন ২৩৩০ বর্গমাইল। ১৮৬৩ সনের জন্য বর্ধমান বিভাগের পুলিশ সংক্রান্ত কমিশনার মিঃ সি. এফ. মন্‌ট্রেসর মহোদয়ের রিপোর্ট, পৃ. ১৭, ব. আ ন.
১৭. ১৮৬৪-৬৫ সনের জন্য বাজেট। বী. অ. ন.
১৮. মাসিক ৩৫৮৫ রৌপ্যমুদ্রা। সমাহর্তার হিসাব, ১৭৮৮-৮৯। বী. অ. ন.
১৯. মাসিক ৫৫৬ রৌপ্যমুদ্রা, মাসিক হিসাব, ১৭৮৮-৮৯। বী. অ. ন.
২০. মাসিক ২৫০ রৌপ্যমুদ্রা। রৌপ্যমুদ্রার মূল্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে

থাকায় আমি (হাণ্টার) ইংরেজি মুদ্রার মূল্যমান নির্ণয়ের চেষ্টা করিনি।

২১. ১৮৬৪-৬৫ সনের ব্যয়ের জন্য পরিশিষ্টে 'বীরভূমের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যয়' দ্রষ্টব্য। বী. অ. ন.

২২. ৬১১,৩২১ রৌপ্যমুদ্রা, ১৭৮৮-৮৯ সনের জমা-উশুল-বাকি, রাজস্ব পর্ষদের নিকট প্রেরিত, ১লা মে, ১৭৮৯। বী. অ. ন.

২৩. ৩৮৬,৭০৭ রৌপ্যমুদ্রা, ১৭৮৮-৮৯ সনের জমা-উশুল-বাকি।

২৪. রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি জন শোর মহোদয় ও সদস্যবৃন্দের নিকট জেলা সমাহর্তার পত্র, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯। রাজস্ব পর্ষদের নিকট জেলা সমাহর্তার পত্র, ১৪ এপ্রিল ১৭৯০। ঐ, ২৫ অকটোবর ১৭৯০; এবং আরো বহু পত্রাবলী। বী. অ. ন.

২৫. বার্ষিক বন্দোবস্ত ও হস্তাবুদ, রাজস্ব পর্ষদ। ক. অ ন.

২৬. রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি জন শোর মহোদয় ও সদস্যবৃন্দের নিকট জেলা সমাহর্তার পত্র, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯। বী. অ ন.

২৭. রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ২৫ অকটোবর ১৭৯০। বী. অ. ন.

২৮. সমাহর্তার নিকট রাজস্ব পর্ষদের পত্র, ১০ মে ১৭৯০। নির্বাচিত স্থান ছিল ঢাকা-বাড়ি। বী. অ. ন.

২৯ সমাহর্তার নিকট মিঃ জর্জ আরবুথনটের পত্র, ঢাকা-বাড়ি, ৩০ জুন, ১৭৯০। ঐ, ১২ জুলাই ১৭৯০, এবং অন্যান্য পত্রাবলী। বী. অ. ন.

৩০. রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি জন শোর ও সদস্যবৃন্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯। বী. অ. ন.

৩১. রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১২ জানুয়ারি ১৭৯১। ঐ, ১লা নভেম্বর ১৭৯১। বী. অ. ন.

৩২. বকেয়া ও 'সেয়ার' নামক আদায়ের অস্থায়ী আদেশ বীরভূমে কার্যকরী করা হয়নি।

৩৩. রাজস্ব পর্ষদের আদেশপত্র, ১৯ এপ্রিল ১৭৯০। মূল নির্দেশপত্রটি নথিপত্র হতে লোপাট হলেও, সমাহর্তার জবাবে ১৯ তারিখকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আরো বহু মূল্যবান নির্দেশ পত্রের মতো, এইটিও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৮৩৮ সনে মুদ্রিত 'পর্ষদের নির্দেশপত্র' সংক্রান্ত পিটারের সংস্করণে অনুপস্থিত।

৩৪. পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ২২ মে ১৭৯০। বী. অ. ন.

৩৫. বিশেষ এই শুল্কের নাম ছিল 'সুরী-মুসী-কুসী-রমজান-সেলামি'। সেয়ার সম্বন্ধে ১৭৯০ সনের এক রিপোর্টে এই শুল্ক বর্ণিত হয়েছে এবং সেখান হতেই, পূর্ব বর্ণিত ২২ মে'র পত্র সমেত এই করের বর্তমান বর্ণনা মূলত

গৃহীত। বী. অ. ন.

৩৬. ৩১৫৪ রৌপ্যমুদ্রা।

৩৭. ১৮৬৪-৬৫ সনের বাজেট হিসাব :

আবগারি ...	...	...	৪৫,৯২৯ টাকা
আফিম ...	....	....	৭,০১৮ "
			৫২,৯৪৭ বী. অ. ন.

৩৮. উদাহরণ স্বরূপ. কলিকাতায় দিন কয়েক বসবাসের পর (১৭৮০) শ্রীমতী কে দেশীয়দের মদের প্রতি অত্যধিক আসক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। *Original Letter's from India*, কলিকাতা ১৮১৭, পৃ. ২৩০। জায়গির সম্বন্ধে মীরজাফরের পরোয়ানা, ১৭৫৬। কোম্পানির জমিদারি সংক্রান্ত সনদ ইত্যাদি।

৩৯. রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১১ মে ১৭৯০। বী. অ. ন.

৪০. রাজস্ব পর্ষদ কর্তৃক নির্দেশিত 'কর নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মাবলী', নিম্ন প্রদেশসমূহ, নিয়ম-১। পূর্বোক্ত সারনিতে প্রদর্শিত উত্তেজক পানীয়ের বর্তমান দর সম্বন্ধে তথ্যাদি নগরীর জমিদার বাবু কেনারাম ঘোষ প্রদত্ত, এবং মদবিক্রেতা ও পালকিবাহকদের নিকট ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরীক্ষিত।

৪ . দেউঘর — আক্ষরিক অর্থে দেবধাম।

৪২. ৯ লক্ষ রৌপমুদ্রা। Stewart's *History of Bengal*, p. 267

৪৩. রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি মাননীয় চার্লস স্টুয়ার্ট ও সদস্যবৃন্দের নিকট জেলা সমাহর্তার রিপোর্ট, ৩০ মে ১৭৯১। বী. অ. ন.

৪৪. রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১১ জানুয়ারি ১৭৯১। বী. অ. ন.

৪৫. 'সামরিক পত্রাবলী', পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১০৩-৪, বী. অ. ন.। রক্ষীদলে ছিল ৩০ জন সিপাহি, একজন জমাদার, দুইজন হাবিলদার ও দুইজন নায়েক। সিউড়ি হতে পবিত্র নগরী দেউঘরের দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল।

৪৬. রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি মাননীয় চার্লস স্টুয়ার্ট ও সদস্যবৃন্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ২৮ মার্চ ১৭৯১।

৪৭. এই তথ্য ভুল, সম্ভবত অনুলিখনের ত্রুটি; তীর্থযাত্রীদের প্রবেশের জন্য তখন একটি মাত্র ছোট দরজা ছিল।

৪৮ সমাহর্তা হতে রাজস্ব পর্ষদ, ২৮ মার্চ ১৭৯১। বী. অ. ন.

৪৯. ঐ, ৩০ মে ১৭৯০ ইত্যাদি। বী. অ. ন.

৫০. 'সামরিক পত্রাবলী' পাণ্ডুলিপি, ফোলিও, পৃ. ১৪৪। বী. অ. ন.

৫১. শিবরাত্রি, মিঃ কিটিং-এর বানানে শী'উ-রাত; ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা-

রাত্রের উৎসব। ১৭৯১ সনে মিঃ কিটিং-এর মন্দির দর্শনের বৎসরে, শিবরাত্রি ২২ ফাল্গুনে পড়ে।

৫২. সমাহর্তা হতে রাজস্ব পর্ষদ, ৩১ জুলাই ১৭৯০। ঐ, ২৮ মার্চ ১৭৯১ ইত্যাদি। বী. অ. ন.

৫৩. ৪০৮৪ রৌপ্যমুদ্রা ৭ আনা।

৫৪. ৮৪৬৩ রৌপ্যমুদ্রা ৬ আনা ২ পাই। রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ৩০ মে ১৭৯০; ঐ, ৩১ জুলাই ১৭৯০; বী. অ. ন.

৫৫. আধ ডজন চিঠিতে এই টাট্টু ঘোড়ার উল্লেখ রয়েছে। রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি মাননীয় চার্লস স্টুয়ার্ট ও সদস্যবৃন্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ২৫ জুন ১৭৯০। ঐ, ১৮ জুলাই ১৭৯০ ইত্যাদি। বী. অ. ন.

৫৬. ৮ হাজার রৌপ্যমুদ্রা।

৫৭. সমাহর্তার নিকট হতে রাজস্ব পর্ষদের প্রতি, ২৮ মার্চ ১৭৯১। বী. অ. ন.

৫৮. ঐ

৫৯. রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ৩০ মে ১৭৯০ ইত্যাদি। বী. অ. ন.

৬০. ঐ, ২৮ মার্চ ১৭৯১

৬১ সমাহর্তার নিকট রাজস্ব পর্ষদের পত্রের মাধ্যমে উক্ত, ১৮ জুলাই ১৭৯১।

৬২. রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি উইলিয়াম কাউপার ও সদস্যবৃন্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ২৭ অকটোবর ১৭৯১। এই তারিখের দুইটি পত্রের মধ্যে দ্বিতীয়টি। বী. অ. ন.

৬৩. নানা প্রকার আদায় সম্বন্ধে এক রিপোর্টে ২৫টি করের এক তালিকা দেওয়া আছে, জুন ১৭৯০। রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি উইলিয়াম কাউপার ও সদস্যবৃন্দের নিকট সমাহর্তার এক পত্রে অপর একটির উল্লেখ রয়েছে। ৭ আগস্ট ১৭৯১-এর পত্র। বী. অ. ন.

৬৪.

বীরভূমের ভূমিরাজস্ব···	রৌপ্যমুদ্রা	৬১১,৩২১ : ৭ : ১৬
বিষ্ণুপুরের ভূমি রাজস্ব···	”	৩৮৬,৭০৭ : ১১ : ৭
মোট ···	”	৯৯৮,০২৯ : ৩ : ৩

এর মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা বা পুরোপুরি প্রায় ১ লক্ষ পাউণ্ড ১৭৮৮-৮৯ সনের জমা-উশুল-বাকি ছিল। বী. অ. ন. এবং ক. অ. ন.

৬৫. রাজস্ব পর্ষদের হিসাব রক্ষক মিঃ ক্যালডিকট ১৭৯০ সনের ১৫ সেপ্টেম্বর

জবাবদিহি করতে বলেন।

৬৬. রাজস্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১৯ এপ্রিল ১৭৮৯; এছাড়া, সুরুলের বাসিন্দা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি মিঃ জন চিপের সাথে পত্র যোগাযোগ দ্রষ্টব্য। বী. অ. ন.

৬৭. ১৭৯০ সনের ১৮ নভেম্বরে 'কলিকাতা গেজেট'। নির্বাচিত অংশাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০। আরো বহুস্থানে এই দুর্ভিক্ষের উল্লেখ রয়েছে। কয়েক মাস আগে কলিকাতার কেন্দ্রীয় কোষাগার হতে মাদ্রাজ ২১ হাজার পাউণ্ড নিতে বাধ্য হয়। ক. অ. ন. এবং ই. অ. ল.

৬৮. কলিকাতা গেজেট, ১৮ নভেম্বর ১৭৯০। নির্বাচিত অংশাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮

৬৯. সমাহর্তার নিকট অস্থায়ী মহাগাণনিক এ. ক্যালডিকটের পত্র, ১৫ নভেম্বর ১৭৯০। ঐ, ২৫ নভেম্বর ১৭৯০; ৭ জানুয়ারি ১৭৯১ ইত্যাদি। বী. অ. ন.

৭০. বীরভূমে সাধারণ নিষেধাজ্ঞায় শুধু বাঘ শিকারের জন্য পুরস্কারকে ছাড় দেওয়া হয়—পরবর্তীকালে এর সাথে বন্দীদের খোরাকি যুক্ত হয়। লবণ ও আফিম উৎপন্নকারী জেলাগুলিতে রাজস্ব প্রদানকারী এইসব দ্রব্যের জন্য অগ্রিম দাদনও অনুমোদিত হয়। বী. অ. ন.

৭১. 'সামরিক পত্রাবলী' দ্রষ্টব্য। এক ক্ষেত্রে, চিত্রার রাজার দূতের রক্ষীর প্রয়োজন হয়; আরেক ক্ষেত্রে, বর্ধমানের এক ধনী ভদ্রলোকের, ইত্যাদি।

৭২. 'সামরিক পত্রাবলী', পৃ. ১২৮

৭৩. উপযুক্ত অফিসারদের নিয়ে ২০ জন সিপাহি সহ রক্ষীদলের জন্য মাসিক ব্যয় নিম্নরূপ :

১ জন জমাদার,	১৩ টাকা হিসাবে	টা. ১৩
১ জন হাবিলদার,	৯ " "	" ৯
১ জন নায়েক,	৭ " "	" ৭
২০ জন সিপাহি,	৫ " "	" ১০০
মাল বহনের ভাতা		৬
	মাসিক	১৩৫ টাকা

অর্থাৎ ১৪ পাউণ্ড। সমাহর্তার নিকট পাহাড়ি অঞ্চলের সেনা দলের বকসি জর্জ চিপের পত্র, কলিকাতা, ১১ এপ্রিল ১৭৮৯।

৭৪. জেলা পুলিশাধ্যক্ষের দফতর এই হিসাব দিয়েছে। দুই অর্ধ-বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৬৪ সনের ৩১ ডিসেম্বরে এবং ১৮৬৫ সনের ৩০ জুন

সমাপ্ত অর্ধ বৎসরগুলির; ৬ মাসের জন্য গড় ছিল ১০০ টাকা, অর্থাৎ বার্ষিক ২০ পাউণ্ড।

৭৫. ১৮৬৪-৬৫ আর্থিক বৎসরে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল মুদ্রায় ৫০ হাজার পাউণ্ড এবং কাগজি নোটে ৯৬০০ পাউণ্ড। যাতায়াত ও রক্ষীদের জন্য সামগ্রিক খরচ ৭৬০ টাকা ১৩ আনা ১ পাই, অথবা ৭৬ পাউণ্ড ১ শিলিং ৮ পেনি, অর্থাৎ প্রেরিত অর্থের $\frac{1}{2}$%-এর সামান্য বেশি। যে কোষাগারগুলিতে অর্থ প্রেরিত হয়, তাদের সাথে দূরত্বের গড় ১৫০ মাইল, অর্থাৎ ১৭৮৯ সনের গড় দূরত্বের তিন গুণ।

৭৬. পরিষদে গভর্নর-জেনারেলের প্রস্তাব, ২৭ মে ১৭৮৯ ইত্যাদি। প্রস্তাবে উল্লিখিত নোট কোনোরূপ গুরুত্ব পায় কিনা বোঝা যায় না; কিন্তু কোষাগারের নথিপত্র হতে স্পষ্ট যে এক ধরনের নোট জোর করে চালানো ক. অ. ন.। দ্রষ্টব্য, Sir James Stewart's *Proposal for The Extension of Paper Credit in Bengal*, 1772। ই. অ. ন.

৭৭. ১৭৮৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি অভিপত্রের উপর ছাড় ছিল শতকরা ৭ ভাগ। ১৭৮৫ সনে এইটি দ্বিগুণ ছিল।—কলিকাতা গেজেট, ৬ সেপ্টেম্বর ১৭৮৭। ই. অ. ল.

৭৮. রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি জন শোর মহোদয় ও সদস্যবৃন্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১১ এপ্রিল ১৭৮৯, ইত্যাদি, বী. অ. ন.

৭৯. মাননীয় ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবহারের জন্য স্যার জেমস্ স্টুয়ার্ট কর্তৃক প্রণীত বাংলার মুদ্রার বর্তমান অবস্থায় প্রযুক্ত মুদ্রানীতি, পৃ. ১৬। ১৭৭২ সনে কোম্পানির জন্য ব্যক্তিগত ভাবে মুদ্রিত হয়। *Grant's Expediency Maintained*, 1813, p. 23; *Essais sur l'Histoire Economique de la Turquie*, Paris, 1865, p. 109

৮০. দশ বার্ষিক বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য পর্ষদের নির্দেশের জবাবে রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি মাননীয় চার্লস স্টুয়ার্ট ও অন্য সদস্যবৃন্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১৭৯০ এপ্রিল।

৮১. ১৭৯২ সনের ১লা নভেম্বরের 'কলিকাতা গেজেট'। মুর্শিদাবাদি, পাটনাই ও ঢাকাই রৌপ্য মুদ্রার তুলনায় উজিরি টাকার মূল্য ৩৭% কম ছিল। তৎকালীন ব্যবহৃত টাকার তালিকা ও মূল্যের জন্য, দ্র. পরিশিষ্ট

৮২. ওজন ও প্রচলিত বিনিময় হার অনুযায়ী, ৬ শিলিং ৮ পেনি হতে ৮ শিলিং ৬ পেনি মূল্য ছিল।

৮৩. ১৭৯০ সনের ১৪ জানুয়ারির 'কলিকাতা গেজেট' দ্রষ্টব্য।

৮৪. Sir James Stewart's *Principles of Money applied to Bengal*, 1772, p. 26, 410

৮৫. ১৭৬৩ সনের ছয়টি ভারতীয় বন্দরে প্রচলিত মুদ্রার তালিকার জন্য, দ্র· পরিশিষ্ট

৮৬. শ্রীহট্টে তাদের নেওয়া হয় ও পরে তাদের ছাড়ানো খুব কঠিন হয়। 'কলিকাতা গেজেট', ৬ অকটোবর ১৭৯১; *Lives of Lindsays*, by Lord Lindsay, vol. 3, p. 170. বীরভূমে তাদের নেওয়া হয় না। বী. অ. ন.

৮৭. মিঃ কিটিং দায়িত্ব গ্রহণের অল্পদিন পরেই, তাঁর কাছে স্বর্ণের মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব দেওয়ার প্রস্তাব আসে এবং বিষয়টি পর্ষদের বিবেচনার জন্য পাঠানোর পর স্বর্ণ-মোহর নেওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। রাজস্ব পর্ষদের সভাপতি জন শোর ও অন্য সদস্যবৃন্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১১ এপ্রিল ১৭৮৯ ও তার জবাব ! অপরদিকে রয়েছে রাজস্ব দেবার জন্য স্বর্ণমুদ্রার অবাধ ব্যবহারের আদেশ প্রার্থনা করে বেশ কয়েকজন 'মাননীয় ব্যবসায়ী'র আবেদনপত্র—এটির উল্লেখ রয়েছে 'কলিকাতা গেজেট'-এ ১৭ এপ্রিল ১৭৮৮, বৃহস্পতিবার। বী. অ. ন. ও ই. অ. ল.

৮৮. বীরভূম সমাহর্তা সি. কিটিং-এর নিকট মুর্শিদাবাদ সমাহর্তা জে. ই. হ্যারিংটনের পত্র, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৯০। বী. অ. ন.

৮৯. 'কলিকাতা গেজেট', ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১০ এপ্রিল ১৭৮৮ ইত্যাদি। ই. অ. ল.

৯০. 'কলিকাতা গেজেট', ১৮ জুন ১৭৯৫, ই. অ. ল.

৯১. Sir James Stewart's *Principles of Money applied to Bengal*, 1772, p. 25

৯২. ঐ, পৃ. ২৬

৯৩. তত্ত্বগত ভাবে, নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী টাকার ওজন ছিল এক সিক্কা বা ১৭৯·৫৫১১ গ্রেন ট্রয়; আদর্শ বেধ ছিল ১০০/৯৮ বিশুদ্ধ রৌপ্য।

৯৪. তুরস্কের মুসলমানরা একই কারণে বাস্তবে একই পন্থার আশ্রয় নেয়। দ্রষ্টব্য, *Essais sur l' Histoire Econoqe de la Turquie, par M. Belin, Secretaire Interprete de l' Empereur a' Constantinople.* Imperal Press, 1865

৯৫. Sir James Stewart's *Principles of Money applied to Bengal*, 1772, p. 17

৯৬. ঐ, পৃ. ১৮-২১

৯৭. ঐ, পৃ. ২৬, ৩২, ৫৭ ইত্যাদি। ই. অ. ল.

৯৮. একেবারে শুরু হতেই বাংলা সেই কামধেনু রূপে গণ্য, অন্যান্য প্রদেশ সর্বদা সহায়তার জন্য যার দ্বারস্থ হয়েছে। বিগত শতাব্দীর ভারতীয় নথিপত্র ও দলিলে এর শত শত উদাহরণ মেলে। উদাহরণ স্বরূপ, পরিচালক সভার নিকট সভাপতিসহ বঙ্গীয় পরিষদের পত্রাবলী, ২৫ আগস্ট ১৭৭০, অনু. ২৬, ৩০; ১৭৭২ সনের ৯ মার্চের পত্রের ২২-তম অনুচ্ছেদে পরিষদ অভিযোগ করছেন যে, অন্যান্য প্রদেশে মুদ্রা প্রেরণের ফলে বাংলার কোষাগার সম্পূর্ণভাবে শূন্য হয়েছে; দ্র. হিকির 'বেঙ্গল গেজেট', ২৯ এপ্রিল ১৭৮০; এছাড়া ১৭৮৪-.৮০৪ সনের মধ্যে কলিকাতা গেজেটে অসংখ্য বিজ্ঞপ্তি। ই. অ. ন., ক. অ ন., এবং ই. অ. ল.। Mr. Marshman's *History of India*, vol., p. 283 (in 1758) ও p. 328 (in 1767) । Longman's, 1867.

৯৯. স্যার জন স্টুয়ার্ট, পৃ. ৫৬

১০০. ১৭৫০ সনের ২৭ নভেম্বরের পত্র, কোম্পানি দ্বারা ১৭৭১ সনে মুদ্রিত। ১৭৮৯ সনের ২০ মার্চের আর্থিক প্রস্তাব, ইত্যাদি।

১০১. মাননীয় হ্যারি ভের্লেস্টের নিকট কলিকাতাস্থ মেয়রের দফতরের আবেদন-পত্র, টাউন হল, ১৪ মার্চ ১৭৬৯, স্বাক্ষর 'জন হোম্‌স, রেজিস্ট্রার'। Calcutta Review, vol. 35, p. 29 হতে উদ্ধৃত।

১০২. ১৭৬৯ সনের আর্মেনিয়ান আবেদনপত্র, Calcutta Review, vol. 35, p. 28 হতে উদ্ধৃত।

১০৩. পরিচালক সভার নিকট বঙ্গীয় পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৬৯, অনু. ৩৯। ই. অ. ন.

১০৪. Sir James Stewart's *Principles*···, ১৭৭২, পৃ. ৩

১০৫. পরিচালক সভার নিকট পত্র, ৩০ আগস্ট ১৭৭১

১০৬. হিকির 'বেঙ্গল গেজেট', ২০ মে ১৭৮০

১০৭ ঐ, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৭৮০

১০৮. ১৭৯০ সনের ২৩ জুনের আদেশ, রাজস্ব পর্ষদের পত্রের সাথে বীরভূম সমাহর্তার নিকট প্রেরিত, ৩০ জুন ১৭৯০, ইত্যাদি। বী. অ. ন.

১০৯. ঐ, ৭ এপ্রিল ১৭৮৯। ১৭৮৭ সনের ৮ জুনের নিয়মাবলীর ১৮ নং ধারা। বী. অ. ন. ও ক. অ. ন.

১১০. রাজস্ব পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি, ২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯০। বী. অ. ন.

১১১. ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা।

১১২. রাজস্ব পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি-আদেশ, ২রা আগস্ট ১৭৯০; বী অ. ন,

১১৩. সমাহর্তার নিকট মহাগাণনিকের পত্র, ১৫ নভেম্বর, ১৯ ডিসেম্বর, ১৭৯০ ও ২৮ জানুয়ারি ১৭৯১। লবণ ও আফিম উৎপন্নকারী জেলা-

গুলির ক্ষেত্রেও এই সকল দ্রব্যগুলিতে ছাড় ছিল। বী. অ. ন.

১১৪. ১৭৮৮ সনের ৩রা ডিসেম্বরের আদেশ।

১১৫. ১৭৯০ সনের ২১ জুলাই-এর আদেশ, সমাহর্তার নিকট রাজস্ব পর্ষদের পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত, ২৩ জুলাই ১৭৯০। বী. অ ন.

১১৬. তাং ফোর্ট উইলিয়াম, সরকারি দফতর, ১৮ নভেম্বর ১৭৯১, স্বাক্ষর ই. হে., সরকারের পক্ষে সেক্রেটারি এবং ১৭৯১ সনের ১লা ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেট-এ পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত।

১১৭. ঘোষণা, ফোর্ট উইলিয়াম, সরকারি দফতর, ২৪ অকটোবর ১৭৯২, স্বাক্ষর জে. এল. সওভেট, সহ-সম্পাদক, ১৭৯২ সনের ১লা নভেম্বরের কলিকাতা গেজেট-এ পূর্ণাকারে প্রকাশিত।

১১৮. অর্থাৎ কোম্পানি মুদ্রিত মুদ্রা, ছাঁচে সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বের ১৯-তম বৎসর, 'সূর্য্য' মুদ্রিত ছিল— এই কাল ১৭৭৩ খ্রী.

১১৯. ঘোষণা, ২৮ জুন ১৭৯৪

১২০. 59 Geo. III c. 49.

১২১. Traite de l'Economie Politique Par M. Say, tome i, p. 393

১২২. বিচার বিভাগীয় বিধি, ২ নং, ১-৫, ১৭৮৭.

১২৩. মনোরঞ্জন সিং ও রাজা লীলানন্দ সিং-এর মধ্যে মামলায় হাইকোর্টের (কলিকাতা) সিদ্ধান্ত।

১২৪. উজ্জা আল্লা খান পারসি রুইদাদে উল্লেখিত, ১৩ জুন ১৮৪৮। বী. অ. ন.

১২৫. লোচন্দ নারায়ণ দেউ-র দরখাস্ত। বী. অ. ন.

১২৬. রিপোর্ট, ১৮ নভেম্বর ১৭৯০। বী. অ. ন

১২৭. জায়গিরের সময়সীমা।

১২৮. ১৮১৪ সনের বিধির ২৯-তম ধারা।

১২৯. এই প্রচেষ্টা ও ঘাটোয়ালদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত, থানাদারদের ক্ষেত্রে নয়। সমাহর্তার নিকট রাজস্ব পর্ষদের পত্র, ১৭৮৯ মে।

১৩০. 'নবাব নাদজম অল দৌলা ও কোম্পানির মধ্যে চুক্তি,' ফোর্ট উইলিয়াম, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৬৫।

১৩১. পরিচালক সভার নিকট সভাপতি ও পরিষদের পত্র।

১৩২. ১৭৯০ সনের বিচার বিভাগীয় বিধির ২৬ নং ধারা।

১৩৩. বিচারকদ্বয় জন হোয়াইট ও টমাস ব্রুক মহোদয়ের উদ্দেশ্যে, ৭ আগস্ট ১৭৯১। বী. অ. ন.

১৩৪. জমিদার।

১৩৫. উপরন্তু, ১৭৯০ সনের ১৩ অকটোবরের আদেশ চৌকিদারি-জমি দখল করে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ভূমি রাজস্বের বৃদ্ধি ঘটানোকে আইনগত ভাবে সন্দেহজনক করে তোলে; এইটি রূপায়ণে অসুবিধা এই সন্দেহকে নিশ্চিত করে তোলে। আইনের দিক দিয়ে দৃষ্টান্ত—জয়কৃষ্ণ মুখার্জি বনাম পূর্ব বর্ধমানের সমাহর্তার মামলায় প্রিভি-কাউনসিলের সিদ্ধান্ত।

১৩৬. ১৮৫৫ সনে লিখিত, এই বৎসরের পর হতে সংস্কারের প্রস্তাব তোলা হয়, কিন্তু তা কার্যকরী হয়েছিল কিনা তা আমি বর্তমানে নির্ণয় করতে পারিনি।

১৩৭. জেলা পুলিশ অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্মারক পত্র, ২৬ জানুয়ারি ১৮৬৬।

১৩৮. এই সংখ্যা শুধু পুলিশি এখতিয়ারভুক্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত; সমগ্র জনসংখ্যা প্রায় অর্ধ-মিলিয়ন।

১৩৯. সমাহর্তার নিকট জেলা সংক্রান্ত হিসাব সম্বন্ধে বেসরকারি হিসাব পরীক্ষকের পত্র, ২৫ জানুয়ারি ১৭৯১; খোরাকি সম্বন্ধে, মহাগাণনিকের পত্র, ২৯ ডিসেম্বর ১৭৯০, ইত্যাদি। বী. অ. ন. ও বী. অ. ন.

১৪০. জি. এ. বারলো মহোদয়ের পত্র, কাউনসিল চেম্বার, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৭৯২। বী. অ. ন.

১৪১. মিঃ কিটিং-এর হিসাবমতো, বীরভূমের জনসংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ এবং বিষ্ণুপুরের জনসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৭০ হাজার; কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন এইগুলি অনুমানমাত্র। রাজস্ব পর্ষদের নিকট পত্র, ১১ আগস্ট ১৭৮৯। ১৮০১ সনে জনসংখ্যা ১ কোটি ৫ লক্ষ অনুমিত হয়—*Geography of Hindoostan*, Calcutta, 1838, p. 29; বী. অ. ন. ইত্যাদি।

১৪২. ১৭৯৩ সনের আগে নথিপত্র অনুযায়ী, সহ-ম্যাজিস্ট্রেট একটি মাত্র মামলার নিষ্পত্তি করেন নি। ১৭৯৩ সনের বী. অ. ন. বিধির ১৩ নং ধারা।

১৪৩. একজন জেলা জজ, একজন মুখ্য সদর আমিন, একজন সদর আমিন, ছয়জন মুনসেফ; এছাড়া একজন সমাহর্তা, একজন সাহায্যকারী ও দুইজন সহ-সমাহর্তা রাজস্ব-সংক্রান্ত মামলার জন্য ছিলেন।

১৪৪. বীরভূম জেলার বাজেট হিসাব, ১৮৬৪-৬৫। বী. অ. ন.

১৪৫. সিভিল জজ কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত হিসাব দাখিল, ৫ ডিসেম্বর ১৮৬৫। বী. আ. ন.

১৪৬. ১৮৬৫ সনের ১২ ডিসেম্বরের অপর একটি হিসাব-দাখিল। জেলার বাস্তব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক সমস্ত মামলার প্রতিনিধিত্ব করে এই সংখ্যা,—বাদ থাকে শুধু ১৮৫৯ সনে ১০ নং ধারার মামলাগুলি,

যেগুলি বাংলার বিশেষ কারণজাত হওয়ার ফলে বিশেষ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত।

১৪৭. ইণ্ডিয়া অফিসের নথিপত্র মিঃ মিলের মতো যিনি ঘেঁটেছেন, তিনিই তাঁর শ্রমসাধ্য সঠিকতার সমাদর করবেন ; লর্ড মেকলের ভারত বিষয়ক প্রবন্ধমালার মধ্যে—যেমন ওয়ারেন হেস্টিংস সম্বন্ধে—কোম্পানির গোপনতম নথিপত্র জাত ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু এঁদের কারো ভারতের গ্রামীণ জনসাধারণকে পর্যবেক্ষণ করার কোনো সুযোগ ছিল না।

১৪৮. ১৮৫২ সনে ৫১৪,৫৯৭। জরিপ রিপোর্ট, পৃ. ৪৩

১৪৯. ১৮৬৫-৬৬ সনের জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক বার্ষিক রিপোর্ট। হাইকোর্ট (ওরিজিনাল জুরিসডিকশন), ১৩০৪ ; ছোট অপরাধের জন্য আদালত, ৮০,৯০৬ ; অন্যান্য দেওয়ানি আদালত ৫২,১০২।

১৫০. ঐ, পৃ. ৮ (১৮৬৪ সনের পরিসংখ্যান)

১৫১. *Life of Lord Teignmouth*, p. 28

১৫২. রাজস্ব পর্ষদের সমাহর্তার পত্র, ১৫ অকটোবর, ৭৯০। বী. অ. ন.

১৫৩. রাজস্ব পর্ষদের অস্থায়ী সমাহর্তা, ২৫ ডিসেম্বর ১৭৯১। বী. অ. ন.

১৫৪. সমাহর্তার নিকট সি. ওল্ডফিল্ডের পত্র, ২৪ জুলাই ১৭৯১। এইগুলি সব পুনর্বিচারের মামলা জানা থাকলে ভারতীয় কর্মচারিদের নিকট এই বিলম্ব আরো অস্বাভাবিক মনে হবে। বী. অ. ন.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রামীণ উৎপাদকরূপে কোম্পানির ভূমিকা

কোম্পানির ব্যবসায়িক কাজকর্ম নথিপত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। ব্যবসা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট দুইটি পদ্ধতি অনুসৃত হতো নিয়মিত বেতনভোগী চুক্তিবদ্ধ কর্মচারিদের মাধ্যমে, যারা ব্যক্তিগত কোনো লাভ না করে তাদের কাছে গচ্ছিত অর্থ বিনিয়োগ করতো ; এবং বেতনহীন দালালদের মারফৎ, যারা নির্দিষ্ট হারে মাল সরবরাহের জন্য চুক্তি করতো ও চুক্তির মাধ্যমে যেইটুকু সম্ভব উপার্জন করতো। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রতিনিধি, বড ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, কুঠিয়াল ও সহ-কুঠিয়াল আখ্যা গ্রহণ করতো। তাদের পদগুলিই ছিল কোম্পানির ভাণ্ডারে সবচেয়ে লোভনীয় ও সর্বোত্তম ব্যক্তিদের আকর্ষণ করতো, আর রাজনৈতিক দায় দায়িত্ব 'কোম্পানিতে কর্মরত ছেলেদের' হাতে ছেড়ে দেওয়া হতো। যে ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্ট্রনায়ক সার্বভৌম ক্ষমতার দায়িত্ব বোঝেন, সেই ওয়ারেন হেস্টিংস স্বয়ং তাঁর উচ্চপদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক দিকটিকে প্রশাসনিক দিকের অধীনস্থ করতে সাহসী হননি। আইন প্রণেতা হিসাবে তাঁর সাফল্য ছিল আংশিক, কিন্তু বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদায়ী বিশাল ব্যবসায়িক সংস্থার প্রধান হিসাবে তিনি পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন ; এবং তিনি ভারত ত্যাগ করার পর, প্রশাসনিক যে সংস্কারগুলি ইতিহাসে তাঁকে চিরস্থায়ী করেছে সেইগুলি চোখে পড়েনা, তাঁর শাসনের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বাংলার প্রতিটি জেলায় থেকে যায় তাঁতিদের গ্রাম, রেশমকুঠি আর কারখানাগুলি। জনগণের উপর এই সকল গ্রামীণ শিল্প কেন্দ্রের প্রভাব ইতিহাসজ্ঞদের নজর এড়িয়ে গেছে ; এবং আমার বিশ্বাস, বর্তমান পরিচ্ছেদ কোম্পানির ব্যবসার উপর নতুন ও তাৎপর্যময় আলোকপাত করবে।

পশ্চিমের এই রাজ্যগুলির প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বহুপূর্বেই কোম্পানি এইসব অঞ্চল ব্যবসায়িক সংস্থা দিয়ে ছেয়ে ফলে ; এবং প্রকৃতপক্ষে লর্ড কর্নওয়ালিস বীরভূমকে নিজ দায়িত্বে আনয়নে রাজী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রাজাদের অপশাসনের ফলশ্রুতি হিসাবে কারখানা-গুলির বিপজ্জনক অবস্থা। একজন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করতেন, এবং সুবিধাজনক ভাবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত তিনটি প্রধান কার-খানার অধীনস্থ ১০টি কারখানার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে। রেশম, সুতিবস্ত্র, বিভিন্ন তন্তু, আঠা ও লাক্ষা রং—এইসব কাঁচামাল বীরভূমে বিনিয়োগের ফলে পাওয়া যেত। পশ্চিমের বিশাল জঙ্গলের সীমান্ত জুড়ে তুঁত উৎপাদক জনপদ মণ্ডলী এবং দক্ষিণে অজয় নদীর ও উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁকে বাঁকে তাঁতিদের গ্রাম উঁকি দিত। তৎকালীন সামগ্রিক বিশৃংখলার মাঝে এই ক্ষুদ্র শিল্পনিবেশগুলি নিরাপদে ছিল—প্রাচীর বেষ্টনী বা সুশিক্ষিত বাহিনী এই সুরক্ষার কারণ ছিল না, কোম্পানির নামের আতংক এইগুলিকে সুরক্ষিত রেখেছিল। সমগ্র সমতল-ভূমি যখন লুণ্ঠিত হচ্ছে, তখন শান্তিকামী হস্তশিল্পীদের এইগুলি আশ্রয় দান করে ; এবং ফসল তোলার পর, কৃষকরা সেইখানেই তাদের শস্য নিয়ে আসতো, তার মাটির কুঁড়ে ঘরের কী হাল দস্যুরা করবে তার পরোয়া না করেই তার স্ত্রী, বলদ জোড়া আর কাঁসার বাসন সহ সে হাজির হতো। অরক্ষিত এই ঘাঁটিগুলির কয়েকটিই গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে গড়ে ওঠে; এবং এক প্রকারের নাম যেমন, দেশ যখন দস্যু আর বন্য জন্তু আকীর্ণ, সেই সময়ের দ্যোতক, তেমনই আর এক প্রকার নাম, যেমন তাঁতিপাড়া, প্রকাশ করে যে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পক্ষপুটে কিভাবে হস্তশিল্পীগণ আর ছোট ব্যবসায়ীরা আশ্রয় লাভ করে।

মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে দস্যুদল কোম্পানির কর্মচারিদের অথবা তাদের মালপত্রের উপর হামলা চালাতে সাহসী হয়নি ; প্রথমটি ঘটে দৈবক্রমে, আর দ্বিতীয়টি ছিল হতাশার ফলশ্রুতি। জঙ্গলের মধ্যে একদল সরকারি মালবাহী বলদ ডাকাতদের হাতে পড়ে ; কিন্তু গাড়োয়ানদের পলায়নের ফলে পণ্যসামগ্রী কার তা বলার কেউ ছিল না, ফলে সেইগুলি লুণ্ঠিত হয়। অপরিসীম ক্রুদ্ধ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জেলা শাসককে লিখিতভাবে জানান। শেষোক্ত জন কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে জবাব দেন এবং যে জমিদারের মহালে এই দুর্ঘটনা ঘটে, তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষতিপূরণ করে ক্ষমা অর্জন করার অনুমতি প্রাপ্তিতে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। সম্ভবত, নিজেদের ভুল আবিষ্কার করার পর ডাকাতরা নিজেরাই দ্রব্যসামগ্রী ফিরিয়ে দেয়, কারণ অপহৃত দ্রব্যসামগ্রীর অবিকল অনুরূপ দ্রব্যাদিই পুনরুদ্ধার করা হয়।

অপর ঘটনাটি ছিল তুলনায় গুরুতর। অজয়ের দক্ষিণে দস্যুদলকে মিঃ কিটিং ঘিরে ধরেন, কিন্তু কোম্পানির নামই সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট বিবেচনা করে নদীর

উত্তর তীরের তন্তুবায় প্রধান গ্রামগুলিকে রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নি। সাধারণ অবস্থায় তাঁর বিচার নিঃসন্দেহে সঠিক প্রমাণিত হতো। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না; কাজেই একদিন সকালে দস্যুদল নদী অতিক্রম করে কোম্পানির প্রাধান বয়ন কেন্দ্র লুণ্ঠন করে। এই প্রকারের অভূতপূর্ব ধৃষ্টতায় শুধু জেলাশাসকের কৈফিয়ৎ বা জমিদারের ক্ষতিপূরণ মার্জনা করা যায় না। প্রায় এই সময়েই জেলার প্রাচীন রাজধানী আক্রান্ত হয়, প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়, তন্তুবায়দের ডজনখানেক গ্রামের থেকে শতগুণে মূল্যবান সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় বা ধ্বংস করা হয়, কিন্তু তা সত্বেও সরকার একদম নিশ্চুপ থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে জেলাশাসক বৃথাই বাণিজ্যিক প্রতিনিধির নিকট নত হন। শেষোক্ত জন বিষয়টি লর্ড কর্নওয়ালিসের নিকট পেশ করেন, এবং অচিরেই কঠিন সরকারি ভর্ৎসনা মিঃ কিটিংকে এই শিক্ষা দেয় যে, দস্যুদল খুশিমতো সমগ্র জেলা লুণ্ঠন করতে পারে, কিন্তু কোম্পানির কর্মীবৃন্দকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

বীরভূমে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ খাতে বার্ষিক ৪৫ হাজার পাউণ্ড হতে ৬৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হয়।[১] তন্তুবায়রা অগ্রিম দাদন নিয়ে কাজ করত। কোম্পানির গ্রামের, প্রতিটি পরিবার প্রধানের কারখানায় এক হিসাব থাকত, বছরে একবার সেইখানে গিয়ে সে জমাখরচের হিসাব মেলাত। এই জমা-খরচের ভিত্তিতে সাধারণত নতুন অগ্রিম দাদন দেওয়া হতো এবং আগামী বৎসরের নতুন হিসাব খোলা হতো।

বাণিজ্যিক প্রতিনিধি মিঃ চিপ, আগাগোড়া গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন এবং স্বভাবগত ভাবে মানিয়ে চলার লোক না হলেও মিঃ কিটিং তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। জেলা শাসক অপেক্ষা চাকুরিতে প্রবীণ হওয়ায় ও বদলির সম্ভাবনা তুলনায় কম থাকায় বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ছিলেন জেলার প্রকৃত প্রধান। তাঁর উপার্জন ছিল অপরিমিত; কারণ সরকারি বেতন ছাড়াও তিনি নিজস্ব নামে বিপুল ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন। আমরা মিঃ কিটিং-কে অভিযোগরত দেখি যে তাঁর বেতনে তিনি কায়ক্লেশে টিঁকে আছেন, জেলাশাসকের জীর্ণপ্রায় মাটির কুঠিতে জল আটকায় না এবং বৃথাই তিনি সিকি-একর জমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য আবেদন করে চলেছেন। অদরদিকে, মিঃ চিপ যে শুধু বিপুল সম্পদ আহরণ করেন ও বাংলা দেশের ঐ অঞ্চলে বৃহত্তম নীলকুঠির মালিক হন তাই নয়, উপরন্তু কৃত্রিম হ্রদ ও বিশাল বাগান শোভিত অট্টালিকা সমূহের মাঝে বিলাস-বহুল জীবনযাপন করতেন—বাণিজ্যিক প্রতিনিধির প্রাকার বেষ্টিত আবাসস্থল ব্যক্তিগত বাসগৃহের চেয়ে বরং সুরক্ষিত নগরী বলে মনে হতো। শৈলশিখরে সেই বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ বহু মাইল দূর হতে আজও পরিদৃশ্যমান, এবং ২০০ বৎসর ধরে বীরভূমের রাজারা প্রাসাদ, চত্বর ও সমাধিস্থল যে বিশাল এলাকায়

গড়ে তোলেন, বাণিজ্যিক প্রতিনিধির আবাসস্থল তার সমান।

সরকারি অর্থের ক্ষেত্রে সমাহর্তার চেয়ে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির ক্ষমতা বেশি ছিল। মিঃ কিটিং বার্ষিক মাত্র ৩ হাজার পাউণ্ড ব্যয় নির্বাহে সক্ষম ছিলেন এবং তাঁর এখতিয়ারের সকল লোভনীয় চাকুরিগুলির ক্ষেত্রেই কলিকাতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রধান হিসাবে মিঃ চিপ, কোম্পানির তরফ হতে প্রতি বৎসর ৪৫ হাজার হতে ৬৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয় নির্বাহের জন্য পেতেন। সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণী তাঁর বেতনভোগী ছিল, এবং তাঁর মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা অমায়িকরূপে সরকার আবির্ভূত। কর ধার্য করার কঠোর দায়িত্ব ছিল সমাহর্তার উপর, আর বাণিজ্যিক প্রতিনিধির ছিল সেইগুলি পুনর্বিতরণের মনোরম দায়িত্ব। তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের নিকট মিঃ কিটিং ছিলেন কোম্পানির শিবরূপ প্রতিমূর্তি—ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতা ও সেই কারণেই তুষ্ট রাখা বিধেয়, আর মিঃ চিপের মাধ্যমে কোম্পানি বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ, মঙ্গলার্থে প্রবল, কম ভয়ংকর তাই কম ভক্তিভাজন, কিন্তু শ্রদ্ধার-ভালোবাসার পাত্র, সর্বদিক দিয়ে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করার ও প্রতারিত করার দেবতা। কারখানা থেকে কারখানায় তাঁকে অনুসরণ করত বিনি মাইনের দীর্ঘ বাহিনী এবং গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পালকির দর্শনলাভের জন্য মায়েরা শিশুদের তুলে ধরত, আর বৃদ্ধরা অন্নদায়ী দেবতার সম্মুখে আভূমি আনত হতো। যে শিশুর উপর তাঁর ছায়াপাত ঘটত, সে মহাভাগ্যবান! মহান কোম্পানির সম্পদ, আড়ম্বর ও স্থায়িত্বের মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রায় ২৫ বৎসর ধরে তাঁর সুরুলের প্রাসাদে তিনি আড়ম্বরে ছিলেন; এবং সন্নিহিত অঞ্চলে আজও বিচরণরত এক বৃদ্ধ, বর্তমানে নীরব ও জীর্ণপ্রায় প্রাসাদে সেই সময়ের ৭০ দিন ব্যাপী ভোজসভার কথা স্মরণ করে—সেইখানে তার বাবা স্বয়ং পরিবেশন করত আর সে নিজে বড় হয়েছে এইসবের মধ্যেই।

মিঃ চিপ শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, আর যেইসব গ্রামবাসীর নিকট জেলাশাসকের সম্মুখে বাদী বা প্রতিবাদী রূপে হাজির হওয়া ছিল সমভাবে আতংককর, তারা বিবাদ সালিশির জন্য বাণিজ্যিক প্রতিনিধির নিকট হাজির হতো। প্রতিদিন সকাল হতেই ছোট ছোট দল উপস্থিত হতো, কেউ পুরস্কারের আশায় বন্য জন্তু নিয়ে, কেউ ধৃত দস্যু[২] সমেত, কেউবা গ্রামের উপর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের অনুরোধ সহ, আবার কেউ জল বা জমি সংক্রান্ত বিবাদের সালিশির জন্য। এইসব বিষয়ে আইনত মিঃ চিপের কোনো বিচারালয়ের অভাবে, যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি সে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চাইলে, জনমত সে ক্ষমতার পক্ষে থাকতো, এবং এই ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির সিদ্ধান্তগুলি হতো দ্রুত, কম ব্যয়সাধ্য ও সচরাসচর ন্যায়সংগত।

বাণিজ্যিক প্রতিনিধির আবাসস্থল ছিল অন্ধকারের মাঝে একমাত্র আলোক উজ্জ্বল স্থান ; এবং পরবর্তীকালে আদি প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সমগ্র জেলা, মিঃ চিপ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিচারবিভাগীয় কর্তৃত্ব মেনে এসেছে। বাংলায় প্রতিটি জমিদারের নিজস্ব কাছারি বসতো, এবং সেখানে কখনো কখনো প্রজাদের মাঝে বিরোধের মীমাংসা করা হতো ; কিন্তু মিঃ চিপ ছিলেন জেলার বিচারক প্রধান এবং এই প্রকার জনপ্রিয় বিচারালয়ের মূল্য ও সেই সাথে এইগুলি তদারকির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, সরকারও বিজ্ঞতার সাথে বর্তমানে ব্যবসায় সংস্থার অংশীদার তথা আবাসিক প্রতিনিধিকে বৈধ বিচারক্ষমতা দিয়েছেন - প্রায় ৭৫ বছর আগে মিঃ চিপ এইটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

কোম্পানির অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যম ছাড়াও, মিঃ চিপ স্বয়ং ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী তথা শিল্পমালিক। একদা ব্যক্তিগত এই ব্যবসায়ের সুযোগ নিষ্ঠুরভাবে অপব্যবহৃত হয়েছিল। ১৭৬২ সনে স্বয়ং হেস্টিংস এই ব্যাপারে এক তিক্ত পত্র লেখেন। লর্ড ক্লাইভ তাঁর একাধিক জ্বালাময়ী ভাষণে[৩] এর নিন্দা করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর সংস্কারমূলক কাজকর্ম দ্বারা নবীন শ্বেত অফিসারদের মধ্যে নিজের জন্য 'কুখ্যাত স্মৃতির ক্লাইভ'[৪] আখ্যালাভ করেন। ভ্যান্সিটার্টের দুর্বল শাসনকালে এই কুপ্রথার ফলে দেশের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। ১৭৭৩ সনে পরিচালক পর্ষদ গভর্নর জেনারেলকে এই বিষয়ে কঠোরভাবে লেখে ; ১৭৮২ সনের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্টে এইটির নিন্দা করা হয়, এবং পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও, এমনকি ১৭৮৯ সনে পর্যন্ত, লর্ড কর্নওয়ালিস বিচারক ও জেলাশাসকদের ব্যবসায়ী সংস্থার সাথে যুক্ত হতে নিষেধ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।[৫] চাকুরির একটি শাখার ক্ষেত্রে, একটি মাত্র ক্ষেত্রেই, এর ব্যতিক্রম করা হয়। বিচার প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের সাথে কোনো প্রজার সম্পর্ক না থাকায়, সরকারি পদ অপব্যবহার করে পীড়নমূলক আদায় বা অন্যায় লাভের সুযোগ বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের তুলনামূলক ভাবে কম ছিল, এবং মনে করা হতো যে নিজস্ব ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করার ফলে সরকারি কর্মচারিরা আরো ভালো ব্যবসায়ী হতে পারবে। জন শোর লেখেন, "আপনারা দেখবেন যে আপনাদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের ও দালালদের ব্যক্তিগত ব্যাবসার স্বাধীনতা আমরা অক্ষুণ্ণ রেখেছি। বিশ্বাস করুন আপনাদের ব্যবসায়ের উন্নতির প্রকৃত পথ হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কোম্পানির স্বার্থকে একসূত্রে বাঁধা।"[৬]

মিঃ চিপের ব্যক্তিগত ব্যবসা সম্বন্ধে নথিপত্র নীরব। তিনি জেলায় নীলচাষ প্রবর্তন করেন, ইয়োরোপ হতে আনীত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চিনি উৎপাদনের উন্নতি সাধন করেন, এবং একটি গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন যা আজও সগর্বে দণ্ডায়মান এবং সেইখানে বিশেষচিহ্ন হিসাবে তাঁর নামের আদ্যক্ষর আজও বিদ্যমান।

বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পুরাতন কর্তৃত্বের রেশ আজও এই সংস্থাতে রয়ে গেছে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে বিদ্বেষ পূর্ব-বাংলাকে ধ্বংস করেছে, তা কোম্পানির তালুকে অজ্ঞাত এবং আবাসিক প্রতিনিধির যে কোনো আদেশের গুরুত্ব অজয় নদীর সমগ্র উপত্যকা জুড়ে বিধিবদ্ধ আইনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

আমরা দেখেছি যে, কোম্পানি তার গ্রামীণ উৎপাদন দুইটি পদ্ধতি আবলম্বন করে পরিচালনা করতো : বাণিজ্যিক প্রতিনিধির মতো বেতনভোগী অফিসারদের দ্বারা, এবং নির্দিষ্ট হারে মাল সরবরাহে রাজী বেতনহীন দালালদের দ্বারা। বীরভূমে শেষোক্ত শ্রেণীর একটি মাত্র নমুনা ছিল। কলিকাতার এক ব্যবসায়ী, মিঃ ফ্রুশার্ড বীরভূমে রেশম সরবরাহের চুক্তি করে এবং ময়ূরাক্ষীর তীরে, পরিখা ও কেল্লা দ্বারা সুরক্ষিত এক কারখানা নির্মাণ করেন। পথহীন বনমধ্যে প্রবহমান নদী, এখানে ওখানে সামান্য উন্মুক্ত অংশ, সেইখানে তুঁত উৎপাদনকারী জনপদগুলো বন্য জন্তুদের প্রতিরোধ করে কোনোক্রমে টিঁকে আছে, কিন্তু বীরভূম-রেশমের উচ্চমূল্য সমস্ত বিপদ জয় করতে তাদের প্রলুব্ধ করত ; এবং দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত বা বুনো হাতির দ্বারা দলিত হয়ে একটি জনপদ বিনষ্ট হওয়া মাত্র আর একটি গজিয়ে উঠত। সন্নিহিত জেলায় তাঁর প্রথম স্বামীর সাথে বসবাস কালে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বীরভূমের-রেশম প্রতি আকৃষ্ট হন ও পরবর্তীকালে দরবারে এই ফ্যাশান চালু করেন, আর ভারতবর্ষে ফ্যাশান মাত্রেই কয়েক শতাব্দী চলিত থাকে। সুতরাং ১৭৮৬ সন নাগাদ মিঃ ফ্রুশার্ড বিপুলাকারে বীরভূম সিল্ক উৎপাদনের সংকল্প গ্রহণ করলেন ; এবং কোম্পানির সাথে এইটি সরবরাহের চুক্তি করে কোম্পানির মাধ্যমে রাজার নিকট হতে ময়ূরাক্ষীর উত্তরের বনাঞ্চল ইজারা নিলেন।

তাঁর কাহিনী হতে বোঝা যায় যে সত্যিই আমরা এক নতুন যুগে বাস করছি। যেই সব পরীক্ষা ও অসুবিধার তিনি ক্রমাগত সম্মুখীন হন, রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁর অবস্থান নির্ণীত হয়, আজকের ইঙ্গ-ভারতীয়দের তা বোধগম্য হওয়ার নয় ; এমনকি তিনি যে শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, সেই শ্রেণীতেও এক পুরুষকালেরও পূর্বে লুপ্ত হয়েছে। এই 'দুঃসাহসী' ব্যক্তিটি জেলায় পদার্পণ করার দিন থেকেই সকল সরকারি কর্মচারির সম্মিলিত বিরোধিতার সম্মুখীন হন। একদিকে দেশীয়রা তাঁর কাছে সকল দ্রব্যের জন্য সর্বোচ্চ দর হাঁকে, আর অন্যদিকে কোম্পানি তাঁকে সর্বাপেক্ষা কম সুযোগ-সুবিধা দেয়। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, কোপন স্বভাব ব্যক্তি, দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ, কৃষিজীবী জনসাধারণের সাথে লেনদেনে নাবালকপ্রায়, কিন্তু প্রাণশক্তিতে ভরপুর, এবং আগামী কয়েক বৎসরে বিপুল ধন-সম্পদ সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয়ী ; খরচের হিসাব না করেই তিনি বিবিধ উদ্যোগে লিপ্ত হন ও সামান্য লাভের আশায় কঠোর জীবন যাপন করতেন। প্রথমত জমির জন্য তাঁকে অনেক ব্যয় করতে হয়। মিঃ ফ্রুশার্ডের জমির মতো জঙ্গলের জমি তখন একর প্রতি

১ শিলিং ৬ পেনিতে ইজারা দেওয়া হতো ; কিন্তু জেলার প্রায় সমগ্র জমির উপর রাজাদের একচেটিয়া অধিকার থাকায়, তাঁরা এই আগ্রহী ইংরেজটির নিকট একর প্রতি ৬ শিলিং ৬ পেনি অর্থাৎ কৃষিযোগ্য জমির একর প্রতি ১৬ শিলিং হারে আদায় করেন। চমৎকার ধানী জমির জন্য তৎকালীন সাধারণ খাজনা ৭ শিলিং হতে ১২ শিলিং-এর মধ্যে ওঠা-নামা করত।[৭] ফলে দ্রুত মিঃ ফ্রুশার্ডের খাজনা বাকি পড়লো, এবং রাজা নিজের ভূমিরাজস্ব বকেয়া থাকার অজুহাত হিসাবে মিঃ ফ্রুশার্ডের খাজনা বাকি থাকার বিষয়টি ব্যবহার করেন ও সেইমতো জেলাশাসকের নিকট অভিযোগ করেন। জেলাশাসকের নিজের এই ব্যাপারে করার কিছু ছিল না। কারখানার জমি ক্রোক করা বা মজুতমাল দখল করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, কারণ রেশম বিনিয়োগের নিয়মিত সরবরাহে হস্তক্ষেপ করা হতো ; এবং কোম্পানির ব্যবসায়িক কারবার বিঘ্নিত করার মূল্যে দেশীয় এক ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, তৎকালীন দিনে অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার ছিল। এই 'দুঃসাহসী ব্যক্তিটির প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেও, বাণিজ্য পর্ষদের কোপানলে পতিত হওয়ার ভয় থাকায়, মিঃ কিটিং রাজস্ব পর্ষদের নিকট তাঁর অভিযোগ সমূহ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান যে, এইভাবে কারখানার সম্পত্তি ক্রোক করা সম্ভব না হওয়ায় ও 'বেপরোয়া লোকটি' তাঁর এখতিয়ারের বাইরে থেকে গ্রেফতার এড়ানোয়, 'সেই পাইকস্ত রায়ত, মিঃ ফ্রুশার্ড'-এর সন্ধান পাওয়ার কোনো উপায় নেই। শেষোক্ত ভদ্রলোকটিও কিছু কম আকুল ছিলেন না। তাঁর বিষয়টি এমনকি পরিচালক সভার নিকট পৌঁছায় এবং আমরা দেখি যে, ১৭৮৭ সনে লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁকে বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষে লিখেছেন।[৮] তাঁর সমস্ত আবেদনপত্রের বক্তব্য ছিল এই যে, রাজাদের নিকট হতে তাঁর রাজস্ব হ্রাস আদায়ের জন্য সরকারের প্রভাব খাটানো উচিত ; এমনকি স্বেচ্ছাচারী কোনো সরকারের পক্ষেও এই দায়িত্ব গ্রহণ ছিল ভদ্রতাবিরুদ্ধ। অবশেষে ১৭৯০ সনে তিনি নিজেকে রিক্ত ঘোষণা করেন ও সহায়তার জন্য একবার অন্তিম আবেদন করেন ; তিনি বলেন, অত্যন্ত উচ্চ খাজনায় তিনি জমি নিয়েছেন, এর সাথে তিনি যুক্ত করেন জঙ্গলে জমি খরিদ করার জন্য গৃহীত পুঁজির উপর সুদ, বন্যার কারণে তাঁর প্রভূত ক্ষতি হয়েছে ; গত ৪ বৎসর রেশম কারখানায় কাজ করা সত্ত্বেও তাঁর কোনো লাভ হয়নি ; বস্তুত গত বৎসর (১৭৮৯) তাঁর সমস্ত পুঁজির পরিবর্তে তিনি মাত্র ২০০ পাউণ্ড লাভ করেন, কিন্তু বর্তমান বৎসরে (১৭৯০) তাঁর কারখানার সংস্থান পর্যন্ত নেই। "এক কথায়, বিগত ৫ বৎসর জনপূর্ণ স্থান পরিহার ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার পর এবং সুদীর্ঘ ১০ বৎসর কাল দেশত্যাগ করার পর ও প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও, আজ আমার কোনোক্রমে জীবন নির্বাহ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই।"[৯]

আমাদের প্রাথমিক ভারতীয় বাণিজ্য রূপ লটারিতে যে সকল ব্যক্তি বাজি

জিতেছিলেন, একমাত্র তাঁরাই ইংরেজ জনসাধারণের সামনে আবির্ভূত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকালে ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতগমনকে সম্পদশালী হওয়ার সমার্থক ধরার ধারণা অলীক। বিফল ব্যক্তিরা তাদের বিফলতার কাহিনী সহ কখনো দেশে ফেরেনি। নথিপত্রে মিং ফ্রুশার্ডের মতো বিফল অনিশ্চয়তার পথিকদের বাংলার প্রতিটি জেলায় দেখা যায়—মহাজনী, ব্যাধি, অসহনীয় গ্রীষ্ম ও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামরত, স্বদেশীয় সমাজ হতে কঠোরভাবে বিচ্যুত এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলবাসী ভারতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিলাসিতায় বঞ্চিত।

একথা বলা সংগত যে, বিশেষভাবে মিঃ কিটিং সহ সরকারি অফিসাররা প্রতি পদক্ষেপে এই হতভাগ্য রেশম কারখানার অধ্যক্ষকে প্রতিহত করলেও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাঁকে অপরিহার্য উপদ্রব হিসাবে গণ্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। অবশেষে ১৭৯১ সনে, তাঁর কর্মক্ষমতা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁর সমস্ত বকেয়া মকুব করার আদেশ দেন, ভবিষ্যতে তাঁর দেয় খাজনার পরিমাণ অর্ধেক করা হয় এবং এই টাকাও রাজাদের দেয় ভূমিরাজস্ব হতে বাদ দেওয়ার জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়।[১০] কারণ, অধিকতর আড়ম্বরপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ব্যবস্থা অপেক্ষা এজেন্সি ব্যবস্থা কোম্পানির পক্ষে অধিকতর লাভজনক প্রতিপন্ন হয়। অংশত ফাটকাবাজের ব্যক্তিগত পুঁজি ও অংশত বাণিজ্য পর্যদ প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ফলে কোম্পানির কোনো ঝুঁকি থাকে না। খারাপ মরশুমের দুর্গতি দালাল ভোগ করে এবং চুক্তিভঙ্গ করলে তার খরচে নির্মিত কারখানাটি বাস্তব জামানতের কাজ করে।

তাড়াহুড়ো করে যে চড়া খাজনা দিতে মিঃ ফ্রুশার্ড রাজী হয়েছিলেন, তা হতে মুক্ত হওয়ার পর তিনি বীরভূমের স্থায়ী বাসিন্দা এবং শীঘ্রই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হন। কোম্পানির তরফে বার্ষিক ১৫ হাজার পাউণ্ড[১১] ব্যয়ে ও সমপরিমাণ অর্থ নিজ নামে ঋণ হিসাবে গ্রহণে সক্ষম হওয়ার ফলে এবং সরকারের সাথে যোগাযোগ থাকার ও তার কর্মচারিবৃন্দ এই যোগাযোগ অতিরঞ্জিত করার ফলে, এই উদ্যোগী ইংরেজ অসভ্য বন্য জনপদগুলির মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। জেলাশাসকের ক্ষমতা বস্তুত ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণে সীমিত থাকে। তারপরই জঙ্গল আর উষর প্রান্তর, আর এখানের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনগণকে যেভাবে সম্ভব আত্মরক্ষা করতে হতো। নিরুৎসাহিত করার সরকারি প্রয়াস সত্ত্বেও, অযত্নলালিত এই অঞ্চলে উদ্যোগী এই ইংরাজ ব্যবসায়ীর উপস্থিতি অনুভূত হতে থাকে। তিনি তাদের শাসনকর্তা ও বিচারক হয়ে দাঁড়ান, ডাকাতদের গ্রেফতার করেন, বাঘের উপদ্রব হতে বহু গ্রামকে মুক্ত করেন এবং অরণ্য অভ্যন্তরে আবাদের সীমা প্রসারিত করেন।

মিঃ কিটিং-এর নিকট সমগ্র ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত তিক্ত। তাঁর নিকট, জেলায় বেসরকারি একজন ইংরাজ এক মারাত্মক জীব: মিঃ ফ্রুশার্ডের দুরবস্থা-কালে মিঃ কিটিং সচেতনভাবে তাঁর উত্থান বোধে সচেষ্ট হন এবং বর্তমানে, তাঁর সমৃদ্ধিকালে যতদূর সম্ভব অসুবিধার সৃষ্টি করেন। নথিপত্রে প্রকাশ, জেলা সদর দফতর হতে কোনো সহায়তা করা হয়নি। বাণিজ্যিক প্রতিনিধির অধীন তন্তুবায় জনপদগুলি রক্ষার জন্য ইচ্ছামতো সেনাদল প্রেরণের নির্দেশ দানে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু ধৃত দস্যুদের সিউড়ি প্রেরণের জন্য জনাকয় সিপাহির জন্য অনুরোধের অতিরিক্ত কিছুতে মিঃ ফ্রুশার্ড সাহসী ছিলেন না।[১২] উপরন্তু, কৃষকদের ইচ্ছামতো শস্য বপনে মিঃ চিপ বাধ্য করতেন এবং এইভাবে জমি ক্রয় ও চাষ ব্যতীতই তিনি কাঁচামাল সংগ্রহ করতেন। অপরদিকে, তৎকালীন ব্যয়সাধ্য ও অসুবিধাজনক পদ্ধতিতে ক্ষেত-মজুরের (নিজ-আবাদ) মাধ্যমে নিজ ক্ষেতে মিঃ ফ্রুশার্ডকে তুঁত চাষ করতে হতো।

মিঃ ফ্রুশার্ডের নিজ হস্তে বিচার ক্ষমতা গ্রহণ ছিল বিবাদের স্বীকৃত এক স্থায়ী উৎস; জেলাশাসক ও তিনি উভয়েই সমভাবে এতে সক্রিয় ছিলেন। রাজস্ব পর্ষদ এই বিবাদ মীমাংসায় ব্যর্থ হন, পরিদর্শক সভা (Court of Circuit) ছিলেন সমভাবে নিরুপায়; এবং সামান্য পারস্পরিক ভদ্র আচরণে যে বিবাদ এক উষ্ণ বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হতে পারত, অবশেষে তার নিষ্পত্তির জন্য স্বয়ং গভর্নর-জেনারেলের দ্বারস্থ হতে হয়। মিঃ ফ্রুশার্ড অভিযোগ করেন যে, বিরক্তি-কর গ্রেফতারের সাহায্যে বৎসরের সর্বাপেক্ষা সংকটজনক পর্যায়ে জেলাশাসক তাঁর সর্দারদের বলপূর্বক নিয়ে যান, ফলে কোম্পানির চুক্তি রক্ষা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।[১৩] জেলাশাসক মিঃ ফ্রুশার্ডের বিরুদ্ধে 'তাঁর আদালতের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করার' ও তার কারখানাটি পলাতক অপরাধীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত করার অভিযোগ এনে প্রতিশোধ নেন। এইভাবে, সেই সময়ের সাধারণ সরকারি ও ইংরাজ ভাগ্যসন্ধানীদের প্রতিনিধিত্ব মূলক এই চরিত্র দুইটি শেষ অবধি পারস্পরিক সংগ্রামরত অবস্থায় নথিপত্র হতে বিদায় নেয়।

বাংলার প্রথম যুগের ইংরাজ বাসিন্দাদের চরিত্র ও আইনি মর্যাদার বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্য সরে যেতে আমি প্রলুব্ধ হচ্ছি। নথিপত্র নিয়ে চার বৎসরের গবেষণায় এই বিষয়ে প্রভূত তথ্যাদি সংকলিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ ভারতের বাসিন্দা সরকারি বা বেসরকারি ইংরেজদের বিষয়ে নয়, শুধু দেশীয়দের বিষয়েই—সেই কথা আমি সর্বদা মনে রাখতে সচেষ্ট হয়েছি। সেই কারণেই, এই কথা বলা যথেষ্ট যে, বাংলার স্বাধীন ব্রিটিশ উদ্যোগের পথপ্রদর্শক ছিল দুই প্রকারের: কোম্পানির নিষেধ সত্ত্বেও, নিজেদের যোগাযোগ বা উৎকোচের শক্তির ওপর নির্ভর করে অথবা ভাগ্যহতদের প্রতি দাক্ষিণ্য জনিত ঘৃণাভরে প্রদত্ত বসবাসের অনুমতির সাহায্যে, যারা এই দেশের বাসিন্দা হতো, সেই 'রবাহুতরা', আর ছিল

ভাগ্যসন্ধানীদের দল,—এদের ছিল শিক্ষা, সক্রিয়তা ও প্রায়শই ভালোরকম পুঁজি এবং ইংল্যাণ্ড হতে যাত্রার পূর্বেই এরা পরিচালক-সভার অনুমতি সংগ্রহ করতো। উভয় শ্রেণীই স্থানীয় অফিসারদের বিরাগভাজন ছিল এবং তার দুইটি সংগত কারণও ছিল। ব্রিটিশজাত প্রজাদের উপর গ্রামীণ আদালতগুলির কোনো এখতিয়ার ছিল না এবং সকল ভাগ্যসন্ধানীরা কলকাতা ত্যাগের পূর্বে নিজেদের অধীনস্থ করলেও দেখা যায় যে, গ্রামীণ বিচারালয়গুলির বাস্তবে কোনো ক্ষমতা থাকে না। কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কোনো ভাগ্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজের কারখানা-ক্রোক রোধ করতে পারতেন এবং জেলার সীমানার বাইরে বা কলিকাতায় থেকে তিনি সহজেই গ্রেফতার এড়াতে পারতেন। মিঃ ক্রুশার্ড ঠিক এইটাই করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি বিচারালয়ের ব্যয়সাধ্য, ও দেশীয়দের নিকট রহস্যময় পদ্ধতির মাধ্যমে রাজা তাঁকে একবারও ধরার চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না। তৎকালীন ব্রিটিশ বাসিন্দাদের সম্বন্ধে আপত্তির দ্বিতীয় করণ ছিল এই যে ভারতবর্ষীয়দের তুলনায়, বা কোম্পানি সেই সময় যা দিতে ইচ্ছুক ছিল তার তুলনায়, যে কারণেই হোক, ইংরেজদের উচ্চতর প্রশাসন প্রয়োজন ছিল ও তারা তা আদায়ও করত। এমনকি বর্তমানেও, ইংরেজ প্রধান 'অঞ্চল সরকারি সুবিধাদি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি ভোগ করে ; এবং নিন্দা বা প্রশংসা ছাড়াই সেই সব জেলাশাসিক বাংলার প্রাচীন নির্জন জেলাগুলির প্রশাসন বছবছর ধরে পরিচালনা করেছেন, ভারতে ইংরাজ সক্রিয়তা বা ইংরাজ পুঁজির সাথে জড়িত কোনো বিষয়ের দায়িত্বগ্রহণ করতেহ হলে তাঁরাই প্রকাশ্যে ভেঙে পড়েন।

ইংরেজ বাসিন্দাদের কেন বাংলায় স্বাগত জানানো উচিত এইটি তার অন্যতম প্রধান কারণ। তারা ভালোভাবে কাজকর্ম করতে সরকারকে বাধ্য করে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শুরু থেকেই জনগণের উপর ব্রিটিশ বাণিজ্যের ফলাফল মঙ্গলকর হয়েছে। জেলায় মিঃ চিপের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতি নিয়মমাফিক প্রশাসনের 'ত্রুটি বহুল পরিমাণে পূরণ করেছে এবং তাঁর ব্যবসায়ে নিরাপত্তার জন্য সম্পত্তির নিরাপত্তার তৎকালীন ব্যাপক অভাব বহু পরিমাণে সীমিত থেকেছে। কোম্পানির ব্যবসায়ে আর একটি বাস্তব সুবিধা হলো অতি অল্প পরিমাণ রাজস্বই জেলার বাইরে যেত। মুসলমান শাসনে সমগ্র রাজস্ব মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হতো ; কিন্তু কোম্পানির শাসনে, জেলার শস্যাদি ক্রয়ের জন্য রাজস্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি জেলায় ফেরৎ পাঠানো হতো। যথা সময়ে, ব্যক্তিগত ইংরাজ' উদ্যোগ কোম্পানির ব্যবসায়ে স্থান গ্রহণ করে ; এবং রাজকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্তমানে অতিরিক্ত রাজস্ব কলিকাতায় প্রেরিত হলেও, বাগিচা মালিক ও মালিক ব্যবসায়ীরা গ্রামবাংলায় অফুরন্ত পুঁজি বিনি-য়োগ করে।

মিঃ চিপ বৃহদাকারে যে সুবিধাদি দিতেন, স্বল্প মাত্রায় মিঃ ক্রুশার্ডও সেইরকম

সুবিধা বিতরণ করতেন। তাঁর কারখানা ঘিরে চারপাশে তিনি চাষ-আবাদের তথা সমৃদ্ধির বৃত্তরচনা করেন, এবং শীঘ্রই বীরভূমের সমগ্র উত্তর-পূর্ব জঙ্গলব্যাপী ছোট ছোট রেশম কারখানা গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন ইংরাজদের এক বিশেষ প্রতীকস্বরূপ—প্রারম্ভে বিজ্ঞতা অপেক্ষা নিজের উপর আস্থা বেশি এবং ইংরাজজাতি সুলভ আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে দেশীয় রীতিনীতির প্রতি সহানুভূতিহীন, কিন্তু পরিশেষে তিনিও একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ বাগিচা মালিকে পরিণত হন—বাংলার জেলা নিবাসী প্রতিটি ইংরাজের মতোই তাঁর ও স্থানীয় সরল জনগণের জন্য এক ধরনের মোটা দাগের পিতৃপ্রতিম ভালোবাসা জন্মে। বহুবার পুনর্নির্মিত তাঁর কারখানা বর্তমানে বীরভূমে সর্বাপেক্ষা জমকালো বাণিজ্যিক অট্টালিকা। ময়ূরাক্ষীর তীরে উচ্চভূমিতে মনোরমভাবে এই অট্টালিকা অবস্থিত, সুবিশাল আলম্ব দ্বারা নদী হতে সুরক্ষিত এবং উচ্চ বহুকোণী প্রাকার বেষ্টিত—ক্ষুদ্র এক শহরের জন্য স্থান সংকুলানে সক্ষম। এর প্রাচীন গ্রন্থাগারের অবশেষ, আজও প্রাচীন মালিকদের উন্নত সাংস্কৃতিক মানের সাক্ষ্য বহন করে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গিবনের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ছয়টি ফর্মা—যার পৃষ্ঠাগুলির সাহায্যে আশা করা যায়, বিচ্ছিন্ন এই 'ভাগ্যসন্ধানী' জেলাশাসকের সাথে দ্বন্দ্ব ও তুঁতক্ষেতে প্লাবনের আশংকার কথা প্রায়শই বিস্মৃত হতে সক্ষম হতেন। বর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারীরা শুধু রেশম গুটি ছাড়ানোর জন্য ২ হাজার ৪ শত কর্মী নিয়োগ করেছেন, এবং এর সাথে যদি অসংখ্য তুঁতচাষী ও রেশমগুটি উৎপাদকদের পরিবার সহ ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এই কারখানা ১৫ হাজার মানুষের অন্ন সংস্থান করছে। এই কারখানার বার্ষিক বিনিয়োগ গড়ে ৭২ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ বিগত দিনে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির সমগ্র বিনিয়োগের প্রায় অর্ধাংশ, এবং জেলার সাধারণ রেশম উৎপাদনের বার্ষিক মূল্য ১৬০ হাজার পাউণ্ডেরও অধিক।[১৪] মনে রাখা দরকার যে এইটি বহু সামগ্রীর একটিমাত্র। ময়ূরাক্ষী তীরে মিঃ ফ্রুশার্ডের উত্তরাধিকারীরা ছাড়াও রয়েছেন অজয়তীর নিবাসী মিঃ চিপের উত্তরাধিকারীরা, এদেরও অসংখ্য ক্ষুদ্রতর কারখানা ছড়িয়ে রয়েছে, এবং রেশম ছাড়াও এই জেলা বিপুল মূল্যের নীল, লাক্ষা রং, লৌহ তন্তু ও তৈলবীজ উৎপন্ন করে; এই ছাড়াও রয়েছে অদ্যাপি দেশীয় হস্তাধীন শস্য রফতানির বিপুল ব্যবসা। ব্যক্তি ও সম্পত্তির দীর্ঘ-অব্যাহত নিরাপত্তার ফলশ্রুতিতে বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, প্রধানত ইংরাজ পুঁজির এই প্লাবন পূরণ করেছে। জীবনধারণের জন্য গ্রামবাংলার ভূমি নির্ভরতা বন্ধ হয়েছে; এবং সেই কারণেই, জমির পরিমাণ অভিন্ন থাকলেও জনসংখ্যা নিরাপদে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং একদা যে স্বাধীন উদ্যোগ কোম্পানির কর্মচারিদের দ্বারা এত ঘৃণিত ও সন্দেহজনক ছিল, বর্তমানে সেইটিই যে জীবন সংগ্রাম তীব্রতর না করা

ভারতে সুশাসন সম্ভব করেছে, সেই কথা বলা মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

এই কারণেই কোম্পানির কার্যাবলী ও পদ্ধতির হিসাব নিকাশ করার সময় এইগুলি সম্বন্ধে কোম্পানির ধারণা কি ছিল সেই কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ১৭৯০ সন পর্যন্ত বাণিজ্য ছিল কোম্পানির ঘোষিত প্রধান কাজ, এবং সেই কাজ উৎকৃষ্টভাবে সম্পন্ন হয়। এর গৌণ কাজ ছিল, ব্যবসার্থে তহবিল গঠনের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ, এবং এই কাজেও বিপুল উৎসাহ ও দক্ষতা প্রদর্শিত হয়। এর তৃতীয় কর্তব্য ছিল ন্যায়বিচার; কিন্তু এইটিই যে আদৌ কোম্পানির কর্তব্য তা বোঝার আগে ৭ বৎসর (১৭৬৫-১৭৭২) অতিক্রান্ত হয় এবং আরো ২১ বৎসর ধরে (১৭৭২-৯৩) এর গ্রামীণ আদালতগুলি জনগণের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। ১৭৯০ সন পর্যন্ত কি চুক্তি দ্বারা কি বাস্তবে, ফৌজদারি প্রশাসন ও পুলিশি ব্যবস্থার জন্য কোম্পানির কোনো দায়িত্ব ছিল না।

নির্দেশিকা

১. এই রাশি খাজাঞ্চিখানার বাণিজ্যিক হুণ্ডিগুলির সামগ্রিক যোগফল। —বী. অ. ন.

২. একটি ঘটনায়, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি তাঁর প্রভাব খাটিয়ে জনৈক দস্যুকে গ্রেফতার করার পর, তাঁকে সদর দফতরে আনার জন্য জেলা সমাহর্তাকে সৈন্যবাহিনীর জন্য ফরমাশ করতে হয়।

৩. আত্মপক্ষ সমর্থনে পার্লামেন্টের বক্তৃতা। পরিচালকসভার নিকট পত্র, ৩০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫। মিল, ii, ২৩৫, ২৩৬।

৪. জন পোরের পত্র, ৩ ডিসেম্বর ১৭৬৯; জীবনী, i, ২৬।

৫. জেলা জজদের নিকট পরিষদের গভর্নর-জেনারেলের পত্র, ৪ মার্চ, ১৭৮৯। রাজস্ব পর্ষদের আদেশপত্র, ৬ মার্চ ১৭৮৯। বী. অ. ন.

৬. এইচ. ইংলিস মহোদয়ের নিকট জন শোরের পত্র, ৯ নভেম্বর ১৭৮৮।

৭. হেতমপুর রাজ দফতরের নথিপত্র। সমাহর্তার দফতরের নথি। বী. অ. ন.

৮. পরিচালক সভার নিকট বঙ্গীয় পরিষদের পত্র, ২৭ জুলাই ১৭৮৭, অনু. ৩৪; ই. অ. ন.

৯. পত্র, মাননীয় স্টুয়ার্ট, ৪ জুন ১৭৯০। বী. অ. ন.

১০. রাজস্ব পর্ষদের পত্রের সাথে প্রেরিত, ১৮ জুলাই ১৭৯১, এবং পূর্বতন পত্রাবলী, বী. অ. ন.

১১. খাজাঞ্চি খানার হুণ্ডিগুলি যোগ করে এই রাশি প্রাপ্ত। বী. অ. ন.

১২. সামরিক পত্রাবলী, পৃ. ২৪ ইত্যাদি। বী. অ. ন.

১৩. ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারকদের নিকট পত্র, ১৭ মে ১৭৯১ ইত্যাদি। বী. অ. ন.

১৪. প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার কর্তৃক প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক ৮ পাউণ্ড আয়ে একজন কৃষকের স্বচ্ছলভাবে চলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

বিগত শতাব্দীর উত্তরভাগে বাংলার গ্রামীণ সমাজের বহির্বিশ্লেষণ এক্ষণে সমাপ্ত এবং এইখানেই বর্তমান গ্রন্থের সমাপ্তি হওয়া উচিত। ক্লাইভ ও হেস্টিংস —এই দুই মহান ব্যক্তি কোম্পানিকে ব্যবসায়ী সংস্থা হতে হঠাৎ সার্বভৌম এক শক্তিতে পরিণত করেছে—এই বিশ্বাসে অভ্যস্ত আমার স্বদেশবাসীদের বীর-পূজারী বিশাল অংশের নিকট সম্ভবত এই চিত্র অপ্রীতিকর হবে। সত্যই ক্লাইভ কোম্পানির জন্য ক্ষমতা জয় করেছে; কিন্তু, তিনি প্রকৃতই কি জয় করেছেন, তা তিনি বা তাঁর প্রভুরা কেউই জানতেন না। ওয়ারেন হেস্টিংস সাম্রাজ্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধির পরিচয় রাখেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শাসন-কার্যে, শাসক ও শাসিত, উভয় উপাদানকেই গুরুত্ব দিতে হবে; এবং আইন প্রণয়নের দৃষ্টিকোণ হতে, তাঁর শাসনকালের প্রাথমিক বৎসরগুলি ছিল ভারতে ইংরাজদের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম ঘটনা। কিন্তু পরিকল্পনামতো রূপায়ণের ক্ষমতা হেস্টিংসের ছিল না এবং তৎকালীন ভারত দফতরের নথিপত্রে বাস্তব সংস্কার অপেক্ষা শুভেচ্ছারই বর্ণনা মাত্র—এক অবাস্তব স্বপ্ন কখনো বাস্তবে রূপায়িত না হলেও যা ছিল বহু ধ্যান-ধারণায় আকীর্ণ; কিন্তু এই হতে তিনি প্রকৃতই কি করেছিলেন তা বোঝা যায় না। তবুও এতাবৎ লিখিত ভারতীয় ইতিহাসের একমাত্র উৎস ছিল এই নথিপত্রগুলি। ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস উভয়েই তুচ্ছ সংস্থানের সাহায্যে বৃহৎ কার্যাদি সম্পন্ন করেন। কিন্তু ক্লাইভের তুলনায় হেস্টিংসের ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের বৈষম্য বহুগুণে বেশি ছিল; কারণ ক্ষুদ্র সেনাদলের সহায়তায় বহু সেনাপতি বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করলেও, বিজেতাদের ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংসই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি মাত্র

জনাকয়েক বাণিজ্য সংস্থার কোম্পানির নিকট হতে নিজস্ব শর্তাবলী আদায়ে সক্ষম হন ; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আইনমাফিক ও বাস্তবে স্থানীয় সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে, ততক্ষণ তিনি কোনো প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি। ওয়া-রেণ হেষ্টিংসের এই সুযোগ থাকলে ১৭৯০-৯৩ সনের সংস্কারগুলি ২০ বৎসর পূর্বেই সাধিত হতো। নিয়ন্ত্রণ হতে বৃহত্তর স্বাধীনতা ছাড়াও লর্ড কর্নওয়ালিস প্রথম হতেই দক্ষ একদল ভারতীয় রাষ্ট্রবিদকে পান ; কঠোর পরিশ্রম সহকারে হেস্টিংস এদের তালিম দেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হওয়া পর্যন্ত এরা তাঁর সাথে থাকেন ; ইংল্যাণ্ডের রাউস এবং বাংলার শোর এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতের দিগন্তে পরবর্তীকালে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উদিত হয় সে আলোচনা আমার পক্ষে অনুমোদিত নয় এবং পরবর্তীকালের উজ্জ্বল পর্যায়ের ক্ষণিক চিত্রণ ব্যতীত শুধু প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলির বর্ণনাতে যাঁরা অন্যায্য মনে করেন তাঁদের যথোচিত জবাব দিতেও আমি আগ্রহী নই। আমাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কালীন গ্রামবাংলার অবস্থা আমি চিত্রিত করেছি ; এবং এর বর্তমান অবস্থা সম্যক রূপে জানা থাকায় অতীতের সাথে পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা অধিকাংশ শিক্ষিত ইরেজের রয়েছে। ভবিষ্যতে এই বৈপরীত্যের বিশদ বিবরণ দেওয়া আমার আনন্দময় কর্তব্য হতে পারে ; কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের সুফল সম্বন্ধে কেউ, বিশেষভাবে ভারতীয়রা, প্রশ্ন করলে আমি একটি কথাই বলতে পারি,—'তার কীর্তিসৌধের সন্ধান যদি চাও, নিজের চারপাশে তাকাও'।

কারণ, ইতিমধ্যে, ইংরেজ গভর্নরদের প্রশংসা করার চেয়ে বহুগুণে জরুরি কাজ ভারতীয় বিবরণীকারদের হাতে রয়েছে। শাসিতদের অধিকার এখনো অনির্ণীত। আমরা সচেতনভাবে দেশীয় রীতিনীতি অনুযায়ী শাসন করার চেষ্টা করছি ; কিন্তু এই রীতিনীতি যে কি, তা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে সক্ষম নয়। ১৮৫৯ সন পর্যন্ত বাংলার ভূমিসংক্রান্ত আইন সামগ্রিকভাবে সংশোধিত, গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সমূহ কার্যকরী করা হয় এর ফলে সমগ্র প্রদেশে মামলার পাহাড় জমে ওঠে। ১৮৬৫ সনে, নতুন ব্যবস্থা ৫ বৎসর কার্যকরী হওয়ার পর, এর ধারাগুলির চূড়ান্তভাবে ব্যাখ্যার জন্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ১৫ জন বিচারক একত্রে মিলিত হন ; এবং এইজন্য তাঁরা ইতিহাসের দুর্বোধ্যতম বিষয়সমূহ আলোচনায় বাধ্য হন। তাহাদের বহু রায় লিখিত আইনের ঘোষণা অপেক্ষা অনেকাংশে প্রাচীন বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা হয়ে দাঁড়ায় ; এবং তাদের সিদ্ধান্ত যতই সঠিক ও মঙ্গলকর প্রমাণিত হোক না কেন, আইনি গ্রন্থ ছেড়ে প্রাচীন গবেষণা অনির্দিষ্ট ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তা বিচারকদের পক্ষে অতি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এই কাজ সম্পন্ন করার পর, তাদের হাতে দেওয়া উচিত।

ইতিমধ্যেই অনেক যোগ্য ব্যক্তি এই কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। এক-দল প্রাচীন হিন্দু আইনের মধ্যে জনগণের অধিকার আবিষ্কারের আশা করেছেন।

কিন্তু, তুরস্কের বর্তমান ভূমিনীতির সাথে প্রাচীন থিওডোসিয়ানাসের নীতির যে সম্পর্ক বর্তমান, মনু বা যাজ্ঞবল্ক্যের নীতির সাথে বাংলার বর্তমান ভূমিনীতির প্রায় একই প্রকারের সম্পর্ক। মূলত হিন্দু হলেও বাংলা দীর্ঘদিন মুসলমান শাসনাধীনে রয়েছে, এই যুক্তিতে আরেকদল আরবি কাজীদের রচনা হতে এই খানের ভূমিববস্থার ব্যাখ্যার সন্ধান করেছেন। কিন্তু এই সকল পণ্ডিত প্রবররা ভুলে যান যে মুসলমানদের নিম্নবঙ্গ বিজয় কখনো পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি; এখানকার বহু নবাব করদ রাজা ছিলেন, প্রজা ছিলেন না; এবং মুসলমান প্রাধান্যের পরিধির বাইরে কোরান, হিদায়ত বা এমনকি ফতোয়া আলমগিরির যৎসামান্য মাত্র প্রভাব ছিল। আমাদের শাসনের প্রথম অর্ধশতাব্দী ব্যাপী গ্রামীণ অফিসারদের পরিচালনাধীন গবেষণাগুলির মধ্যেই একমাত্র এই দেশের প্রকৃত ভূমিনীতির সন্ধান পাওয়া যাবে।

সুতরাং, পরবর্তী খণ্ডে আমি জমির মালিক ও কৃষকের বিভিন্ন শ্রেণীর, গ্রামীণ নথিপত্রে বর্ণিত অধিকার ও আইনি মর্যাদা সম্বন্ধে তদন্ত করার ইচ্ছা রাখি। বর্তমান ভূম্যধিকারী বৃহৎ জমিদার পরিবারগুলির ইতিহাস এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই তদন্তে কয়েকটি মাত্র পরিবার বা জেলার নথিপত্র পর্যালোচনা করলে বরং সকল জেলাগুলির এবং প্রদেশের যত বেশি সংখ্যক সম্ভব বিখ্যাত পরিবারগুলির ইতিহাস বিচার করতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় বাংলার বহু অগ্রগণ্য দেশীয় ভদ্রলোক সম্প্রতি আমার গবেষণা নিরপেক্ষভাবে শেষোক্ত বিরাট কাজটি গ্রহণ করেছেন এবং শীঘ্রই ভারতীয় ভূমিব্যবস্থা ও প্রথাগুলি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট এক সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। আমার নিজস্ব তদন্তেই জমিতে স্বার্থ সম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারে অনন্ত স্তর বিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। কয়েকটি জেলায় জমিদাররা মুসলমান নবাবের অধীনতা প্রায় স্বীকার করতেন না এবং প্রায়শই বা কখনো তাঁর হস্তক্ষেপ সহ্য করতেন না, অন্যগুলিতে তিনি ছিলেন রাজস্ব গ্রহণের জন্য নিযুক্ত পেয়াদা মাত্র। কয়েকটি জেলায় আবার কৃষকদের অধিকার স্বীকৃত ছিল এবং প্রাচীন গোষ্ঠীতন্ত্র নির্দিষ্টরূপে বজায় ছিল; অন্যগুলিতে কৃষকরা ছিল ভূমিদাস মাত্র, এবং তাদের গ্রামত্যাগ রোধ করা গ্রামীণ পুলিশের প্রধান কর্তব্য ছিল। এইটিই ভূমিনীতি বিষয়ে লর্ড কর্নওয়ালিসের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী আপত্তির গুপ্ত রহস্য। কোম্পানির কর্মচারিদের একজন কলিকাতা গেজেটে লেখেন, সেই সময়ে জনগণের অধিকার এত কম প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে 'দক্ষতম ব্যক্তিদের তদন্তেও সেইগুলি নির্ণীত হয়নি;'[১] এবং আর একজন বলেন যে এইগুলি সম্বন্ধে প্রশাসনের কোনো দুইজন অভিন্ন মত পোষণ করেন নি। সুতরাং ঘটনা এই দাঁড়ায় যে, সেই সব জেলায় জমিদাররাই জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন সেইখানের জেলাশাসকরা অভিযোগ করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদের অধিকারচ্যুত করে ধ্বংস করেছে; অপরদিকে, দেশের যেসব

অঞ্চলে মুসলিম ব্যবস্থা প্রাচীন পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করেছে সেইখানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা আপত্তি তোলেন যে লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারের দাবি ও জনগণের অধিকারের মূল্যে একদল রাজস্ব সংগ্রাহকদের ও নায়েবদের নকল অভিজাতদের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

ইয়োরোপে মুসলিম ভূমি ব্যবস্থার সাথে তুলনার উদ্দেশ্যে, অসুস্থতার সুযোগে আমি তুরস্ক ও ড্যানিউবের প্রদেশগুলি পরিদর্শন করি। সেইখানে, সমগ্র অটোমান রাজ্যব্যাপী ভূমি ব্যবস্থায় বাংলার মতো একই প্রকার অনিশ্চয়তা আমি লক্ষ্য করেছি। সুষম এক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বা সমসত্ত্ব এক জাতির বিকাশে মুসলমানরা কি ইয়োরোপে কি ভারতে ব্যর্থ হয়েছে। যে কয়েকজন আলোকিত রাষ্ট্রনায়কের উপর তুরস্কের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল তাদের অন্যতম, গ্রীসের অটোমান বংশীয় মন্ত্রী ফোটিয়ারিস বে মহোদয়ের নিকট হতে এর একমাত্র আপাত বোধগম্য ব্যাখ্যা আমি পেয়েছি। কিন্তু এই কট্টর ফ্যানারিয়টের বিবরণ ও সুদূর প্রদেশগুলিতে প্রকৃত অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। জনৈক ওয়ালাকিয়ান অভিজাতের মতানুসারে, সরকারই সর্বেসর্বা।

এই খণ্ডে, আমি বাঙালি জনসাধারণের জাতিগত উপাদান ও ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার সময় তাদের অবস্থা বর্ণনায় সচেষ্ট হয়েছি। ইংরাজ সরকারের প্রশংসা বা নিন্দা আমার পরিকল্পনার কোনোরূপ অঙ্গ ছিল না, এবং প্রকৃতপক্ষে আমি এই কারণে কৃতজ্ঞ যে, আমার বর্ণনায় যে প্রশাসকটির ছিল প্রধান ভূমিকা, সেই মিঃ কিটিং ছিলেন একজন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র—বিরাগ বা অনুরাগ অর্জনে অক্ষম। তাঁর নির্ধারিত কাজ তিনি করতেন এবং তার জন্য নির্ধারিত বেতন গ্রহণ করতেন, কিন্তু স্বীয় কর্তব্য পালনের যে ব্যাখ্যা তাঁর ভারতে চাকুরি জীবনের দীর্ঘ নিদাঘ-পীড়িত বৎসরগুলিতে মর্যাদা বা সকরুণ বিষণ্ণতা আরোপে সক্ষম, সেই ব্যাখ্যা গ্রহণে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণত অক্ষম। অবশ্য আমার আশংকা এই যে সম্ভবত আমাদের পূর্বসূরী মুসলমানদের সম্বন্ধে আমি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছি, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমি তাদের জরাজীর্ণ ও দুর্বল অন্তিম দিনগুলির কথা বলেছি। জনগণের প্রকৃত নেতা দেশীয় প্রাচীন পরিবারগুলি সম্বন্ধে আমি নীরব থেকেছি; মুসলিম অত্যাচার হতে সদ্যমুক্ত চরম দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালিদের সম্বন্ধে লর্ড মেকলের আক্ষরিক বর্ণনাকে হিন্দুদের স্বাভাবিক ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করলে সমগ্র বাঙালি জাতির উপর যে অবিচার করা হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন যে পর্যায়ে মধ্যে বর্তমান আলোচনা সীমিত শুধু সেই পরিসরে প্রাচীন পরিবারগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হলে তাদের উপর অনুরূপ অবিচার করা হবে।

নির্দেশিকা

১. কলিকাতা গেজেট, ৩ জুন ১৭৭০।

পরিশিষ্ট—১

১৭৭২ সনে বঙ্গদেশ—ওয়ারেন হেস্টিংসের চিত্রণ

পূর্ব ভারতে ব্যবসায় রত মহামান্য ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীদের সংযুক্ত সমিতি বিষয় সম্বন্ধে মহামান্য পরিচালক সভা সমীপেষু,

তাং, ফোর্ট উইলিয়াম, ৩ নভেম্বর, ১৭৭২

রাজস্ব বিভাগ

মাননীয় সুধীবৃন্দ, বিগত ১৩ এপ্রিল লিখিত কোলব্রুকের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা বাংলায় আপনাদের রাজস্বের অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের জানিয়েছিলাম—যে সময় থেকে আমরা গত বাংলা বর্ষের দরুণ নিট সেটেলমেণ্ট ও আদায়ের হিসাব গুটিয়ে ফেলেছি, সে পর্যন্ত জানানো হয়েছে এবং এর একটি অনুলিপি এই সাথে পাঠালাম। এ হতে আপনারা দয়া করে দেখবেন যে, মুর্শিদাবাদ ট্রেজারি লাভ ক্ষতি জনিত কিছু ব্যয় মকুব সহ বিগত বৎসরে মোট আদায়ের পরিমাণ ১, ৫৭, ২৬, ৫৭৬ : ১০ : ১ : ৯ রৌপ্যমুদ্রা ; অতএব ঐ বৎসরের জন্য বকেয়া আদায়ের পরিমাণ বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ১২, ৪০, ৮১২ : ৭ : ১৫ টাকা—এর অধিকাংশ আমরা আদায়ের আশা রাখি, আমরা গর্বিত যে বকেয়ার এই হ্রাস ও বাংলায় গত কয়েক বৎসরের আদায়ের সাথে গত বৎসরের আদায়ের তুলনামূলক বিচার, রাজস্ব আদায়ে প্রভূত সাফল্য সম্বন্ধে আপনাদের পুরোপুরি সন্তুষ্ট করবে। সমস্ত হিসাব নিকাশ করার পর মুর্শিদাবাদের খাতা পরের জাহাজে আপনাদের কাছে পাঠানো হবে এবং তাছাড়া এই সাথে প্রেরিত গত বৎসরের রাজস্বের হিসাব আরো পরিষ্কার হবে।

৩০ অগাস্টের আপনাদের কাউন্সিলের এক সভায়, কাশিমবাজারস্থিত কমিটি অফ সার্কিট-এর সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত এই প্রস্তাব সর্বসম্মতি

ক্রমে গৃহীত হয়েছিল যে রাজস্বদফতর প্রেসিডেন্সিতে স্থানান্তরিত হবে এবং আপনাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দফতরটিকে আপনাদের গভর্নর ও কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনা হবে ; এই মতো গত মাসের ১৩ তারিখে আমরা নিজেদের এক কমিটি গঠন করেছি। ঐ সময় হতে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বা প্রদেশগুলির অভ্যন্তরীণ শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় একমাত্র এই দফতরের উপর ন্যস্ত হয়েছে, এবং এখন থেকে এই শিরোনামার আওতায় সকল ব্যাপারে আমরা আলাদাভাবে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব।

এই বিষয়ে আপনাদের এক সুনির্দিষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য এবং এইটিকে আরো সম্পূর্ণ করার জন্য, সম্প্রতি গৃহীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলির পুনরাবৃত্তি দিয়ে আমরা শুরু করবো — আমাদের পূর্বের চিঠিপত্রের মাধ্যমে আপনারা এই বিষয়ে অংশত অবগত।

নটিংহাম লিখিত এক পত্রে, প্রদেশব্যাপী সমস্ত জমি খামাররূপে দীর্ঘমেয়াদী ও সুনিয়ন্ত্রিত ইজারা দেওয়ার ইচ্ছার কথা আপনাদের জানানো হয়েছিল ; এবং রাজস্ব আদায়ের এই বাস্তব ও প্রধান পরিচালন ব্যবস্থা এই বিষয়ে, আপনাদের ইচ্ছা ও আদেশের সম্পূর্ণ সদৃশ হওয়ায় আমরা আনন্দিত। এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিণত চিন্তাভাবনার পরে, ১৪ মে রাজস্বকমিটির সভায় এই ভিত্তিতে সমস্ত জেলাগুলির রাজস্ব নির্ণয়ের এবং ভবিষ্যৎ আদায় পরিচালনার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। যেহেতু এইটি আমাদের পরবর্তী সকল কাজকর্মের এবং তার মাধ্যমে যা গঠনে আমরা সচেষ্ট হয়েছি সেই ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তিভূমি, সুতরাং অবিলম্বে এই ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও গৃহীত ব্যবস্থাদির বিস্তৃত কারণসমূহ সহ একটি অনুলিপি সঠিকভাবে পাঠানো আমরা প্রয়োজনীয় ভেবেছি।

এই বিষয়ে আরো অগ্রসর হওয়ার আগে, প্রদেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু সাধারণ মন্তব্য করা হয়তো অসমীচীন হবে না।

১৭৭০ সনের সারা বৎসর ব্যাপী মারাত্মক দুর্ভিক্ষের ফলাফল আমাদের আগের পত্রাবলীতে আপনাদের নিয়মিত জানানো হয়েছে, — বিস্তৃত বর্ণনার মাধ্যমে জনসাধারণকেও অবহিত করা হয়েছে, সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য এবং আপনাদের কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টির জন্য বাস্তব প্রতিটি ঘটনা ও ভাষার প্রতিটি কলাকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে — আমাদের দুর্ভাগ্য যে মানুষের এই দুর্ভোগে আমাদের দর্শক ও সাক্ষীমাত্র হতে হয়। কিন্তু করদাতাদের ওপর ছাড়া রাজস্বের ওপর এর অন্য কোনো প্রভাব এখনো পরিলক্ষিত হয়নি, এমনকি অনুভূতও হয়নি ; কারণ, যদিও রাজ্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী বিনষ্ট হয়েছে এবং ফলত চাষ আবাদ কমেছে, তথাপি ১৭৭১ সনের তুলনায়ও অধিক ছিল — মুর্শিদাবাদে রাজস্ব বিভাগের বিগত চার বৎসরের

নিম্নলিখিত হিসাব হতে এইটি পরিষ্কার বোঝা যায় :

বাংলা সন	
১১৭৫ [ইং ১৭৬৮-৬৯] — প্রকৃত আদায়	১,৫২,৫৪,৮৫৬ : ৯ : ৪ : ৩
১১৭৬ [ইং ১৭৬৯-৭০] — দুর্ভিক্ষ পূর্ববর্তী ঘাটতি বৎসর	১,৩১,৪৯,১৪৮ : ৬ : ৩ : ২
১১৭৭ [ইং ১৭৭০-৭১] — দুর্ভিক্ষ ও মড়কের বৎসর	১,৪০,০৬,০৩০ : ৭ : ৩ : ২
১১৭৮ [ইং ১৭৭১-৭২] — ...	১,৫৭,২৬,৫৭৬ : ১০ : ২ : ১
রাজস্বগত ত্রুটির অপরিহার্য কারণ জনিত সরকারের ক্ষতি বাবদ বাদ	৩,৯২,৯১৫ : ১১ ১২ : ৩
	১,৫৩,৩৩,৬৬০ : ১৪ : ৯ : ২

এতবড় বিপর্যয়ের অন্যান্য ফলাফলের সাথে সংগতি রেখে রাজস্ব হ্রাস স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। জবরদস্তি পূর্বমান বজায় রাখার কারণে তা ঘটেনি। যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল সেইগুলি নির্ণয় করা সহজ হবে না। যেসব জটিল পথে রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি ঘটেছে সেইগুলিকে অনুসরণ করা অথবা কোন কোন দ্রব্যসামগ্রী প্রাথমিকভাবে রাজস্বযোগ্য এমনকি সেই সবগুলিও বোঝা দুরূহ। অবশ্য, গত আদায়ে সমতা রক্ষার যে প্রচেষ্টা হয় সেইটি বোঝাবার জন্য বিগত আদায়ের প্রধান একটি কর সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। এই করের নাম 'নাজে' — এইটি হচ্ছে মৃত বা পলাতক প্রতিবেশীর কারণে রাজস্বের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিটি নিম্নমানের জমির প্রকৃত অধিবাসীদের উপর ধার্য কর। যদিও এই কর আরোপণ অবিবেচনাপ্রসূত এবং আদায় করা দমনমূলক, তবুও দেশের প্রাচীন ও সাধারণ প্রথায় এটি অনুমোদিত। এইটিতে সরকারের অনুমোদন নাই কিন্তু বাস্তবে এইটি প্রচলিত। সাধারণ ক্ষেত্রে এবং চাষ আবাদ অব্যাহত থাকাকালীন, এইটি কদাচিৎ অনুভূত হতো। অভিযোগের ঘটনা কখনো ঘটত না বা বিরল ছিল। কঠোর সুবিচারের সাথে যতই সংগতিবিহীন হোক না কেন, রাষ্ট্রের সাময়িক ঘাটতিতে এইটির একটি প্রস্তুতির ভূমিকা ছিল; অধিবাসীদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল থাকতে বাধ্য করে এইটি বাস্তুত্যাগের বিরুদ্ধে জামিন স্বরূপ ছিল; এর দ্বারা অসৎ জেলা সমাহর্তা, বন্ধ্যা বা পরিত্যক্ত জমির অজুহাতে, আদায়ের কিয়দংশ গোপন করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু অন্য সময়ে ও অন্য অবস্থায় এই রীতি মঙ্গলজনক হলেও এই সময়ে এইটি অধিবাসীদের পক্ষে অসহনীয় ভার হয়ে দাঁড়ায়। যেসব গ্রাম বস্তুত্যাগে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেইগুলি সরকারি ক্ষমাশীলতার যোগ্যতম হলেও, এই করের কোনো নির্দিষ্ট হার বা মাত্রার অনুপস্থিতির ফলে সেই গ্রামগুলির

অবশিষ্ট বাসিন্দাদের উপরই এই করের চরম বোঝা পড়ে। নিয়মিত রীতির প্রতিটি ব্যতিক্রমের মতো এখানেও অতিরিক্ত আর একটি ত্রুটি ছিল—এই করের নামে অন্যান্য কর ধার্য করার সুযোগ ইজারাদার ও শিকদারদের সামনে উপস্থিত হয়, এবং যেহেতু তারাই ক্ষতির পরিমাণ ও ক্ষতিপূরণের অনুপাত নির্ধারণ করে, তাই ক্ষতিপূরণের জন্য এমনকি করের পরিমাণও তারাই নিজেদের খেয়ালখুশি মাফিক নির্ধারণ করে।

প্রদেশব্যাপী সর্বত্র এইটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ; পূর্বের সঞ্চয় না থাকায়, এখন এই কর অব্যহত রাখলে জনগণের উদ্যম এত অবদমিত হবে যে চরম মাত্রায় রাজস্বহানি ঘটার আশংকা আছে।

কোম্পানি দেওয়ানি গ্রহণ করার পর ৭ বৎসর অতিবাহিত হলেও এখনো পর্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়মিত কোনো ব্যবস্থা প্রণীত হয়নি। প্রতিটি জমিদারি ও তালুক নিজস্ব অদ্ভুত প্রথা বজায় রেখেছে। এইগুলিও ব্যতিক্রমহীন ভাবে মান্য করা হয় না। তত্ত্বাবধায়কদের কাছে এই বিষয়ের নতুনত্ব, যাদের তাঁরা এজেন্ট নিযুক্ত করতে বাধ্য হন তাদের প্রতারণা, প্রতিটি জেলার আকস্মিক জরুরি প্রয়োজন এবং প্রায়শই, জেলা সমাহর্তার ন্যায্য উপলব্ধির কারণে বহু পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি পরিবর্তনে সামগ্রিক বিভ্রান্তি আরো বাড়ে এবং এইগুলি সরকারে আসীন সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত ছিল না বা তাদের জানা ছিল না। যে কোনো বিজ্ঞানের দুর্বোধ্যতা প্রধানত যেইগুলি দ্বারা সৃষ্ট হয়,—সেই করযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী, হিসাবপত্র রাখার পদ্ধতি, সময়ের হিসাব এমনকি পরিভাষাগুলিও প্রদেশের মাটি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মতোই অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এই বিভ্রান্তির উৎস ছিল পূর্ববর্তী সরকার। নাজিমরা জমিদারদের থেকে যতটা পারতো আদায় করতো ; এবং রাজস্বের বড় বড় ইজারাদারদের ক্ষেত্রেও, যাদের নিজেদের অধীনস্থ সকলকে লুণ্ঠনের সকল স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল—শুধু লুঠের মাল আত্মসাৎ করে তারা ধনী হয়েছে মনে হলে পরিবর্তে এদের লুণ্ঠন করার বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত ছিল। নাজিম ও জমিদারদের মধ্যে বা তাদের ও জনগণের মধ্যে অবস্থানরত মুৎসুদ্দিদের প্রত্যেকের সরকারি সম্পদে নিজ নিজ বখরা ছিল। এই উপরিলাভ বেআইনি তছরূপ হিসাবে বিবেচিত হতো, সুতরাং গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সতর্কতা গ্রহণ করা হতো ; এবং ফলত নির্ধারিত কোনো হার না থাকার ফলে, এর পরিমাণ ব্যক্তির মর্জি, ক্ষমতা ও শক্তির উপর নির্ভর করতো। সুতরাং নিজ সম্পত্তির মূল্য গোপন করার জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে যে কোনো তদন্ত এড়িয়ে যাওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াত, যেসব জমিদার ও জোতদারদের দীর্ঘদিন দখল বজায় রাখার সুবিধা ছিল, সরকারি অফিসারদের হতবুদ্ধি করার জন্য তারা জটিল নানাভাগে জমিকে ভাগ করে রাখতো ও রাজস্ব

আদায়ের নানা জটিল পদ্ধতি গ্রহণ করতো এবং খাজনা বিষয়ে জ্ঞাতব্য সবকিছু শুধু নিজেদের মধ্যে গুপ্ত রাখতো। সহজেই অনুমেয় যে বর্তমান সম্পদের এক বৃহদংশ সরকারি কোষাগারে পৌছত না। বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই যথাযথ মন্তব্য করতেই হয় যে এই প্রকার ব্যবস্থা থাকা সৌভাগ্যজনক ছিল, কারণ এই গোপন তছরূপগুলিই দেশের বর্তমান মুদ্রাপরিমাণকে সঞ্চিত রেখে পুনঃ সঞ্চালিত করতো; অথচ সরকারপ্রাপ্ত সম্পদের বৃহদংশ দেশে ব্যয়িত হতো —যে সামান্য অংশ দিল্লি দরবারে প্রেরণের জন্য থাকতো, এই প্রদেশে সেইটুকু চিরতরে হারাতো।

এই প্রদেশগুলির সংবিধানগত সহজাত মূলগত ত্রুটির সাথে আমাদের সম্পত্তি হওয়ার পর, এদের অসম ও অস্থায়ী শাসনব্যবস্থার ত্রুটি যুক্ত হয়। যেই সব অঞ্চল আগে থেকেই আমাদের অধিকারে ছিল, যেমন, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম, সেইগুলিতে প্রেসিডেন্সিব প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন দেশীয় রাজাদের শাসন অব্যাহত থাকে। পলাশির চুক্তি অনুযায়ী চব্বিশ পরগনা কোম্পানিকে দেওয়া হয়। জমিদার ও রাজাদের বাদ দিয়ে এইটিতেও তাদের প্রত্যক্ষ অধিকার ছিল, শর্তাবলী ছিল ভিন্ন: প্রতিটি পরগনায় নিয়োজিত এজেন্টরা খাজনা আদায় করে কলিকাতাস্থিত কালেকটার বা সমাহর্তার কাছে জমা দিত।

বাকি প্রদেশের দায়ভার কিছু সময়ের জন্য নায়েব দেওয়ান ও দরবারের প্রতিনিধির যুক্ত দায়িত্বে এবং পরে মুর্শিদাবাদস্থিত রাজস্ব পর্ষদের ও পর্ষদের অধীন তত্ত্বাবধায়কদের উপরে ন্যস্ত হয়। খাস প্রশাসন এই রাজস্ব সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা হতে অব্যাহতি পেল।

সমগ্র প্রদেশের মতো জেলাগত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাও কম বৈচিত্র্যময় ছিল না। একই কালেক্টারের অধীন মেলানো-মেশানো জমির কিয়দংশ ইজারায় ছিল, কিছু ছিল শিকদারদের বা কালেকটার নিয়োজিত এজেন্টদের তত্ত্বাবধানে, আর কিছু খোদ জমিদারদের ও তালুকদারের অধীনে—বিভিন্ন মাত্রার নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। যেহেতু ইজারার মেয়াদ ছিল এক বৎসর এবং জমি হতে সাধ্যাতীত আদায় রোধে ইজারাদারদের কোনো স্বার্থ বা প্রতিবন্ধক ছিল না, তাই প্রথম প্রকারের জমি হতে নির্দয় আদায় চলতো। দ্বিতীয় প্রকারের জমিও সমভাবেই শোষিত হতো এবং যেহেতু সর্বাধিক সতর্কতা সত্ত্বেও কালেকটারের পক্ষে চুরি ধরা বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না, তাই খাজনা তছরূপ হতো। অনুমান করা যায় যে, কালেকটারও সাধারণ দুর্নীতির আওতার বাইরে থাকত না। যদি থাকত, সেইক্ষেত্রে সন্নিহিত অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপক বাস্তুত্যাগ ঘটতো, কারণ সেইখানের অধিবাসীরা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যাচার হতে বাঁচার জন্য অধিকতর নমনীয় ও সমদর্শী প্রশাসনের আশ্রয় নিত।

ন্যায়বিচারের সাথে রাজস্বের সংযোগ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইতিমধ্যে

অন্যত্র আমরা বলেছি এবং প্রয়োজন মতো তার উল্লেখ আমরা করবো ; কিন্তু এই দুইয়ের সংযোগ এত গভীর যে সাধারণভাবে এই বিষয়ে আলোচনা কালে আমরা এর উল্লেখ না করে পারি না। যে কোনো রাষ্ট্রের সম্পদ শিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা এই শিল্পের পক্ষে সর্বাধিক অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রশাসনের ক্ষমতা সীমিতকরণ, ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব দ্বারা এইগুলি অন্যায়ভাবে পরি-গ্রহণের যে কোনো প্রচেষ্টাকে দমন করা, এবং ন্যায়বিচারকে অনায়াস লব্ধ করা —এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এইগুলিই ছিল একমাত্র উপায়। কিন্তু এতাবৎ বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এইটি সম্ভব ছিল না। নিজামত ও দেওয়ানি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দায়িত্বে থাকাকালীন এবং প্রথমোক্তের সমস্ত অধিকার স্বীকৃত থাকায়, নাজিমের একচ্ছত্র অধিকারের ক্ষেত্রে বিচারালয় প্রজাদের সাধারণ মঙ্গলার্থে গঠিত হলেও, মাত্র কিছু সংস্কার সাধন করতে পারতো। নিজামতের বিচারালয় ও অফিসারবৃন্দ অব্যাহত রইল, কিন্তু দেওয়ানির প্রশাসনিক প্রভাবে এইগুলির উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়। নিয়মিত ন্যায়বিচার সর্বত্র স্থগিত থাকে ; কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত অন্যদের মান্য করতে বাধ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রত্যেকে এইটি প্রয়োগ করত। জনগণ ছিল অত্যাচারিত ; দেশের সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহ হতোদ্যম করা হতো ; এবং যে অনুপাতে তারা ব্যক্তির দাবি মেটাতো, সেই অনুপাতে সরকারের ন্যায়সংগত প্রাপ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বাধা দেওয়া হতো।

ল্যাপউইংগ আপনাদের আদেশ পাওয়ার সময়ে এই ছিল রাজস্বের অবস্থা ; নায়েব দেওয়ানের পদ লুপ্ত করে এবং আপনাদের তরফে আপনাদের প্রশাসনকে দেওয়ানি বন্দোবস্তের দায়িত্ব গ্রহণের খোলাখুলি ক্ষমতা দান করে, বাইরের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই আরো সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে এতদিনের বাধাগুলি সহজেই অপসারিত হয়।

উপরোক্ত বক্তব্য হতে এইটা স্পষ্ট যে আপনাদের নির্দেশ রূপায়ণে যে বিষয়গুলি মূলত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেইগুলি হচ্ছে রাজস্বের হিসাব সরল ও সহজ-বোধ্য করা, রাজস্বের নির্দিষ্ট হার প্রবর্তন করা, সমগ্র প্রদেশব্যাপী অভিন্ন এক ব্যবস্থা কায়েম করা ও সমান ন্যায়বিচারের সুযোগ সহজলভ্য করা। ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা সেই উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করেছি, কতদূর সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এর পর তা বোঝা যাবে।

পূর্বে উল্লেখিত নিয়মবিধিগুলির সূত্রায়ণ সমাপ্ত হওয়ার পর, সার্কিট-কমিটি গঠিত হয়—এতে থাকেন (গত চিঠিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে) গভর্নর সাহেব সহ মিঃ মিডলটন, মিঃ ডেকারস, মিঃ লরেল এবং মিঃ গ্রাহাম। আমরা বঙ্গ-প্রদেশের সকল জমি ৫ বছরের ইজারায় দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি ও প্রত্যেককে প্রস্তাব পেশ করতে আহ্বান জানাই।

এই কমিটি সর্বপ্রথম কৃষ্ণনগর যায় এবং নদীয়া জেলার জরিপের ও কর নির্ধারণের কাজ শুরু করে। যেসব প্রস্তাব আসে, তাতে শর্তাবলী এত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হয় ও এদের পারস্পরিক রূপভেদ এত দুস্তর ছিল যে কোনো প্রকার তুলনামূলক বিচার বা আনুপাতিক মান নির্ণয় সম্ভব ছিল না; বোধগম্য কয়েকটি মাত্র প্রস্তাবের শর্তাবলী ছিল নিম্নমানের ও অসুবিধাজনক। সুতরাং এই প্রস্তাবগুলিকে নাকচ করা ও প্রাথমিক ইচ্ছার বিপরীত হলেও, সব জমি প্রকাশ্য নিলামে চড়ানো—এই ছিল কমিটির অভিমত।

রাজস্বের সূক্ষ্মতর অনুচ্ছেদগুলি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থেকে শুরু করে যে ভিত্তিতে চাষী ও ইজারাদারদের মধ্যে প্রদেয় কর নির্ধারণ কায়েম করার মতো সম্ভাব্য নানা বাধা ছিল। এইসব বাধা দূর করার জন্য, ইজারা বিক্রি শুরু হওয়ার আগে সম্পূর্ণ নূতন এক হস্তাবুদ অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত বিচিত্র ও জটিল অনুচ্ছেদগুলির ব্যাখ্যা প্রণয়ন করা, কমিটি অপরিহার্য বিবেচনা করে। এর মধ্যে ছিল আসল অর্থাৎ মূল ভূমিরাজস্ব এবং 'আবওয়াব' নামে নানা প্রকার কর, যা বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার, জমিদাররা, ইজারাদাররা, এমনকি সামান্য নায়েবরাও বাছবিচারহীন ভাবে ধার্য করত। এক প্রকার আবওয়াব আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি; এর অনেকগুলিই কোনোরূপ ব্যাখ্যার অতীত।

রাজস্বের উপরিউক্ত ব্যাপারগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর, যেগুলি জনগণের নিকট সর্বাপেক্ষা নির্যাতনমূলক বা যেগুলি বিগত প্রশাসন জনিত, সেইগুলি বাদ দেন; কিন্তু একই সাথে যেগুলি দীর্ঘ প্রচলিত, এবং রায়তদের দ্বারা সানন্দে স্বীকৃত, বস্তুত যেগুলি আসল খাজনার বৃহদংশ, সেইগুলি রক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত করগুলির মধ্যে ছিল দেশের গভীর অভ্যন্তরে জলপথ বাহিত সকল দ্রব্যাদি ও জীবনধারণের উপকরণের উপর জমিদারদের ও ইজারাদারদের দ্বারা খেয়ালখুশি মতো ধার্য কর। আপনাদের আদেশের মানবিক ও সমতার চেতনার সাথে সংগতি বজায় রেখে 'বাজি জুম্মা' অর্থাৎ তুচ্ছ অপরাধ ও অপকর্মজনিত জরিমানা এবং হলদারি অর্থাৎ বিবাহের উপর কর সম্পূর্ণরূপে লোপ করা হয়—এইগুলি হতে সরকারের রাজস্ব সামান্যই আসে, কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে এইগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ এইগুলি জনগণকে নিরুৎসাহিত করে ও জনসংখ্যা হ্রাস ঘটায়। জনসংখ্যার সাধারণ গুরুত্ব সর্বসময়ে বর্তমান, কিন্তু বিগত দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মড়কের ফলে বিপুল জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে বর্তমানে এর গুরুত্ব সমধিক। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে অনুকূল এই ছাড়গুলি প্রাথমিকভাবে রাজস্বহ্রাস ঘটালেও, যেইহেতু এইগুলি দেশের উৎপাদন ও ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়ক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল, বিরক্তিকর নিপীড়ন হতে জনগণকে মুক্ত করার পক্ষে এবং দেশের সাধারণ শান্তি বজায় রাখার সহায়ক, তাই এইগুলির ফল নিঃসন্দেহে যথাসময়ে মঙ্গলদায়ক হবে এবং উন্নতি সাধন করবে।

চাষের নিমিত্ত জমি নেওয়ার পর অধিবাসীদের নিরুপদ্রবে দখল বজায় রাখার জন্য এবং পূর্ববর্ণিত কর আদায় ভবিষ্যতে বন্ধ করার জন্য কমিটি নতুন আমলনামা বা লিজ প্রণয়ন করে। এতে রায়তদের কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণীত থাকে এবং ইজারাদারদের অতিরিক্ত কোনো দাবি নিষিদ্ধ হয় ও অন্যথায় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে এবং এই নিষেধাজ্ঞা কৌশলে এড়ানো রোধ করার জন্য রায়তদের নতুন পর্চা বা দলিল দিতে ইজারাদারদের আদেশ দেওয়া হয়; কমিটি এই দলিলের রূপরেখা প্রস্তুত করে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। এতে রায়তরা যে শর্তে জমি নিয়েছে তথা ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় বা অনুচ্ছেদে রাজস্ব সুনির্দিষ্ট থাকে এবং অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু ক্রমবর্ধমান খাজনায় পতিত জমি চাষ করার জন্য সকল প্রকার উৎসাহদানের ব্যবস্থা থাকে।

কমিটির অপর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়ের খরচ যথাসম্ভব কম রাখা। কমিটির প্রত্যয় ছিল যে অধিবাসীদের নিরাপত্তাবোধের সাথে সর্বাপেক্ষা সংগতিপূর্ণ হওয়ার ফলে অন্যান্য ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয়-বর্জন রাজস্ববৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত উৎস উন্মুক্ত করে। এই উদ্দেশ্যে আমরা সর্বত্র একই রকমের নিয়মিত এক ব্যবস্থা কায়েম করেছি—সকল প্রয়োজনীয় খরচপত্র জেলাসমূহের কাছারির মাধ্যমে হবে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে কোনো প্রকার ব্যয়বৃদ্ধি করা যাবে না এই সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। আমরা নিঃসন্দেহ যেহেতু এইটি ভবিষ্যতে সকল প্রকার অতিরিক্ত ও অহেতুক ব্যয় রোধে কার্যকরী উপায় হবে, তাই এর ফলে মহামান্য কোম্পানির বিরাট সাশ্রয় ঘটবে। আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, এই বিষয়টির প্রতি যথাবিহিত মনোযোগ দেওয়া হবে কারণ হিসাবপত্র পর্যবেক্ষণ কালে এই বিষয়ে প্রতিটি বিচ্যুতি প্রতিরোধ করা হিসাব পরীক্ষকের প্রায় একমাত্র মাথাব্যাথা হবে।

পূর্বোক্ত এইসব পদক্ষেপ গ্রহণের পর কৃষ্ণনগরের জমিগুলি প্রকাশ্য নিলামে তোলা হয় এবং ৫ বছরের জন্য ক্রমবৃদ্ধির ভিত্তিতে এক স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়—এর বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমরা কমিটির যে কার্যবিবরণী পাঠালাম সেইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

কৃষ্ণনগরে নিলাম চলাকালে, সেখানের রাজা সমগ্র জেলা ইজারা নেওয়ার এক প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব বঙ্গপ্রদেশের জমিদারদের ও তালুকদারদের বিষয়ে নিম্নলিখিত সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে।

যেখানে উপযোগী সেখানে বংশানুক্রমিক জমিদারদের হাতে জেলার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় আমরা অত্যন্ত আগ্রহী; কারণ আমরা মনে করি যে এর ফলে জনগণ আরো সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পাবে, খাজনা বৃদ্ধি পাবে এবং চাষ-আবাদে উৎসাহ বৃদ্ধির আরো সম্ভাবনা থাকবে; যেহেতু দেশের সাথে জমিদারদের স্বার্থের সংযোগ চিরন্তন এবং তার উত্তরাধিকার লুপ্ত করা যায় না ও দেশ

রাজস্ব জমা দিতে অসুবিধা ঘটলে ইজারাদাররা যেমন প্রায়শই জেলা হতে পালিয়ে যায়, জমিদারদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকার জন্য সেইরকম করা যেহেতু অসম্ভব প্রায়, এবং যেহেতু তার পক্ষে ইজারা নেওয়া প্রায়শই পূর্বনির্ধারিত হয়, তাই ইজারাদাদের অপেক্ষা জমিদারদের ব্যর্থতার বা বিচ্যুতির সম্ভাবনা তুলনায় কম থাকে।

তালুকদারির ক্ষেত্রে এবং যে জেলাগুলি সরাসরি মুর্শিদাবাদে বড় কাছারিতে খাজনা জমা দেয়, সেই হুজুর জিলাগুলির অংশবিশেষ হিসাবে ছোট ছোট জমিদারগুলি তথা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রকারের বহু জমিদারগুলির ক্ষেত্রে, এইসব ক্ষেত্রে, জমির প্রকৃত মূল্যের সাথে সংগতিপূর্ণ রাজস্বের ন্যায়-সংগত দাবির পক্ষেই হোক অথবা নিয়মিত সনদ অধিকারের, দীর্ঘ বংশানুক্রমিক পারিবারিক উত্তরাধিকারের ও উচিত মূল্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের ও তালুকদাবদের অধিকার ও সুবিধার সপক্ষেই হোক, সকল যুক্তি সবদিক দিয়ে বিচার করা হয়েছে। যথাযথভাবে এই সকল বিচার করার পর, এদের বন্দোবস্তের ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুইটি পদ্ধতির কথা মাত্র আমাদের মনে হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে—সমস্ত জমি সরাসরি ইজারায় দেওয়া, জমিদার ও তালুকদারদের ও তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণে বা হারে কর দেওয়ার ভিত্তিতে রায়তদের হাতে জমির সম্পূর্ণ দখল ও কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—খোদ জমিদারদের ইজারাদার হিসাবে গণ্য করে তাদের সাথেই বন্দোবস্ত করা; এই ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে, প্রথমত, ইজারার সকল শর্তাবলী আরোপ করা; দ্বিতীয়ত, ইজারাদারদের থেকে প্রত্যাশিত রাজস্বের সমপরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য করা; তৃতীয়ত, উপযুক্ত জামিনের ব্যবস্থা করা ও চতুর্থত, সরকারের কাছে সংরক্ষিত হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখা—আপাত সঠিক বর্তমান হিসাবপত্র ভবিষ্যতে প্রতারণাপূর্ণ মনে হলে বা প্রকৃতমূল্য গোপন করা হয়েছে সন্দেহ হলে, ভবিষ্যতে প্রকৃতমূল্যের ভিত্তিতে সঠিকভাবে বন্দোবস্ত করার জন্য, ইজারার বর্তমান মেয়াদের অন্তর্বর্তীকালে, একটি সঠিক হস্তাবুদ (হিসাবপত্র হতে মূল্যাংকন) অথবা সম্পত্তির পরিমাপ করার জন্য এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। জমিদারদের ও তালুকদারদের অধিকার সংক্রান্ত আবেদনের আমরা কিছু মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছি—প্রথম পদ্ধতি গ্রহণ করলে নিশ্চিতভাবে এই অধিকার ভঙ্গের ঝুঁকি থাকে; কারণ যেহেতু রায়তদের কর্তৃত্ব দিলে বর্তমান সপক্ষে অধীশ্বররা সামান্য পেনসনভোগীর পর্যায়ে নেমে যাবে এবং মালিক হিসাবে তাদের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে ব্যাহত হবে, সুতরাং দীর্ঘকালীন কয়েকটি ইজারার পর রায়তদের নিজ সম্পত্তিতে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদে, পুরাতন প্রভুর মৃত্যু ও নতুন নাবালকের উত্তরাধিকার অর্জনে, জমিদার ও তালুকদারদের অধিকার ও সনদ এত অজানা, সন্দেহ জটিল ও বিতর্কিত হবে যে তাদের উত্তরাধি-

কার হতে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। জমিদার ও তালুকদারদের এই ঝুঁকি নিতে বাধ্য করা আমাদের সমতার ধারণার সাথে তো নয়ই আপনাদের আদেশের সাথেও সংগতি পূর্ণ নয়,—আপনাদের আদেশের নির্দেশ হলো এই যে 'আকস্মিক কোনো পরিবর্তন দ্বারা আমরা সংবিধান পরিবর্তন তো করিই না, জমিদার প্রভৃতিদের প্রাচীন সুযোগ সুবিধাদি হতে বঞ্চিত করি না।"

জমিদার ও তালুকদারদের থেকে প্রত্যাশিত ব্যবহার জাত আর একটি কারণ আমাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রথম পদ্ধতি গ্রহণের বিপক্ষে দাঁড়ায়। জমিগুলি পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে দীর্ঘকাল থাকার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে জেলায় এদের এক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে, রায়তদের মনে এক উচ্চস্থান দখল করেছে এবং তাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে। জমিদারদের পুরোপুরি বঞ্চিত করলে, এইসব কারণে খণ্ডিত কর্তৃত্বে জাত সকল বাস্তব কুফল রাজস্বে, বাস্তুত্যাগে ও বিরল বসতি জনপদে দেখা যাবে। অন্যদিকে, জমির সমৃদ্ধিতে যাদের স্বাভাবিক ও চিরন্তন আগ্রহ রয়েছে তাদের হাতে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অব্যাহত রাখলে এবং তার মূল্য খুব একটা বেশি না হলে, বিপুল লাভ প্রত্যাশা করা যায়। সুতরাং পূর্বে উল্লেখিত সুযোগের সম্ভাবনা যেখানে রয়েছে, সেখানে ছোট জমিদারদের ও তালুকদারদের সাথে বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণই সমীচীন বোধ হয়।

প্রথমত—এর দ্বারা সমপরিমাণ রাজস্ব পাওয়া যাবে এবং সময়মতো তা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকবে। দ্বিতীয়ত—তাদের ইজারাদারে পরিণত করার ফলে সেই ভিত্তিতে বন্দোবস্ত করার অধিকার সরকারে বর্তায়; সতত এই ভয় তাদের সদ্ব্যবহার ও সুবন্দোবস্ত নিশ্চিত করে। তৃতীয়ত—সমীক্ষার ব্যবস্থা সংবলিত অনুচ্ছেদ তাদের উপর আরোপ করার ফলেও অনুরূপ প্রবণতা হয়; একই সাথে যেখানে গুপ্ত আয়ের সন্দেহ রয়েছে বা রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, সেইখানে এইটি কঠোরভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

যেহেতু সমমান সম্পন্ন ও ন্যায়সংগত হলে জমির মালিকরা এই প্রকার বন্দোবস্ত মেনে নিতে আগ্রহী, তাই উপরিউক্ত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৃষ্ণনগরের কমিটি ঐ জেলার বেশ কয়েকটি তালুক প্রকাশ্য নিলামের বাইরে রাখে; এবং তদনুসারে তাদের জমির এক প্রকৃত মূল্যাংকন করা হয়। অবশ্য পূর্বে উল্লেখিত কৃষ্ণনগরের জমিদার প্রস্তাবিত শর্তাবলী ইজারাদারির প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত শর্তাবলীর তুলনায়, কমিটির আশানুরূপ হয় না এইসব কারণে এবং যেসব ইজারাদারের প্রস্তাব ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে, তারা সরকারের আস্থাভাজন হওয়ার ফলে এবং এই জমিদারটি ধূর্ত ও বিশ্বাসঘাতক হিসাবে সুপরিচিত থাকার জন্য, তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার এবং সরকারের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক হওয়ার কারণে ইজারাদারদের প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

কৃষ্ণনগরের বন্দোবস্ত সমাপ্ত হওয়ার পর, পূর্বে উল্লেখিত আমাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিধি অনুযায়ী রাজস্ব তত্ত্বাবধানে কালেকটারের সাথে যুক্তভাবে নির্দিষ্ট এক দেওয়ান কমিটি দ্বারা মনোনীত হয়, এবং পথনির্দেশ হিসাবে সেইমতো তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগরের চুক্তি এত সবিস্তারে বিবৃত করার দুইটি কারণ—আমাদের পূর্ববর্তী নির্ণয়ের বিভিন্ন দিকগুলি তথা সাধারণ ও স্থানীয় পর্যবেক্ষণ হতে কমিটি যেসব নতুন সংযোজন করেন তার প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে বোঝা যাবে এবং কৃষ্ণনগরকে আদর্শ ধরন হিসাবে নিয়ে সমগ্র প্রদেশের বন্দোবস্তের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত করানো যাবে।

কৃষ্ণনগর হতে কমিটি কাশিমবাজার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং জুলাই-এর প্রারম্ভে সেইখানে পৌছান। নবাবের পরিবার ও বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা ও তার বিষয়-আশয় তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় অফিসারদের নিযুক্ত করা কমিটির অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যেহেতু এই বিষয়গুলি সাধারণ দফতর হতে আমাদের পত্রে বিশদভাবে আলোচিত হবে, আমরা আমাদের পত্র শুধু চলতি রাজস্ব বিষয়ে সীমিত রাখবো।

এরপর রাজশাহি প্রদেশ ও হুজুর জেলাগুলি বিবেচিত হয় এবং কৃষ্ণনগরের মতো অভিন্ন নিয়মবিধি বন্দোবস্তের আগে এখানেও অরোপিত হয়। প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি মারফৎ রাজশাহির বিভিন্ন পরগনার ইজারার জন্য প্রস্তাব চাওয়া হয় এবং সেইগুলি জমা দেওয়ার উপযুক্ত এক সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, সমগ্র বিভাগের জন্য প্রদত্ত শর্তাবলী পরীক্ষিত হয় এবং ইজারাদারদের ও জমিদারদের প্রস্তাবগুলির সঠিক তুলনামূলক বিচার করা হয়। শেষোক্তদের প্রস্তাব সরকারের পক্ষে অধিকতর লাভজনক প্রতিপন্ন হয়। তদনুযায়ী ঐ জেলার জমিদার রানী ভবানীর সাথে ৫ বছরের এক বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয়। রানীর ধনসম্পদ, সুনাম ও চরিত্র মাধুর্যের জন্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জমিকে ১৪টি ভাগে বা ইজারায় বিভাজন করার যে পরিকল্পনা কমিটি করে সেটি মেনে নেওয়ায় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাজনা জমা দেওয়ার জন্য নিজের চুক্তির সাথে ইজারাদারদের 'কবুলিয়ত' বা চুক্তি জমা দিতে রাজী হওয়ায়, তাঁর প্রস্তাবের শর্তাবলী অধিকতর কাম্য হয়। রাজশাহির পূর্ব বিভাগের জন্য ও অন্য কোনো প্রস্তাব না আসায় একইভাবে এইটি ও এই জমিদারকেই ইজারা দেওয়া হয়। এই অঞ্চল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকার জন্য ও তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত সুনামের জন্য অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে তিনি অধিকতর লাভজনক প্রস্তাব দিতে সক্ষম হন। এই গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত জেলাগুলির জন্য পুরো রাজস্ব আদায় সম্পর্কে আমাদের কোনো সংশয় নেই। রাজস্ব আদায়ের ব্যয় হ্রাস ছাড়াও, প্রাচীন ও বংশানুক্রমিক অধিকারীর অধীনে সমগ্র অঞ্চলটিকে এইভাবে অবিভক্ত রাখতে সক্ষম

হওয়া আমাদের অতিরিক্ত লাভ।

আমাদের বেশ কয়েকটি কার্যবিবরণীতে যে বিশেষ কারণগুলি ও যুক্তিগুলি হাজির করেছি, সেগুলি সম্বন্ধে অন্য দফতরের পত্রে আরো বিস্তৃতভাবে বলা হবে। সেইগুলির জন্যই আপনারা লক্ষ্য করবেন, দরবারে প্রতিনিধি ও কাশিমবাজারের প্রধান মিঃ মিডলটনের উপর রাজশাহির রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্তি আমরা উপযোগী মনে করেছি। সবকিছু সরাসরি জমিদারের ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকায়, এই কর্ম সম্পাদনে কালেকটার হিসাবে মিঃ মিডলটনের একমাত্র করণীয় হবে যথাসময়ে মাসিক কিস্তি গ্রহণ করা, রায়তদের অভিযোগ ও আবেদন শোনা এবং নিয়মবিধি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা দেখা।

মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহির সীমান্তে অবস্থিত হুজুর জেলাগুলি, ছোট জমিদারিগুলি ও তালুকদারিগুলিরও একই পরিকল্পনা মাফিক বন্দোবস্ত করা হয়—পূর্বে বর্ণিত সিদ্ধান্ত মতো, বংশানুক্রমিক অধিকারীদের সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু এইসব অসংখ্য বন্দোবস্তগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি আলোচনা করলে আপনাদের বহু সময় ব্যয় হবে, তাই সেই ব্যাপারে বিগত সার্কিট-কমিটির কার্যবিবরণীর উল্লেখ আপনাদের কাছে করতেই হবে। আপনারা সেইখানে লক্ষ্য করবেন যে ঐ জেলাগুলির রাজস্ব তত্ত্বাবধানের জন্য আমরা অতিরিক্ত ৫ জন কালেকটার নিযুক্ত করেছি। এই নিয়োগগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি কিছুটা অনিচ্ছাসহকারে আমাদের করতে হয়। হুজুর জেলাগুলির বিভিন্ন অংশের জটিলতার কারণে এই নিয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং এইখানেই এদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমরা আশা করি যে, প্রয়োজনে সদরে বা প্রধান কাছারিতে খাজনা জমা দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে যথাসময়ে প্রতিষ্ঠানগত খরচ কমাতে আমরা সক্ষম হব।

ল্যাপউংগ-এর মাধ্যমে আনীত আপনাদের সাম্প্রতিক নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, এই সরকারি কাজের ফাঁকে কমিটি সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন; এই নির্দেশে আপনারা কোম্পানির কর্মচারিদের এজেন্সির তরফে দেওয়ান নিযুক্ত করা ও 'রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব' গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—'কোম্পানির সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি ও ব্যবস্থা গ্রহণ' করার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিকল্পনা তথা রূপায়ণের দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়।

মুর্শিদাবাদস্থিত রাজস্ব পর্ষদ বিলোপ করা হবে কিনা এবং সর্বত্র রাজস্ব আদায়ের কাজকর্ম প্রেসিডেন্সিতে আপনাদের প্রশাসনের অধীন করা হবে কিনা—এটাই ছিল প্রথম বিবেচ্য বিষয়; এবং উত্থাপিত প্রতিটি যুক্তিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব সহকারে বিচার করার পর আমরা শেষোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

সম্বন্ধে কমিটির সাথে সর্বসম্মতি ক্রমে একমত হই এবং তদনুসারে কার্যকরী করি। যে ভিত্তিতে এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম—আমরা আশা করি যে, এইটি আপনাদের অনুমোদন লাভ করবে।

যেহেতু ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায় সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষভাবে যে সময়ে এইগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তদন্ত ও বিচারের দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে এবং যে সময়ে দেশের অবস্থা সময়োচিত, সুচিন্তিত ও উদ্দীপনাময় ব্যবস্থাদি দাবি করে, তখন এইগুলি নিশ্চিতভাবে আপনাদের সভাপতি তথা পরিষদের মনোযোগ সর্বপ্রথমে আকর্ষণ করবে।

রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকরী করা এবং কালেকটারদের সাথে যোগাযোগ মুর্শিদাবাদস্থিত এক পরিষদের দায়িত্বে থাকায়, রাজস্ব সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ব্যাপক জ্ঞানের কোনো সুযোগ আপনাদের প্রশাসনের সদস্যদের ছিল না। কিন্তু যেহেতু আপনাদের সাম্প্রতিক আদেশ এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় বহু নতুন নিয়মবিধি ও তদন্তের নির্দেশ দিতে চায় এবং যেহেতু এইগুলির অধীনস্থ কোনো পর্ষদকে সুষ্ঠুভাবে হস্তান্তরিত করা যায় না, তাই রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি আমাদের প্রত্যক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচালনাধীন রাখা চরম আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আমাদের বিশ্বাস, এই পরিবর্তনে ন্যায়বিচার আরো সহজলভ্য হওয়ার ফলে প্রদেশের অধিবাসীদের পক্ষে উপশমকর হবে, কারণ নিম্নতর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল, পূর্বে যেখানে মুর্শিদাবাদের পর্ষদের মাধ্যমে আমাদের নিকট প্রেরিত হতো, বর্তমানে তা সরাসরি প্রেসিডেন্সিতে পাঠানো যাবে।

বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কলকাতার সম্পদ বৃদ্ধি এর অপর অন্যতম সুফল; এর ফলে আমাদের দেশ থেকে আনীত মহামূল্য দ্রব্য সম্ভারের আমদানি যেমন বাড়বে, তেমনি এর মাধ্যমে আমাদের প্রথা ও ধরন ধারণের সাথে এ দেশীয়দের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটলে এবং তারা আমদের সরকার ও পলিসির বশীভূত হবে।

মুর্শিদাবাদস্থিত পর্ষদের বিলুপ্তির উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও আপনাদের ১৭৬৯ সনের ৩০ জুনের আদেশের সাথে অসংগতির ভিত্তিতে সম্ভাব্য কোনো আপত্তির জবাবে আমাদের এই আন্তরিক যুক্তি হাজির করার জন্য অনুমতি আবশ্যক। অবশ্য, আপনাদের পরবর্তী আদেশের ফলে এবং ল্যাগউইং-এর মাধ্যমে আমাদের স্বেচ্ছাধীন অবাধ ক্ষমতা প্রদানের ফলে, আপনাদের পূর্ববর্তী আদেশ আমরা বাতিল হিসাবে গণ্য করি। তবুও দেওয়ানির নতুন ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ ভাবে যতদূর সম্ভব এর মূলভাব বজায় রাখার চেষ্টা আমরা করতাম, কিন্তু পরবর্তী আদেশে এইটি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়।

আপনাদের রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্রস্থল মুর্শিদাবাদ থাকলেও, যেহেতু এই বৃহৎ

দায়িত্ব কোনো ব্যক্তিবিশেষে ন্যস্ত হওয়ার নয়, তাই এর তত্ত্বাবধানের জন্য একটি পর্ষদ স্থাপন সকল বিচারে আবশ্যক হয়। একমাত্র এই ভিত্তিতেই মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় এই প্রকার পর্ষদ গঠনের জন্য আপনাদের আদেশ রচিত হয়েছে বলে আমাদের অনুমান। কিন্তু নায়েব দেওয়ানের পদ বিলোপের পর এবং রাজস্ব আদায় সরাসরি আপনাদের নিজেদের কর্মচারিদের অধীন করার কথা ঘোষণা করার পর, আপনাদের গভর্নর ও পর্ষদের নজর হতে এত দূরে রাজস্ব দফতর বজায় রাখার কোনো যুক্তি থাকে না ; এবং যেহেতু নিম্নতর পর্ষদ দ্বারা এই ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব না হওয়ার ফলে আদায়ের কাজ প্রেসিডেন্সিতে স্থানান্তরিত করতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে রাজস্ব দফতরগুলি বজায় রাখা এবং তার ব্যয়নির্বাহ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সুতরাং, প্রতিটি নতুন সংস্থা প্রবর্তনের আনুষঙ্গিক ব্যয় ও অসুবিধা সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও আমরা এই আশা পোষণ করি যে এই পরিবর্তনের ফলে বাৎসরিক কয়েক লক্ষ টাকার সাশ্রয় হবে।

যেহেতু খালসা অপসারণের কারণগুলি সার্কিট-কমিটির ২৮ জুলাই এর কার্য-বিবরণীতে খুব বিস্তৃতভাবে আলোচিত রয়েছে এবং সাধারণভাবে রাজস্বের প্রকৃতি সংক্রান্ত নানা বক্তব্যও রয়েছে, আকারে বিশাল এইগুলি এই পত্রে সন্নিবেশিত করতে না পারায় আমরা এইগুলির প্রতি আপনাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

খালসার অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের উর্ধ্বতর অফিস পরিচালনার জন্য আমরা যে পরিকল্পনা রচনা করেছি, তা প্যাকেটে স্বতন্ত্র নম্বর হিসাবে পাঠানো হবে।

আরো আইনানুগ ন্যায়বিচার বিধান সম্পর্কেও সার্কিট কমিটি আলোচনা করেন এবং তাদের দ্বারা রচিত এক পরিকল্পনা পরে আমাদের অনুমোদনও লাভ করে। যে ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচিত হয়, সে সম্বন্ধে ধারণা করার সর্বোত্তম উপায় হিসাবে এর এক প্রতিলিপির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই প্রতিলিপি ও সাথে এ সম্বন্ধে বোর্ডের নিকট সার্কিট-কমিটির পত্র উভয়ই এই প্যাকেটে স্বতন্ত্র নম্বর হিসাবে আপনাদের পাঠ করার জন্য সাগ্রহে পাঠানো হচ্ছে ; এবং সর্বাপেক্ষা সমতাপূর্ণ, দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমরা প্রচেষ্টা নিয়েছি, তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আদেশ ও নির্দেশ দানে সহায়তা করতে আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি। আইনের তত্ত্বে সুসজ্জিত হওয়ার সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে শুধু অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞানের নীতিপ্রসূত এই ধরনের পরীক্ষামূলক কাজকে যেরূপ প্রশ্রয়ের সাথে বিচার করা হয়, আশা করি আপনারা তা করবেন। প্রাচীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যতদূর সম্ভব সংগতি বজায় রেখে জনগণের আদবকায়দা ও উপলব্ধি এবং দেশের জরুরি প্রয়োজন মাফিক আইনবিধি প্রণয়নে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সমগ্র প্রদেশব্যাপী এগুলি প্রতিষ্ঠা করতে, আমাদের আশংকা আরো কয়েক মাস

লেগে যাবে; কিন্তু যদি এইগুলি আপনাদের অনুমোদন লাভ করে এবং আমাদের প্রত্যাশা মতো সুফলদায়ক হয়, তাহলেই আমরা আমাদের পরিশ্রম যথেষ্ট সার্থক মনে করবো।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ আমাদের সভাপতি কলিকাতায় ফিরে আসেন। মিঃ মিডলটন যেসব পদে নিযুক্ত হয়েছেন, সেইগুলির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি মুর্শিদাবাদে থাকেন এবং সার্কিট-কমিটির অপর তিন সদস্য ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন; সেইখানে তাঁরা বর্তমানে ঐ প্রদেশের এবং সন্নিহিত জেলাগুলি বন্দোবস্তের কাজে নিয়োজিত এবং এরপর তাঁরা পূর্ববঙ্গের বাকি বিভাগগুলি পরিভ্রমণ করবেন; এবং আমরা আশা করি যে তাঁদের কার্যক্রমের আরো বিস্তৃত তথ্যাদি সহ আগামী ৫ বছরের রাজস্বের পূর্ণ বিবরণী এই মরশুমেই কোনো এক জাহাজে পাঠাতে সক্ষম হব।

আপনাদের পরিষদের বাকি সদস্যদের নিয়ে গঠিত প্রেসিডেন্সিস্থিত রাজস্ব কমিটি, রাজস্ব পরিচালনার নতুন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পূর্বোক্ত সাধারণ পরিকল্পনা এবং যেখানে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও হুগলি, মেদিনীপুর, বীরভূম, যশোহর জেলাগুলির এবং কলিকাতা মূলভূমির বন্দোবস্তের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সার্কিট-কমিটিকে প্রদত্ত জেলাগুলি এবং এইগুলি মিলে সমগ্র বাংলার বন্দোবস্তের কাজ শেষ হয়; একমাত্র ব্যতিক্রম বর্ধমান—কিন্তু সেখানে ইতিমধ্যেই সমগ্র জমি ৫ বছরের ভিত্তিতে ইজারা দেওয়া আছে এবং ১১৮২ বঙ্গাব্দের (১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ) শেষ অবধি এই ইজারার মেয়াদ পূর্ণ হবে না।

হুগলির বন্দোবস্তের ব্যাপারে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি জারির ফলে, ইজারার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব আসে; এবং সেইগুলি পরীক্ষা করে দেখার পর যেগুলি সরকারের পক্ষে সর্বাধিক লাভজনক সেইগুলি গৃহীত হয়। প্রাথমিক ভাবে ক্ষুদ্রাকারে ইজারা দেওয়া স্থিরীকৃত হয়; কিন্তু বড় ইজারার প্রস্তাবগুলি অন্যান্যগুলির চেয়ে আকর্ষণীয় হওয়ার ফলে আমরা সেইগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে প্রলোভিত হই। অন্যান্য জেলার মতো এখানেও বহু তালুকদারি ও ছোট জমিদারি রয়েছে এবং এদের মালিকরা কত দীর্ঘকাল ব্যাপী মালিকানা ভোগ করেছে এবং এ হতে বঞ্চিত হলে তাদের যে দুরবস্থা হবে, সেকথা জানিয়ে আমাদের কাছে আবেদন করে। যেহেতু তারা সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী সরকারকে বর্ধিত খাজনা দিতে রাজী হয়, তাই অনুরূপ অবস্থায় সার্কিট-কমিটির মতো আমরাও একই কারণে এদের বংশানুক্রমিক মালিকানা অব্যাহত রাখতে রাজী হয়েছি। কয়েকটি পরগনায় বিগত দুর্ভিক্ষ জনিত বিশেষ কারণে কিছু রাজস্ব হ্রাস প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে; কিন্তু অন্যান্য পরগনায় লাভজনক বৃদ্ধি হওয়ার ফলে হুগলি ও অধীনস্থ এলাকার বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট সাফল্য সম্পর্কে আমাদের সন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অনুরূপ পরিকল্পনা মাফিক বর্ধিত রাজস্বের ভিত্তিতে বীরভূম বিষ্ণুপুর ও পাচি-তের বন্দোবস্তও সম্পন্ন হয়েছে।

যশোহর ও মহম্মদশাহির বন্দোবস্ত সরকারের পক্ষে লাভজনক শর্তে সম্পন্ন হয়; এই কাজের ভারপ্রাপ্ত আমাদের পর্ষদের সদস্য মিঃ লেনের প্রদত্ত বিবরণ হতে সেইটাই প্রতিপন্ন হয় এবং তার কার্যবিবরণীর এক পূর্ণ বয়ান আমাদের ১০ অগাস্টের স্মারকপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কার্যবিবরণী হতে বোঝা যায় যে, কলিকাতাস্থ জমির সম্পূর্ণ ইজারা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যেহেতু কিছু ইজারাদার চুক্তিভঙ্গ করেছে ও আত্মগোপন করেছে এবং বাকিদের মালিকানা স্বত্বের প্রামাণ্য দলিল কার্যকরী করা বিলম্বিত হয়েছে, সেই কারণে এ ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হতে আমাদের বিরত থাকতে হয়েছে। মেদিনীপুরের বন্দোবস্তের কাজ জোরকদমে চলেছে। সুতরাং কলকাতা তথা মেদিনীপুরের ব্যাপারে কোনো হিসাব পাঠানো আমরা পরবর্তী জাহাজ পর্যন্ত স্থগিত রাখছি।

আপনাদের সুস্পষ্ট আদেশ অনুসারে, বাংলার লবণ ব্যবসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহে বিগত কিছুদিন ধরে আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এর ফলে, এই দ্রব্যের উপর সরকারি কর আদায়ের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ ও এই ব্যবসায়ের ব্যাপক মঙ্গল সম্ভব হবে। এই ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতির জন্য, যতদূর কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে, এই সাথে প্রেরিত স্মারকপত্রের দিকে, বিশেষভাবে ৭ অকটোবরের পত্রটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং প্রথম যে বিষয়গুলি বিবেচিত হবে এই বিষয়টি তার অন্যতম হওয়ায়, এর চূড়ান্ত অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের পরবর্তী যোগাযোগ আপনাদের জানাতে পারব বলে আমরা আশা রাখি।

বিগত দুই বৎসর যাবৎ হুগলির লবণ সংক্রান্ত ব্যাপারে যে বিরোধ ও অসুবিধা ছিল, অবশেষে আমরা সেইটির সুচারু নিষ্পত্তি করেছি—১ অকটো-বরের বিবরণীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বক্স বন্দর অর্থাৎ হুগলির শুল্ক বিভাগ তথা মুর্শিদাবাদের পাচেত্রা ইজারা দেওয়া হয়নি; আপনাদের নির্দেশমতো, আপনাদের রাজস্বের এই উৎসের নব রূপায়ণের পথে যাতে কোনো বাধা না থাকে, সেইজন্য সরকারি অফিসারদের দ্বারাই এইখানের রাজস্ব সংগ্রহ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ঢাকার শাউ বন্দর বা প্রধান শুল্ক দফতর সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা বর্তমানে ঢাকাস্থ সার্কিট-কমিটির পরামর্শ ও আরো আলোকপাতের প্রতীক্ষারত। এইগুলি পাওয়া যাওয়ার পর, শুল্ক আদায় সম্বন্ধে ব্যাপক ও সর্বত্র অভিন্ন এক পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হব এবং আপনাদের অবগতির জন্য যথাসময়ে তা প্রেরিত হবে।

১৭৬৯ সনের ৩০ জুনের আদেশে এবং পরবর্তী বহু পত্রে পূর্বপুরুষদের

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জমিদারদের প্রতি যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনার পুরাতন জমিদার-দের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করছি; পলাশির চুক্তি অনুযায়ী এইগুলি কোম্পানির জমিদারি হয় এবং ফলস্বরূপ এইগুলি তাদের হাতছাড়া হয়। তৎপূর্বেই তাদের জমির ছোট এক অংশ বর্ধমান ও নদীয়ার জমিদারির সাথে যুক্ত করা হয়—এইখানের জমিদারদের অবস্থা যথেষ্ট ভালো। সেই সময় হতেই অন্যান্য জমিদাররা ও তালিন্দাররা (!) অত্যন্ত অভাবের মধ্যে দিনযাপন করেন। তাদের কয়েকজনের রয়েছে বিরাট পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব। মোগল আমলে প্রচলিত নিয়ম ছিল যে যখন কোনো জমিদারের কর্তৃত্ব হরণ করা হতো, তখন তার জমিদারির খাজনা হতে আদায়ের আনুপাতিক হারে তাকে ভাতা দেওয়া হতো। সাধারণত এই অনুপাত ছিল এক-দশমাংশ। এইসব জমিদারদের জন্য আমরা এত বেশি অনুপাতে ভাতা সুপারিশ করবো না। আমরা জেনেছি যে, এর তুলনায় অনেক কম ভাতায় তারা সন্তুষ্ট হবে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করবে। আপনাদের শাসনাধীন হওয়ার পর উভয় প্রদেশের অন্যান্য সকল জমিদারদের ক্ষেত্রে যেহেতু এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তাই আমাদের মনে হয়েছে যে, একমাত্র যারা বাদ পড়েছে তাদের জন্য এই আবেদন আপনাদের কাছে গ্রহণীয় হবে।

যেহেতু বিহার প্রদেশের বন্দোবস্ত বহু বছরের মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছে, এবং সেইজন্য আশু কোনো পরিবর্তন দাবি করে না, তাই বাংলার সমগ্র নিয়মবিধি প্রণয়ন সমাপ্ত করা পর্যন্ত ঐ প্রদেশের নতুন কিছু প্রবর্তনের প্রচেষ্টা আমরা স্থগিত রাখবো। ঐ অঞ্চলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার একমাত্র যে পূর্বাভাস আমরা দিতে পারি, তা হলো, বাংলার সাথে এইখানের রাজস্ব আদায় সংযুক্ত করা উচিত এবং আমাদের আরো ভারগ্রস্ত না করে সুবিধামতো উভয় প্রদেশে একই নিয়মবিধি কায়েম করা।

আমাদের রাজস্ব কমিটির ১০ তারিখের কার্যবিবরণীতে মুর্শিদাবাদস্থিত রাজস্ব পর্ষদ ও দিনাজপুরের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ হেনরি কট্রেলের মধ্যে বিবাদের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে; এর ফলস্বরূপ শেষোক্ত জন তার পদ হতে অপ-সারিত হয়েছে। তার কাজকর্মের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব পর্ষদের বিভিন্ন বক্তব্য তথা নিজের স্বপক্ষে তার পত্রের পূর্ণ বয়ান উপরিউক্ত কার্যবিবরণীতে রয়েছে; এবং আপনাদের অকপট বিচারবুদ্ধির নির্দেশ মতো যাতে আপনারা

এ ব্যাপারে আপনাদের রায় দিতে পারেন, সেইজন্য আমরা এইগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের অনুমতি প্রার্থনা করেছি।

প্রভূত শ্রদ্ধা সহকারে,

আপনাদের বিশ্বস্ততম অনুগত কর্মচারীবৃন্দ,
(স্বাক্ষর) ওয়ারেন হেস্টিংস।[১]
আর. বার্কার।
ডবলিউ. অলডারসি।
টমাস লেন।
রিচার্ড বারওয়েল।
জেমস্ হ্যারিস।
এইচ. গুডউইন।

ফোর্ট উইলিয়াম,
৩রা নভেম্বর, ১৭৭২।

নির্দেশিকা

১. এই পত্রের মূল অংশগুলি ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বহস্ত লিখিত।

পরিশিষ্ট-২

১৭৭০ সনের মহাদুর্ভিক্ষ—প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ

প্রথমভাগ—বাংলা হতে প্রেরিত সাধারণ পত্রাবলীর নির্বাচিত অংশবিশেষ (গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির পূর্ণ বয়ান সহ)।

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯—২০ থেকে ২৭ অনুচ্ছেদগুলি। শত্রুর লুণ্ঠনে এবং বহু মাসব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে মাদ্রাজে শস্য এত বেশি বিরল হয় যে, সেইখানের সরকার নিদারুণ পরিণতি সম্বন্ধে আশংকিত হয়ে পড়ে। অভাব পূরণের জন্য বঙ্গদেশ হতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু বঙ্গদেশও দুর্ভিক্ষ কবলিত ছিল। মাদ্রাজের পথে লর্ড হল্যাণ্ড জাহাজ চাউল সমেত পথ হারায়, পরবর্তী সরবরাহ প্রেরিত হবে।

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯—৫৩ অনুচ্ছেদ। অতি অস্বাভাবিক শস্য ঘাটতির কারণে বাংলা ও বিহার প্রদেশের রাজস্বের পরিমাণ আশানুরূপ হবে না মনে হয়।

২৩ নভেম্বর, ১৭৬৯—৮ থেকে ১০ অনুচ্ছেদ; অনুচ্ছেদ ৮—'অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে, মহাশয়গণ, আপনাদের জানাতে হচ্ছে যে শস্যের অভাবে আমরা সর্বজনীন এক দুর্দশার বিষণ্ন সম্ভাবনার সম্মুখীন।' অস্বাভাবিক, সর্বব্যাপী, অবিস্মরণীয় এক অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৯—'যেহেতু এই দুর্দশা বৃদ্ধির সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেহেতু আগামী ৬ মাসে এর উপশম না ঘটা নিশ্চিত, তাই আমরা সৈন্যবাহিনীর পক্ষে ঐ সময়ের জন্য পর্যাপ্ত শস্য উপযুক্ত গুদামে জমা রাখার নির্দেশ দিয়েছি; এবং এই মারাত্মক বিপর্যয়ে গরিব জনসাধারণ যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে, তা হতে তাদের উদ্ধার করার জন্য আমাদের সাধ্যানুযায়ী সকল ব্যবস্থা আমরা

গ্রহণ করেছি ও করব ; কিন্তু আমাদের এই সকল প্রচেষ্টা মারাত্মক পরিণতি রোধে সক্ষম হবে, বা এর সর্বনাশা প্রভাব মানবিক প্রচেষ্টায় প্রতিহৃত হবে বলে আমরা আত্মসন্তুষ্ট হতে পারছি না।'

১০ অনুচ্ছেদে রাজস্ব হ্রাসের এবং সম্ভাব্য অব্যাহতির প্রয়োজনীয়তা অনুমান করা হয়েছে ; কিন্তু এছাড়া (এইটুকুও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয়), নির্দিষ্ট কোনো ত্রাণ ব্যবস্থা সুপারিশ করা বা বহুদিন পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়নি।

২৫ জানুয়ারি, ১৭৭০ — অনুচ্ছেদ ৪৮ থেকে ৫০ ; অনুচ্ছেদ ৪৮ — 'আমরা আপনাকে একথা জানাতে দুঃখিত যে আমরা বিগত ২৩ নভেম্বরের পত্রে অস্বাভাবিক অনাবৃষ্টির প্রকোপের পরিণাম সম্বন্ধে যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলাম তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, এবং এই সাধারণ বিপর্যয় সকল প্রদেশে কঠোরভাবে অনুভূত হয়েছে। এই বৎসরের রাজস্ব হ্রাসের প্রস্তাব করে বর্ধমানের রাজা ও বাণিজ্যিক প্রধান এই বিষয়ে সমাহর্তা-প্রধানের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে এক আবেদন পত্র পেশ করেছেন ; এবং তাদের কথিত এই দুঃখজনক ঘটনা সম্বন্ধে আমরা এত সহানুভূতি সম্পন্ন যে বর্ধমান প্রদেশের কৃষকদের আড়াই লাখ হতে ৩ লাখ টাকা হ্রাসের অনুমোদন দিতে আমরা রাজী হয়েছি — এই রাজস্ব হ্রাস রায়তদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা হয়েছে ; এবং ঐ অনুমোদনের সময়, পরবর্তী বৎসরের খাজনার সাথে নির্দিষ্ট পর্যায়ে এই ঘাটতি পূরণ করতে কৃষক ও রায়ত উভয়েই স্বীকার করেছে।' — [বাস্তবে, ১ লক্ষেরও কম বা মাত্র ৮,২১৮ পাউণ্ড পূরণ করা হয় এবং এমনকি এই পরিমাণ ও পরবর্তী বৎসরের সূচনায় মিটিয়ে দিতে হয় ;] 'এবং কলিকাতার জমির ক্ষেত্রে একই প্রকার বিবেচনা প্রয়োজন হওয়ায় আমরা সমাহর্তা-প্রধানকে এই একই ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছি।'

অনুচ্ছেদ, ৪৯ — 'এই অভাব ও দুর্দশার সময়ে কৃষকদেরও রায়তদের আমাদের সাধ্যমতো সুবিধা ও সহায়তা দেওয়া সংগত হওয়ায়, আমরা এই পদ্ধতিতে তাদের ভার লাঘব করার আশা রাখি ; এবং আমরা আরো আশা করি যে, এই পদ্ধতিতে আপনারা সামগ্রিক ক্ষতির পরিবর্তে অস্থায়ী অসুবিধামাত্র ভোগ করবেন এবং পরবর্তী বৎসর প্রাচুর্যের বৎসর হলে, এই হ্রাস পূরিত হবে।'

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০ — অনুচ্ছেদ ৫ 'বাংলায় এখনও রাজস্বহানি পরিলক্ষিত হয়নি ; কিন্তু যে দেশে শ্রমজীবীদের প্রতিষ্ঠিত বা সঞ্চিত সম্পত্তির পরিবর্তে শুধু ফসল কাটার ওপর নির্ভর করতে হয়, সেইখানে তারা সরকারের পূর্ণ দাবি মেটাতে সক্ষম হবে মনে করা যায় না। এবং বিন্দুমাত্র ন্যায়বোধ বা ফলাফলের চিন্তা থাকলে, আমরা তা দাবিও করতে পারি না।'

৯ মে, ১৭৭০ — গোপন — অনুচ্ছেদ ৩। 'এই সকল প্রদেশের অভ্যন্তরীণ

সমৃদ্ধি যদি আমাদের বহির্নিরাপত্তার সাথে সংগতি বজায় রাখে, তাহলে আমাদের সুখী হওয়া উচিত ; কিন্তু এইটি একেবারে বিপরীত হয়ে আছে। অধিকাংশ জেলায় গত ছয়মাস একেবারে বৃষ্টি হয়নি। সমাগত দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও ভিক্ষাবৃত্তি বর্ণনাতীত হয়ে উঠেছে। একদা প্রাচুর্যময় পুর্ণিয়া প্রদেশে এক-তৃতীয়াংশ জনগণ বিনষ্ট হয়েছে, এবং অন্যত্রও সমান দুর্গতি অব্যাহত। বিহারের তত্ত্বাবধায়ক আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে ঐ প্রদেশে সচরাচর মার্চ ও এপ্রিল মাসে যে ফসল তোলা হয়, তা এবার স্বল্প হয়েছে, এমনকি ফসল তোলার মরশুম থেকেই শস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং সেনাবাহিনীর রসদের সহায়তায় অনেক গরিব মানুষের জীবন রক্ষার জন্য বাঁকিপুর হতে কুরামপা ছাড়িয়ে সেনাবাহিনীকে স্থানান্তরিত করা একান্ত প্রয়োজন। যদি অন্তিম প্রয়োজন হিসাবে এই প্রস্তাব করতে বিহারের তত্ত্বাবধায়ক বাধ্য হন, তবুও এর বিরুদ্ধে আপনাদের আদেশ এত কঠোর, পদাতিক বাহিনীর ইয়োরোপিয়ানদের পক্ষে আবহাওয়া এত মারাত্মক, প্রেসিডেন্সির যত সন্নিকটে সম্ভব সেনাদলকে রাখার নীতি এত স্পষ্ট, এবং রাজার সাথে যেসব বিবাদ হতে আমরা সম্প্রতি মুক্ত হয়েছি সেই একই গণ্ডগোলে আবার জড়িত হওয়ার পরিণাম এত ভীতিকর যে অন্যান্য দিক দিয়ে যতই গ্রহণীয় হোক না কেন,আমরা ত্রাণকার্যের ঐ পদ্ধতি সংগত ভাবেই গ্রহণ করতে পারিনি। অবশ্য আমরা দুই ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ও অশ্বারোহী বাহিনীকে সেনানিবেশ হতে বকসারের দুর্গে স্থানান্তরিত করতে রাজী হয়েছি পাটনার[১] দুর্দশা লাঘবের সাথে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে ও এতে আপনাদের কোনো রাজনৈতিক স্বার্থহানি ঘটবে না। অপরদিকে, যেহেতু রাজা ও মন্ত্রী আমাদের সাথে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ও আলোচনা পুনরায় শুরু করেছেন, সুতরাং এই সৈন্য চলাচলে সকল হানাদারের বিরুদ্ধে তাদের সম্মান রক্ষা ও সহায়তার আগ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করে আমাদের সাথে তাদের দ্রুত ঐক্যবদ্ধ করার এইটি একটি অনুকূল সুযোগ বলে আমরা ভেবেছি।

২৮ জুন ১৭৭০ — অনুচ্ছেদ ২ — 'এই অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ইতিমধ্যেই আমরা দুর্ভিক্ষের যে অনতিরঞ্জিত বর্ণনা আপনাদের দিয়েছি, সকল সর্বগ্রাসী পরিণাম সহ সেই দুর্ভিক্ষ অব্যাহত থেকেছে ; এবং জনসাধারণের দনের সাহায্যে দরিদ্রদের ত্রাণকার্য রাজস্ব হ্রাস ও সন্নিহিত প্রদেশগুলি হতে শস্য আমদানি সহ আমাদের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও এই বিপর্যয় আমরা প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান দেখেছি। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে, উভয় ক্ষেত্রেই আপনাদের রাজস্বহানি অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু এই বিপর্যয়কে যথাসম্ভব লঘু ও অস্থায়ী করার জন্য আমাদের তরফ হতে সকল প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

৩১ আগস্ট ১৭৭০ — অনুচ্ছেদ ১৪ — 'যদি বিগত ৯ মে তারিখের পত্রে প্রেরিত এই সকল প্রদেশের সকল অঞ্চলব্যাপী দুর্ভিক্ষজনিত সাধারণ বিপর্যয়ের

বর্ণনা প্রকৃতই আতংকজনক হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত দৈনিক ক্রমবর্ধমান আমাদের দুর্দশা বর্তমানে কত বেশি গুণই না নিদারুণ হয়েছে, এবং আমাদের নিকট উপশমের সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। এত বিপর্যয়কর ঘটনার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই রাজস্ব সংগ্রহে বিরাট ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তবুও আমরা এই আশা করতে ইচ্ছুক যে এই ক্ষতির পরিমাণ আমাদের আশঙ্কা অনুযায়ী বিশাল নাও হতে পারে।'

১১ সেপ্টেম্বর ১৭৭০—অনুচ্ছেদ ৪—'এই কমিটি প্রেরিত বিভিন্ন পত্রে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এই দেশের দুর্দশার এক বিশ্বস্ত, অকপট ও নিরপেক্ষ বর্ণনা দিতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি; বস্তুত, দেশবাসী যে দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে কোনো বর্ণনাই তার অতিরঞ্জনে সক্ষম নয়। সুতরাং রাজস্বের ওপর যে এই বিপর্যয়ের প্রভাব পড়বে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু যে সময়ে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হয়েছিল এবং যখন দেশবাসী আসন্ন দুর্দশায় তার কোনো ধারণা করা যায়নি, তৎকালীন অনুমানের তুলনায় প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি কম হয়েছে—এই মতামত ব্যক্ত করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

অনুচ্ছেদ ৫—গত কয়েকদিনের মধ্যে দরবারে স্থায়ী প্রতিনিধির নিকট হতে প্রাপ্ত বার্ষিক হিসাবে দেখা যায় যে, সংগৃহীত প্রকৃত রাজস্ব এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ দুই হাজার ছয়শত তিরানব্বই রৌপ্যমুদ্রা নয় আনা দশ পাই (১,৩৮,০২, ৬৯৩ : ৯ : ১০ রৌপ্যমুদ্রা); (কিন্তু অতিরিক্ত ২,০৩,৩০৭ টাকা জনগণের নিকট হতে আদায় করা হয়, ফলে সর্বমোট দাঁড়ায় ১,৪০,০৬,০৩০ টাকা;) 'হতভাগ্য অধিবাসীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে সর্বমোট আট লক্ষ তিন হাজার তিন শত একুশ টাকা পনেরো আনা (৮,০৩,৩২১ : ১৫) প্রেরিত হয়' (অর্থাৎ যে প্রদেশে জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ বিনষ্ট হয়েছে, সেইখানে রাজস্বের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ ব্যয়িত হয়); 'এবং গত বৎসরের চুক্তিমত ছয় লক্ষ চোদ্দ হাজার দুই শত উনিশ টাকা আট আনা (৬,১৪,২১৯ : ৮) ঘাটতি আদায় বাকি আছে; ১৭৭০ সনের ১০ এপ্রিল তারিখে নবগঠিত পূর্ণিয়ায় বাংলার জন্য এক কোটি বাহান্ন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয় শত উনআশি টাকা পনেরো আনা বারো পাই-এর (১,৫২,৪৫,৯৭৯ : ১৫ : ১২) এক নতুন সনদ তৈরি হয়' (দুর্ভিক্ষের বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি!), 'ফলন ভালো হলে দেশে ব্যাপক জনহানি সত্ত্বেও, মহম্মদ রেজা খানের কথানুযায়ী, এই পরিমাণ আদায়ের ক্ষীণ আশ্বাস আমাদের প্রতিনিধি দিয়েছেন।'

২৪ ডিসেম্বর ১৭৭০—অনুচ্ছেদ ২২—'দুর্ভিক্ষ পুরোপুরি শেষ হওয়ায় এবং ফলনের প্রাচুর্যের কারণে এই স্থানে ইতিমধ্যেই বিশাল পরিমাণ শস্য থাকায় ও শীঘ্রই আরো প্রাচুর্যের সম্ভাবনা থাকায়, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য নতুন দুর্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য পর্ষদের নিকট সুপারিশ

করেছি এবং অত্যন্ত সুলভে এটি করা যাবে বলে আমরা আশা করি।'

১২ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১—অনুচ্ছেদ ৪৩-৪৪। অনুচ্ছেদ ৪৩—গ্রাফটনের মাধ্যমে প্রেরিত আমাদের ১৭৭০ সনের ২৫ জানুয়ারির পত্রে আমরা আপনাদের জানিয়েছি যে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের কারণে বর্ধমান প্রদেশের কৃষকদের, পরবর্তী বৎসরের রাজস্বের সাথে পূরণ করার শর্তে, আমরা প্রায় ২½ বা ৩ লাখ টাকা রাজস্ব হ্রাস করেছি।

অনুচ্ছেদ ৪৪—'কিন্তু সমাহর্তা-প্রধান আমাদের জানিয়েছেন যে, তখন হতে দুর্ভিক্ষ বহুগুণে তীব্র হওয়ার ফলশ্রুতিতে রায়তদের মধ্যে মড়ক ও গ্রামত্যাগ এত ব্যাপক হয়েছে যে, বকেয়া খাজনা আদায়ের সম্ভাবনা হতে কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছে; এবং সেই কারণে এই বকেয়া খাজনায় কিছু পরিমাণ ছাড় না দিলে অনেক ইজারাদারেরই সর্বনাশ হবে। মিঃ স্টুয়ার্টের এক তদন্তে প্রকাশ যে, রায়তদের মৃত্যু ও বাস্তুত্যাগের কারণে ইজারাদারদের উপরোক্ত ৩ লাখ টাকার মধ্যে ৮২,১৮০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। যেহেতু অস্থায়ী এই রাজস্ব হ্রাস অনুমোদনের সময় দুর্ভিক্ষ যে এত মারাত্মক হবে আশা করা হয়নি এবং যেহেতু অনাদায়ী খাজনার দায় হতে ইজারাদারদের রেহাই দেওয়া ন্যায়সংগত মনে হয়, সেই কারণেই আরো খুঁটিয়ে দেখার পর ও ন্যায়সংগত ভাবে আরো হ্রাস সম্ভব না হলে আমরা সমাহর্তা-প্রধানকে ইজারাদারদের উপরোক্ত অর্থ অনুমোদনের ক্ষমতা দিয়েছিলাম।' (বাস্তবে, কোনোরূপ হ্রাস করা হয়নি কারণ সমস্ত টাকাই মিটিয়ে দেওয়া হয়।)

১২ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১,—অনুচ্ছেদ ২—'বিগত দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড তীব্রতা ও তজ্জনিত বিপুল জনহানি সত্ত্বেও বাংলা ও বিহার উভয় প্রদেশের বর্তমান বৎসরের বন্দোবস্তের কিছু বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে এবং আমরা আশা করি, পরবর্তী বৎসরগুলিতে অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে রায়তদের নিপীড়ন না করেই বহুগুণ বৃদ্ধি ঘটানো যাবে। ইতিমধ্যেই খাজনা আদায়ের অগ্রগতি হতে এবং রাজস্ব পরিষদগুলি ও বিভিন্ন জেলার তত্ত্বাবধায়কদের মনোযোগ ও সতর্কতা হতে বলা যায় যে, বর্তমান বৎসরের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব বহুলাংশে আদায় করা যাবে, যদিও জনহানি যেসব বিশেষ অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও বন্যার কারণে অন্য যেসব অঞ্চলে শস্যহানি ঘটেছে সেইখানে, আমাদের আশঙ্কা, ঘাটতি অনিবার্য।'

১২ এপ্রিল ১৭৭১—২রা এপ্রিলের পত্রের পুনশ্চ। 'একইভাবে আমাদের, আপনাদের জানানো উচিত যে বাংলায় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক মড়কের ফলে উপযুক্ত সংখ্যক কুলি সংগ্রহের প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও, আমাদের এনজিনিয়ারদের সর্বশেষ রিপোর্ট দাখিলের পর হতে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে।'

১০ জানুয়ারি ১৭৭২, অনুচ্ছেদ ১৫-১৯। অনুচ্ছেদ ১৫—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

এক ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন ঘটায় আমরা দুঃখিত, মুর্শিদাবাদস্থিত রাজস্ব পরিষদের নির্দেশে, গত বৎসরের হিসাব সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহে এই ত্রুটি ঘটেছে। বিগত বৎসরের জমা-খরচ হিসাবে মার্চ মাসের শেষের জমা-খরচ দাখিল করা হতেই এই ত্রুটি ঘটেছে। এত গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি সংশোধনের আমরা অনুমতি চাইছি, এবং আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে ঐ দফতরে বিগত বৎসরের বন্দোবস্ত মতো নিট জমা খরচ আঠারো লক্ষ আটত্রিশ হাজার ছয় শত একষট্টি টাকা চার আনা দুই গণ্ডা ও তিন কড়ি (১৮,৩৮, ৬৬১ : ৪ : ২ : ৩)। পরবর্তীকালে এই জমা-খরচ কমে ১২ লক্ষে দাঁড়ায়, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরে রাজস্ব বৃদ্ধির অপেক্ষা কম।)

অনুচ্ছেদ ১৬—'বর্তমান বৎসরে প্রতিটি রাজস্ব বিভাগে আশানুরূপ আদায় হওয়ার ঘটনায় আমরা অনুরূপভাবে আনন্দিত; এবং মরশুমে অনুকূল থাকায় আমরা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে বিগত যে-কোনো বৎসরের তুলনায় এই বৎসর বিভিন্ন বন্দোবস্তের স্থিরীকৃত পরিমাণের নিকটতম আদায় সম্পন্ন হবে।

অনুচ্ছেদ ১৭—বাংলা ১১৭৮ সাল অর্থাৎ ১৭৭০-৭১ সনের জন্য বিহারের রাজস্বের হিসাব আমাদের বিগত পত্রের পরে আমরা পেয়েছি; এবং অশেষ সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ্য করি যে ৪৩,৬১,৬৫১ : ০ : ৬ টাকা আদায় হয়েছে; এ ছাড়াও রয়েছে পূর্ববর্তী বৎসরের জমা-খরচ বাবদ, সুদ বাবদ লাভ ও বাট্টা ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত সংগ্রহ ২,৬৫,০৪৪ : ১০ : ০, অর্থাৎ সর্বমোট সংগ্রহ হয় টাকা ৪৬,২৬,৬৯৫ : ১০ : ০।

অনুচ্ছেদ ১৯—অতএব, বোঝা যায় যে, উপরোক্ত অতিরিক্ত সংগ্রহ বাদ দিয়েও অর্থের পরিমাণ (দুর্ভিক্ষের বৎসরে সংগৃহীত) বিগত বৎসরের তুলনায় ৪,২৫, ৭৪৭ : ৯ : ৩ টাকা বেশি।

দ্বিতীয় ভাগ—১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে দেশীয়দের লিখিত পত্রাবলীর অংশবিশেষ।

মহারাজা সিতার রায়—১৭৭০ সনের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্ত—'এই প্রদেশে শস্যাভাব এত তীব্র যে পাটনার রাস্তায় প্রতিদিন দুর্ভিক্ষের ফলে ৫০ জন হতভাগ্য গরিব লোক মারা যায়।' জেলাগুলিতে এই বিপর্যয় তীব্রতর ভাবে অনুভূত হয়। বাঁকিপুরে সেনাদের জন্য আদেশমতো ঢাকা হতে ৪০ হাজার মণ চাউল আসেনি। সেনাদলের খাদ্য সরবরাহে তৎপরতার জন্য ও প্রদেশে উৎপন্ন শস্য অধিবাসীদের জন্য অপ্রতুল হওয়ার জন্য সেনাদল যাতে তা ব্যবহার না করে, তার জন্য আবেদন।

ফৌজদার রুজুক খাঁর নিকট হতে—১৭৭০ সনের ১৩এপ্রিল প্রাপ্ত—অনাবৃষ্টির কারণে খরিফ ফসল প্রায় বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও 'দেশে উৎপন্ন দ্রব্য সকল সংগৃহীত হয়েছে ; কিন্তু রবি (অর্থাৎ বসন্তকালীন ফসল) ভালো হওয়ায় তিনি 'দায়িত্ব সম্পন্ন' করেন।

মহম্মদ রেজা খান—১৭৭০ সনের ১৫ মে প্রাপ্ত—'বিশ্বস্ততম শুভার্থীসুলভ অধ্যবসায় ও মনোযোগের সাথে আমি এখনো পর্যন্ত রাজস্ব সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে রত থেকেছি ; এবং মনুষ্যপ্রকৃতি দ্বারা সীমিত সাধ্যের মধ্যে কোনো কিছুই বাদ রাখিনি। কিন্তু নিয়তি নির্দিষ্ট ব্যাপারের কোনো প্রতিকার না থাকায় আমি অত্যধিক অনাবৃষ্টি, মূল্যবৃদ্ধি ও শস্যাভাব জাত দেশের এই বর্তমান দুর্দশাকে সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতা ছাড়া আর কি বলব? পুষ্করিণী ও ঝর্ণা সকল শুষ্ক, এবং জল সংগ্রহ করা প্রতিদিনই কঠিনতর। এইসব বিপর্যয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে দেশব্যাপী মারাত্মক ও ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড, এতে বহু পরিবারও হাজার হাজার বিনষ্ট হয়েছে। দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় রাজগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ ও অন্যত্র যে স্বল্প শস্য এখনো সঞ্চিত ছিল তা ভস্মীভূত হয়েছে। পূর্বে প্রতিদিনই হাজার হাজার লোকের দুর্দশার খবর আসত, কিন্তু তা সত্ত্বেও আশা ছিল যে, এপ্রিল ও মে মাস বৃষ্টির ফলশ্রুতিতে গরিব রায়তরা জমি চাষ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এ পর্যন্ত একবিন্দুও বৃষ্টি হয়নি। এই সময়ে যে মোটা ফসল তোলা হয় তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে, এবং এপ্রিল ও মে মাসেই আউশের বীজ বপন করা হয়। বর্তমান মে মাসের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হলেও বৃষ্টির অভাবে তা শুরু করা যায়নি। এমনকি এখনো কয়েক পশলা বৃষ্টি হলে কিছু করা সম্ভব। শস্যাভাব ও অনাবৃষ্টি প্রদেশের এক অংশে সীমিত থাকলে, ব্যবস্থাপনা ও মনোযোগের সাহায্যে প্রতিকার করা হয়তো সম্ভব ছিল ; কিন্তু এই দুর্যোগ সর্বব্যাপী হলে ভগবৎ কৃপা ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিকার নাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় এই দেশের ভাগ্যে কি আছে আমি জানি না। এই বিপর্যয় মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির উর্ধ্বে। একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের এই দুর্দশামুক্ত করতে সক্ষম।'

মহম্মদ রেজা খান—১৭৭০ সনের ২০ জুন প্রাপ্ত—অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও, আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনি ১৭৭০ সনের মতো 'মারাত্মক বৎসরে' যতটুকু সম্ভব রাজস্ব আদায় করেন। তিনি আরো বলেন, 'রায়তদের পরিষ্কার ধ্বংস, দেশের সর্বনাশ ও আগামী বৎসরের প্রভূত ক্ষতি ব্যতীত বকেয়া খাজনা আদায় করা যাবে না।' (তৎসত্ত্বেও, আমরা দেখেছি যে প্রায় সমগ্র রাজস্বই পরিশেষে সংগৃহীত হয়।)

বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ ১৭৭১ সনের ১৪ মে তারিখের পত্রে বলেন যে, "দুর্ভিক্ষের ফলে এই দেশের রায়তদের, গরিবদের ও অধিবাসীদের দুর্ভোগ ও দুর্দশা সত্ত্বেও কোনোরূপ বকেয়া ব্যতীতই সমগ্র রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে।'

তৃতীয় ভাগ—বঙ্গ সরকারের আলোচনা হতে উদ্ধৃত

১৭৬৯ সনের ২৩ অকটোবরের আলোচনা—শস্যাভাবের কারণে সেনাবাহিনীর জন্য শস্য মজুত করতে হবে। ছয় মাসের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ হাজার মণ। যেসব অঞ্চলে শস্যের প্রাচুর্য রয়েছে ও অনাবৃষ্টির প্রকোপ কম সেইখান থেকে এই শস্য সংগ্রহ করতে হবে।

পাটনা নগরীর প্রধান তথা প্রতিনিধি ৮০ হাজার মণ সংগ্রহ করবেন এর মধ্যে ৬০ হাজার মণ বহরমপুর ও পাটনা নগরীতে এবং ২০ হাজার মণ প্রেসিডেন্সিতে সেনাদলের জন্য প্রেরিত হবে। (বিঃ দ্রঃ পাটনা নগর হতে যখন এই সরবরাহ করা হয় তখন সেইটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রপীড়িত জেলাগুলির অন্যতম।)

দরবারের প্রতিনিধি দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলা হতে ৪০ হাজার মণ সংগ্রহ করবেন—খেয়াল রাখতে হবে যেন স্থানীয় অভাব পূরণ করার পর অন্যত্র সরবরাহ করা হয়। (বিঃ দ্রঃ যে পূর্ণিয়া হতে এই সরবরাহ করা হয়, পরবর্তী ছয় মাসে সেইখানের আধিবাসীদের 'এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বিনষ্ট হয়।)

পাটনা জেলায় ও নগরে গুদাম ঘর নির্মিত হবে। অগ্নি ও অন্যান্য দুর্ঘটনা সম্পর্কে সতর্কতা গ্রহণ।

দরবারের প্রতিনিধিগণ ও বিহারের রাজস্ব তত্ত্বাবধায়কদের খাদ্য শস্যের একচেটিয়া কারবার বন্ধ করতে হবে। ডাল, দানাশস্য, যব ও গ্রীষ্মকালীন শস্যের চাষে উৎসাহ দিতে হবে এবং ধানের অভাব পূরণের জন্য চিন্তনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাজস্বপ্রধান, বকসি ও জমিদার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি একচেটিয়া কারবার রোধ ও আধিবাসীদের ত্রাণকার্যের জন্য নিয়মবিধি প্রণয়ন করবে।

১৭৬৯ সনের ১৪ নভেম্বরের আলোচনা—ঢাকা নগরের প্রধান ও পরিষদ ৬০ হাজার টাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। অনুমোদিত, এবং শস্যক্রয়ের জন্য মিঃ সুমনারকে রাখরগঞ্জে প্রেরণও অনুমোদিত।

১৭৬৯ সনের ১৪ নভেম্বরের আলোচনা—শ্রমিকদের শস্তাদরে খাদ্য সরবরাহ করে কলিকাতায় নির্মীয়মাণ দুর্গের জন্য শ্রমিক পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কথিত যে, এই কাজে শস্য ব্যবসায়ীরা অসুবিধা সৃষ্টি করে।

১৯ হাজার মণ মজুত আছে (অর্থাৎ একটিমাত্র ব্রিগেডের তিন মাসের খোরাকিরও কম)। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আরো সরবরাহের প্রত্যাশা ছিল। দুর্গ নির্মাণে কর্মরত প্রত্যেককে মাথাপিছু দৈনিক ক্রয়মূল্যে এক সের চাউল ও বাকি পাওনা কড়িতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়; ফলে বাজারদর হতে শতকরা ৪০ ভাগ শস্তায় এইগুলি তারা পাবে। এই অনটন সম্ভবত আরো ৮ মাস অব্যাহত থাকবে ও এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে। ৮ হাজার কুলির জন্য

৪৭ হাজার মণের প্রয়োজন হতে পারে ; মজুত শস্য ছাড়াও এই পরিমাণের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং চট্টগ্রাম হতে আরো সরবরাহ পাওয়া যেতে পারে।

সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য বকসির কাছে সর্বদাই ২০ হাজার মণ মজুত থাকবে। বর্তমানে সেণ্ট জর্জ দুর্গ সম্ভবত চাউল সরবরাহ করতে পারে। বাংলা হতে মার্লবরো দুর্গে সরবরাহ সম্ভব নয়। আরো সরবরাহের জন্য চট্টগ্রামকে চাপ দিতে হবে। সেণ্ট জর্জ দুর্গে লেখা হয়েছে (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাংলা থেকেই মাদ্রাজে সরবরাহ যায়, মাদ্রাজ থেকে বাংলায় নয়।)

১৭৬৯ সনের ২০ নভেম্বরের আলোচনা—বর্ধমানের রাজার আবেদনপত্র। অনাবৃষ্টি ও শস্যমূল্য বৃদ্ধি। শস্য শুকিয়ে যায় ও গবাদির খাদ্য হয়। পুষ্করিণী শুষ্ক। অধিবাসীদের জন্য জল অপ্রতুল। রবি ফসলের কাজ পিছিয়ে যায় ও বৃষ্টি ছাড়া বিনষ্ট হবে। বিপুল সংখ্যক রায়তের বাস্তুত্যাগ।

দরবারের প্রতিনিধি জানায় যে, একচেটিয়া কারবার বন্ধ করার ফলে উপশম ঘটেছে, কিন্তু রায়তদের বাস্তুত্যাগ ও চাষের অভাবের ফলে আগামী মরশুমে সমগ্র প্রদেশ পরিত্যক্ত হওয়ার আশংকাজনক সম্ভাবনা রয়েছে। আতঙ্ক ছড়ানো বন্ধ করার জন্য এই খবর গোপন রাখা হয়েছে, কিন্তু কর্তব্যবোধ ও মানবিকতা-বোধের খাতিরে দেশের দুর্দশা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। দক্ষিণে বৃষ্টি হয়েছে ; কিন্তু উত্তরে ধান কিছু অঞ্চলে সম্পূর্ণত ও অন্যত্র বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে। নদীগুলি শুষ্ক ও পুষ্করিণী শূন্য। রায়তরা তুলা, তুঁত, শস্য, মটরশুঁটি, যব, তামাক ইত্যাদি চাষ করতে পারে না। সেই কারণে, দিনমজুর হিসাবে জীবিকার্জনের জন্য রায়তদের পলায়ন। এর প্রতিকার না হওয়ার ফলশ্রুতিতে রাজস্বহানি হবে।

১৭৬৯ সনের ১২ ডিসেম্বরের আলোচনা—চট্টগ্রামের প্রধান ও পরিষদ অনটন দূর করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন।

১৭৭০ সনের ১৮ জানুয়ারির আলোচনা—মালাবার উপকূল হতে সরাসরি পাওয়া না গেলে, মার্লবরো দুর্গে শস্য সরবরাহের জন্য সেণ্ট জর্জ দুর্গ প্রতিশ্রুতি দেয়। বিলম্বিত বৃষ্টির কারণে তাদের প্রচুর শস্য পাওয়ার সম্ভাবনা।

১৭৭০ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারির আলোচনা—দরবারের প্রতিনিধি দৈনিক মাথাপিছু আধসের হারে ছয়টি জায়গায় চাউল বিতরণের প্রস্তাব করেন। ইয়োরোপিয়রা ও তাদের গোমস্তারা বাধা দিচ্ছে। যেসব প্রদেশ নগরীকে সরবরাহ জোগায় সেইখানে পরবর্তী আগস্ট মাস পর্যন্ত এদের শস্য ক্রয় বন্ধ করা উচিত। পুবের জেলাগুলি কলিকাতায় সরবরাহ জোগাবে। বহরমপুরে সেনা-বাহিনীর জন্য ৪০ হাজার মণ চাউল সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৭৭০ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারির আলোচনা—রাজস্ব ও তাকাভি হ্রাস করা অপেক্ষা পরিশোধযোগ্য হ্রাস অনুমোদনের বিষয়টি দরবারের প্রতিনিধির 'বিবেচনা ও নিরপেক্ষতার' উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৭৭০ সনের ২৭ মার্চের আলোচনা—বাখরগঞ্জ হতে চাউলের প্রতিশ্রুত সরবরাহ আসেনি।

১৭৭০ সনের ৩ এপ্রিলের আলোচনা—বকসি জানায় যে বাখরগঞ্জ হতে ৩৩,৯১৩ মণ এসেছে। শরৎকালীন শস্যের (সাধারণ মানের) ২৫,৬৫৭ মণ ছোট ছোট ভাগে বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৭৭০ সনের ৩ এপ্রিলের আলোচনা—রাসেল, ফস্থার ও হেয়ার মহোদয়দের অনুরোধ (৩ এপ্রিল ১৭৭০), ব্যবসায়ীদের সহায়তার অতিরিক্ত দৈনিক আরো ৫৫ মণ চাউল কলিকাতায় ও দৈনিক আরো ২০ হতে ২৫ মণ চাউল বর্ধমানে দান হিসাবে বিতরণের আদেশ দেওয়া হয়।

১৭৭০ সনের ১৪ আগস্টের আলোচনা—তাদের একদিনের খোরাকিও মজুত নেই এই যুক্তিতে পরিষদ চন্দননগরে ফরাসি উপনিবেশকে কোনোরূপ সহায়তা দিতে অস্বীকার করে।

১৭৭০ সনের ১৯ সেপ্টেম্বরের আলোচনা—অনাবৃষ্টির কারণে বহু অধিবাসী মারা যাওয়ার ফলে মালদহের বিনিয়োগে ক্ষতি হয়—অবশিষ্ট অধিবাসীরা এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে গত বৎসরের প্রস্তুত বস্ত্রের অর্ধাংশও এ বৎসর প্রস্তুত হয়নি।

১৭৭০ সনের ২২ অকটোবরের আলোচনা—সামান্য পরিমাণ চাউল চোরা-চালানের চেষ্টার পরিণামে লুশিপুরস্থ ফরাসিদের সাথে বিবাদ।

১৭৭০ সনের ১৪ নভেম্বরের আলোচনা—'যেহেতু দুর্ভিক্ষ এখন সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে এবং যেহেতু বর্তমানে শুধু বিপুল প্রাচুর্য ছাড়াও সর্বাধিক ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে—সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হচ্ছে যে চাউলের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হউক এবং সেই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হউক'।

চতুর্থ ভাগ—মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক পরিষদের কার্যবিবরণী হতে উদ্ধৃত বিশেষাংশ।

১৭৭০ সনের ২৭ সেপ্টেম্বরের আলোচনা—দেশের বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা-জনিত ক্ষতির আশংকা পরিহারের উদ্দেশ্যে, ভাদ্রের ফসল হতে রাজস্ব সংগ্রহে নবাবকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা উচিত।

১৭৭০ সনের ৪ অকটোবরের আলোচনা—বিহারের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ গ্রোসের নিকট হতে পত্রে, তাং, গোবিন্দগঞ্জ, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৭৭০—রায়তদের পলায়নের ফলে এবং জনসাধারণের অসন্তুষ্ট এক অংশমাত্র থাকায়, বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ জমি অকর্ষিত রয়েছে। ধানের ফলন চমৎকার এবং চাষ করা হলে প্রচুর ফসল হতে পারতো।

রংপুরের তত্ত্বাবধায়কের পত্র, ২৬ সেপ্টেম্বর—গরিবদের চরম দুর্দশা অব্যাহত। ত্রাণের জন্য প্রতিদিন বহু হতভাগ্য আবেদন করে। সবচেয়ে অভাবীদের মধ্যে প্রতিদিন ৫ টাকার চাউল বিতরণ করা হয়। পূর্বে এই কাজে ১০ টাকা ব্যয় করা হতো। প্রাদেশিক পরিষদ এই খরচ অনুমোদন করে (৪ লক্ষ অনশন-ক্লিষ্ট লোকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ১০ শিলিং!)

১৭৭০ সনের ১৭ অকটোবরের আলোচনা—১৭৭০ সনের ১০ অকটোবর তারিখের এক পত্রে পূর্ণিয়ার তত্ত্বাবধায়ক মিঃ ডাকারেল অভিযোগ করেন যে তাঁর জেলা হতে শস্য চালান নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, মুঙ্গেরে সেনাদের জন্য শস্য ক্রয় করতে কর্নেল চ্যাম্পিয়ন সিপাহিদের পাঠান। বর্তমান দুর্দশা ও শরৎকালীন ফসল নষ্ট হওয়ার সময়ে তিনি আশা করেন যে মুঙ্গেরের জন্য সরবরাহ, সশস্ত্র সেনাবাহিনীর পরিবর্তে সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ দেশীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করা হবে।

১৭৭০ সনের ২৩ অকটোবরের আলোচনা—বীরভূমের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ হিগিনসন ১৭৭০ সনের ১৮ অকটোবর এক পত্রে জানান যে, শিকদারদের তদারকিতে ন্যস্ত জমিগুলির বিপুল খাজনা বাকি পড়েছে। জানানো হয়েছে যে এইগুলি 'দুর্ভিক্ষের ফলে এখন বন্ধ্যা ও জনহীন অবস্থায় রয়েছে' যে, এইগুলির ইজারাদার পাওয়ার কোনো আশা নেই, তবু তিনি রাজস্ববৃদ্ধি ও পরবর্তী বৎসরে ভালো রাজস্ব আশা করেন।

১৭৭০ সনের ৬ নভেম্বরের আলোচনা—বিগত দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতায় শস্য সরবরাহ ভালো ছিল; সেই সময় যেসব অঞ্চল হতে এই শস্য সংগৃহীত হতো, সেইসব অঞ্চল ছিল চরম দারিদ্র্য পীড়িত। মজুরির হার—একজন মজুরের জন্য মাসিক ৬ বা ৮ আনা (অর্থাৎ খোরাকি বাদে)—'যে সময়ে টাকায় দুই বা তিন মণ চাউল পাওয়া যেত, সেই সময়ের হিসাবে করা হয়।' উপযুক্ত মূল্যে জীবনধারণের সামগ্রী সংগ্রহে অক্ষম হলে পরিবার সহ তারা যেসব অঞ্চলে মজুরি বেশি বা জীবনধারণের সামগ্রী শস্তা, সেইখানে চলে যেত,' এবং 'এখন শস্য চালান চালু করলে,' গোমস্তারা ও ব্যবসায়ীরা 'এমন দরে ক্রয় করবে, যা শ্রমজীবী জনগণ তাদের প্রাণধারণের জন্যও ক্রয় করতে পারবে না'।—পূর্ণিয়ার তত্ত্বাবধায়কের পত্র।

১৭৭০ সনের ২৬ নভেম্বরের আলোচনা—নায়েব দেওয়ান রেশমশিল্প অব্যাহত রাখার অসুবিধা সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অস্বাভাবিক দুর্ভিক্ষের কারণে, জীবনধারণের সামগ্রীর অভাবে বহু রায়ত মারা যায়, বহু গৃহ পরিত্যক্ত হয় ও অবশিষ্ট অধিবাসীরা কোনো প্রকার উদ্যোগ নিতে বা চাষ-আবাদের ধকল সহ্য করতে সম্পূর্ণ অপারগ। বর্তমান বৎসরের বন্দোবস্ত পাঠাবার সময় মিঃ হারউড তাঁর অধীনস্থ জেলার 'নিঃস্ব, অধঃপতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা'র

উল্লেখ করেছেন।

১৭৭০ সনের ২৮ নভেম্বরের আলোচনা—নদীয়ার রাজা কুসুমচাঁদ দুর্ভিক্ষের কারণে, 'বহু রায়তের মৃত্যু ও পলায়নের খবর জানান।

১৭৭০ সনের ১৩ ডিসেম্বরের আলোচনা—তিন বৎসর ব্যাপী ক্রমাগত রাজস্ব-বৃদ্ধির বর্তমান বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পূর্ণিয়ার তত্ত্বাবধায়ক মিঃ ডাকারেল বলেন: 'দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত জনহানি সম্বন্ধে যদি আমি জানতাম, তবে আমি কখনো তিন বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত (অর্থাৎ রাজস্ব ব্যবস্থা) বা রাজস্ববৃদ্ধির ব্যবস্থা করতাম না।' ব্যক্তিগত পরিদর্শনের পর চারটি পরগনা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে 'ফসল না হওয়ার ফলে মানুষ হয় মারা যায়, অথবা প্রাণধারণের জন্য অন্যত্র যায়, এবং জমির মূল্য সত্যই এক বৎসরে অর্ধেক দাঁড়ায়; গভীর পর্যবেক্ষণ জাত নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতীত আমি কখনো এই বিষয় সন্তুষ্ট হতাম না। সত্যই এইগুলি জনবসতির অভাবে পতিত রয়েছে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাভেলি পূর্ণিয়া—এইখানে ১ হাজারের অধিক গ্রাম ছিল, এবং পূর্ণিয়ার অভূতপূর্ব রাজস্ব হ্রাসের কারণ এইখানেই নিহিত'।

এই ছাড়াও, মিঃ ডাকারেল নিম্নলিখিত বক্তব্যটি যোগ করেন—'আলমগঞ্জ নামক গঞ্জের কর প্রধানত শহরের শস্য ব্যবহারের উপর নির্ভর করত এবং বিগত দুর্ভিক্ষের কারণে শহরের এক বৃহদংশ জঙ্গলে পরিণত হয়ে আক্ষরিকভাবে বন্য জন্তুদের আবাসস্থল হওয়ার ফলে বিপুলভাবে এই কর হ্রাস পায়।

দেশের উন্নতির প্রসঙ্গে জবাব হিসাবে মুখবন্ধে আমি অবশ্যই উল্লেখ করব যে বিভিন্ন পরগনা হতে প্রাপ্ত প্রামাণ্য বিবরণ অনুসারে, এই জেলার প্রায় দু'লক্ষ (অর্থাৎ ২০০, ০০০) লোক মারা যায়। এই ক্ষতি জনিত (বেশি বা কম যাই হোক) ফলাফল ব্যতীত, আমি নিরাপদে এই মতামত দিতে পারি যে দেশের উন্নতি ঘটছে।'

১৭৭০ সনের ২০ ডিসেম্বরের আলোচনা—মুর্শিদাবাদ হতে মিঃ রিডের পত্রে বলা হয়েছে যে ঢাকা, পূর্ণিয়া ও হুগলিতে নিয়মিত রাজস্ববৃদ্ধি হয়ে চলেছে ও কয়েক ক্ষেত্রে অগ্রিম জমা দেওয়া হয়েছে। বাকি অন্যান্য তত্ত্বাবধায়কদের বক্তব্য হতে 'সামান্য কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত' সাধারণভাবে সমগ্র প্রদেশে রাজস্ব যথা-রীতি সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

১৭৭০ সনের ১৪ ডিসেম্বরের আলোচনা—মিঃ বেচারের মতে, সর্বাপেক্ষা সংকটজনক পরিস্থিতিতে বাখরগঞ্জের চাউল পৌছায়; এবং 'এইখানের ইংরাজ-দের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল জনগণের ত্রাণ হিসাবে প্রমাণিত এই ব্যবস্থা কোম্পানির পক্ষে খুব লাভজনক হয় ও নিয়ম শৃংখলা রক্ষার সহায়ক হয়; অন্যথায় 'বৃহত্তম বিশৃংখলা অনিবার্য ছিল'।

নগরের ও সন্নিহিত অঞ্চলের হতভাগ্যদের মধ্যে চাউল বিতরণের জন্য কমিটি

৮৭ হাজার টাকা অনুমোদন করে—কোম্পানি ৪০ হাজার টাকা ও নবাব ৪৭ হাজার টাকা দেন। কিন্তু অনুমোদনের চেয়ে বেশি টাকা খরচ হয়। 'মরশুমের অগ্রগতির সাথে দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত ফলাফল বহুগুণে ভয়াবহ হয়ে ওঠে; মূল্য-বৃদ্ধির ফলে চাউলের দর টাকা প্রতি ১০ সের হতে ৩ সের হয়; এবং মানবিক ও নীতিগত উভয় দিক হতেই এই বিতরণ আরো আগে বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। অতিরিক্ত এই খরচের জন্য নবাব ও মন্ত্রীদের তাঁদের অংশ দিতে বলা হবে কিনা এইটাই বিবেচ্য'। 'এই বিতরণ ছাড়াও এই ভদ্রমহোদয়গণ তাঁদের দানধ্যান দ্বারা বহু জীবনরক্ষায় সহায়ক হন, ও আমার বিশ্বাস এই অঞ্চলের প্রতিটি ধনী ব্যক্তিই এতে অংশগ্রহণ করেন; বস্তুত যে সকল হতভাগ্যরা ক্রমাগত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তাদের ত্রাণের জন্য সাধ্যমতো প্রচেষ্টা নিতে অস্বীকার করা অতি পাষাণ হৃদয় ব্যতীত অপর কোনো বিত্তশালী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না।' 'এই দায়িত্ব অপরিহার্য ছিল এবং চাউল বিতরণের কারণে বহু জীবনরক্ষা পাওয়ার ফলে কোম্পানি লাভবান হবে'।

১৭৭০ সনের ৩১ ডিসেম্বরের আলোচনা—রাজশাহির তত্ত্বাবধায়ক মিঃ রাউস জানান: আউস ধানের ঘাটতির সর্বাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ এই অভূতপূর্ব ঘটনা হতে পাওয়া যায় যে, এই অঞ্চলের ব্যবহারের জন্য শস্য বর্তমানে উত্তরের জেলা-গুলি ও মুর্শিদাবাদ সন্নিহিত অঞ্চল হতে রফতানি দ্বারা সরবরাহ করা হয়; এবং মুর্শিদাবাদে টাকা প্রতি ৩০ সেরেরও অধিক দরে শস্য বিক্রয় করা হলেও, চাউল-অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত নাহোরে শস্য টাকা প্রতি ১৮ সের দরে বিক্রয় করা হয়'।

১৭৭১ সনের ৪ ফেব্রুয়ারির আলোচনা—দুর্ভিক্ষ জনিত জনহানি ও জেলার বিধ্বস্ত অবস্থার কারণে দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ কর-হ্রাসের জন্য আবেদন করেছেন; তিনি জানান যে বহুগ্রাম সম্পূর্ণত পরিত্যক্ত হয়েছে এবং বীজ ও চাষের সরঞ্জামের অভাবের ফলে অধিকাংশ জমি পতিত রয়েছে। ধার্য সর্বমোট ১৩,৭০,৯৩২ টাকার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে; এবং পর্ষদ বর্তমানে আদেশ দিয়েছেন যে যদি রাজা ধার্য রাজস্ব পুরোপুরি সংগ্রহে 'সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা' না করেন, তবে তিনি রাজত্ব বঞ্চিত হবেন ও ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তি হিসাবে তাকে পর্ষদের সামনে হাজির করা হবে।

১৭৭১ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারির আলোচনা—বীরভূমের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ হিগিন-সন জানান: 'ভদ্রমহোদয়গণ এই জেলাগুলির অবশিষ্ট গরিব রায়তদের গত বৎসরের বকেয়া খাজনা দিতে বাধ্য করার কুফল সম্বন্ধে, এখন আপনাদের অব-হিত করতে আমি বাধ্য হচ্ছি—বিগত দুর্ভিক্ষের চরম দুর্ভাগ্যের ফলে এদের অধিকাংশই খাজনা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাদের গবাদি পশু ও চাষের সরঞ্জাম বিক্রয়ে বাধ্য করে সামান্য অংশ আদায় করা সম্ভব, কিন্তু এর ফলে তাদের

প্রদেশ ত্যাগ নিশ্চিত হবে ও পরবর্তী বৎসরের চাষ বন্ধ হবে, ফলে বকেয়া জনিত সমগ্র ক্ষতির চেয়েও রাজস্বের বহু বেশি ক্ষতি হবে। বিষ্ণুপুরে, আমার দায়িত্ব গ্রহণের আগে, ১০৬৭ টাকা আদায় করা হয় এবং সেই সকল রায়ত দেশত্যাগ করে। গত বৎসরের এইসব বকেয়া করের অনেকগুলি বহুলাংশে আমিল ও দেশীয় খাজনা আদায়কারীদের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থাপনার কারণে ঘটে (তখন এদের মাধ্যমেই আমরা দেশ শাসন করতাম), এবং বিশেষভাবে বিষ্ণুপুরের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :—কর্ষিত জমির জন্য কর হিসাবে রায়তদের ধান দেওয়ার প্রথা ছিল, কিন্তু গতবৎসর বৃষ্টির অভাবে সম্পূর্ণ শস্যহানির কারণে তাদের দেওয়ার মতো ধান ছিল না। এই সুযোগ গ্রহণ করে খাজনা আদায়কারী বিঘা প্রতি ১ টাকার পরিবর্তে ৩ টাকায় বন্দোবস্ত করতে তাদের বাধ্য করে। এতে সক্ষম না হওয়ায় রায়তরা প্রদেশ পরিত্যাগ করে এবং অবশিষ্টদের সর্বনাশ ঘটে। এবং সেই কারণেই, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কিভাবে এই বকেয়া খাজনা আদায় করা হবে তা জানার জন্য আপনাদের শরণাপন্ন হলাম; ইতিমধ্যে খাজনা দিতে সক্ষম ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়ের জন্য আমি সচেষ্ট থাকব, কিন্তু, আমার আশঙ্কা, এই রকম লোকের সংখ্যা খুব কম হবে।

পূবের প্রপীড়িত পরগনাগুলি মিঃ হিগিনসন পরিদর্শন করেন।

তিনি বলেন, এইগুলির সবকটিই প্রদেশের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত ছিল এবং অন্যান্য পরগনাগুলির তুলনায় গত বৎসর অত্যন্ত কম বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এইগুলি বহুগুণ বেশি কষ্টভোগ করে। অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় আমি আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এই সকল অঞ্চলে বিগত দুর্ভিক্ষের কুফল বর্ণনাতীত ভাবে ভয়ংকর। শত শত গ্রাম সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে; এবং এমনকি বড় শহরগুলিতেও এক-চতুর্থাংশ গৃহও অনধ্যুষিত। রায়তের অভাবে বিশাল বিশাল চমৎকার জমি সম্পূর্ণ পতিত ও অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। এই সকল পরগনার ব্যাপক রায়তরা শিকদারদের অত্যাচার হতে নিস্তার পাওয়ার জন্য এবং প্রদেশের অন্যান্য অংশের মতো একই পদ্ধতিতে ইজারাদারদের নিকট তাদের জমি ইজারা দেওয়ার জন্য আমার কাছে আবেদন করেছে; তারা চাষের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগের ও বর্তমান বাস্তুভিটায় থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মরশুমের শুরুতেই যত শীঘ্র সম্ভব এইটি করার সুবিধা আপনাদের নিকট অবশ্য সুস্পষ্ট কারণ অধিকাংশ রায়তই তাকাভির সহায়তা ছাড়া জমি চাষে সক্ষম হবে না; তাকাভি একমাত্র ইজারাদারদের দেওয়া যায় এবং নিজেদের স্বার্থের কারণে তারা রায়তদের উৎসাহিত করার জন্য এই টাকা অগ্রিম দেয়।'

পরিষদ উত্তর দেন—

'যদিও আমরা আপনার জেলা হতে প্রাপ্য মফস্বল বকেয়ার দাবি কোনো-

ক্রমেই ছাড়তে পারি না, তবুও যেহেতু বর্তমান মরশুমে রায়তদের এইজন্য হয়রানি অব্যাহত থাকলে আগামী বৎসরে চাষ তথা আদায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, সেইজন্য বর্তমানের জন্য এই আদায় স্থগিত রাখার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার সাথে একমত না হয়ে আমাদের উপায় নেই। অবশ্য, আগামী বৎসরে ফলন ভালো হলে, আমরা এইসব বকেয়া খাজনা আদায় করার আশা রাখি; এবং সেইক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যের প্রতি আপনার মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমরা সুপারিশ করছি।'

১৭৭১ সনের ১লা এপ্রিলের আলোচনা—চাষীদের চাষ শুরু করতে সক্ষম করার জন্য নদীয়ার তত্ত্বাবধায়ক ৪ হাজার পাউণ্ড অগ্রিমের জন্য আবেদন করেন। পরিষদ মাত্র ২৫০০ পাউণ্ড অনুমোদন করেন এবং পরিশোধের জন্য জোতদারদের দায়ী রাখেন।

১৭৭১ সনের ১৫ এপ্রিলের আলোচনা—রাজশাহির তত্ত্বাবধায়ক মিঃ রাউস্ জানান: 'বিভিন্ন পরগনা হতে প্রায়শই গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার খবর আমি পেয়েছি, এই সকল বেপরোয়া দুষ্কর্ম দুর্দশায় ক্ষিপ্ত জনগণের কীর্তি। এতাবৎ সচ্চরিত্র বহু রায়ত জীবনধারণের জন্য অন্তিম এই বেপরোয়া পথ গ্রহণ করেছে।'

পঞ্চম ভাগ—সিলেক্ট কমিটি, গোপন আলোচনা ও রাজস্ব কমিটি হতে নির্বাচিত অংশ।

১৭৬৯ সনের ৯ ফেব্রুয়ারির আলোচনা—দরবারে প্রতিনিধি মিঃ বেচার জানান যে 'এত সুনির্দিষ্টভাবে রাজস্ব পূর্বে কখনো আদায় করা হয়নি'।

১৭৬৯ সনের ১৫ অগাস্টের আলোচনা—বেশ কয়েকটি পত্রে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ঘোষণা করার পর বিহারের প্রধান মিঃ রামবোল্ড প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার কথা জানিয়ে এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, অভাব ও ক্ষুধা হতে হয়তো মুক্তি পাওয়া যাবে।

এই তারিখ হতে বৎসরের শেষ পর্যন্ত আলোচনাগুলিতে স্থানীয় অফিসারের নিকট হতে বহু পত্রের উল্লেখ রয়েছে—এই পত্রগুলিতে অনাবৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে, চরম দুর্দশা ও রাজস্ব হ্রাসের আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে এবং সরকারি খাজনা পূর্ণত বা অংশত শস্যে দেওয়ার অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

১৭৭০ সনের ২৮ জানুয়ারির আলোচনা—বিহারের তত্ত্বাবধায়ক, মিঃ আলেকজাণ্ডার, জানান যে 'দূরবর্তী দুর্যোগের নয়, বরং 'আশু চরম দুর্দশা'র জন্য প্রতিকার অবশ্য প্রয়োজন; চিন্তায় ব্যয়িত প্রতিটি দিন দুর্যোগ বৃদ্ধি ঘটাবে', তিনি সরকারি চাউলের মণ প্রতি ২৫ সের গ্রহণ করার ও বাকি ১৫ সের রায়ত-

দের জন্য ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন,—প্রথামতো আখ, তুলা ও আফিম দেওয়া হয়েছে।

মিঃ আলেকজাণ্ডার রাজা সিতাব রায়ের সাথে প্রদেশ পরিদর্শনের এক প্রস্তাবও দেন। তিনি বলেন: 'পাটনা নগরী হতে বিচারে মনে হয় যে দেশের অভ্যন্তরের অবস্থা শোচনীয়। বিগত ১০ দিন যাবৎ প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ জন লোক শুধু ক্ষুধার কারণে রাস্তায় মারা গেছে।' এখনো সেখানে ৮ হাজার অধিক ভিক্ষুক রয়েছে; এবং যদি রাজা জনসাধারণের দানধ্যানের মাধ্যমে উপশমের চেষ্টা করেন, তবে পাটনা সন্নিহিত প্রতিটি গ্রাম হতে এই সংখ্যা আরো বাড়বে। তাঁর বাসগৃহের নিকটস্থদের জন্য তিনি প্রতিদিন কোম্পানির খরচে ৫০ টাকার চাউল বিতরণ করেন এবং দুর্ভিক্ষ চলা পর্যন্ত বা বিপরীত আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এইটি অব্যাহত রাখবেন। রাজা প্রায় ২ লক্ষ টাকা দরিদ্রের ত্রাণ ও সহায়তার জন্য দেওয়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু অনুমতি ব্যতীত মিঃ আলেকজাণ্ডার এইটি অনুমোদন করতে পারেন নি।

পরিষদ শস্যে রাজস্বগ্রহণ সম্বন্ধে সতর্কতা গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং সীমিত আকারে এই পরিকল্পনা গ্রহণে মিঃ আলেকজাণ্ডারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৭৭০ সনের ২৮ এপ্রিলের আলোচনা—প্রত্যক্ষদর্শী নহেন এইরূপ যে কোনো ব্যক্তির কল্পনা অপেক্ষা দেশের গভীর অভ্যন্তরে জনহানি আরো দ্রুত ছিল, এবং জনগণের মানসিকতা এমন ছিল যে উদ্যোগ ও শ্রম দ্বারা দুর্দশা ও ক্ষুধা হতে নিজেদের মুক্ত করার পরিবর্তে তাদের মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণের প্রবণতা ছিল। আমি চাষের জন্য সম্ভাব্য সকলপ্রকার উৎসাহদানে ইচ্ছুক ছিলাম এবং এই উদ্দেশ্যে পরোয়ানা জারি করা হয় এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সর্বত্র জানানো হয় যে অর্জুন নামক বিশেষ এক শস্য উৎপাদনকারী জমির জন্য আগামী ৬ মাসে কোনো খাজনা দিতে হবে না। মনে হয়, এইটি একটি নিম্নস্তরের শস্য এবং কখনো উল্লেখযোগ্য রাজস্ব দেয় না; পর্যাপ্ত ফলনের মরশুমে সচরাচর এটি টাকায় ৫ মণ পাওয়া যায়।

এই স্থানের দরিদ্রের দুর্দশা এমনভাবে বাড়ছে যে পাটনায় এক দিনে অন্তত ১৫০ জন মারা গেছে। এই কারণে এবং আপনারা আমাকে নমনীয়তার অবকাশ দেওয়ার ফলে আমি প্রতিদিন কোম্পানির টাকা হতে ৩৮০ মুদ্রা খরচ করি,—এর মধ্যে রাজা ১০০টি, মেসার্স স্টিফেনসন, ড্রোজওল ৮০টি ও আমি নিজে ১৫০টি খরচ করি। আমি স্থির নিশ্চিত যে সমগ্র অর্থই অত্যন্ত হিসাব করে খরচ করা হয়েছে। দানাপুরের অফিসাররা ব্যক্তিগত চাঁদা দ্বারা বিশাল সংখ্যককে খাদ্য দেন এবং ফরাসি ও ওলন্দাজরাও তাদের ছোট কারখানা হতে প্রত্যাশামতো যত বেশি সম্ভব দান করেন।

১৭৭০ সনের ২৮ এপ্রিলের আলোচনা—'প্রতিকূল মরশুমে বিশেষভাবে

পীড়িত জেলাগুলি হলো পূর্ণিয়া, রাজমহল, বীরভূম ও রাজশাহির একাংশ, বস্তুত একমাত্র যে জেলা হতে অনাবৃষ্টির অভিযোগ আসেনি সেইটি হলো ঢাকা ও পূবের নিম্নভূমি—এইসব অঞ্চলে লক্ষণীয় এক খরার সময়েও নদীগুলি দ্বারা জমি প্লাবিত ও উর্বরা হয়েছে।

ভাগলপুর অনাবৃষ্টির দ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত হয়েছে, এর সাথে অন্যান্য কারণ যুক্ত হয়ে এই সমৃদ্ধ অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় করেছে। নমনীয় রাজস্ব ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হচ্ছে।

বীরভূম ও এইখানের অধিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'শোচনীয় প্রায় বর্ণনাতীত'। অব্যাহত অনাবৃষ্টির জন্য আক্ষেপ করা হয়েছে এবং এই অঞ্চলের অবস্থার মিঃ বেচার এইভাবে সারসংক্ষেপ করেছেন —

'বর্তমান অনাবৃষ্টি আর বেশিদিন অব্যাহত রাখা যদি ভগবানের মর্জি হয় তবে আপনাদের তরফে (সিলেক্ট কমিটি) মন্ত্রীদের তরফে এবং আমার তরফে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ফেব্রুয়ারির বৃষ্টির ফলে রায়তরা জমি চাষ করতে পারে, এবং এখন বীজ বপনের জন্য আর একদফা বৃষ্টির প্রয়োজন। যদি এই আশীর্বাদ তারা শীঘ্রই পায়, তবে তাদের আগামী ফসলের ভালো সম্ভাবনা থাকবে; যদি তা না হয়, তবে এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে পরিণত হবে। বস্তুত আগামী বৎসরে কোম্পানি সামান্য রাজস্বই আশা করতে পারে। অধিবাসীদের বর্তমান দুর্দশা শুধু খাদ্যের অভাব ও অনাবৃষ্টি জনিত নয় বরং বহু অঞ্চলে তাদের পানীয় জলও নেই।'

১৭৭০ সনের ২৮ এপ্রিলের আলোচনা—পূর্ণিয়ার ফৌজদার মহম্মদ আলা খাঁ।

'৩০-৪০ জন লোক মারা যায় না এমন দিন কদাচিৎ আসে'। 'বিপুল সংখ্যক লোক ইতিমধ্যেই ক্ষুধার জ্বালায় মারা গেছে এবং এখনো যাচ্ছে'। খাদ্যের জন্য বীজধান, গবাদি পশু ও চাষের সরঞ্জাম বিক্রয় করা হয়েছে। শিশুদের বিক্রয় করা হচ্ছে কিন্তু কোনো ক্রেতা নেই। সরকারের স্বার্থে, প্রশংসনীয় না হলেও দুর্দশার প্রতি সরকারি চোখবুঁজে থাকা ও বিলাপের প্রতি কর্ণপাত না করার কথা মহম্মদ আলি প্রকাশ করেছেন। বিষ্ণুপুরের আউমিল নবকিশোর হলফ করে বলেছে যে—

'অতিরিক্ত অনাবৃষ্টি ও পুকুর ও বিল হতে জল সরবরাহে ব্যর্থতার কারণে জমির ধান সূর্যের তাপে জ্বলে গিয়ে শুষ্ক খড়ের জমিতে পরিণত হয়েছে'।

যশোহরের আউমিল উজাগর মাল ভাদ্র মাসে কিংবা তার আগেও কোনো বৃষ্টি না হওয়ার কথা জানায়। জনসাধারণ খাদ্যের জন্য গাছের পাতা নিয়ে আসছে এবং তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিক্রয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। বহু রায়ত পলাতক।

রাজমহলের ফৌজদার প্রতাপ রায় একই ধরনের বিবরণ দেন। রাজস্ব হিসাবে হাল-বলদ দিতে চাওয়া হচ্ছে, এবং জনগণের আর্তনাদে কাছারির কাজ বিঘ্নিত।

মিঃ ডুকারেল জানান যে, পূর্ণিমা শহরের অবস্থা গ্রামের অবস্থা থেকে কিছু কম ভয়াবহ নয়। মহামারী প্রতিরোধের জন্য মৃতদেহ অপসারণ আবশ্যক। তাঁর আগমনের পর ৩ দিনে হাজারের অধিক কবর দেওয়া হয়। কৃষক ও খাজনা-দাতাদের অর্ধাংশ ক্ষুধার জ্বালায় ধ্বংস হবে, আর জীবনধারণের সামগ্রী ক্রয়ে সক্ষম ব্যক্তিদের খাদ্যমূল্য হিসাবে অন্তত শতকরা ৫০০ ভাগ অগ্রিম দিতে হবে। তাঁর মতে উঁচু ও বালিময় জমিতে অর্ধাংশেরও বেশি রায়ত মারা যায়।

রাজমহলের মিঃ হারউড জানান যে, গত ১২ মাসে জমিতে অর্ধেক ফলনও না হওয়ার ফলে জমিদারদের সর্বনাশ হয়েছে।

পরবর্তী এক পত্রে (২৮ মার্চ ১৭৭০) খাজনার সাম্প্রতিক স্থগিতাদেশ অনু-মোদনে মানবিকতার উল্লেখ করে মিঃ হারউড বলেন :

'অধিবাসীদের দুর্দশা যদি আপনাদের পূর্বে জানানো হতো এবং রায়তরা যদি যথাসময়ে এই রেহাই পেত, তবে আপনাদের শুভেচ্ছা পুরোপুরি সফল হতো এবং বহু সহস্র দরিদ্র নিপীড়িত ব্যক্তি প্রাচুর্য না হোক অন্তত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত, কিন্তু এই বিপর্যয়ের সময় ভুল নীতি ও স্বার্থের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে (দেশীয়) আদায়কারীরা সরকারের সাথে বন্দোবস্ত পূরণ করার জন্য রায়তদের উপর এত চাপ দেয় যে অনিবার্যভাবে তাদের সম্পূর্ণ সর্বনাশ ঘটে'। মিঃ হারউড এই আশা ব্যক্ত করেন যে যেহেতু শস্য 'ঘাটতি বা মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি', তাই 'এই বিপর্যয় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে'।

১৭৭০ সনের, ৩রা মের আলোচনা—পাটনা হতে মিঃ আলেকজাণ্ডার জানি-য়েছেন যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেড়েছে এবং মারাত্মক পরিণতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেনাবাহিনীর খাদ্য সরবরাহের কারণে অধিবাসীদের উপর চাপ বেড়েছে।

প্রত্যুত্তরে কমিটি জানিয়েছেন, 'আপনি যখন মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের উপদ্রবে পীড়িত তখন আপনার প্রতিবেশীরা প্রায় প্রাচুর্যময় এক মরশুম উপভোগ করছেন—এই বিপরীত চিত্র ইংরেজ নীতির পক্ষে সম্মানহানিকর। আপনার সতর্কতা ও সক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু এই দেশের সরকার দরিদ্রদের নিরাপত্তার জন্য এত কম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যে এইসব বিপর্যয় রোধে অসাধারণ প্রয়াস না নিয়ে এইগুলি সবসময়েই চরমতম দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়'।

১৭৭০ সনের ৯ জুনের আলোচনা—দরবারের প্রতিনিধি জানান : 'অব্যাহত দুর্দশার চিত্র বর্ণনাতীতরূপে মানবতাকে আঘাত করে। এইটা নিশ্চিত যে কয়েকটি অঞ্চলে লোকে শবদেহ ভক্ষণ করেছে এবং এই কয়েকটি মাত্র মাসে প্রদেশের

দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে চলেছে। চাউলের দর টাকায় ৬-৭ সের, এবং সম্প্রতি বেশ কয়েকদিন এক দানা শস্যও কেনা যায়নি। এমনকি কোম্পানির উপর প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভরশীল লোকজনদেরও বাখরগঞ্জ থেকে সরবরাহ না এলে অনশনে থাকতে হতো। এখন প্রচুর বৃষ্টি, কিন্তু অতিবৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই আশঙ্কার কারণে এবং চাষী গবাদি পশু এবং বীজধানের অভাবে কৃষিকর্ম হ্রাস পাওয়ার ফলে আসন্ন বৎসরের আদায়ের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়।

১৭৭০ সনের ১৯ জুলাইয়ের আলোচনা—দরবারের প্রতিনিধি জানান: বর্তমান দুর্দশা বিগত প্রতিবেদনগুলিকে ম্লান করে দিয়েছে। নগরীর ৩০ মাইলের মধ্যে, চাউলের দর টাকায় ৩ সের, অন্যান্য শস্যের দরও একই অনুপাতে, এবং এমনকি এত চড়া দরেও অধিবাসীদের অর্ধাংশেরও প্রাত্যহিক খাদ্য সরবরাহের পক্ষে যথেষ্ট নয়; একমাত্র মুর্শিদাবাদ নগরীতেই প্রতিদিন ৫ শত ব্যক্তি খাদ্যাভাবে মারা যাচ্ছে এবং সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে মৃতের সংখ্যা অবিশ্বাস্য। 'এই মারাত্মক বিপর্যয় উপশমে (দেশীয়) মন্ত্রীদের ও আমার পক্ষ হতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আসন্ন ফসলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং উত্তরে ও পুবের অধিবাসীদের দুর্দশা বিগত দিনের তুলনায় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। আমাদের আশা এক মাসের মধ্যে নতুন ফসলের সহায়তায় বর্তমানে দুর্দশার উপশম ঘটবে, অবশ্য যদি জনগণ ফসল সংগ্রহে সমর্থ হয়; কিন্তু ইতিমধ্যে এই বিশাল সংখ্যক মানুষ মারা যাবে এবং আমার চারপাশের মৃতপ্রায় জনসাধারণের অবস্থা মানুষ হিসাবে আমার অনুভূতি ও মানবতাকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছে এবং কোম্পানির কর্মচারি হিসাবে রাজস্বের ক্ষেত্রে এর পরিণতি সম্বন্ধে আমাকে শঙ্কিত করেছে।

১৭৭১ সনের ১ ফেব্রুয়ারি—গোপন আলোচনা—কমিটির টীকা—'বাখরগঞ্জের চাউল বিক্রয়ে ৬৭,৫৯৩ টাকা লাভ হয়েছে, মুর্শিদাবাদ ট্রেজারি হতে অগ্রিম হিসাবে নেওয়া ১২৪,৮০৬ টাকা বাদ দিলে কোম্পানির খরচ হিসাবে ৫৯,৬১১ টাকা বাকি থাকে অর্থাৎ প্রাথমিক জমা ছাড়া মাত্র ১৬,৯১১ টাকা থাকে। নবাবের প্রথম দান কোম্পানির থেকে বেশি ছিল। তিনি ও তাঁর মন্ত্রীরা উদারতা দেখিয়েছেন। আরো টাকার জন্য তাদের বলা উচিত হবে না।'

দরবারের প্রতিনিধি, মিঃ বেচার জানিয়েছেন (২৪ ডিসেম্বর ১৭৭০)—'অত্যন্ত সংকট মুহূর্তে এই চাউল আসে এবং আমি সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করি যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোম্পানির বেশ ভালো:রকম লাভ (অর্থাৎ প্রায় ৭ হাজার পাউণ্ড) হয়েছে; এই ব্যবস্থার ফলে এইখানের ইংরেজদের উপর প্রত্যক্ষ-ভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সাধারণ ত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছে এবং এই প্রকার দুর্দশা ও অভাবের সময় সামরিক বাহিনীতে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষায় সহায়তা করেছে; আমি নিশ্চিত যে গুদাম হতে চাউল সরবরাহ করার নির্দেশ দিতে আমি সক্ষম না হলে চরমতম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো। এখন আমি ভদ্রমহোদয়গণ,

মুর্শিদাবাদ নগরীতে ও সন্নিহিত অঞ্চলে সাম্প্রতিক মারাত্মক বিপর্যয়ের সময় যে অবস্থায় উপস্থিত বহুসংখ্যক হতভাগ্যদের মধ্যে চাউল বিতরিত হয়, তা উল্লেখ করবো। আমার আবেদনক্রমে কমিটি ৮৭ হাজার টাকা বিতরণের অনুমতি দেন, এবং ৪০ হাজার টাকার দায়ভার থাকবে কোম্পানির ও বাদবাকি ব্যয়ভার নবাব ও মন্ত্রীরা বহন করবেন, এবং তাঁরা এতে রাজী হয়েছেন।'

অতঃপর দেশীয় অভিজাতদের দানের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের অন্তিম মাসগুলিতে চাউলের মূল্য পাউণ্ড প্রতি ৪ পেনিতে ওঠে।

ষষ্ঠ ভাগ—দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গ পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে পরিচালক সভার অভিমত।

১৭৭১ সনের ২৮ আগস্টের পত্রে—দুর্দশা উপশমের জন্য যেসব ব্যক্তি প্রয়াস নিয়েছেন সাধারণভাবে তাঁদের প্রশংসা করার পর, যাঁরা ('বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী') এই সাধারণ দুর্দশার সুযোগকে ব্যক্তিগত লাভের উৎসে পরিণত করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সভা ক্রোধ প্রকাশ করেন।

অনুচ্ছেদ—১০—'মিঃ বেচার ও মহম্মদ রেজা খানের যে পত্রগুলিতে কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিদের গোমস্তাদের সম্পর্কে শুধু শস্য দখল করা নয়, এমনকি পরবর্তী বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় বীজধান বিক্রয় করতে দরিদ্র রায়তদের বাধ্য করার অভিযোগ আনা হয়,তা বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। উপরোক্ত পত্রের ভিত্তিতে, আশু পদক্ষেপ হিসাবে এই প্রকার হীন বিনিময়ে সক্ষম ব্যক্তিদের নামধাম সম্পর্কে কঠোর তদন্ত এবং কোম্পানির মহানুভবতার সুযোগ গ্রহণে সাহসী ও বর্ণনাতীত দুঃখ-কাতর মরণাপন্ন হতভাগ্য দেশবাসীর সর্বজনীন দুর্দশা হতে লাভ আদায় করতে উৎসুক এই সকল দুষ্কৃতকারীদের কঠোরতম সাজা দেওয়া হয়েছে প্রত্যাশা করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

অনুচ্ছেদ ১১—'এই প্রকার সাধারণ দায়িত্ব দেওয়ার পর মিঃ বেচার বা মহম্মদ রেজা খান কেউই একটি মাত্র নামও নির্দিষ্টভাবে পাঠান নি, অর্থাৎ এই ব্যাপার সম্বন্ধে আদৌ কোনো তদন্তে আপনারা যান নি, এইটা লক্ষ্য করে আমরা যে কি পরিমাণে বিস্মিত হয়েছি তা আপনারা উপরোক্ত বক্তব্য হতে বুঝবেন! এই ছাড়াও আরো একটি ব্যাপার আমাদের সমান বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য লেগেছে—আপনারা দরবারের প্রতিনিধিকে সাধারণভাবে বলেছেন যে, এই অনটনের সময়ে দরিদ্রদের দুর্দশা লাঘবের জন্য প্রতিটি ব্যবস্থায় আপনাদের সহমতির উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যে তিনি যে একটি

মাত্র বিশেষ প্রতিকার নির্দেশিত ও সুপারিশ করেন তা আপনারা বাতিল করেন!...যেহেতু অভিযোগের অংশবিশেষ এইটা যে রায়তরা এই সকল এক-চেটিয়া কারবারি ইয়োরোপিয়দের নিকট তাদের চাউল বিক্রয়ে বাধ্য হয়, সুতরাং এই সকল ব্যক্তি যে আমাদের কাজে উচ্চ পদাধিকারী, সেই সন্দেহের যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে; অন্যথায় তারা তাদের এই সকল কার্য সম্বন্ধে তদন্ত বন্ধ করার মতো যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে অনুমান করত না বলেই আমাদের আশঙ্কা।

পরিশিষ্ট - ৩

বীরভূম সম্বন্ধে কুকের বিবরণী

(সন ১৭৮৫ - ১৮২০)

রামগুলাম বাবুর্চি, বয়স ৮০ - তার কাহিনী

(প্রায়শ ব্যবহৃত 'সাহেব' শব্দটি দেশীয়রা ইংরেজদের সম্বন্ধে সম্মানসূচক পদ হিসাবে ব্যবহার করত।)

বীরভূমের প্রথম ইংরেজ শাসক ছিলেন কিটিং সাহেব; আমার বাবা ছিলেন তার বাবুর্চি, আর আমি তাঁকে দেখেছি। সিপাহি আর হাতিদের সাথে তিনি যখন যেতেন, আমার মা তাঁকে দেখাবার জন্য আমায কোলে তুলে ধরতেন। এইটা ছিল বীরভূমের রাজাদের আমল। তাঁদের খুব নামডাক ছিল; তাঁদের ঘোড়া, হাতি ও সেনাদল ছিল, এইসব দিয়ে তাঁরা শিকার করতেন। রাজনগরে তাঁদের প্রাসাদ ছিল, আর ছিল এক বাগান; এইখানেই তাঁদের কবর ছিল - সেইসব এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। তাছাড়াও পশ্চিমের পাহাড়ে বহু দুর্গ ছিল, আর হোসেনাবাদে ছিল এক গ্রীষ্মাবাস; কিন্তু এসবগুলির দেওয়াল এখন মাটিতে ধ্বসে পড়েছে, আর তাদের গ্রীষ্মাবাস এখন জেলাশাসকের বাংলোর পেছনে সবুজ ছোট এক মাটির ঢিবি হিসাবে পরিচিত। বাবার কাছে শুনেছি যে, হুজুর বাহাদুর কিটিং সাহেব ছিলেন খুব বড় সাহেব; আমি ছোট ছিলাম - তাই জানিনা। বাবা ছিলেন অতিবৃদ্ধ; তিনি প্রায়ই বলতেন যে সাহেবরা যখন এদেশে আসে, তখন সবে তাঁর বিয়ে হয়েছে এবং শীঘ্রই চাউলের দাম বেড়ে টাকায় ৩ সের (অর্থাৎ ১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষের সময়) দাঁড়ায়; সুতরাং সব লোক মারা যায় এবং দেশ জঙ্গলে পরিণত হয়। তিনি আমায় আরো বলেন যে, পশ্চিম হতে মারাঠারা (বর্গী) আসে, তারা বহু শহর জ্বালিয়ে দেয়, বহু লোককে হত্যা করে। তারা আমার বাবাকে ধরে, হাত বেঁধে ফেলে ঘোড়ায় তুলে ক্রীতদাস হিসাবে শিবিরে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার পিসিমা সর্দারদের কাছে দয়াভিক্ষা করে বাবাকে ছাড়িয়ে আনেন। কিটিং সাহেবেরও পক্ষে ছিলেন হেসেলরিগ সাহেব ও পাই সাহেব; কিন্তু পাইসাহেব বহু দূরে বাস করতেন, আর হেসেলরিগ সাহেব এসে জঙ্গল কাটার পর আবার ধান বোনে।

প্রথমে যে সাহেবের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি হলেন ব্রুক জজ-সাহেব। এখন যেখানে জজ সাহেবের কুঠি তার নিকটেই ছিল তাঁর কুঠি। আমার কাকা ব্রুক সাহেবের কুঠিতে বাবুর্চি ছিলেন, এবং আমার সবচেয়ে পুরানো স্মৃতি হলো, ব্রুক মেমসাহেব বারান্দায় পায়চারি করতে করতে কাঁদছেন, কারণ তাঁর মেয়ে মারা গেছে। সে যে কিভাবে মারা যায়, আমার মনে নেই; কিন্তু আমার মনে আছে যে সাহেব ও মেমসাহেব মিলে তাকে কবর দেওয়া দেখার জন্য আমার কাকা আমায় কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেইখানে অন্যান্য সাহেবরাও ছিলেন; কিন্তু চিপ সাহেবের বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সাহেব সুরুল গিয়েছিলেন। বাগানের প্রান্তে এক তেঁতুল গাছের নিচে বাচ্চা মেয়েটিকে কবর দেওয়া হয়: তার ওপর এক শাদা পাথর বসানো হয়, সেই পাথর আজও রয়েছে।

আমি চিপ সাহেবকেও চিনতাম। কিটিং সাহেব চলে যাওয়ার পর বাবা সেখানে বাবুর্চি হয়ে যান। চিপ সাহেব ছিলেন কোম্পানির কারবারি (বাণিজ্যিক প্রতিনিধি)। পাহাড়ের ওপরে তাঁর ছিল মস্ত কুঠি, কলকাতার দুর্গপ্রাকারের চেয়েও উঁচু প্রাচীর দিয়ে তাঁর কুঠি ঘেরা ছিল। প্রাচীরের মধ্যে ছিল ফুল-বাগিচা, ফলের বাগান, গাছে অনেক ফল ধরত; তাছাড়া ছিল অনেক বাড়ি ও গুদাম। কোম্পানির কাপড় সেইখানে রাখা হতো, প্রাচীরের মধ্যে এক গ্রামে গোমস্তারা আর কেরানিরা বাস করত। কোম্পানির গুদামগুলি রক্ষার জন্য সিপাহিরাও ছিল; আর কোম্পানির নিম্নপদস্থ কর্মচারিরা পাহাড়ের নিচে এক শহরে বাস করত। চিপ সাহেব ছিলেন ধনী ও ক্ষমতাবান; তাঁর অনেকগুলি সন্তান ছিল, অধিকাংশই মেয়ে, প্রত্যেকের জন্য আলাদা চাকর ছিল। চিপ সাহেব ও মেমসাহেবের জন্য ৬ জন খানসামা ছিল। তাঁর সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ জন গৃহভৃত্য ছিল, ছিল অনেক ঘোড়া, আর ছিল এক পক্ষীশালা, সেইখানে অদ্ভুত সব পাখি ছিল। বাগানে হরিণ ছুটে বেড়াত। মেমসাহেবের খুব ফুলের শখ ছিল। তিনি ছিলেন মস্ত সাহেব; তাঁর রান্নাঘরেই আমি কাজ শিখেছি।

পরে, নদীর ধারে ইলামবাজারে ছিলেন এরস্কিন সাহেব, তাঁর মারা যাওয়া খুব বেশি দিন আগের ব্যাপার নয়। তিনিও ছিলেন বড় সাহেব, তিনি চিপ-সাহেবের ব্যবসার অংশীদার ছিলেন। কাপড়, চিনি, রেশম, লাক্ষা—এইসব বহু জিনিস নিয়ে তাঁর ব্যবসা ছিল ও তিনি বহু টাকা করেছিলেন। চিপ সাহেবের কুঠিতে কাজ শেখার পর এরস্কিন সাহেবের বাবুর্চি অসুস্থ থাকায় আমাকে ইলাম-বাজারে বাবুর্চি হিসাবে পাঠানো হয়; কিন্তু ইলামবাজারের কুঠির রান্নাঘর চিপ-সাহেবের কুঠির মতো এত বড় ছিল না।

আমি সুরুল ও ইলামবাজারের থাকার সময় বহু সাহেব সিউড়িতে আসেন ও চলে যান। আমি তাঁদের বাবুর্চি ছিলাম না, কাজেই তাঁদের জানি না। কেবল

সাহেব, টিক্‌রি সাহেব, চলব্লান সাহেব, রেইলি সাহেব ১২ বছর যিনি ছিলেন, সেই মরিসন সাহেব, বিস্কো সাহেব—এঁদের নাম আমার মনে আছে। এই সাহেবদের আমি চিনতাম না। (কয়েকটি নাম এত অদ্ভুত যে সেইগুলি আমার বোধগম্য হয়নি !)

সব জিনিসই ছিল শস্তা, দেড় পয়সায় (আধ পেনি), এক বড় ভোজ (বড়া খানা) দেওয়া হতো (এইটা আলংকারিক অর্থে, কিন্তু পরবর্তী অংশ সত্য)। পুষ্ট মুরগি টাকায় (অর্থাৎ দুই শিলিং-এ) ৩২ টি, কচি মুরগি ৪০ থেকে ৫০ টি, হাঁস ১৬ থেকে ২৫ টি, ছোট ভেড়া তিন আনা (সাড়ে চার পেনি), পুষ্ট ভেড়া ছয় আনা (নয় পেনি), চাউল টাকায় ৬০ থেকে ১০০ পাউণ্ড। সমস্ত জিনিসেরই দাম কম ছিল। চাকরদের বেতন ভালো ছিল। প্রধান বাবুর্চি হিসাবে আমার বাবা ২০ টাকা বেতন পেতেন ; খানসামাদের বেতন ছিল ৮ টাকা ; কুলিরা দৈনিক ৪ থেকে ৭ পয়সা পেত, কিন্তু তারা তাদের টাকায় বেশি খাদ্য কিনতে পারত এবং আরো ভালো থাকত। সাঁওতালরা কাজের সন্ধানে তখন সমতলে নেমে আসত না এবং বাউড়ি ও হাড়িদের জন্য যথেষ্ট কাজ ছিল। সাঁওতালরা তখন জেলার পশ্চিমে পাহাড়ের নিচের জঙ্গল কাটছিল ; এখন তারা সারা জেলায় কাজ করে। গরিব লোকদের কোনো টাকা ছিল না ; তারা সর্বদা কড়ি দিয়ে কেনাবেচা করত। একজন কুলি সারা দিনের কাজের জন্য ৪ থেকে ৬ পণ (৩২০ থেকে ৪৮০) কড়ি পেত (১১/২ থেকে ৩ পনি)। অধিবাসীর সংখ্যা ছিল খুব কম। চাষীদের অধিকাংশই নিজের জোত ছিল, কিন্তু এছাড়া তাদের কাজ করবার জন্য কিছু কিষাণও ছিল। জোতদার জমি, বীজধান, হাল-বলদ দিত ও উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পেত ; কিষান শুধু শ্রম দিত ও উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ পেত। এইভাবেই তারা জঙ্গলের জমি চাষ করত। পাহাড় হতে কাজের জন্য সাঁওতাল ও পাহাড়িয়ারা নেমে আসায়, কিষানদের সংখ্যা বাড়লো। এখন তারা সমগ্র জেলায় রয়েছে ও বহু অঞ্চলে কিষানদের হাল ও বলদ দিতে হয় এবং কোনো মতে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ পায়। তাদের কপাল খারাপ হচ্ছে। সমস্ত কৃষিজীবী শ্রেণীই সচরাচর জমি পেতে পারত ; কিন্তু এখন তারা কিষান হিসাবেও জমি পায় না এবং ভাড়াটে মজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়।

আমার ছেলেবেলায়, অফিস-কাছারি লালকুঠি পাড়ায় ছিল—এখন যেখানে পাদরি সাহেবের বাস। খুব কম সাহেবই তখন বাইরে থাকতেন। শুধু জেলা-শাসক, জজসাহেব, ছোটসাহেব ও ডাক্তার সাহেব ছিলেন। আর কারো কথা আমার মনে নেই। সাত বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়, কিন্তু আমার স্ত্রীর বাবা-মা তাকে গৌরীতে (কৃষ্ণনগর) নিয়ে যান এবং আমার ২০ বছর বয়সের আগে আমি আর তাকে দেখিনি। আমার ২০ বছর বয়সে ছোট সাহেব ক্লার্ক সাহে-

বের কাছে আমি প্রথম স্থায়ী চাকরি পাই। তিনি পুলিশ লাইনে (সেনানিবাস) আনন্দপুর ভবনে বাস করতেন ; এই বাড়ি এখন ভেঙ্গে পড়েছে। তখন, সামান্যই রাস্তা ছিল—এক কুঠি হতে অন্য কুঠি পর্যন্ত। ক্লার্কসাহেব গৌরীতে বদলি হয়ে গেলে আমি তাঁর সাথে গিয়েছিলাম। ক্লার্কসাহেব আমাদের আগে পালকিতে যান ; মালপত্তর নিয়ে আমি ও অন্যান্য চাকররা পিছনে পিছনে যাই। আমাদের সাথে সিপাই ছিল। মালপত্র অংশত গোরুর গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলেও, রাস্তা দুর্গম হাওয়ায় প্রধানত মানুষের পিঠেই যায়। লামপুর (বর্তমান লাভপুর) ও কিরিনাহার (বর্তমান কীর্ণাহার) হয়ে আমরা কাটোয়া যাই, তারপর মালপত্র নৌকোতে চাপিয়ে অবশেষে কৃষ্ণনগর পৌঁছাই। আমার মনে আছে, আমাদের ১৬ দিন লাগে। ঐদিকে তখন কোনো সরকারি পথ ছিল না, কিন্তু জমিদাররা প্রত্যেকে নিজের নিজের জমিদারিতে পথ বের করে দেন। আমাদের যাত্রাকালে চৌকিদাররা সারা পথ ছোট সাহেবের মালপত্র রক্ষা করতে হাজির ছিল।

(কয়েকটি বৈঠকে বৃদ্ধ লোকটির নিজের মুখে হিন্দুস্থানিতে কথিত উপরোক্ত বয়ান আমি লিখে নিয়েছিলাম. কিন্তু এই সময়ে তার কঠিন অসুখ হয় এবং আমার কাছে আবার আসার মতো সুস্থ হওয়ার আগেই আমি জেলা ত্যাগ করি। এইসব বর্ণনায় সঠিকতার সন্ধান করা অর্থহীন, কিন্তু অন্যান্য বৃদ্ধ অধিবাসীদের নিকট হতে আমি যেসব বর্ণনা পেয়েছি এইটি তার একটি ভালো নমুনা।)

ডবলিউ. ডবলিউ. হানটার

পরিশিষ্ট—৪

পণ্ডিতের বীরভূম বিবরণী

(স্থানীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও দেশীয় পারিবারিক নথিপত্র হতে নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলায় আমার জন্য লিখিত ।)

ভূ মি কা

কোনো প্রকার ইতিহাসগত সংশোধন করার প্রচেষ্টা ছাড়াই আমি এইটি ও বিষ্ণুপুরের অনুরূপ বিবরণী রাখছি । এইগুলি স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে দেশীয় পণ্ডিতদের ধারণার উত্তম নমুনা এবং অনুরূপ সকল রচনার মতোই এইখানেও আমাদের শাসনাধীন হওয়ার পূর্বে এই দেশের জনগণের অবস্থা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের অধিকার সম্বন্ধে মূল্যবান ইঙ্গিতসমূহ যত্রতত্র রয়েছে ।

জাতিবিদ্যার ছাত্রদের নিকট পরিশিষ্ট ৪ ও ৬-এর মতো পাণ্ডুলিপিগুলি চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হাজির করে : প্রথমত—আর্যরা বাংলায় আসার আগে পশু-পালক ও কৃষিজীবী সম্প্রদায় নিজেদের রাজাদের অধীনে এই দেশে বসবাস করত ; দ্বিতীয়ত—আর্যরা সবসময়ে বাংলা দেশে বিজয়ী হিসাবে নয় বরং বিভিন্ন ভূমিকায় স্থান লাভ করেছে ; তৃতীয়ত—সমগ্র বঙ্গব্যাপী আর্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহু আদিম রাজা নবাগতদের পাশাপাশি নিজেদের রাজ্য বজায় রাখেন এবং কখনো কখনো তাঁদের আদিবাসী সৈন্য সরবরাহ করেন ; চতুর্থত—উত্তর হতে বহিরাগতদের একের পর এক ধাক্কায় এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমশ বাংলায় আর্য উপনিবেশ স্থাপন ঘটেছে এবং আর্য ভাষা ও আর্য ধর্মকে প্রভাবিত করা কালে আদিবাসীদের যথেষ্ট দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং পরিশেষে তারা চূড়ান্তভাবে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে বা নিম্নভূমি হতে বিতাড়িত হয়েছে ।

পণ্ডিতের বিবরণী

পুরাণের ভৌগোলিক বিবরণ অনুসারে, পুণ্ড্রদেশের সীমান্ত বাংলার দক্ষিণে এসে মিশেছে এবং বর্তমান বাংলার বীরভূম, জঙ্গলমহল, বর্ধমান, রাজমহল,

মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ দিনাজপুর, মেদিনীপুর, নদীয়া ও নবদ্বীপ এই দেশের অন্তর্গত ছিল। এই দেশের নামের কারণে এইখানের অধিবাসীরা পুরাকালে পুণ্ডারি নামে অভিহিত ছিল।

আদিশ্বর কর্তৃক এই দেশে আনীত পাঁচ ব্রাহ্মণের বংশধরদের গৌড়ের রাজা বল্লাল সেন দুই ভাগে ভাগ করেন—বারেন্দ্র ও রাঢ়ী—উভয়েই কুলীন ছিল। রাঢ়ীরা বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়াতে বসবাস করতো, এইখানে ভবানন্দ সেন এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। সেন পরিবারে বা পালদের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরের আদি রাজারা পার্বত্যাঞ্চলে এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আদিশ্বরের বংশধরগণ কর্তৃক স্থাপিত স্বতন্ত্র রাজ্যগুলি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক রাজা যথেষ্ট তেজস্বীতার সাথে আপন রাজ্য শাসন করতেন; এবং অনুগত আমির ওমরাহদের নিপীড়ন না করলেও তাদের উপর তাঁর অখণ্ড প্রতাপ ছিল।

বীরভূম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। বলা হয় যে, একদা তাঁর শিক্ষিত বাজপাখিদের সহায়তায় শিকারের জন্য বিষ্ণুপুরের রাজা রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চলে যান। একটি সারস পাখির পশ্চাদ্ধাবনে একটি বাজপাখিকে তিনি ইঙ্গিত করেন, তখন সচরাচর বাজপাখি দিয়ে এইগুলি শিকার করা হতো। সারসটি প্রচণ্ড বিক্রমে অনুসরণকারী বাজটিকে আক্রমণ করে ও বিজয়ী হয়। অস্বাভাবিক এই ঘটনায় রাজা বিস্মিত হন। তিনি ভাবেন যে নিশ্চিতভাবে মাটির কোনো রহস্যজনক গুণের কারণে এইটা সম্ভব হয়েছে; অর্থাৎ এইখানের মাটিই বীর-মাটি এবং এই মৃত্তিকাজাত যে কোনো বস্তুই বীরত্ব ও শক্তিমণ্ডিত হবে। সেই কারণে তিনি এইখানের নামকরণ করেন বীরভূমি, তারপর হতে সর্বদা এই পার্বত্যাঞ্চল ঐ নামেই পরিচিত হয়েছে। অন্যেরা, অবশ্য ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে এই নামের ব্যুৎপত্তি করেছে, কারণ পুরাকালে এই অঞ্চল বহু বীরের জন্ম দিয়েছে,সেই কারণে এর নাম হয়েছে বীর-ভূমি (বীরভূম), অর্থাৎ বীরদের দেশ।[১] সিউড়ি, জেলার বর্তমান রাজধানী, নামটি শৌর্য শব্দের অপভ্রংশ।

বীরভূমের উত্তর সীমান্তে মুঙ্গের ও রাজমহল, দক্ষিণে বর্ধমান ও পাঞ্চেৎ (বাঁকুড়া), পূবে রাজশাহি ও পশ্চিমে মুঙ্গের ও পাঞ্চেৎ। মুসলিম শাসনকালে, আবুল ফজল এই দেশের নাম দেন 'মাদারান'। প্রাচীনকালে এইখানে জলাভাব থাকায় ও এক বিশাল অংশ জঙ্গল আবৃত থাকায় এই অঞ্চল বহুলাংশে কৃষির অনুপযোগী ছিল।

বীরভূম মুসলিম শাসনাধীন থাকাকালে প্রায়শই 'ঝাড়ভূক্তি' পাহাড়িয়া উপজাতি দ্বারা লুণ্ঠিত হতো। এই লুণ্ঠন কার্য বন্ধ করার জন্য শেরশাহ বদরুল্লার পুত্র আত্তুলাকে সিউড়ি অর্পণ করেন। ১৫৪০ সনে ২ লক্ষ আফগান সেনার সহায়তায় শেরশাহ কান্যকুব্জে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন ও দিল্লির মসনদ দখল

করেন। পরের বছর তিনি গৌড়ে আসেন এবং এইটিকে কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত করেন ও প্রত্যেক রাজ্যে একজন করে শাসক নির্দিষ্ট করেন। এদের ওপরে ছিলেন একজন উর্ধ্বতন শাসক; তিনি এদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করতেন ও শেরশাহের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতেন।

সিউড়ির পূবে রয়েছে 'আক-চোকরা' গ্রাম; কথিত আছে যে জতুগৃহ হতে পলায়নের পর পাণ্ডবরা এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইস্থানে ভীম হিড়ম্বককে হত্যা করেন (সম্ভবত বাংলায় আর্য বিজয়ের এক কিংবদন্তি), এবং তার বোন হিড়িম্বাকে বিবাহ করে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র লাভ করেন—মহাভারত অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কোনো কোনো বিবরণ অনুসারে কথিত যে নিমাই, ঘোড়াদহ, গুন্টিয়া ও কোটেশ্বর গ্রামগুলি আক্‌চোকরার অন্তর্গত ছিল এবং স্ত্রী ও মাতা সহ ভীম এইখানে বসবাস করতেন। বীরভূমে দেওঘর নামে এক জায়গা আছে; এইখানে সিংহল যাওয়ার পথে রাম শিবকে রেখে যান। বক্রেশ্বর নামে খ্যাত আর একটি শিব এক গ্রামে স্থাপিত হন, দেবতার নামানুসারে পরবর্তীকালে ঐ স্থানের নামকরণ হয় এবং আজও বহু ভক্ত প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে সেইখানে পূজা দিতে যায়। বৈদ্য পরিবারের রাজত্বকালে ইতিহাসে একমাত্র বিষ্ণুপুরের ও বর্ধমানের রাজার নাম ছিল। লাওসান, ইছাই ঘোষ, মুঙ্গাই, গিধোড় (মনে হয় কয়েকজন আদিবাসী রাজা), মল্লার সিং ও বীর সিং—বীরভূমের এইসব রাজাদের সম্বন্ধে নামটুকু ছাড়া আমরা বিশেষ কিছু জানি না।

বীরভূমের পাহাড়গুলি অসভ্য উপজাতি অধ্যুষিত ছিল এবং ছোট রাজারা উপান্তে বসবাস করত। বীর সিং ও চৈতন্য সিং নামে দুই ভাই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হতে বীরভূমে আসে পাহাড়িয়াদের দমন করে এবং যে স্থানে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে সেইগুলি আজও তাদের নাম বীরসিংপুর, চৈতাঙ্গপুর ও চৈতাঙ্গা—বহন করে। বীরসিংহের ভাই হিসাবে পরিচিত ফতে সিং মুর্শিদাবাদের বহু অঞ্চল দখল করে; এইসব অঞ্চল আজও তার নামানুসারে ফতেপুর পরগনা নামে পরিচিত ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত।

বীরসিং বীরভূমের প্রথম (হিন্দু) রাজা। তিনি ছিলেন শক্ত সমর্থ এবং নিজ ক্ষমতাবলে তিনি জঙ্গলের অধিবাসীদের দমন করেন ও এইভাবে নিজ রাজত্ব বিস্তৃত করেন। ভাইকে তাঁর রাজ্য হতে বঞ্চিত করে তিনি বীরসিংপুরে নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। বহু রাজা ও জমিদার তাঁর ক্ষমতা স্বীকার করে তাঁকে সম্রাট হিসাবে মেনে নেন। সিউড়ি হতে ৬ মাইল পশ্চিমে আজও তাঁর প্রাসাদ, দুর্গ ও পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন; এবং শত্রুদ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে তাঁর রাণী এক পুষ্করিণীতে আত্মহত্যা করেন—এই স্থান আজও রানীদহ (রাণীর পুকুর) নামে পরিচিত।

বীরসিং দেবী কালীকে এক মন্দির উৎসর্গ করে এক প্রস্তর-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংপুরের সন্নিকটে রাজা এক গোপাল মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন; এবং চতুর্দিক জঙ্গলাবৃত থাকায় ঐ স্থান বৃন্দাবন নাম লাভ করে।

ভীল, কোল, গোণ্ডা ও অন্যান্য পাহাড়িয়া উপজাতিগুলি (আদিবাসী) মগধরাজ্যে (বিহার ও বাংলা) বাস করত। এবং বীরভূম ও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্যের পরিধি বিশাল হলেও সুশাসিত ছিল না বলে মনে হয়, কারণ রাজধানীর অতি নিকটস্থ জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই কর দিত না (অর্থাৎ আর্যবিজয় আংশিক ছিল)। ভালো ক্রীড়াবিদ হওয়ার কারণে একজন রাজকে কর দিতে হতো না। মগধ সাম্রাজ্যের পতনের পর পালরাজারা সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করেন, তাদের আদি নিবাস ছিল বিহার। পালদের পর বৈদ্য রাজবংশ আসে।

বীরভূমের সাঁওতালরা দুমকা, জলঝারি ও কুমারাবাদের পাহাড়ে বাস করতো। তাদের দেবতা ছিল বোরাম (মারাংবুরু); এঁর কাছে নরবলি দিত। কিন্তু দেশে মহামারীর পর এই প্রথা বন্ধ হয় এবং পরিবর্তে ছাগল, শূকর ও অন্যান্য জন্তু বলি দেওয়া হতো। বোয়ালিয়া নামে আর একটি উপজাতি এই একই দেবতার পূজা করতো। রাজা কীর্তিচন্দ্রের আমলে তাদের কিছু লোক বর্ধমানে বাস করতো এবং তাঁর কুলি হিসাবে কাজ করতো। বর্ধমান ও কলিকাতায় তারা এই পেশায় নিযুক্ত। বীরভূমের উত্তর-পশ্চিমের জঙ্গলে বীরপোর নামক এক বন্য উপজাতির বাস, তারা গাছের বাকল হতে প্রস্তুত দড়ি বিক্রয় করে জীবিকার্জন করে। তারা বাঁদর কুকুর ও শুয়োরের মাংস খায় এবং হাতির পূজা করে। নিম্নভূমির আদিবাসীদের নিকট জঙ্গলের বন্য জন্তু ও এই বন্য জাতিগুলি ছিল অব্যাহত আতঙ্কের উৎস। কিন্তু যেহেতু এই অঞ্চলজাত বীরদের (হিন্দু) রাজারা সচরাচর চাকুরিতে নিয়োগ করতো, সেই কারণেই এইখানের অধিবাসীদের (বন্য উপজাতিদের) নিঃশেষ করা হয়নি।

অনেকে বলেন যে, আলি নকি খানের পূর্বপুরুষরা বীর রাজাকে হত্যা করে রাজনগর দখল করেন; কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বর্ণনার আগে, রাজনগর প্রতিষ্ঠার সময় সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। মনে হয় যে, নগর রাজত্ব মুসলমান আমলে নয় বৈদ্য বংশের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়; কারণ দেখা যায় যে মুসলমানরা বাংলার মসনদ দখল করার পর সুবাদার গৌড়ের দেবকুঠি হতে বীরভূমের প্রধান শহর নগর পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করেন এইটি ১২০৫ সনের ঘটনা।

বীররাজা এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারজাত। তিনি নগরে আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজ শৌর্য ও অস্ত্র দক্ষতার জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী খ্যাতি অর্জন করেন। পাঠানরা ক্ষমতার তুঙ্গে থাকাকালীন বাংলার বহু সমৃদ্ধ প্রদেশকে যখন

শ্মশানে পরিণত করেছিল তখন বীররাজা অবিচল প্রতিরোধ করেন এবং নিজ সামরিক কৌশল বিশিষ্ট সাহস দ্বারা অত্যাচারীদের হাত হতে দেশকে মুক্ত করতে সফল হন।

আসাদুল্লা খান ও জোনেত খান নামক উত্তর-পশ্চিমের দুই পাঠান একদিন নগরের রাজার সমীপে হাজির হয়। তাদের শারীরিক গঠন ও পুরুষোচিত চেহারা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাদের ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজ বাহিনীতে তাদের গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। তাদের শৌর্য যথেষ্ট প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি তাদের সেনাধ্যক্ষ ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর পদে উন্নীত করেন। তাদের প্রশাসনে দেশের বিরাট ও দ্রুত অগ্রগতি ঘটে এবং জনগণ শান্তি উপভোগ করে। কিন্তু কালক্রমে, পাঠানরা প্রভুর ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হয় এবং ধ্বংসের জন্য সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে। এদের একজন, আসাদুল্লা রাণীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় এবং তাদের হীন সংক্রান্ত সহায়তার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করে। কথিত যে, রাজা কুস্তি করতে ভালোবাসতেন এবং এর জন্য স্বতন্ত্রভাবে এক বিশেষ ভবন রেখেছিলেন, প্রতিদিন তিনি এইখানে লড়তেন। এক-দিন আসাদুল্লা সেইখানে হাজির হলে রাজা প্রবেশানুমতি দিতে অস্বীকার করেন। আসাদুল্লা এতে ক্রুদ্ধ হয়। সে তার ভাই জোনেত সহ ফিরে আসে, বলপূর্বক প্রবেশ করে এবং রাজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মারাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়; এবং কিভাবে এই যুদ্ধ শেষ হতো বলা শক্ত, কারণ জোনেত খানের সাথেও রাণীর প্রেম থাকায়, রাণীর প্ররোচনায় জোনেত খান উভয়কেই আক্রমণ করেন এবং সংগ্রামরত দুইজনকে এক কূপে নিক্ষেপ করেন রাজার ভৃত্য ও দেহরক্ষীরা উপ-স্থিত থাকা সত্ত্বেও, রাণীর উপস্থিতির কারণে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন; এইভাবে রাজা ও আসাদুল্লা উভয়েই ডুবে মারা যান। যে রাজার অধীনে এত দীর্ঘদিন জনগণ সুখ ও সমৃদ্ধি উপভোগ করেছে, সেই রাজার মৃত্যু জনগণকে শোকমগ্ন করে।

জোনেত খান—এরপর রাণী শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে জোনেত খানকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। পাঠানটির হাতে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। কিছু-দিনের মধ্যেই একমাত্র পুত্রকে সিংহাসনের আইনি উত্তরাধিকারী রেখে রাণী মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু পাঠানটি দ্রুত শৃংখলা ফিরিয়ে আনে। এই ঘটনার পর শীঘ্রই জোনেত খান মারা যায় ও শাসনভার বাহাদুর খানের হাতে যায়।

এঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে বলার আগে, পাঠান ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্ব ইতিহাস বিষয়ে কিছু তথ্য বলা যেতে পারে। তাদের শিশুকালে তাদের পিতা মারা যান এবং তাঁর বিধবার জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় থাকে না। একদিন, তিনি প্রতিবেশীদের নিকট অন্নভিক্ষায় যাওয়ার পর, তাঁর ঘরে এক ফকির উপস্থিত

হন এবং আপাত কোনো কারণ ছাড়াই, ভ্রাতৃদ্বয়ের একজনকে জুতাদ্বারা প্রচণ্ড প্রহার করেন। শিশুর আর্তনাদে শীঘ্রই মা হাজির হন; এবং ফকিরের নিকট জবাব দাবি করলে, ফকির তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে তিনি তাঁর পুত্রকে প্রহার করছিলেন না, আশীর্বাদ করছিলেন। এবং সেইদিন দূরে নয় যেদিন উভয় ভাই-ই বাংলার রাজদণ্ড নিয়ন্ত্রণ করবে। এই তরুণেরা, বয়ঃপ্রাপ্তির পর দূরদেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে এবং অস্ত্রশিক্ষায় নিজেদের সুশিক্ষিত করার জন্য প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। ভ্রমণকালে তারা বীরভূমে হাজির হয়; এবং সেই দেশে তাদের কীর্তিকাহিনী ও কিভাবে তারা রাজা হয়, আমরা ইতিমধ্যেই তা বর্ণনা করেছি।

বাহাদুর খান অথবা রণ-মস্ত খান (১৬০ -৫৯ খ্রীস্টাব্দ)—বাংলা ১°০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই রাজা তাঁর রাজত্ব শুরু করেন। তাঁর আমলে শান্তি বজায় থাকে, জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে, ও কৃষিকর্মে পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র খাজা কামাল খানকে সিংহাসন অর্পণ করে তিনি বাংলা ১০৬৬ সালে (১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ) মারা যান। রাজধানীকে সুন্দর করা ও রাজ্যব্যাপী কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজ ব্যতীত পরবর্তী এই রাজার কথা আর কিছু বর্ণিত নাই। বাংলা ১১০৪ সালে (১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে) তিনি মারা যান, এবং তাঁর পুত্র আসাদুল্লা অভিষিক্ত হন—ইনি ছিলেন তৎকালীন বিজ্ঞতম ও সবচেয়ে ধার্মিক রাজা। আসাদুল্লা সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং রাজধানীতে বহু সংখ্যক পুষ্করিণী খনন করেন—এর ফলে জলাভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়। তিনি নবাবকে কর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা হতে নিজ রাজ্যকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন ও যুদ্ধের সময় নবাবকে মূল্যবান সহায়তা করেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বহু মসজিদ উৎসর্গ করা হয় এবং ধর্মীয় উপাসনায় তাঁর বহু সময় অতিবাহিত হতো। বৈদ্য জামা ও আজমত খান নামে দুই পুত্র তিনি রেখে যান।

বৈদ্য জামা—১১২৫ সালে (১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে) এই রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খানের নিকট হতে সনদ লাভ করেন। প্রায় এই সময়েই নবাবকে দেয় কর সম্বন্ধে এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম হয় এবং ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা কর হিসাবে স্বীকার করা হয়। এই রাজত্বকালে, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে মারাঠারা পশ্চিমের দেশগুলিকে লুণ্ঠন করে ও পরিশেষে কেন্দুয়াডাঙ্গা বা গঞ্জ মুরসদ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। কিন্তু বর্ষা শুরু হওয়ায় তারা মীর হাবিব নামে এক পাঠানের সাথে কাটোয়ায় চলে যায়। বৈদ্য জামা, তার ভাই আলি নকি ও বর্ধমানের রাজার সাথে মিলিতভাবে মারাঠা বিতাড়নে নবাবকে সহায়তা করে ও তাদের মেদিনীপুরে বিতাড়ন করে। বৈদ্যর দুইটি পত্নী ছিল, তাঁর প্রথম স্ত্রীর ছিল দুই পুত্র, আহমদ জামা খান ও মহম্মদ আলি খান; দ্বিতীয় স্ত্রীর ছিল একটি পুত্র, অসদজামা খান। এই তিনটি ছাড়াও

তাঁর বাহাদুর জামা খান নামে অবৈধ পুত্র ছিল। আহমদের ছিল ধর্মীয় মানসিকতা এবং তিনি দেশের প্রশাসনে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ক্ষমতাবান রাজপুত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের সাহস ও অস্ত্রবিদ্যার জন্য উচ্চ খ্যাতি লাভ করেন। একবার সইফুল হক নামে উত্তর হতে এক ফকির বীরভূম রাজসভায় উপস্থিত হন ও কালক্রমে রাজার আস্থাভাজন হন। ফকিরের কোরান সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান ছিল এবং রাজা অধিকাংশ সময় কোরান পাঠে তার সাথে ব্যয় করতেন। কালক্রমে ধর্মীয় গুরুর সাথে তিনি এত মগ্ন হন যে রাজকার্য সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়; এবং তাঁর পুত্ররা আলি এবং আহমদ এই প্রিয় পাত্র হতে অব্যাহতির কাজে নিজেদের নিয়োগ করে। এই উদ্দেশ্যে তারা মুর্শিদাবাদ গমন করে। সেইখানে অবস্থানকালে এক ঘটনায় তাঁরা নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একদিন নবাবের হাতিকে জলপানের জন্য এক পুষ্করিণীতে নিয়ে যাওয়া হয়, আহমদ ঘটনাক্রমে সেইখানে উপস্থিত ছিল। পশুটি নিকটে এলে মাহুত রাজপুত্রকে পথ হতে সরে যেতে বলেন; কিন্তু এই নির্দেশ মান্য করার পরিবর্তে আহমদ শুঁড় ধরে হাতিটিকে দূরে নিক্ষেপ করে। এই ঘটনা পথচারীদের বিস্মিত করে এবং অচিরেই নবাবের কানে যায়; তিনি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁর সমীপে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। মুর্শিদাবাদে তাদের হঠাৎ উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা ফকিরের কাহিনী ও তাদের পিতার রাজ্যে সম্ভাব্য বিশৃংখলার আশংকা ব্যক্ত করে। নবাব তাদের ফকিরকে হত্যার অনুমতি দেন; এবং তদনুসারে ভ্রাতৃদ্বয় দ্রুত রাজনগরে প্রত্যাবর্তন করে ফকিরকে হত্যা করে। তাদের পিতা শোকাহত হন এবং ধীরে ধীরে শোকাভিভূত রাজা ভগ্ন হৃদয়ে মারা যান। তাঁর পুত্ররাও তাদের অপরাধের জন্য লজ্জিত হয় এবং পিতার নিকট কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ও কখনো সিংহাসনে আসীন হওয়ার আশা পোষণ না করার প্রতিজ্ঞা করে। তদনুসারে, তারা তাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসদকে আইনসংগত উত্তরাধিকারী হিসাবে সমর্থন করতে মনস্থ করে এই উদ্দেশ্যে তারা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করে এবং সমস্ত ঘটনাবলী নবাবকে জানায়। নবাব প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন ও বলেন যে ভ্রাতারা জীবিত থাকাকালীন কনিষ্ঠতমকে সিংহাসন অর্পণ আইনসিদ্ধ নয়; কিন্তু তাদের আন্তরিক আবেদনে তিনি অনুমতি দেন এবং তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর বিরাট আড়ম্বরসহ অসদজামার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় মুর্শিদাবাদ যায় ও নবাবের অধীনে কর্মরত থাকে। মারাঠাদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তারা খ্যাতিলাভ করে; এবং এক ঘটনায় মীরজাফর আলি খানের জামাতা বন্দী হয়ে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ হওয়ার পর তারা ছদ্মবেশে মারাঠাদের শিবিরে প্রবেশ করে এবং মারাঠাদের পরিকল্পনা গোপনে শুনে অসতর্ক মুহূর্তে তাদের আক্রমণ করে ও বন্দীকে মুক্ত করে বিজয়ী বীর হিসাবে

প্রত্যাবর্তন করে।

বাংলার নবাব হিসাবে সিরাজউদ্দৌলা পিতামহের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শীঘ্রই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধবার তাগিদ অনুভব করেন। এর জন্য দুইটি কারণ দেখানো হয়েছে : ক) নবাবের শত্রু কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা আশ্রয় দেয় এবং খ) নবাবের অনুমতি ছাড়াই নবাবের শাসনাধীন অঞ্চলে তারা দুর্গ স্থাপন করে। তদনুসারে নবাব শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং দেওয়ান মাণিক-চাঁদ, মোহনলাল ও জাফর আলি খানের সাথে একযোগে বীরভূমের আলি নকি খান ও আলি জামা খানকে সেনাপতিরূপে বরণ করেন। এরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলিকাতা অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করে ও বাগবাজারে শিবির স্থাপন করে। ইংরেজরা পলায়ন করে হাওড়া, বালী ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঝটিকা আক্র-মণে নবাব দুর্গ দখল করেন। দেওয়ান মাণিকচাঁদকে তিনি ইংরেজ বন্দীদের দায়িত্ব অর্পণ করে বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। দেওয়ান বন্দীদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন এবং তাদের সর্বমোট ১৪৬ জনকে অন্ধকূপে বন্ধ করে রাখেন ; সেইখান হতে মাত্র ১৩ জন জীবন্ত বেরিয়ে আসে। এইটি ১৭৫৬ সনের ঘটনা।

এই বিজয়ের পর বীরভূমের আলি নকি খান শত্রুরাজ্যের অংশ বিশেষ দখল করেন এবং সরকারের বর্তমান শাসনকেন্দ্র আলিপুরে পত্তন করেন। নবাবের অধীন সমস্ত অমাত্যদের মধ্যে এই ব্যক্তি ও তার ভাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী এবং নবাবকে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সহায়তা দান করতেন। একবার সিরাজউদ্দৌলা আলিকে বীরভূমের কোন রমণী সবচেয়ে সুন্দরী জিজ্ঞাসা করেন।[১] ক্রুদ্ধ পাঠান জবাব দেয় যে নিজের মা ও মায়ের কন্যাদের সাথে সাদৃশ্যসম্পন্না যে কোনো রমণীকেই তাঁর সুন্দর মনে হয়। এই বলে, সে তলোয়ার উঠিয়ে নবাবকে লক্ষ্য করে আঘাত করে ; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট এই আঘাত এক প্রস্তর খণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করে। প্রহরীরা এত হতচকিত হয়ে পড়ে যে নবাবকে রক্ষা করার কোনো প্রচেষ্টাই তারা নিতে পারে না। সম্ভবত পাঠানের প্রসিদ্ধ দুঃসাহস তাদের হস্তক্ষেপকে সংযত করারার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অবশ্য, কিছুদিনের জন্য ভ্রাতৃদ্বয় দরবার হতে নিজেদের সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয় ; পরবর্তীকালে নবাবকে তুষ্ট করার পর, তাদের প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তারা পুনরায় নবাবের প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন হয়।

বীরভূমের বদিয়াজামা খান রাজা গিধোর কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পর, আলি নকি খান পিতৃশত্রুদের বিরুদ্ধে নিজ সেনাদল পরিচালনা করেন এবং ৬ দিন ব্যাপী কঠোর সংঘর্ষের পর শত্রুদের রণক্ষেত্র হতে বিতাড়নে সফল হন। পাহাড়িয়া উপজাতিদের দমন করার পর দেওঘর শহর পাঠানের দখলে আসে। এই শহরে হিন্দু দেবতা বৈদ্যনাথের অধিষ্ঠান ছিল এবং আজও রয়েছে। ভক্তরা

প্রতিমাসে এই মন্দিরে আনুমানিক ৫০ হাজার টাকার বিভিন্ন মূল্যবান পূজা উপহার আনতো। পাণ্ডাদের হাতে দেবতার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আলি নকি খান তাদের নিকট হতে কর আদায় করতো। পাঠান তার এক পিসিকে বিবাহ করে ও তাদের এক পুত্র হয়, কিন্তু সে তরুণ অবস্থায় মারা যায়। তার মৃত্যুতে তার বাবা ও কাকা আহমদ জামা খান—উভয়ের মন ভেঙ্গে পড়ে; শেষোক্ত জন অবশেষে ১১৬৯ সালের ১৫ মাঘ (১৭৬২ খ্রীস্টাব্দ) আত্মহত্যা করে। এইসব কারণে পিতাও ক্রমাগত শোকমগ্ন হতে থাকে ও তার জীবনের অন্তিম দুইটি বৎসর অত্যন্ত দুর্দশায় কাটে। ১১৭১ সালের ২১ ফাল্গুন সে মারা যায় ও তার ভায়ের কবরের সামনে তাকে কবর দেওয়া হয়। উভয় ভ্রাতাই মহান গুণাবলীর অধিকারী ছিল। তারা ছিল ভদ্র, সাহসী, উদার ও ইন্দ্রিয়সুখে অনাগ্রহী। বদিয়াজামা খান ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনে জীবনের অধিকাংশ ব্যয় করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের মৃত্যুর জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করার পর অবশেষে ১১৭৮ সালে (১৭৭১ খ্রীস্টাব্দ) মারা যান। নগরের পশ্চিমে এক বাগানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে তাঁর জীবিত পুত্র অসদজামা খান সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা ও ভাইদের সম্মতি নিয়ে তিনি রাজধানীকে সজ্জিত করেন এবং বহু ধনী ব্যবসায়ীর সহায়তায় এর বাণিজ্যিক গুরুত্বের বিপুল বৃদ্ধি ঘটান। মীরজাফর আলি খান পুত্রের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন; সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর অতি শীঘ্র সে প্রজাদের নিপীড়ন করতে থাকে। নবাবের দুই কন্যাকে সে হত্যা করে; কিন্তু তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের সময় সহযোগীদের সাথে সে বজ্রপাতে নিহত হয়। বীরভূমের রাজা অসদজামা নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার এই ভালো সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শক্তিশালী সেনাবাহিনী সহ চুনাখালি অভিমুখে যাত্রা করে। নবাবের অনুগত জমিদারেরা কোনো প্রকার প্রতিরোধে অক্ষম হয় এবং পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত নবাব নিজে সেনা পরিচালনায় অক্ষম হন। সে কারণে বীরভূমের রাজার অগ্রগতি রোধ করার জন্য তিনি শান্তি প্রার্থনা করেন এবং যে সকল জেলা অসদজামা ইতি-মধ্যেই দখল করেছে সেইগুলি নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বীরভূমের রাজা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে গঙ্গা অতিক্রম করে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তাই, নবাবের পত্নী মারী বেগম ইংরেজদের সহায়তা প্রার্থনা করেন এবং পরিবর্তে স্বামীর রাজ্যের এক বৃহদংশ তাদের দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তারা রাজী হয় ও তৎক্ষণাৎ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়; তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে নগরের দুর্গ পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করে। এই দুর্গ অবরোধ কয়েকদিন চলে, কিন্তু অবশেষে রাজা তাঁর সর্বাপেক্ষা সাহসী সেনাপতি আফজল খানকে হারান। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তে এক চুক্তি হয়: ক) রাজার করের এক-তৃতীয়াংশ ইংরেজরা পাবে; খ) তারা বীরভূমের

ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না ; গ) গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে রাজা ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এরপর অসদজামা নবাবকে নিয়মিত কর দিয়েছিলেন, তিনি মুনসি অনুপ মিত্রকে ঋণ পরিশোধের জন্য ১ হাজার বিঘা (৩৬০ একর) নিষ্কর জমিও দান করেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য জায়গির হিসাবে তিনি ৬১০০ বিঘা (২২০০ একর) জমি দেন।

সিউড়ি হতে ১৪ মাইল দূরে মল্লারপুর নামে এক গ্রাম আছে। এর মালিক মল্লার সিং ছিলেন এক ধার্মিক ও জনপ্রিয় ব্যক্তি। এক ব্যক্তি তাঁকে বোঝান যে, নগরের রাজা তাঁকে ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য করবেন। তিনি এত মর্মাহত হন যে কোনো সত্যানুসন্ধান না করেই আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে রাজা শোকাহত হন এবং এই দুষ্কৃতকারীর সন্ধানের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালান।

সিউড়ি হতে ২০ মাইল দূরে নগরের উত্তরে রয়েছে সিনপাহাড়ি নামে এক বিশাল জঙ্গল। এইখানের শাসক ছিলেন ইছাই ঘোষ। তিনি ইছাই মন্দির নামে এক বড় মন্দির ও শ্যামরূপ ঘর নামে এক দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি লাউসেন নামক জেলার অপর এক ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হন ; এবং দেবী প্রতিমাসহ তাঁর মন্দির ও দুর্গ শত্রুর হাতে পড়ে।

সিউড়ি হতে ১৮ মাইল দূরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব মুনি নামে এক বিখ্যাত কবি ও রাধাদামোদর নামে এক দেবতার নিবাস। কথিত আছে যে, গঙ্গাস্নানের জন্য কবি প্রতিদিন ৪০ মাইল পদব্রজে যেতেন। এই গ্রামটিকে হিন্দুর পবিত্র স্থান মনে করে এবং মন্দিরের পূজা দেওয়ার জন্য প্রতি বছর ৫০-৬০ হাজার লোক জমায়েত হয়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শেষদিনে মাঘের সংক্রান্তি নামে এখানে এক মেলা বসে।

বীরভূমের অসদজামা খান ১১৮৪ সালে (১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ) কলিকাতায় পক্ষাঘাতে মারা যান। ইনি ছিলেন উদার ও শক্তিশালী রাজা এবং প্রজারা তাঁকে সম্মান করত। তাঁর সমগ্র বাংলায় রাজত্ব করবার দুর্বার উচ্চাকাংক্ষা ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা দখলের জন্য তিনি বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। দীর্ঘ ২৬ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই বাহাদুরজামা খান সিংহাসন দখলের জন্য ইংরেজ সরকারের সহায়তা প্রার্থনা করেন। একই সাথে অসদজামা খানের বিধবা লালবিহি তাঁর ভাই মহম্মদ টাকিখানের সাথে বিপরীত দাবি উপস্থিত করে এই যুক্তি হাজির করেন যে, যেহেতু বাহাদুর তাঁর শ্বশুর বদিয়াজামা খানের জারজ সন্তান, সেই কারণে সিংহাসনে আইনত তাঁর কোনো অধিকার থাকতে পারে না। ইংরেজরা তাঁর অনুকূলে রায় দেয় এবং তদনুসারে লালবিহি সিংহাসনে বসেন। অবশ্য এই ঘটনার অল্পদিন পরে বাহাদুরের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভোতন সাহার পরিকল্পনার ফলে ঐ বিধবা ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি মহম্মদ টাকির এক অনুচরকে বাহাদুরের দ্বাররক্ষীকে হত্যার এবং তার প্রভু স্বয়ং

বাহাদুরকে হত্যার জন্য তাকে নিয়োজিত করে, এই কথা জানাতে নির্দেশ দেন। অনুচরটিকে উৎকোচে বশীভূত করে ভোতন তার হীন চক্রান্ত কার্যকর করতে সমর্থ হয়; এই বিবরণ বিশ্বাস করে ইংরেজরা মহম্মদকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাহাদুরকে ক্ষমতাসীন করে। নতুন রাজা বিধবার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন এবং তাঁর ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করেন। ১১৯৬ সালে (১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ) বাহাদুর মারা যান এবং নগরের বাগানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি নিজপুত্র মহম্মদ জামাখানকে রেখে যান।

নগরের রাজার অন্যতম দেওয়ান ছিলেন রাধাকৃষ্ণ রায়। তাঁর নিবাস ছিল পুরন্দরপুরে—ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত দেবতা পুরন্দরের নামে এই নামকরণ—এবং ১৪০০ বিঘা (৫০০ একর) জায়গির হিসাবে রাজার নিকট হতে লাভ করেন।

ইংরেজদের সম্মতি নিয়ে ১১৯৭ সালে (১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ) মহম্মদ জামাখান সিংহাসনে বসেন। তিনি নাবালক থাকাকালীন শাসন ক্ষমতার দায়িত্বে দেওয়ান লালা রামনাথ ও মিঃ কিটিং থাকেন। সাবালক হয়ে তিনি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞতা ও দৃঢ়তার সাথে শাসন করেন। ইনি ছিলেন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিকৃতি কলকাতায় প্রেরিত হয়। তাঁর রাজত্বকালে বীরভূমের জনসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ, এক-তৃতীয়াংশ ছিল হিন্দু (প্রকৃতপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ)। বীরভূমের রাজস্বে স্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করেন লালা রামনাথ। সিউড়ি হতে ৬ মাইল দূরে ভাণ্ডীরবন নামক স্থানে তিনি ভাণ্ডীশ্বর শিবের মন্দির স্থাপন করেন। জায়গির হিসাবে তাঁকে বিশাল জমি দেওয়া হয়।

মহম্মদ জামাখানের পুত্র মহম্মদ দেওয়ান জামাখান ১২০৯ সালে (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ১২১৯ সালে (১৮১২ খ্রীস্টাব্দ) ইংরেজদের নিকট হতে সনদ গ্রহণ করেন। ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ) তিনি মারা যান; তাঁর পুত্র জহুর জামাখান আজও জীবিত। বীরভূম সম্পূর্ণ রূপে ইংরেজদের শাসনাধীন হওয়ার সময় এইখানের জেল ছিল মাটির ঘর, খড়ে ছাওয়া; কিন্তু ১৮০০ সনের ১৫ মে সরকারের আদেশে মিঃ ক্যাম্পবেলের তত্ত্বাবধানে পাকা ঘর তৈরি হয়। অনুরূপভাবে কৃষিকার্যকেও উৎসাহ দান করা হয় এবং জনগণ সভ্যতাভিমুখে দ্রুত এগিয়ে যায়।

বীরভূমের রাজারা বহু মসজিদ ও দুর্গ নির্মাণ করেন এবং পুষ্করিণী খনন করেন। এইগুলির অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ।

১২৬১ সালে (১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দ) বীরভূমের সাঁওতালরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কিন্তু বর্ধমানের রাজা বর্ধমানের বিভাগীয় প্রধান মিঃ ইলিয়টের সহায়তায় তাদের দ্রুত দমন করা হয়। বাংলার ছোটলাট সাহেবের আদেশানুসারে, মহম্মদ হামিদ, দারোগার নামে এক ব্যক্তি গোলাম আলি খান, মীর খান, সাহেব খান, সুখলাল এবং হিম্মত আলি জমাদারকে ১৮৫৬ সনের

২০ জানুয়ারি পুরস্কার দেওয়া হয়।

বীরভূম এক উর্বর দেশ। রাজনগর আমের জন্য ও সংরক্ষিত ফলের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং আজও আছে। এই দেশ অজয়, ময়ূরাক্ষী ও বক্রেশ্বর নদী দ্বারা জল সিঞ্চিত। এইখানের বর্তমান ভূমিরাজস্ব প্রায় ৬ লাখ টাকা (৬৫ হাজার পাউণ্ড)।

নির্দেশিকা

১. পণ্ডিতের বিবরণী—এইটা বলে রাখা সংগত যে, বীরভূমের অনার্য ভাষা সাঁওতালিতে 'ভীর' বা বীর শব্দের অর্থ 'জঙ্গল'।—হাণ্টার

২. অপমান বিশেষ—যার উদ্দেশ্য ছিল এই যে কোনো রমণীর নামোল্লেখ অবশ্যই করবে এবং তখন নবাব সেই রমণীকে রক্ষিতা করবেন।

পরিশিষ্ট—৫

পণ্ডিতের বিষ্ণুপুর বিবরণী

(নিম্নলিখিত রচনাটি আমার পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা রচনার সংক্ষিপ্ত রূপ, যেটি রাজার আদেশে (যার জন্য আমি, বাংলায় মহারানীর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্যতম বিচারপতি, বাংলার প্রশাসনিক দফতরের মিঃ জর্জ লকের নিকট কৃতজ্ঞ) প্রস্তুত ফারসি পাণ্ডুলিপির ও রাজার দফতরের কাগজপত্রের সাথে তুলনামূলক পরিমার্জিত।)

বি ব র ণী

বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ সিং বৃন্দাবনের নিকট জয়নগরের রাজবংশজাত। তাঁর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ। দূরদেশ পরিভ্রমণের ইচ্ছায় জয়নগরের রাজা পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ও যাত্রাপথে বিষ্ণুপুর পড়ে। এই দেশের বিশাল জঙ্গলে এক বিশ্রামস্থলে বিশ্রামকালে, তাঁর স্ত্রী এক পুত্রের জন্ম দেয়; এবং সাথে শিশুপুত্র সহ যাত্রার অসুবিধা বিবেচনা করে মাতাসহ শিশুটিকে পরিত্যাগ করে যাত্রাপথে অগ্রসর হন। এই প্রকার বর্বর পরিত্যাগ করার কথা আজও শোনা যায়: এমনকি স্ত্রীলোকরাও, তীর্থযাত্রায় একবার স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলে, নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রেও নির্মম হয়ে ওঠে; এবং পথিমধ্যে প্রসূত যে কোনো নবজাতককে পরিত্যাগ করে।

পিতা বিদায় নেওয়ার পরেই, শ্রী কসমেকটিয়া বাগদি (এক অনার্য অধিবাসী) নামে এক ব্যক্তি জালানি কাঠ সংগ্রহ কালে এই বিশ্রামস্থলের নিকট আসে এবং অসহায় নিঃসঙ্গ নবজাতককে দেখে। মাতার কথা কখনো শোনা যায়নি; এবং তিনি বন্য জন্তুদের খাদ্য হন বা দেশজদের মধ্যে আশ্রয় পান কিনা তা আজও এক রহস্য থেকে গেছে। কাঠুরিয়াটি শিশুটিকে ঘরে নিয়ে যায় এবং ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিপালন করে; এই সময় তার সৌন্দর্য ও শারীরিক রাজলক্ষণ দেখে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ তাকে নিজের গৃহে নিয়ে যায়। (লক্ষণীয় যে কিংবদন্তিতে

স্থানীয় বাসিন্দা কোনো আর্যের এই প্রথম আবির্ভাব ; এবং সে কোনো বিজয়ী বীর নয় বরং দরিদ্র ঔপনিবেশিক।) অবশ্য, অভাবের কারণে ব্রাহ্মণ বালকটিকে গোচারণে তথা আপন জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজে পাঠাতে বাধ্য হয় ; এবং কিশোরটি বাগদিদের এত স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠে যে তার রঘুনাথ নামকরণ করে ও তার খাদ্য জোগায়।

একদিন অন্যান্য রাখাল বালকদের সাথে খেলার সময় বালকটির সৌন্দর্য বিশেষ-ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বয়স্ক গোপালকরা খেলা দেখতে থাকে। দিনশেষ সমাগত দেখে বয়স্করা তাদের অসংখ্য গবাদিপশু সহ ঘরের দিকে যাত্রা করে। পথে রঘুর পালের একটি গোরু দলছাড়া হয়ে পড়ে এবং বালকটি তার সন্ধানে গভীর জঙ্গলে সবদিকে ব্যর্থ অনুসন্ধান করে ; অবশেষে, ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নিচে সে শুয়ে পড়ে। সে নিদ্রিত হওয়া মাত্র বিশাল এক গোখরো বেরিয়ে আসে, কিন্তু বালকটিকে দংশন করার পরিবর্তে তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে এবং বহুবর্ণ রঞ্জিত ফণা তুলে নিদ্রিত বালকটির মুখ সূর্যালোক হতে আড়াল করে (বহু সফল দুঃসাহসী সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তি)। ইতিমধ্যে তার পালক পিতামাতা তার অন্তর্ধানে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল এবং উদ্বেগ অসহ্য হওয়ায় তার সন্ধান করতে শুরু করে। অবশেষে তার পিতা ঐস্থানে উপস্থিত হলেন ; কিন্তু উদ্ধত ফণা সেই মারাত্মক সাপ, যেন দংশন উদ্যত – দংশনে তাঁর কি আতংক। তিনি আক্ষেপ করে উঠলেন – 'হায় বাছা, কি পাগলামির ঝোঁকে আমি তোমায় সর্বনাশের পথে ঠেলে দিলাম।' ইতিমধ্যে, তাঁর আগমনে সন্ত্রস্ত সাপটি দ্রুত ফণা গুটিয়ে সরে গেল এবং অপসারিত ছায়ার কারণে জাগ্রত বালকটি চমকে উঠে বসলো। বৃদ্ধটির চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু এবং আর কখনো এই নয়নের মণিকে জঙ্গলে না পাঠাবার শপথ নিলেন। তিনি আক্ষেপ করলেন – "ওহ্, তোকে হারালে আমি কি করতাম ? মুহূর্তের জন্যে তোর অদর্শন আমার সহ্য হয় না। কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাপড় সহ বাগদিদের নিকট হতে তোকে আমি ঘরে এনেছি, আমার হৃদয়ে তোর জন্য গভীর অনির্বচনীয় মায়া জন্মেছে। তোর সুন্দর মুখ আর ছোট্ট গাল বেয়ে ঝরে পড়া তোর অশ্রু কখনো ভুলবার নয়।" অনন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠে যেমন মৎস্যের দ্রুততম গতিও সামান্যতম তরঙ্গ সৃষ্টিতে অক্ষম, তেমনই সকল দ্রুত ঘটনাবলী ও জীবনের ক্রমাগত পরিবর্তন সকলও প্রকৃত স্নেহের প্রশান্তি ভঙ্গ করতে পারে না।

একদিন বালকটি এক নালার মধ্যে এক স্বর্ণগোলক পেয়ে গৃহকর্তার কাছে নিয়ে গেল – বালকটির ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্যের প্রতীক হিসাবে তিনি সানন্দে একে রেখে দিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজা (আদিবাসী প্রধান) মারা গেলে সাড়ম্বরে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় ও শ্রাদ্ধের ভোজে সর্বত্র হতে লোকজন আসে। দারিদ্র্যের কারণে ব্রাহ্মণ ও রঘুকে সাথে নিয়ে অন্যান্যদের সাথে

সেখানে যান। ভোজনকালে, মৃত রাজার হাতি শুঁড় দিয়ে রঘুকে ধরে নিয়ে শূন্য সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যায়। বালকটির মৃত্যু আশংকায় সকলেই খুব বিচলিত ওআশংকিত হলো,কিন্তু রাজকীয় এই প্রাণীটি বালকটিকে সযত্নে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়ার পর, ঈশ্বর নির্দেশিত এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করায় হতচকিত এই জনসমুদায়ের বিস্ময়োক্তিতে পরিপূর্ণ হলো এবং মন্ত্রীরা সেই স্থানে বালকটির অভিষেকে রাজী হলো। এইভাবে তারা তাকে দেশের রাজা করলো, তারপর গায়করা এলো গান করতে,বাজনদারেরা বাজনা বাজালো আর চারণদল অতীতের কীর্তিগাথার বিবরণ দিল।

প্রাচীন দেশগুলির এইই ছিল প্রথা—রাজা মারা যাওয়ার পর মন্ত্রীরা আইনি উত্তরাধিকারীকে অভিষিক্ত করত না, পরিবর্তে তারা সকল অমাত্যের উপস্থিতিতে রাজার শাদা হাতিটিকে অলংকার সজ্জিত করে রাজধানীর মধ্যে ভাবগম্ভীর শোভাযাত্রায় বের হতো; এবং সমগ্র জনসমুদায়ের মধ্যে হাতিটি যাকেই পিঠে তুলে নিতে, ঈশ্বরের নির্দেশ হিসাবে তাকেই রাজা হিসাবে গ্রহণ করা হতো।

গোখরোর ফণার ছায়ায় আশ্রয় লাভের পরিণামে সিংহাসন লাভের অন্যান্য উদাহরণও বৃদ্ধরা দিয়ে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ একদা এক ব্রাহ্মণের ঘরে এক গরিব বালক থাকত, সে গোরু চরাতো। একদিন মাঠে নিদ্রিত থাকা কালে ঐ পথে গমনরত এক সন্ন্যাসী লক্ষ্য করলেন যে বালকটিকে রৌদ্র হতে রক্ষা করার জন্য এক কাল কেউটে তার মুখের উপর ফণা বিস্তার করে আছে। সন্ন্যাসী নিকটে আসায় সাপটি পালিয়ে যায় এবং জাগ্রত বালকটি তার সামান্য খাবার সন্ন্যাসীর সাথে ভাগ করে খায়। বিদায়কালে, সন্ন্যাসী বালকটিকে বলেন যে সে একদিন রাজা হবে; এবই সাথে তিনি বালকটিকে পায়ের ওপর পা দিয়ে বা সূর্যের দিকে মুখ রেখে ঘুমোতে নিষেধ করলেন এবং অস্ত্রশিক্ষার জন্য আদেশ দিলেন। বালকটির সাথে পরবর্তী সাক্ষাতে বালকটির পদদ্বয়ে তিনি রাম-লক্ষণ আবিষ্কার করেন এবং সিংহাসন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য অপর এক সন্ন্যাসীকে কি দিতে হবে জানালেন। বালকটি সানন্দে উত্তর দিল যে সন্ন্যাসী যা চাইবে সে তাই দেবে; সুতরাং কিভাবে সন্নিহিত সর্দারদের উপর ছোটখাটো হামলা শুরু করতে হবে এবং ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করার সাথে আরো প্রকাণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের ঐ অঞ্চল দখল করতে হবে সেকথা সন্ন্যাসী তাকে বললেন। সন্ন্যাসী সর্বদা বালকটিকে নজরে রেখেছিলেন; এবং যখনই সে কোনো নির্দেশ অমান্য করেছে, সন্ন্যাসী বেত দিয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছেন। কালক্রমে বালকটি সমগ্র দেশের রাজা হয় এবং সন্ন্যাসীকে এক-লক্ষ টাকা এবং নির্দিষ্ট সামান্য খাজনায় চাঁদপাড়া শহর ও সন্নিহিত জমি দান করে—সেই হতে ঐ শহর আজও নির্দিষ্ট খাজনা চাঁদপাড়া হিসাবে পরিচিত। (এইখানে আরো বহু উদাহরণ

দেওয়া হয়েছে সেগুলি, সংক্ষিপ্ততার জন্য বাদ দেওয়া হলো।)

সুতরাং রঘুনাথ সিং ছিলেন বিষ্ণুপুরের প্রথম রাজা (অর্থাৎ আর্যবংশ জাত প্রথম রাজা, আমার পণ্ডিত প্রবরের কাছে অনার্য রাজারা গণ্য করার যোগ্য ছিল না)। ইতিহাসে তিনি বাগদিদের রাজা হিসাবে খ্যাত এবং যে জাতি প্রায় ১১০০ বৎসর রাজত্ব করে তার আদিপুরুষ। পবিত্র চিহ্ন-দ্বারা নির্দেশিত হয়ে তিনি বিষ্ণুপুরে নগরী স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন তাঁর রাজত্ব মল্লভূমি নামে ও পরবর্তী কালে জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল; বর্তমানে এইটি বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত।

বীরভূম বীরদের ও বাগদিদের (অনার্য উপজাতি) দেশ হিসাবে পরিচিত। তারা লম্বা কালো চুল রাখে এবং সাধারণত বালা নামে লোহার কখনো কখনো রূপার অলংকার ব্যবহার করে। তাদের অস্ত্র বল্লম ও বর্শা। প্রায়শই রাজারা মল্ল-যুদ্ধে তাদের দক্ষতার জন্য প্রাসাদরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করত। বন্য উপজাতিদের সাথে মিলিত হয়ে তারা লুণ্ঠনও করে এবং এইভাবে শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের সময় মুর্শিদাবাদের নবাব কখনো কখনো তাদের সহায়তা গ্রহণ করেন। মারাঠাদের সাথে সংঘর্ষ কালে নবাব অনুগত রাজাদের সর্বপ্রকার সহায়তার জন্য অনুরোধ করেন, তদনুসারে বিষ্ণুপুরের রাজা নবাবের সহায়তার জন্য সর্বোত্তম বীরদের একটি দল পাঠান। তাদের শৌর্যে মারাঠারা পরাজিত হয় এবং সেই সময় হতে নবাবের করদ রাজা হিসাবে বিষ্ণুপুরের রাজা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দফতরে রাজা গোপাল সিং লিখিত বিষ্ণুপুরের রাজাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। সেইখানে প্রাপ্ত ও অন্যান্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিষ্ণুপুরের রাজাদের এক বিবরণী আমি উপস্থিত করছি। রাজাদের ও রাজ্যের সাথে যুক্ত আরো দু-একটি তথ্য, বর্ণনাকালে বলা যেতে পারে।

রাজারা মহর্ষি পরিবারের কুটুমি শাখার অন্তর্গত। তাদের দেবতা আকো-লোঙ্গ এবং দেবী পুরা, ক্ষত্রিয় বর্ণজাত। রাজারা সম্বর ভক্ত; প্রধান পুরোহিত বা ঋষি ছিলেন বিশ্বামিত্র; বৈষ্ণব ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মগুরু ছিলেন। পৈতা বা উপবীত গ্রহণকালে প্রাপ্ত গাথা নামে পবিত্র শ্লোক এখনো ব্যবহৃত হয়। বাগদিরা রাজা রঘুনাথ সিংকে রঘুনাথ নামে ডাকতো এবং তাঁর আমল হতেই বিষ্ণুপুর ইতিহাসে স্থান গ্রহণ করে। অভিষেকের সময় তিনি আদিমল্ল উপাধি লাভ করেন।

ক) আদিমল্ল—বাংলা ১২২ সালে (৭১৫ খ্রীস্টাব্দ) রাজা জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য রাজারা তাঁর কপালে টীকা দেন, অর্থাৎ বিষ্ণুপুর এক সালে তিনি অভিষিক্ত হন। তিনি ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাণী চন্দ্রাকুমারী ছিলেন পশ্চিমের শোলার দেশের রাজা ইন্দ্র সিং-এর কন্যা। দেবী পুষ্করিণীর উদ্দেশ্যে

তিনি এক মন্দির নির্মাণ করেন। লাউগ্রামে তাঁর রাজধানী ছিল।

খ) রাজা জয়মল্ল—বাংলায় ১৫৬ সনে (৭৪৯ খ্রীস্টাব্দ) এই রাজা জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুর ৩৪ সালে তিনি সিংহাসনে বসেন। ৩০ বৎসর রাজত্ব করার পর বিষ্ণুপুর ৬৪ সালে তিনি মারা যান। তাঁর রাণী ছিলেন পশ্চিমের শোলার জাতির রাজা দীনু সিং-এর কন্যা। দেবতা সং চাকোবিহারীর উদ্দেশ্যে রাজা জয়মল্ল এক মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর কামদার (নায়েব) ছিলেন ভাগীরথী গোপ—ইনি মল্লভূমির খাজনা পেতেন। রাজার দুই পুত্র: জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে বসেন ও কনিষ্ঠতম মাসোহারা পেতেন। পরবর্তী জনের বংশলোপ পেয়েছিল। রাজা ছিলেন শক্তিশালী শাসক এবং আড়ম্বর প্রদর্শন পছন্দ করতেন। তিনি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

গ) রাজা অম্বুচল্ল (ওরফে বেনীমল্ল)—বাংলায় ১৮৬ সালে (৭৭৯ খ্রীস্টাব্দ) সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুর ৬৭ সালে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয়। তিনি ১২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং ৭৬ সালে মারা যান। তাঁর রাজধানী ছিল লালগ্রাম। পশ্চিমের শোলার জাতির রাজা মতিহার সিং-এর কন্যা কাঞ্চনমণি তাঁর রাণী ছিলেন। আগের মতোই ভাগীরথী সিং তাঁর নায়েব ছিল। তাঁর পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠপুত্র পরে রাজা হন এবং অন্যরা মাসোহারা পেতেন। বর্তমানে তাঁর কোনো বংশধর নেই।

[এইভাবেই পণ্ডিত রাজাদের দীর্ঘ তালিকা দিয়ে গেছেন। এইসব রাজারা উত্তরের আর্যবংশ জাত ক্ষত্রিয় কন্যাদের বিবাহ করেছেন এবং অধিকাংশই নায়েব ও মন্ত্রী হিসাবে আর্যদের নিযুক্ত করেছেন। সন্নিহিত রাজাদের অধিকাংশই অনার্য, কিন্তু কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী আয দেশান্তরী—সাথে তারা ক্রমাগত যুদ্ধ করেছেন; মন্দির নির্মাণ করেছেন—অধিকাংশই আর্য দেবতা, কিন্তু কখনো কখনো পূজার অনার্য ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভূতপূজাও করেছেন; কিন্তু এই বিবরণী জুড়ে এবং আমার দেখা সমস্ত অনুরূপ দলিলেই অনার্য উপাদানের গুরুত্ব এবং এর উল্লেখ ক্রমাগত কমেছে। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।]

১৮) রাজা জগৎমল্ল—রাজা বিষ্ণুপুর মতে ২৭৫ সালে (৯৯০ খ্রীস্টাব্দ) মারা যান। বিষ্ণুপুর ছিল তাঁর রাজধানী। গোলুন্দা সিং-এর কন্যা চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করেন। রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে রাধাবিনোদ ঠাকুর স্মরণে এক মন্দির-গৃহ ও একটি রাসমন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর নায়েব ছিলেন গোপাল সিং। তাঁর তিন পুত্র। তখন বিষ্ণুপুর পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধতম নগর ছিল এবং স্বর্গের সুন্দর ইন্দ্রালয়ের অপেক্ষাও সুন্দরতর ছিল। প্রাসাদগুলি ছিল বিশুদ্ধ শ্বেতমর্মরে প্রস্তুত। প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে ছিল মঞ্চ, সজ্জিত কক্ষ, বসবাসের গৃহাদি, সজ্জাকক্ষ। এইছাড়া ছিল হাতিঘর, সেনাশিবির, আস্তাবল, গুদাম, তোষাখানা

ও এক মন্দির। নগরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে রাজা খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর রাজত্ব-কালে বহু ব্যবসায়ী নগরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন।

৩৩) রাজা রামমল্ল (ক্ষেত্রনাথ মল্ল?)—৫৬৭ সালে (১২৭৭ খ্রীস্টাব্দ) রাজা অভিষিক্ত হন এবং ৫৮৭ সনে (১৩০০), ২৩ বৎসর রাজত্বের পর মারা যান। নন্দলাল সিং-এর কন্যা সুকুমারী বাই তাঁর রাণী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে রাধকান্ত জীউয়ের উদ্দেশে বহু ব্যয় করে এক মন্দির নির্মিত হয়। নায়েব ছিলেন জগমান্ধর গোহ। রাজার চার পুত্র। এই সময়ে দুর্গের উন্নতি সাধন করা হয়। উর্দি তৈয়ারির জন্য এক মন্ত্রী নিয়োজিত হয়। সৈন্যরা আরো ভালোভাবে অস্ত্রের ব্যবহার শেখে এবং তাদের বিপুল প্রসিদ্ধি বৃহৎ জাতির মনেও আতঙ্কের সঞ্চার করে। এই রাজত্বকালে বিদেশি কোনো রাজা বিষ্ণুপুর আক্রমণে সাহসী হয় নি।

৪৮) রাজা বীরহাম্বর—ইনি ৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুর মতে ৮৮১ সালে (১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনি ২৬ বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজার ছিল ৪ জন পত্নী এবং ২২ জন পুত্র। তাঁর রাজত্বে তিনটি মন্দির স্থাপিত হয়। শেষ দুর্গ সজ্জিত হয় এবং প্রাচীরে কামান বসানো হয়। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু তাঁকে দেশের সম্রাট জেনে তিনি নজরানা হিসাবে ১৬৭ হাজার টাকা (১৭ হাজার পাউণ্ড) দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন। তাঁর নায়েব ছিলেন দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।

৫৪) রাজা গোপাল সিং—এই রাজা বিষ্ণুপুর মতে ৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর তিনি ১০৫৫ সালে (১৭০৮ খ্রীস্টাব্দ) মারা যান। টুঙ্গভূমির রাজা রঘুনাথ টুঙ্গুর কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর রাজত্বকালে পাঁচটি মন্দির নির্মিত হয়। এই সময়েই ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে মারাঠারা বিষ্ণুপুর দুর্গের দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হন। সসৈন্যে রাজা তাঁদের সম্মুখীন হন, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী শত্রুদের অনুকূলে থাকে। কথিত আছে যে মদনমোহন দেবের কৃপায় কোনো মানুষের সহায়তা ছাড়াই কামান চলতে থাকে। মৃতদের মধ্যে ছিলেন মারাঠা সেনাপতি। বিষ্ণুপুরী সৈন্যরা শত্রুদের লুণ্ঠন করার পর দুর্গে আশ্রয় নেয়। অন্যরা বলে যে, রাজা নিজ ক্ষমতা বলে বহু শত্রু নিধন করে; কিন্তু শত্রু সেনাপতির জীবন নিতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় যুদ্ধ অস্বীকার করেন ও দুর্গমধ্যে পলায়ন করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে মারাঠারা আক্রমণ করে, কিন্তু স্বয়ংচালিত কামান দ্বারা কার্যকরীভাবে প্রতিহত হয়। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র বাহাদুরও বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হন। রাজার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র জামকুন্তির জায়গির লাভ করে এবং আজও তা তাঁর বংশধরদের দখলে রয়েছে।

[এইভাবেই বিবরণী চলেছে। একজন রাজা পুষ্করিণী খনন করেন, মূর্তি, প্রায়শই অনার্য পূজা-প্রতীক, প্রতিষ্ঠা করেন ; অন্যজন ব্যবসায়ে উৎসাহ দেন ; চতুর্থ জন যুদ্ধে যান। জীবিত থাকলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসন অধিকার করেন, কিন্তু অন্যদেরও যথাযোগ্য মাসোহারার অধিকার ছিল। বিষ্ণুপুর পরিবার, মুসলমান নবাবের কখনো শত্রু কখনো মিত্র এবং কখনো বা করদ রাজা হিসাবে আবির্ভূত। কিন্তু মুর্শিদাবাদ দরবারে ব্যক্তিগত উপস্থিতি হতে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের অব্যাহতি দেওয়া ছিল এবং পরবর্তীকালে ইংরেজদের মতো তাদেরও তখন দরবারে প্রতিনিধির মারফৎ প্রতিনিধিত্ব থাকত। বিভিন্ন রাজা সম্বন্ধে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তারা ব্যবসায়ে উৎসাহিত করত এবং আগন্তুকরা তাদের রাজধানীতে বসতি স্থাপন করত ; এক রাজা দুইজন বিচারক নিযুক্ত করেন, আর একজন দুর্গের সুরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করেন ; এবং এই পরিবার মল্ল নামক পিতৃনামটি (প্রাচীন অনার্য প্রভাবের অন্যতম শেষ চিহ্নাবশেষ) বর্জন করে এই রাজবংশের ৫০-তম পুরুষ (বিষ্ণুপুর মতে ৯২২ সাল, ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ) সিং পদবি গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরিবারের দ্রুত অবনতি ঘটে ; মারাঠারা তাদের নিঃশেষ করে ; ১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষ তাদের রাজ্যকে জনহীন করে তোলে এবং ইংরেজরা এই করদ রাজাদের সাথে সামান্য ন্যায়বোচিত ব্যবহার করে মর্জি মাফিক তাদের সরকারি বোঝা বাড়ায় এবং তাদের ধ্বংস সম্পূর্ণ করে। অনার্য পূজার অবশেষ মদনমোহনের মূর্তি বিষ্ণুপুর হতে অপসারিত হওয়ার পর এই নগরীর পতন শুরু হয়। নিদারুণ অভাবের কারণে রাজা কলিকাতার গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট মূর্তিটি বন্ধক রাখেন। কিছুদিন পর হতভাগ্য রাজা বন্ধক ছাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বহু কষ্টে সংগ্রহ করেন এবং নিজ মন্ত্রীকে মূর্তিটি ফেরৎ আনার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করেন। গোকুল টাকা গ্রহণ করে, কিন্তু মূর্তি ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে। কলিকাতার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নিকট এই মামলা আসে এবং রাজার অনুকূলে রায় হয় ; এবং গোকুল মূল মূর্তিটির অবিকল, অনুরূপ এক নকল মূর্তি নির্মাণ করে সেইটি রাজাকে দেন। এইভাবেই পণ্ডিতের বিবরণী শেষ হয়েছে।]

পরিশিষ্ট-৬

বীরভূমের রাজাদের বংশতালিকা

(সহজাত কৌতূহলের কারণে নয়, বরং দেশীয় পরিবারগুলির কালক্রমানুসারী দলিলপত্রাদি সংরক্ষণের নমুনা হিসাবে নিম্নলিখিত বংশ তালিকাটি রাখা হয়েছে। ফারসি ভাষায় লেখা মূল পাণ্ডুলিপিটি জরাজীর্ণ রাজপ্রাসাদ হতে পাওয়া গেছে।)

বংশতালিকা

এইটি বীরভূমের রাজাদের বংশতালিকা—এতে রয়েছে, প্রত্যেক রাজা কোন সালে সিংহাসন আরোহণ করেন, কতদিন রাজত্ব করেন, কোথায় বসবাস করেন ও কোন রোগে মারা যান।

প্রথম—দেওয়ান রণমস্ত খান বাহাদুর। বাংলা ১০০৭ সালের (১৬০০ খ্রীস্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু হতে বাংলা ১০৬৬ সালের (১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দ) ১লা কার্তিক অবধি রাজত্ব করে জ্বরে মারা যান।

দ্বিতীয়—দেওয়ান খাজা কামাল খান বাহাদুর। মৃত রাজার পুত্র. বাংলা ১০৬৬ সাল (১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দ) হতে ১১০৪ সাল (১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দ) অবধি রাজত্ব করে জ্বরে মারা যান। তাঁকে 'বড় ফুল বাগানে' সমাধি দেওয়া হয়। তিনি ৩৮ বৎসর ৪ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করেন।

তৃতীয়—দেওয়ান অসদ উল্লা খান। দেওয়ান খাজার পুত্র, বাংলা ১১০৪ সাল (১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দ) হতে ১১২৫ সাল (১৭১৮ খ্রীস্টাব্দ) অবধি রাজত্ব করেন। তিনি ২১ বৎসর ১ মাস ২০ দিন রাজত্ব করেন। নিজ পুত্রদের আজিম খান ও বদিয়া জামান খানকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে তিনি মারা যান।

চতুর্থ—দেওয়ান বদিয়া আল জামান খান। বাংলা ১১২৫ সাল (১৭১৮ খ্রীস্টাব্দ) হতে ১১৫৮ সাল (১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ) অবধি রাজত্ব করেন। তিনি পুরো ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি তাঁর চার পুত্রকে—আহমদ আল জামান খান মহম্মদ আলি নকি খান, অসদ আল জামান খান ও বাহাদুর আল জামান খানকে নিজ-

উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন ; এবং অন্য ৩ জনের সম্মতিসহ তৃতীয় পুত্র অসদ আল জামান খানকে বাংলা ১১৪৯ সালের ১লা বৈশাখ সিংহাসনে আরোহণ করান। বাংলা ১১৭৮ সালে তিনি মারা যান। তাঁর শবদেহ ফুলবাগানে সমাধিস্থ করা হয়।

জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমদ আল জুমন খান পিতার চোখের সামনে রাজনগরে বাংলা ১১৬৯ সালের (১৭৬২ খ্রীস্টাব্দ) ১৫ মাঘ মারা যান। বড় ভাই-এর পাশে বড় ইমামবাড়ায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

পঞ্চম—রাজা মহম্মদ অসদ অল জামান খান বাহাদুর। বাংলা ১১৫৯ সালের (১৭৫২ খ্রীস্টাব্দ) ১লা বৈশাখ হতে ১১৮৪ সাল (১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ) অবধি রাজত্ব করেন। ১১৮৪ সালে, বহু অভিজাত ব্যক্তির বাসস্থান কলিকাতা নগরীতে গমন করার পর তিনি 'কলিজ' রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। ['কলিজ' এক প্রকারের পক্ষাঘাত বিশেষ, দেশীয় ধারণা অনুসারে, কোনো ব্যক্তির উপর উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়াপাত হতে এই রোগের উৎপত্তি।] তাঁর মরদেহ গৃহে আনা হয় ও ফুলবাগানে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি ২৬ বৎসর রাজত্ব করেন।

ষষ্ঠ—মহম্মদ বাহাদুর আল জামান খান। ভ্রাতার মৃত্যুর পর বাংলা ১১৮৫ সালের (১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ) শুরু হতে ১১৯৬ সাল (১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ) অবধি রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১২ বৎসর। বাংলা ১১৯৩ সালে, জীবিত থাকা কালে তিনি তাঁর শিশুপুত্রকে দিয়ে রাজকার্য সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রে দস্তখত ও সিলমোহর করান এবং পুত্রকে সকল রাজকার্য ও প্রথা শিক্ষা দেন। ১১৯৬ সালে, হাসিনাবাদের পল্লীভবনে কোষবৃদ্ধি রোগে তিনি মারা যান। তাঁর মরদেহ রাজধানীতে আনয়ন করার পর ফুলবাগানে সমাধিস্থ করা হয়।

সপ্তম—রাজা মহম্মদ আল জামান খান বাহাদুর। পিতার মৃত্যুর পর, নাবালক থাকাকালীন সিংহাসনে বসেন। তিনি রাজকার্য সম্পন্ন করতেন এবং সরকারি কাগজপত্রে দস্তখত দিতেন ও সিলমোহর দিতেন। তিনি নাবালক থাকার কারণে মিঃ কিটিং তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং দেওয়ান ছিলেন লাল রামনাথ। বাংলা ১১৯৭ সালে (১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ) তিনি সাবালক হন এবং বীরভূম রাজ্যের জন্য সরকারের নিকট হতে সনদ লাভ করেন। তিনি ১২ বৎসর রাজত্ব করেন। অসুস্থ হয়ে (সন্নরপোতা রোগে), বাংলা ১২০৮ সালের (১৮০১ খ্রীস্টাব্দ) ৫ ফাল্গুন বারাদুয়ারী প্রাসাদে তিনি মারা যান। তাঁর মরদেহ বড় ফুলবাগানে সমাধিস্থ হয়।

অষ্টম,—রাজা মহম্মদ দৌরা আল জামান খান। বাংলা ১২০৯ সালে (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্ব করেন। বাংলা ১২১৯ সালে (১৮১২ খ্রীস্টাব্দ) সরকারের নিকট হতে তিনি সনদ লাভ করেন। ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ) ১৭ ফালগুন সন্নর রোগে রাজধানীতে তিনি মারা যান। তিনি তাঁর পুত্র মহম্মদ

জোহর আল জামান খাঁন এবং তাঁর স্ত্রী রামবাক সানকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। রাজধানীর বাজারে মসজিদের সম্মুখে তাঁর মরদেহ কবর দেওয়া হয়।

(আমার মুনসি) মোকতার শেখ রহম বক্সের আদেশানুসারে বাংলা ১২৭১ সালের (১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ) ২৮ মাঘ বৃহস্পতিবার নগর পরিবারের বংশ-তালিকা সিউড়িতে অনুলিখিত হয় এবং বেলা ৯ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়।

পরিশিষ্ট–৭

সাঁওতাল ঐতিহ্য, আক্ষরিক অনুবাদ

ক. পৃথিবীর গঠন

পুরাকালে চারিদিকেই ছিল সমুদ্র আর ছিল দুই পাখি—এক হংস ও এক হংসী। তারা তা' দিচ্ছিল (জলের ওপর)। তারপর মারাংবুরু (হিন্দুদের শিবের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়) বলেন—'এই পাখিদের আমি কোথায় রাখি'? তিনি বললেন—'এই সাগরের মাঝে একটি পদ্ম আছে'। তারপর তিনি বললেন—'এই পৃথিবীকে কে ওঠাবে? একটি কাঁকড়া আছে; যাও তাকে ডাকো'। তারা কাঁকড়াকে ডাকার পর সে এলো এবং মারাংবুরুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো—'আমায় আপনি ডেকেছেন কেন?' 'শুধু এইজন্য: তুমি কি এই পৃথিবীকে ওঠাতে পারো'? 'হ্যাঁ, যদি আপনি আমায় আদেশ করেন আমি একে ওঠাতে পারি'। তারপর কাঁকড়াটি দাঁড়ার সাহায্যে পৃথিবীকে তুলে ধরল, কিন্তু সব মাটি গলে গেল। তখন মারাংবুরু বললেন—'এ কখনো এই পৃথিবীকে তুলতে পারবে না। আর কে আছে'? 'কেঁচো মহারাজ ছাড়া আর কেউ নেই।' 'তাহলে যাও তাকে ডেকে নিয়ে এসো'। কেঁচো মহারাজকে ডাকার পর সে বললো—'হে মহান প্রভু মারাংবুরু, আমার আপনি কেন ডেকেছেন'? 'ও কিছুই না, শুধু এইখানের এই পৃথিবীকে তুমি কি ওঠাতে পারো?' 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি একা ওঠাতে পারি;

না'। তখন মহান প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আর কে আছে'? 'কেউ নেই; শুধু এক কচ্ছপ। সে যদি আমাকে তার মাথায় নেয় তাহলে আমি পৃথিবীকে ওঠাতে পারি'। 'তাহলে কচ্ছপকে ডাকো'।

কচ্ছপ এসে বললো,—'হে মহান প্রভু ও মারাংবুরু, আমায় আপনারা কেন ডেকেছেন'? 'এমনিই; তুমি কি এইখানে এই পৃথিবীকে মাথায় ওঠাতে পারবে'? 'হ্যাঁ, আপনার আদেশ পেলে আমি ওঠাতে পারি; কিন্তু আপনি শেকল দিয়ে আমার চারটি পা (পৃথিবীর) চারটি কোণায় বেঁধে রাখুন; তাহলে আমি ওঠাতে পারবো'। তখন তারা তাকে (কচ্ছপকে) বেঁধে রাখলো, কেঁচো মহারাজ পদ্মপাতায় পৃথিবীকে তুলে ধরলো।

তারপর মহান প্রভু মারাংবুরুকে বললেন—'তুমি গিয়ে দেখে এসে আমাদের বলে যাও'। তারপর মারাংবুরু নেমে এলেন এবং দেখলেন, পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে, দেখলেন যে তা নড়বড়ে (ভাসমান)। তারপর মারাংবুরু, মহান প্রভুর কাছে ফিরে এসে বললেন যে—ব্যাপারটা এইরকম: পৃথিবীটা নড়বড় করছে (ভাসমান)'। তারপর মহানপ্রভু তাঁকে বললেন 'তাহলে তুমি ঘাসের বীজ নিয়ে গিয়ে বপন কর, এর শিকড়গুচ্ছ পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে থাকুক'।

খ. প্রথম মানব যুগল

তারপর বেনা (এক প্রকারের ঘাস) তৈরি হলো। সেই বেনার উপর হংস ও হংসী নেমে এসে ডিম পাড়লো। তাতে তা দিয়ে দুইজনের (একটি ভাই ও বোন) জন্ম হলো।

এরপর মহান প্রভু মারাংবুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'খবর কি?' তখন তিনি উত্তর দিলেন—'মাত্র দু'জনের জন্ম হয়েছে।' 'ঠিক আছে, তাদের জন্ম হয়ে থাকলে তারা ঐ খানেই থাকুক।' (পুনরায়) মহানপ্রভু মারাংবুরুকে বললেন—'যাও, তাদের দেখে এসো ও তাদের খবর নিয়ে এসো।' তখন মারাংবুরু গিয়ে তাদের দেখলেন এবং খবর আনলেন: 'হে মহান প্রভু, আমি গিয়ে তাদের দেখলাম। তারা বড় হয়েছে কিন্তু তাদের কোনো কাপড় নেই।'

গ. পোশাক সরবরাহ

তখন মহানপ্রভু বললেন—হে মারাংবুরু, তাদের কাপড় দাও—একটি দশহাতি, আর একটি বারো হাতি।' তাদের কাপড় দেওয়ার পর তারা জিজ্ঞাসা করলো—'হে পিতামহ, আপনি কোথা হতে এসেছেন?' 'হে পৌত্র, এইখানে আমি তোমাদের দেখতে এসেছি।' 'আমরা ভালো আছি', 'তাহলে, হে পৌত্র, এই কাপড় পরে নাও।' তখন তিনি ছেলেটিকে দশহাতি কাপড় ও মেয়েটিকে বারো

হাতি কাপড় দিলেন। তারপর ছেলেটির কাপড় শুধু 'রোপানী'র (নেংটি) কাজ করলো। বারোহাতি কাপড়টি কোনোক্রমে মেয়েটির কোমর আবৃত করলো।

ঘ. উত্তেজক পানীয় প্রস্তুতি

এই ছাড়াও মহানপ্রভু তাঁকে বললেন—'হে মারাংবুরু, যাও ঐ দুইজনকে দেখে এসো।' তখন মারাংবুরু গিয়ে তাদের দেখে বললেন—'ওহে নাতি-নাতনিরা, তোমাদের দুইজনকে একটি কথা বলার আছে। তোমরা কি শুনবে?' 'হ্যাঁ বলুন আমরা শুনব।' 'কথাটি হলো : আমি তোমাদের মদ তৈয়ারির জন্য দুইটি বীজ দেবো। এইটি নিয়ে হাঁড়াতে রাখো।' 'হ্যাঁ, আমরা তাই করবো।' তখন হাঁড়া প্রস্তুত করলো; এবং চারদিন পর তিনি (পুনরায়) তাদের দেখতে এলেন। 'ওহে, নাতি-নাতনিরা আমি সেইদিন তোমাদের যেভাবে বলেছিলাম সেইভাবে তোমরা কি হাঁড়া প্রস্তুত করেছ?' 'হ্যাঁ, পিতামহ, আমরা ঠিকভাবে হাঁড়া বসিয়েছি।' 'তাহলে, তোমরা কি করেছ আমাকে দেখাও।' তারপর সব দেখেশুনে তিনি তাদের বলেন—'ওহে, নাতি-নাতনিরা, তোমরা জল দিয়ে (হাঁড়া) পূর্ণ কর।' তারা জল দিয়ে হাঁড়া পূর্ণ করার পর মারাংবুরু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—'ওহে নাতি-নাতনিরা, তোমরা কি জল দিয়েছ? তাহলে গাছের পাতা দিয়ে পানপাত্র প্রস্তুত কর: তোমরা কি পাত্র প্রস্তুত করেছ?' 'হ্যাঁ, পিতামহ, আমরা পানপাত্র তৈয়ারি করেছি।' 'তাহলে সেইগুলি নিয়ে এসো।' তারা (সেইগুলি নিয়ে এলো এবং) বললো—'হে পিতামহ এইগুলি নিন এবং পান করুন।' 'না হে, আর একটি ব্যাপার বাকি আছে।' তখন তারা জিজ্ঞাসা করলো—সেটা কি?' 'প্রথমে, তোমরা অবশ্যই এই মারাংবুরুর পূজা করবে।' (দেবতার উদ্দেশ্যে মদ ঢেলে)

ঙ. বংশবিস্তার করা

তারপর তারা দু'জন মারাংবুরুর পূজা করার পর তিনি বললেন—'এখন তোমরা পান কর।' তারা বললো—'হে পিতামহ, আপনি নিন ও পান করুন।' 'না, নাতি-নাতনিরা তোমরা নাও এবং পান কর।' মারাংবুরু আবার বললেন—'তোমরা পান করো, আমি অবশ্যই বাড়ি ফিরব।' তারপর তারা দু'জন পান করলো এবং মাতাল হলো। তারপর মারাংবুরু ফিরে দেখলেন যে তারা খুব মাতাল হয়েছে। একজন এক জায়গায় ও অন্যজন অন্য জায়গায় পড়ে রয়েছে। এইভাবে তাদের মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে দেখে মারাংবুরু তাদের এক জায়গায় নিয়ে এলেন। তখন তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী হয়ে একত্রে শুয়ে রইলো।

পরের দিন ভোরে তাদের দেখতে এসে মারাংবুরু তাদের একত্রে শায়িত

দেখলেন এবং বললেন—'হো তাহলে ও নাতি-নাতনিরা তোমরা এখনো জেগে ওঠোনি ?' 'আঃ ঠাকুর্দা এইটা খুব খারাপ, গতকাল আপনি আমাদের খুব মাতাল করেছিলেন। কি লজ্জা ঠাকুর্দা, কিন্তু এইরকমই হয়েছে। এখন, কি করা যাবে ?'

তারপর সেইভাবে থেকে এই দু'জনের ৭টি ছেলে ও ৭টি মেয়ে জন্মালো। কিছুদিন পর মাজা টুডুকেকা তাদের বিতাড়িত করলো।

চ. সম্প্রসারণ

তারপর সেইখানে আরো দীর্ঘদিন থাকতে না পেরে তারা তাদের সন্তানদের চাইচম্পার পাদদেশে নিয়ে গেল এবং সেইখানে তারা থাকল। সেইখানে বসবাস কালে তাদের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলো। চাইচম্পা দুর্গের দিকে ছিল (দুইটি দ্বার), আহীন দ্বার ও বাহিনী দ্বার।

তারপর পিলচু-হানাম ও পিলচু-ক্রুধি (আদি যুগল) তাদের (বংশধরদের) বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করলো। প্রথম জাতক হলো নিজ্-হাঁসদা-হড়; পরের জন নিজ্-মর্মু-হড; তারপর নিজ্-সোরেন-হড়; তারপর ছিল নিজ্-তাতি-ঝারি-হাঁসদা-হড়; তারপরের জন ছিল নিজ্-মাণ্ডি হড়; তারপর ছিল নিজ্-কিস্কু-হড়; এবং তারপরের জন ছিল নিজ্-টুডু-হড়।

তারপর তারা চাইচম্পার পাদদেশ থেকে চলে যায় এবং বিদায় নিয়ে, তার বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুগ্‌দারা হেদে ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকে কিছু যায় সিংভূম; কিছু যায় সিকার-এ; অন্যরা টুণ্ডিতে; এবং বাদবাকি কাতরাতে যায়। তারপর অন্যরা সেইখান হতে চলে যায় এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় হতে আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

[এই কিংবদন্তিগুলি ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি মিঃ ফিলিপ্‌স দক্ষিণের সাঁওতালদের মধ্য হতে সংগ্রহ করে আমায় পাঠিয়েছেন। এইগুলি মূলত মধ্যাঞ্চলের সাঁওতালদের ঐতিহ্যের সাথে অভিন্ন, শুধু নামগুলির বানানে সামান্য পার্থক্য আছে।]

পরিশিষ্ট – ৮

সাঁওতালি পরব

ক. জোহরাই – ডিসেম্বরের ফসল তোলার পর ; প্রতি গ্রামে ৫ দিন ধরে চলে, কিন্তু সন্নিহিত গ্রামগুলিতে বিভিন্ন দিন নির্দিষ্ট করায় সাধারণত একমাস কাল ব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই পরবে অনুষ্ঠান অতি সরল। জমিতে একটি ডিম রাখা হয় ; গ্রামের সমস্ত গোরুকে এর নিকটে আনা হয় এবং যে গোরুটি প্রথম ডিমটিকে শোঁকে তার শিং দুটিতে তেল মাখিয়ে তাকে সম্মানিত করা হয়।

খ. সক্রাট – জোহরাইয়ের কয়েকদিন পরে হয় ; দুই দিন চলে। এতে রয়েছে, তীর-ধনুক নিয়ে অনুশীলন, তলোয়ার নৃত্য ও অনুরূপ ক্রীড়া-কৌশল।

গ. যাত্রা – ফেবরুয়ারি নাগাদ ; দুই দিন চলে। ৮ জন চেয়ারে বসে ; প্রতিটি সাঁওতাল মিলে গ্রামের বাইরে যে খুঁটি দুইটি থাকে, তার চারপাশে তাদের ঘোরায়। নাগরদোলায় ঘোরানো হয়।

ঘ. বাহা (ফুল) – মার্চ নাগাদ ; দুই দিন চলে। প্রতিটি পরিবার নাইকির (পুরোহিতের) পা ধুইয়ে দেয় ও পরিবর্তে তিনি ফুল বিতরণ করেন। প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে বৃক্ষকুঞ্জেও অনুষ্ঠান হয়। মারাংবুরুকে (সাঁওতাল-দের বড় দেবতা) ৪টি বাচ্চা মোরগ উৎসর্গ করা হয় ; জহির-এরাকে (জাতির আদিমাতা) একটি রঙিন মোরগ বাচ্চা ; গোঁসাই-এরাকে (জহির-এরার মতো শালকুঞ্জ নিবাসী এক দেবী) একটি কালো মোরগ এবং মাঝি-হারামকে (পূর্বতন সর্দার) একটি ছাগল বা মোরগ উৎসর্গ করা হয়।

ঙ. পোতা (চড়ক) – বর্তমানে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ; কিন্তু এখনো (১৮৬৫) উত্তরের সাঁওতালদের মধ্যে এপ্রিল বা মে মাসে প্রচলিত। প্রায় একমাস ব্যাপী চলে। হিন্দুদের চড়কপূজার মতোই যুবকরা পিঠে

কাঁটা আটকে পাক খায়—এরা এর আগের দিন ও পরের দিন উপবাস করে এবং মাঝের রাত্রি কণ্টক শয্যায় যাপন করে।

চ. এরো-সিম (মোরগ বপন)—বীজ বপনের সময় প্রতিটি পরিবার বলি দেয়।

ছ. হরিয়র সিম (সবুজ মোরগ)—নাইকি (পুরোহিত) কর্তৃক, ধান কিছুটা বড় হলে বলি দেয়।

জ. 'ছাতা'—প্রায় আগস্ট মাসে; ৫ দিন চলে। নাইকি (পুরোহিত) একটি ছাগল বলি দেয় এবং সুউচ্চ এক খুঁটির উপর এক বাঁশের ছাতাকে প্রদক্ষিণ করে জনসাধারণ নৃত্য করে।

ঝ. ইরি-গুন্দলি (দুই প্রকারের শস্য)—জহির থান (শালকুঞ্জে) এইগুলি দুধের সাথে নাইকি (পুরোহিত) উৎসর্গ করে এবং দরিদ্রদের আসার জন্য ও খাওয়ার জন্য ডাকে।

ঞ. হোরো (ধান)—ধান পাকার সময়; প্রথম বারের ধান একটি শুয়োর সহ পরগনা বোঙ্গাকে (জেলাগত দেবতা) উৎসর্গ করা হয় এবং পরে গ্রামের পুরুষরা এইটি শালবনে বসে খায়।

এই সকল উৎসবে বিপুল পরিমাণ হাঁড়িয়া পান করা হয়।

পরিশিষ্ট—৯

সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়েকটি নথিপত্র

১নং—বেসামরিক অফিসারদের প্রতি সাধারণ নির্দেশ। বাংলা সরকার হতে ১৮৫৫ সনের ৩০ জুলাই তারিখে, নং—১৭৮৬ সনে প্রেরিত।

মহাশয়, আপনার নিকট এই পত্র পৌঁছবার আগেই আপনি সচেতন হয়ে থাকবেন যে, সাঁওতালদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সমগ্র বাহিনীর পরিচালনার জন্য মেজর জেনারেল লয়েড নিয়োজিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত—সার্বভৌম সরকার কর্তৃক জেনারেল. লয়েডকে প্রথমে রাজমহল যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে জানানো হয়েছে যে, বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্রুত ও ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ কাম্য বিবেচনা করে পরিষদের সভাপতি সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে মনস্থ করেছেন; এবং বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করার ও গ্রেফতার করার জন্য তথা বিদ্রোহ দমনের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত—এই আদেশ সরকারকে জানাবার সময়, পরিসদের সভাপতি অনুরোধ করেছেন যে, ছোট লাটসাহেব যেন এইসব বিভাগের বেসামরিক অফিসারদের মেজর জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করার ও তাঁর নির্ণীত কর্মপন্থা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি তথ্য ও সর্বপ্রকার সহায়তা দানের জন্য নির্দেশ দেন।

চতুর্থত—পরবর্তী এক যোগাযোগে পরিষদের সভাপতি ব্যাখ্যা করেছেন যে, জেনারেল লয়েডের প্রতি উপরোক্ত নির্দেশের দ্বারা একথা কখনো বোঝাতে চাওয়া হয়নি যে আমাদের নিজেদের প্রজাদের বিরুদ্ধে বেসামরিক কর্তৃত্ব নিরপেক্ষও স্বাধীনভাবে সামরিক বাহিনী সক্রিয় হতে পারবে; বরং এইটুকু শুধু বলা হয়েছে যে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ও গ্রেফতার করার জন্য তথা বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক কার্যকলাপের প্রকৃতি-নির্ণয় সম্পূর্ণভাবে সামরিক অধিনায়কদের হাতে থাকবে। এইটাও বলা হয়েছে যে, অধীনস্থ বেসামরিক

পদ্ধতির সহায়তায় কাজ করার ক্ষমতা এখনো বেসামরিক কর্তৃপক্ষের রয়েছে এবং একমাত্র যে পরিবর্তন করতে চাওয়া হয়েছে, তা হলো সেনা চলাচল সম্বন্ধে প্রতিটি বেসামরিক অফিসারের যে ক্ষমতা ছিল, বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্তত সামরিক ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারদের হাতে সেই ক্ষমতা হস্তান্তরণ মাত্র। আরো বলা হয়েছে, পরিষদের সভাপতির বিবেচনায়,আকস্মিক জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সেনাবাহিনীকে কার্যকরী নির্দেশ দান হতে বিরত থাকা উচিত, কিন্তু সামরিক অফিসারদের, বিশেষভাবে জেলায় সামরিক বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে দেশের অবস্থা, বিদ্রোহীদের যাতায়াত সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহিত রাখা এবং বর্তমান সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত তাঁদের চিন্তাপ্রসূত যে কোনো পরামর্শ দেওয়া উচিত।

পঞ্চমত—জেনারেল লয়েডের নিযুক্তির পর, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর বিশেষ অধিনায়করূপে ব্রিগেডিয়ার পদে কর্নেল বার্ডের নিযুক্তি ও পরিষদের সভাপতির কাম্য মনে হয়েছে। যে কোনো স্থানে থাকুক না কেন, সেইখানেই বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ও গ্রেফতার করার জন্য এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য, বেসামরিক অফিসারদের সাথে একযোগে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এই অফিসারটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে যে, মঙ্গলপুরে মিঃ লক এবং সিউড়িতে আপনি তাকে সর্বপ্রকার তথ্য ও সহায়তা দেবেন; বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা রূপায়ণে মিঃ লক ও আপনার সাথে একযোগে সক্রিয় হতে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ষষ্ঠত—উপরোক্ত নির্দেশের সাথে ছোটলাট বাহাদুর শুধু এই আন্তরিক আশা যুক্ত করতে চেয়েছেন যে, স্বয়ং আপনি ও আপনার অধীনস্থ সকল বেসামরিক অফিসাররা সকল সম্ভাব্য উপায়ে সেনাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপে সহায়তা ও সহযোগিতা করবেন। সেনাবাহিনীর জন্য সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করা ও তাদের পরিবহন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার দিকে আপনাদের সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত হবে। তারপর দিন কয়েকের মধ্যেই, যত বেশি সংখ্যক সম্ভব হাতি সংগ্রহ করা ও তাদের বীরভূমে ও ভাগলপুরে প্রেরণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে সন্নিহিত জেলাগুলির জেলাশাসকদের নিকট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এবং কলিকাতা হতে ইতিমধ্যেই সরাসরি (কিছু সংখ্যক) পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও, সেনাদল কোন কোন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করবে তা নির্দেশিত হওয়া মাত্র আপনাদের দেখা উচিত যেন অফিসার ও সৈনিকদের উভয়ের জন্যই ভালো আশ্রয় দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়; এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিপাহিদের শয়নের জন্য চারপাই বা কোনো উঁচু মাচার ব্যবস্থা

করার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। (এই অনুচ্ছেদটি অসতর্কভাবে অনুলিখিত। — হাণ্টার)

সপ্তমত — অনুরূপভাবে যদি চিকিৎসা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হয়ে না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব সহকারে লক্ষ্য করা উচিত যেন প্রতিটি বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে কয়েকটি সাধারণ ঔষধ, বিশেষভাবে কুইনাইন, এবং তৎসহ দেয় পরিমাণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওয়া হয়।

অষ্টমত — ছোটলাট বাহাদুর ঘটনার অগ্রগতি সম্বন্ধে যত ঘন ঘন সম্ভব আপনাদের বিবরণ পেতে আগ্রহী।

নবমত — আপনাদের অধীনস্থ যেসব অফিসার উপদ্রুত জেলাগুলিতে নিয়োজিত তাদের উপরোক্ত আদেশ আপনারা জানিয়ে দেবেন।

২নং — ক্ষমাপত্র বিষয়ে জেলাশাসকদের নিকট বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশ, ১৫ আগস্ট, ১৮৫৫।

মহাশয়, —

দ্বিতীয়ত — এই সাথে প্রেরিত ঘোষণাপত্রটি সাঁওতাল জনসাধারণের মধ্যে সাধ্যমতো সর্ব উপায়ে আপনি প্রচার করবেন, এবং বশ্যতা স্বীকারের জন্য যেসব ব্যক্তি আপনার সম্মুখে হাজির হবে তাদের প্রত্যেকের নাম নিম্নলিখিত তথ্যাদি সহ একটি খাতায় তালিকাবদ্ধ করবেন। (একটি সারনি সন্নিবেশিত)।

তৃতীয়ত — যেসব ব্যক্তি বশ্যতা স্বীকার করবে তাদের সকলকে নিম্নলিখিত ছকে একটি লিখিত প্রমাণপত্র দেওয়া উচিত এবং তাদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট মুচলেকাটি দস্তখত করানো উচিত।

৩নং — মার্জনা দানের ঘোষণা

যে সকল সাঁওতাল লুণ্ঠন ও ধ্বংস কার্যেব সামিল হবে, সৈন্যদের প্রতিরোধ করে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, যেহেতু তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের এই সকল কাজের বোকামি ও অন্যায় বুঝে মার্জনা ভিক্ষায় ও নিজেদের পূর্বতন শান্ত জীবনের প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী তাদের জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে যে, অসৎ ব্যক্তিদের কুপরামর্শে বিপথচালিত প্রজাদেরও মঙ্গলের জন্য সদাসতর্ক সরকার, যে সকল সাঁওতাল ১০ দিনের মধ্যে যে কোনো সংগঠিত কর্তৃত্বের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করবে, তাদের সকলকে অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করবে — একমাত্র ব্যতিক্রম হবে বিদ্রোহে মূল উদ্যোক্তারা ও নেতারা এবং সেই সকল ব্যক্তি যারা কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটনে মূলত জড়িত ছিল বলে প্রমাণিত হবে। সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করার সাথে সাথেই, সাঁওতালদের যুক্তিসংগত অভিযোগগুলির পূর্ণ তদন্ত করা হবে। কিন্তু অপরদিকে এই ঘোষণা জারির পর যে সকল

বিদ্রোহীরা সরকারের বিরোধিতা করতে থাকবে, তাদের দ্রুততম কঠোরতম সাজা দেওয়া হবে।

৪নং—বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের উদ্দেশ্যে বীরভূমের জেলাশাসকের পত্র, তাং ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫।

বিগত পক্ষকালের মধ্যে ওপরবান্ধা ও নানগুলিয়া থানার ৩০টিরও অধিক গ্রাম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছে। নগরের ৪ মাইল পশ্চিমে লোরোজোড় হতে দেওঘরের সন্নিকট পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তাদের দখলে রয়েছে। ডাক বন্ধ হয়েছে এবং গ্রামবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করে পালিয়েছে। তারা দুই বিশাল দলে বিভক্ত: একদল ভাগলপুর জেলার ওপরবান্ধা থানার ১০ মাইল উত্তরে রক্ষাডাঙ্গালে শিবির স্থাপন করেছে; আরেকদল ভাগলপুর জেলার মধ্যেই কিন্তু নানগুলিয়া থানার সীমান্তে, সিউড়ি হতে ৬ মাইল পশ্চিমে তিলাবনিতে রয়েছে; এবং আমাদের অনুমান মতো তাদের সংখ্যা ১২ হাজার হতে ১৪ হাজার এবং সর্বদিক হতে তারও শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত—মচিয়া কোসনজোলা, রাম ও সুন্দরা মাঝির নেতৃত্বে রক্ষাডাঙ্গাল সাঁওতালদের প্রায় সংখ্যায় ৩ হাজার জনের একদল, ১৬ তারিখ বৈকালে ওপরবান্ধার নিকট শিবির স্থাপন করেছে, এবং পরের দিন থানা ও গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করেছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দারোগা ও বরকন্দাজরা স্বস্থানে ছিল; কিন্তু আক্রমণকারীদের বিপুল সংখ্যা দেখে এবং তাদের পক্ষ হতে প্রতিরোধ নিষ্ফল জেনে তারা পশ্চাদপসরণ করে এবং অতিকষ্টে কোনোক্রমে দারোগা সাহানা ও আফজলপুর হয়ে পলায়ন করে এবং পিঠে শুধু পোশাক নিয়ে এইখানে উপস্থিত হয়। কয়েকদিন আগে সাঁওতালদের থানা আক্রমণের ইচ্ছার কথা শুনে যে সমস্ত নথিপত্রাদি নিরাপত্তার জন্য দেওঘরে পাঠিয়ে দেয় এবং সেইখানের বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট সহায়তার জন্য আবেদন করে; কিন্তু দূরত্ব ও পথিমধ্যে গভীর জঙ্গলের কারণে শেষোক্ত জনতার সহায়তায় সৈন্য প্রেরণে গররাজী হন। মিঃ ওয়ার্ডকে এই অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করলে, তিনি রানীগঞ্জ হতে সাহানা থানার জামতাড়ায়, ওপরবান্ধাতে এবং আফজলপুরে এখনই সেনা পাঠাতে বলেন—বর্ষার পর সাঁওতালদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী নিয়োজিত হওয়া পর্যন্ত এই সেনাদল মোতায়েন থাকবে; এবং আমি এইমাত্র শুনেছি যে পূর্বোক্ত স্থানে সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়েছে; সাহানা থানার সুরক্ষার পক্ষে এই বাহিনী যথেষ্ট; এই থানায় এখনো পর্যন্ত কোনো লুণ্ঠন ঘটেনি; কিন্তু বর্তমানে সাঁওতালরা বিদ্রোহীদের সাথে যোগদানের জন্য সমবেত হচ্ছে। ওপরবান্ধায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা পর্যন্ত সর্বত্র বর্তমান বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তি বজায় থাকবে কিন্তু তারা আসামাত্র, আমি পুলিশদের থানায় ফেরৎ

পাঠাবো এবং ডাক চলাচল আবার শুরু করবো। বর্তমানে এইটা অসম্ভব। কারণ ২০০ জন লোক সহ রাম মাঝি হলদিগড় নিকটস্থ জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে ঐ পথ অতিক্রমে প্রয়াসরত সকল কিছুর উপরই হামলা ও লুণ্ঠন করে। বর্তমান সংকট মুহূর্তে দেওঘরে একজন বেসামরিক অফিসারের অনুপস্থিতি অতীব পরিতাপ-জনক, কারণ এই সময় তাঁর কাজ অত্যন্ত মূল্যবান হতো, কিন্তু পূর্বতন এক পত্রে ইতিমধ্যেই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

তৃতীয়ত—সীরু মাঝির অধীন ৫ হাজার থেকে ৭ হাজার সাঁওতালের একদল তিলাবনির সুলিয়া টাকুর দখল করে এবং সেইখানে বাঁধ দিয়ে ও পুকুর খনন করে নিজেদের অবস্থা দৃঢ় করেছে। তারা দুর্গাপূজার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে এবং এইজন্য নানগুলিয়া থানা তাদের দ্বারা লুণ্ঠিত এক গ্রাম হতে দুইজন ব্রাহ্মণকে অপহরণ করে আটকে রেখেছে; এবং গতকাল গুপ্তচররা খবর দিয়েছে যে সিউড়ি আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসার আগে তারা শুধু রক্ষাডাঙ্গাল দলের তাদের সাথে মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে; কিন্তু আমি মনে করি যে বর্তমান অবস্থার এই থানা আক্রমণে সাহসী হওয়া প্রায় অসম্ভব। কয়েকদিন আগে তারা দেওঘরের ডাকহরকরাকে ধরে তার মাধ্যমে আমাদের নিকট, তাদের ভাষায় 'দাহরা' বা খবর পাঠিয়েছে—উদাহরণ স্বরূপ, তিনপাতা সম্পন্ন একটি শালপল্লব, প্রতিটি পাতা তাদের আগমনের দিনসূচক, ভারপ্রাপ্ত কর্নেল থানার উত্তর ও পশ্চিম দিকে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ চৌকি মোতায়েন করার সতর্কতা গ্রহণ করেছে—আক্রমণ ঘটলে এই দিকগুলি অরক্ষিত থাকার কথা; এবং বিশেষ কমিশনারের অনুরোধ ক্রমে শেঠ গিলান ও তাঁর যে বরকন্দাজদের আমি তাঁর অধীনে এইখানে রেখেছিলাম, আমার মনে হয় তাদের নগরে পাঠাতে হবে, কারণ সেইখানের অধিবাসীরা অত্যন্ত আতংকজনক অবস্থায় রয়েছে এবং অনেকেই গৃহত্যাগ করে পলায়ন করেছে।

৫নং—বেসামরিক অফিসারের নিকট হতে বীরভূমের জেলাশাসকের উদ্দেশ্যে পত্র; রানীগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর ১৮৫৫।

মহাশয়,—উপক্রান্ত জেলাগুলিতে সামরিক আইন ঘোষণার ফলে আমার কার্যাবলী বন্ধ হয়েছে। এই অফিস থেকে সূত্রপাতের ফলে এইখানেই মীমাংসা প্রয়োজন ভেবে বিদ্রোহ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে যদি আপনি আমার সাথে যোগাযোগে ইচ্ছুক হন, তবে হুগলিতে আমার নিকট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবর পাঠালে, আমি বাধিত হব।

পরিশিষ্ট — ১০

সংযুক্ত জেলার রাজস্ব, প্রাক-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যয়।

১৭৮৯ সনের রাজস্ব।

		প্রচলিত টাকায়
বীরভূমের ভূমি রাজস্ব	...	৬১১, ৩২১
বিষ্ণুপুরের ভূমি রাজস্ব	...	৩৮৬, ৭০৭
বিবিধ রাজস্ব	....	১৫,০০০
	মোট প্রচলিত টাকায় ...	১,০১৩,০২৮
	অথবা, পাঃ	১০১,৩০২,১৬ শিঃ

১৭৮৯ সনের খরচ		রৌপ্য মুদ্রা
রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রেরণের সাধারণ ব্যয়		৩৩,০২০
সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত		১০,৯০০
দেওয়ানি আদালত খাতে		৬,৭৭২
ফৌজদারি আদালত খাতে ; বাঘ শিকারের জন্য ৪০০ টাকা, কয়েদিদের খাদ্যের জন্য ৪০০ টাকা এবং দানের ৩৬ টাকা সহ	...	৩,০০০
মোট রৌপ্য মুদ্রা	...	৫২,৬৯২
প্রায়	...	৫৪০০ পাউণ্ড

১৭৮৯ সন

		পাঃ	শি	পে
জমা	...	১০১,৩০২	১৬	০
প্রশাসনিক ব্যয়	...	৫,৪০০	০	০
সরকারের নিট মুনাফা	...	৯৫,৯০২	১৬	০

জেলার বর্তমান রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যয়[1]

১৮৬৪-৬৫

	টাকা
ভূমি রাজস্ব	৭,৪৪,৯৬৫
জরিমানা	৪,৫০০
মাশুল	৬০০
আবগারি শুল্ক	৪৫,৯২৯
আফিম বিক্রয় বাবদ	৭,০১৮
আয়কর	৩২,৪১২
স্ট্যাম্প বিক্রয় বাবদ	৭১,৬৮৫
রসিদ স্ট্যাম্প বাবদ	৪০৬
স্ট্যাম্পের আইন-ভঙ্গ জনিত জরিমানা	৩,৩০০
পুলিশি জমি পুনর্গ্রহণ বাবদ আদায়	২,৫০০
মোট	৯,১৩,৩১৫
শিক্ষা দফতর	৩,১০০
ডাক বিভাগ	৭,২০০
সর্বমোট	৯,২৩,৬১৫

অথবা, পাঃ ৯২,৩৬১, শিঃ ১০, পেঃ ০

ব্যয় বাবদ	২,৪৮,৬৯১

অথবা, পাঃ ২৪,৮৬৯, শিঃ ১০, পেঃ ০

নিট মুনাফা	৬,৭৪,৯২৪

অথবা, পাঃ ৬৭,৪৯২, শিঃ ৮, পেঃ ০

ব্যয়
১৮৬৪-৬৫

	টাকা
ফেরৎ স্ট্যাম্পের মূল্য বাবদ	২,০০০
ফেরৎ আয়কর	৫০০
মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য,চট দ্বারা বাক্স বাঁধাই ও অন্যান্য বাঁধাই সহ, ব্যয়	১,৫০০
বন্য জন্তু শিকারের জন্য ব্যয়	১০০
অফিসারদের রাহা খরচ	৫০০
জেলাশাসকের দফতর বাবদ ব্যয়	৩৫,৫০৮
আবগারি ব্যয়	২,৭৭৬
আয়কর বাবদ খরচ	২,৭০৬
স্ট্যাম্প দফতর বাবদ	২,৬০০
দেওয়ানি আদালত বাবদ খরচ	৭১,০০০
ফৌজদারি আদালত বাবদ খরচ	৩০,২০০
কারাবিভাগ বাবদ খরচ	৭,০০০
বেসামরিক প্রধান চিকিৎসকের বেতন	৪,২০০
তাঁর চিকিৎসালয় বাবদ	১২০
উত্তর বেতন বৃত্তি বাবদ	৫,৬৩৪
রাজনৈতিক ভাতা	৩৪৭
পুলিশ দফতর	৬২,০০০
শিক্ষা বিভাগ	১০,০০০
ডাক বিভাগ	১০,০০০
মোট ···	২,৪৮,৬৯১

অথবা, পাঃ ২৪,৮৬৯, শিঃ ২ পেঃ ০

(১) এই সময় বিষ্ণুপুর অন্য জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে এখানে শুধুমাত্র বীরভূমের রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলো।

পরিশিষ্ট — ১২

(এই সারনিতে, ১৭৯২ সনের অকটোবর মাসে কলিকাতার টাঁকশালে প্রস্তুত রৌপ্যমুদ্রার সাথে তৎকালীন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় প্রচলিত নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার নিহিত মূল্যমান দেখানো হয়েছে।)

বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার নাম।		রৌপ্যমুদ্রার সহিত তুলনামূলক নিহিত মূল্যমান।		
		টাঃ	আঃ	পাঃ
১। মুর্শিদাবাদি সিককা, প্রতিটির ওজন অনুসারে,		১০০	০	০
২। পাটনাই সিককা	…	১০০	০	০
৩। ঢাকাই সিককা,	…	১০০	০	০
৪। ফোলি সোনাট,	…	১০০	০	০
৫। দিল্লি মহম্মদ শাহি,	…	৯৯	৮	০
৬। সুরাটি মুদ্রা, বড়	…	৯৯	৮	০
৭। বেনারসী সিককা,	…	৯৯	৮	০
৮। বিসুন আর্কট,	…	৯৭	১৪	৬
৯। সোনাট স্থাবিক,	…	৯৭	৮	০
১০। সোনাট ডাকি,	…	৯৭	৮	০
১১। ফারসি আর্কট,	…	৯৭	৬	৬
১২। ফারসি আর্কট,	…	৯৭	০	০

১৩। পাটনাইয়া আর্কট,	...	৯৬	৯	[illegible]
১৪। ঔরঙ্গজেবি আর্কট,	...	৯৬	৯	৬
১৫। গুড়সাউল,	...	৯৬	৯	৬
১৬। মাদ্রাজি আর্কট, নূতন	...	৯৬	৪	৯
১৭। মসলিপত্তনম আর্কট,	...	৯৬	০	০
১৮। সর্দার আর্কট,	...	৯৬	০	০
১৯। পাটনাই সোনাট, পুরাতন	...	৯৬	০	০
২০। বেনারসি টাকা, পুরাতন	...	৯৫	১৪	৬
২১। মাদ্রাজি আর্কট, পুরাতন	...	৯৫	১৪	৬
২২। ফরাক্কাবাদ, টাকা	...	৯৫	১২	৯
২৩। জেহানজি আর্কট,	...	৯৫	১১	৩
২৪। চুনত্তা আর্কট,	...	৯৫	১১	৩
২৫। কলিকাতা আর্কট,	...	৯৫	৬	৬
২৬। মুর্শিদাবাদ আর্কট,	...	৯৫	৬	৬
২৭। পুরাতন আর্কট,	...	৯৫	৩	৩
২৮। ওলন্দাজ আর্কট,	...	৯৫	০	০
২৯। স্বরাটি আর্কট,	...	৯৭	০	০
৩০। বেনারসি ফ্রিজোলাই,	...	৯২	৬	৬
৩১। উজিরি টাকা,	....	৬৩	০	০
৩২। নারায়ণী আধুলি,	...	৬৩	০	০

নির্ঘণ্ট